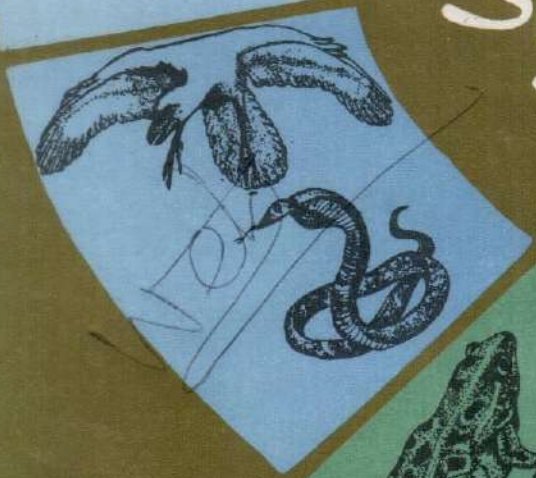

পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব

ডেভিড এটেনবরো

পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব

ডেভিড এটেনবরো

অনুবাদ
তপন চক্রবর্তী

BARDOC Library
Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library
Accession No. 18185
Date 10.6.04 Sign.

পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব
(পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত)

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫ / মে ১৯৯৮

বা/এ ৩৭৭৬
(৯৭-৯৮ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি : ১২)

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জীকৃচি ২৫৩

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা

PRITHIBITE JIBANER UDBHAV (Life on Earth) by David Attenborough. Translated by Tapan Chakraborty. Published by Gholam Moyenuddin. Dircetor. Textbook Division. Bangla Academy. Dhaka 1000. Bangladesh. First Edition : May 1998. Price : Tk. 150-00 only.

ISBN 984-07-3744-9

উৎসর্গ

প্রীতিভাজন
অনুজপ্রতিম
কবি অসীম সাহা-কে

প্রসঙ্গ-কথা

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞান লেখক ডেভিট এটেনবরো তাঁর বিশ্বনন্দিত Life on Earth গ্রন্থটিকে ধারাবাহিকভাবে টেলিভিশনে উপস্থাপন করেছিলেন। উপস্থাপিত বিষয়টি এমনিতেই সবার জন্য আকর্ষণীয়। কিন্তু এটেনবরোর উপস্থাপনার অসাধারণ মনোগ্রাহী ভঙ্গি বিষয়টিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। আমি সেসব অনুষ্ঠান মুগ্ধ বিস্ময়ে উপভোগ করতাম। পরে আমি বইটি সংগ্রহ করি। বই পড়ে আরো বেশি অভিভূত হই। বইটির বাংলা অনুবাদ জীববিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞানমনস্ক কৌতূহলী পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া জরুরি বিবেচনা করি।

১৯৯৪ সালের শুরু থেকে দিনে গড়ে আট ঘন্টা অনুবাদের কাজে ব্যয় করতে থাকি। অনুবাদটি ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক 'রোববার'-এ প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকায়ও একটি পরিচ্ছেদ পত্রস্থ হয়। এসব পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি।

অনুবাদ কর্মে আমি কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু স্বাধীনতা নিয়েছি। আক্ষরিক অনুবাদ পাঠকের কাছে অনেকসময় বিরক্তিকর ঠেকে। তাই ভাবানুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে মূল বক্তব্যের বিকৃতি ঘটিয়ে নয়। এর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই তা করতে হয়। অন্য ভাষার বইয়ের মূল বিষয়বস্তুকে সরস, সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে মাতৃভাষায় পরিবেশন করা সম্ভব হলে, তবেই তা সফল অনুবাদ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। অনুবাদ একটি দুরূহ কাজ। এর নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও সমালোচনামুক্ত কোনো অনুবাদ কর্ম হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আমার সংশয় আছে। আমার অনুবাদ কতটুকু সফল হয়েছে তা পাঠকেরা মূল্যায়ন করবেন। অনুবাদে বড়ো ধরনের ত্রুটি ঘটলে বা অনুবাদ বিষয়ে অন্য কোনো পরামর্শ থাকলে তা পাঠকদের জানাতে অনুরোধ করি।

তপন চক্রবর্তী

সূচিপত্র

		ভূমিকা	নয়
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	অনন্ত বৈচিত্র্য	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	নানা ধরনের দেহগঠন	১৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	অরণ্যের শুরু	৩৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	ঝাঁকে চলা পতঙ্গ	৫১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	জলজয়ী প্রাণী	৬৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	প্রাণীর স্থলভাগ অভিযান	৮১
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	জলরোধী ত্বক	৯৫
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	বায়ুরাজ	১০৯
নবম পরিচ্ছেদ	:	ডিম, শাবকথলে ও ফুলকা	১২৮
দশম পরিচ্ছেদ	:	অপরিবর্তিত ধারাবাহিকতা ও বিবিধায়ন	১৪২
একাদশ পরিচ্ছেদ	:	শিকারী ও শিকার	১৫৬
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	:	বৃক্ষচারী জীবন	১৭০
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	:	যোগাযোগ উদ্ভাবনে পারদর্শী	১৮৬

BANGLA Library Dhaka

ভূমিকা

পঁচিশ বছর আগে, আমি প্রথম গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশ ভ্রমণে যাই। উড়োজাহাজ থেকে বেরিয়ে পশ্চিম আফ্রিকার গুমোট, ভ্যাপসা, অস্বচ্ছ,আবহাওয়ায় পা দেওয়ার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা এখনো স্পষ্ট স্মরণে আসে। বোধ হচ্ছিলো যেনো স্টিম লন্ড্রির ভিতর দিয়ে হাঁটছি। আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্প এতো ঘন ছিলো যে, আমার শার্ট ও আমার শরীর কয়েক মিনিটের মধ্যে ভিজে যায়। এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের কিনারা জুড়ে ছিলো জবা ফুলের ঝোপ। ঝোপে উড়ছিলো সবুজ ও নীল রঙধনু রঙে চকচকে সানবার্ড পাখি। পাখিগুলো পত পত করে পাখা ফুলিয়ে টুকটুকে লাল ফুলে চঞ্চুর সাহায্যে মধু আহরণে ব্যস্ত ছিলো। ওদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। এরপর নজরে এলো এক রক্তচোষা। সরীসৃপটি একটি ডাল আঁকড়ে অনড় হয়ে অপেক্ষমান ছিলো। তবে ওর বড়ো বড়ো চোখের মণি পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া প্রতিটি পোকামাকড়ের পিছু পিছু ঘুরছিলো। ঝোপের পাশে আমি ঘাসের মতো কিসের উপর পা মাড়ালাম। কী বিস্ময়! ঘাসের পাতাগুলো সঙ্গে সঙ্গে বুঁজে গেলো। সবুজ ঘাস যেনো পাতাহীন শাখায় পরিণত হলো। আসলে ওগুলো লজ্জাবতী লতা *Mimosa pudica*। দূরে একটা ডোবা দেখতে পেলাম। জলজ উদ্ভিদে ডোবাটি ছিলো ভর্তি। উদ্ভিদের ফাঁকে ফাঁকে কালো জলে টুকুস্ টুকুস্ করে মাছেরা উঁকি দিচ্ছিলো। বরফে অতি সতর্কভাবে পা ফেলে চলা মানুষের মতো পাতার উপরে লম্বা লম্বা আঙুলযুক্ত পা তুলে হাঁটছিলো পিঙ্গল বর্ণের একটি পাখি। যেদিকে তাকাই, সেদিকে অফুরন্ত নকশা ও রঙ দেখতে পাই। এরকম নিসর্গ দেখার জন্যে আমার মধ্যে প্রস্তুতি ছিলো না। এটি ছিলো প্রকৃতির উজ্জ্বল ও উর্বর জ্বলজ্বলে এক প্রদর্শনী। এ দৃশ্য আমার দৃষ্টি থেকে কখনো বিলীন হবার নয়।

প্রথম যাত্রার পর। প্রায় প্রতি বছর আমি কোনো না কোনোভাবে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল ভ্রমণের সুযোগ গ্রহণ করেছি। অসীম বিচিত্র সেই জগতের কিছু অংশের উপর ছবি বানানোই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। কাজেই মাত্র গুটি কয় মানুষের নজরে পড়া বিরল প্রজাতির একটি প্রাণীকে ছবিতে ধরার জন্যে মাসের পর মাস অরণ্যে ভ্রমণের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পৃথিবীর অরণ্যরাজি তার অতি মনোহর নিসর্গকে অপলক দৃষ্টিতে দেখার দুর্লভ সুযোগ দিয়েছে আমাকে। আমি নিউগিনিতে একটি গাছ ভর্তি বার্ডস অব প্যারাডাইস নামের ঝাঁক ঝাঁক পাখির প্রদর্শনী দেখেছি। মাদাগাস্কারের জঙ্গলে জায়ান্ট লেমুরের লাফ ঝাঁফ দেখেছি। পৃথিবীর জীবিত, ড্রাগনের মতো, সবচেয়ে বড়ো সরীসৃপকে শিকার সন্ধানে ঘুর ঘুর করতে দেখেছি ইন্দোনেশিয়ার ছোট দ্বীপে।

আমাদের বানানো ছবিতে বিশেষ বিশেষ প্রাণীর জীবনযাপন প্রণালীর চালচিত্র ধরে রাখার প্রয়াস পেয়েছি। প্রাণীটি কিভাবে খাদ্য খুঁজে নেয়। কিভাবে আত্মরক্ষা করে, পরস্পর প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয় কী উপায়ে এবং চারপাশের জন্তু ও গাছপালার সাথে সে কিভাবে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেকে, ইত্যাদিই ছবির উপজীব্য বিষয় ছিলো। অবশ্য আমরা একটি বিষয়কে আমল দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা প্রাণীর অভ্যন্তরীণ দেহগঠনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করিনি বললেই চলে। যেমন, একটি টিকটিকিজাতীয় প্রাণীকে সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যের প্রদর্শনীর সাহায্যে বিশেষ সম্ভাব্যতা ও সীমাবদ্ধতার আলোকেই কেবল পুরো বোঝা যায় এবং এই সরীসৃপ বৈশিষ্ট্যটি আবার বোঝা যেতে পারে কেবল এর অতীতের আলোকে।

কাজেই, স্থির করা হয়েছিলো, আমাদের একটা দল কিছু ছবি বানাবে আমরা এতদিন যেভাবে বানানোর চেষ্টা করেছি তা থেকে সামান্য একটু আলাদাভাবে। সেই ছবিগুলোর কাজ হবে কেবল প্রচলিত অর্থে প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে বরং প্রকৃতির ইতিহাস নিয়েও। দলটি পুরো প্রাণিজগতের সমীক্ষা চালাবে এবং আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত দীর্ঘ জীবননাট্য পরিক্রমায় অভিনীত অংশের আলোকে এদের প্রতিটি বড়ো দলকে বিবেচনা করবে। ঐ সব ছবি নির্মাণে ব্যয়িত তিনি বছরের ভ্রমণ ও গবেষণা থেকেই এই গ্রন্থের উদ্ভব।

তিনশ পৃষ্ঠার মধ্যে ৩০০ কোটি বছরের ইতিহাস তুলে ধরবে গিয়ে, হাজার হাজার প্রজাতি সম্বলিত একদল প্রাণীর বিবরণ একটি পরিচ্ছেদে দিতে গিয়ে অনেক কিছুই দিতে হয়েছে। আমার পদ্ধতি ছিলো একটি গ্রুপের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটিমাত্র সূত্র অনুধাবনের চেষ্টা করা এবং তারপর সেটি নিশ্চিত করতে মনোযোগী হওয়া এবং দৃঢ়তার সঙ্গে অন্য সকল বিষয় না যত আকর্ষণীয়ই হোন, উপেক্ষা করা। এতে অবশ্য প্রাণিজগতের উপর এমন একটি উদ্দেশ্যের উপস্থিতি চাপিয়ে দেবার ঝুঁকি রয়েছে যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ডারউইন দেখিয়েছেন যে, বৈশিষ্ট্য পুঞ্জীভূত হওয়াই বিবর্তনের চালিকা শক্তি। অগণিত প্রজন্ম ধরে প্রাণিদেহে বৈশিষ্ট্যের এই পুঞ্জীভবন চলছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের কঠোর নিয়মে বংশগতিতে হঠাৎ পরিবর্তনের কারণে এতে ব্যত্যয় ঘটেছে। এই প্রক্রিয়ার ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে অল্প কথায় অতি সহজে বলা যায় যে, প্রাণীরা নিজেরাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটা পরিবর্তন আনার জন্য চেষ্টা করে চলেছে। যেমন, মাছ শুষ্ক স্থলভূমিতে আরোহণের লক্ষ্যে পাখনাকে উপাঙ্গে পরিণত করেছে, সরীসৃপ আকাশে উড়ার লক্ষ্যে, আঁশকে পালকে পরিবর্তিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত পাখির রূপ ধারণ করেছে। এ বিষয়ে এ ধরনের বস্তুনিষ্ঠ কোনো প্রমাণ নেই এবং আমি এসকল প্রক্রিয়াকে যুক্তিসম্মতভাবে সংক্ষিপ্ত পথে বর্ণনাকালে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিনি যা অন্য অর্থ বহন করতে পারে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সত্যিকারের নায়ক আদি প্রাণীদের প্রতিনিধি বর্তমানের জীবিত প্রাণীদের উপর ভিত্তি করেই ইতিহাসের প্রায় প্রধান প্রধান সকল ঘটনার বিবরণ দেওয়া সম্ভব। কিভাবে ফুসফুসের বিকাশ ঘটেছে তা জানা যায় লাঙ্গফিশ বা ফুসফুসধারী মাছ গবেষণা করে। পাঁচ কোটি বছর আগের অরণ্যচারী খুরওয়ালা প্রাণীর প্রতিনিধিত্ব করে বর্তমানের মাউস ডিয়ার। দেহে বৈশিষ্ট্য আরোপের প্রকৃতি স্পষ্ট বোঝা না গেলে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। বিরল কিছু ক্ষেত্রে একটি জীবিত প্রজাতির সাথে কয়েকশ কোটি বছর আগে শিলীভূত প্রাণীর অবশেষের জীবাশ্মের সাথে মিল দেখা যায়। হতে পারে, বিশাল কাল ধরে এটি পরিবেশে একটি সংরক্ষিত স্থান দখল করে অপরিবর্তিত থেকে গেছে এবং এটি এতো চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলো যে, এতে পরিবর্তন আসার কোনো কারণ ঘটেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পূর্বপুরুষদের দেহ বৈশিষ্ট্যসমূহের কতকগুলো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বর্তমানের উত্তরসুরি জীবিত প্রাণীর দেহে থাকতে পারে। তবে অন্যান্য অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকে। লাঙফিশ ও মাউস ডিয়ার মৌলিকভাবে পূর্বপুরুষদের মতো দেখালেও এরা এবং ওদের পূর্বপুরুষের পরস্পরের অনুরূপ নয়। এই পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বার বার "পূর্বপুরুষের গঠন প্রকৃতি যা বর্তমানের জীবিত প্রজাতির গঠন-প্রকৃতির খুব নিকট সাদৃশ্যবাহী" বলে উক্তি করা হলে তা বিষয়টিকে ঘোলাটে করে তোলে এবং তা কল্পকাহিনী মনে হয়। কিন্তু কোনো জীবিত প্রাণীর নামোল্লেখ করে কোনো পুরোনো প্রাণীর উদাহরণ যখন দিয়ে থাকি তখন একে যথার্থ মনে করা যাবে।

প্রাণীর বিবরণ দান প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম ব্যবহারের পরিবর্তে আমি পরিচিত ইংরেজি নাম ব্যবহার করেছি যাতে এই গ্রন্থের আলোচনায় প্রাণীটিকে উপস্থাপনের সাথে সাথে সবার কাছে এর পরিচয় বোধগম্য হয়ে উঠে। যদি কেউ এর শারীরবিদ্যা ও জীবনালেখ্য অধিক জানায় আগ্রহী হন তাহলে নির্ঘন্টে প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম দেখতে পাবেন। প্রাচীন ভূ-বিদ্যায় বিভিন্নকাল বা যুগের সে বিশেষনিক নাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা সুবিধার্থে আমি কোটি বছরের হিসেবে বয়স বোঝানোর অবাধ স্বাধীনতা নিয়েছি। গ্রন্থের রঙিন ছবির অংশের শেষ পৃষ্ঠায় প্রাণীর কুলপঞ্জীতে কোটি বছরের হিসাবের সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক যুগের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। যে সকল বিজ্ঞানীর গবেষণাপ্রসূত নানা তথ্য ও তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এই গ্রন্থের কলেবর নির্মিত। আমি গ্রন্থে তাঁদের নাম উল্লেখ করিনি। বর্ণনায় সরলতা ও স্পষ্টতা বজায় রাখার প্রয়োজনেই মূলত এ রকম ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। প্রাণী পর্যবেক্ষণ করে যাঁরা বিনোদন লাভ করেছেন, সেসব সহযাত্রী সাথীদের ঋণ স্বীকারে আমার কোনো কুণ্ঠা নেই। তাদের গবেষণার মাধ্যমে তারা আমাদের দিয়েছেন সেই অতি মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি, যা প্রকৃতির সকল প্রতিভাসের মাঝে এর অবিরাম প্রবহমানতা অনুধাবনে এবং প্রকৃতিতে আমাদের নিজের স্থান চিনে নিতে সাহায্য করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনন্ত বৈচিত্র্য

অজানা প্রাণী অবিষ্কার কঠিন কাজ নয়। দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন-বাদাড়ে একটা পুরো দিন কাটিয়ে আসুন। বনে বসে বসে মরা গাছের গুঁড়ি উল্টান। গাছের বাকলের ফাঁকে দৃষ্টি ফেলুন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাতার স্তূপ সরিয়ে দিন, অথবা রাতে সাদা কাপড়ের উপর মার্কারি আলো ছড়িয়ে দিন। দেখবেন সর্বত্র রয়েছে নানা ধরনের বিচিত্র ছোট ছোট প্রাণী। আপনার সংগ্রহ ভাণ্ডার মথ, শূককীট, মাকড়সা, দীর্ঘনাসা ছারপোকা, জ্বলজ্বলে কাচপোকা, গুবরে পোকা, বোলতার আকৃতির নিরীহ প্রজাপতি, বোলতারই মতো পিঁপড়া, লাঠি বা পাতার মতো পোকায় ভরে উঠবে। লাঠির মতো পোকা দেখে আপনি হয়তো বুঝতেই পারেন নি যে এটি একটি জীব। মনে হচ্ছিলো যেনো গাছের কাঁটা। কাছে যেতেই কাঁটাটি চলতে শুরু করলো। সুন্দর পাতা মনে করে যেই না হাত বাড়ালেন অমনি ফুরুৎ। পাখা দুলিয়ে উড়ে গেলো প্রজাপতি। জীবজগতের এই বৈচিত্র্য দেখে দেখে সারাদিন আপনার বিস্ময়ের ঘোর কাটবে না। আপনার সংগ্রহ করা এইসব প্রাণীদের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই এমন কোনো একটি থাকতে পারে যার বর্ণনা এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানে নেই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচুর জানাশোনা আছে এমন বিশেষজ্ঞ পাওয়া এবং তার মাধ্যমে আজনা প্রাণীটিকে শনাক্ত করার কাজটি বেশ কঠিন হতে হতে পারে।

এইসব স্যাঁতস্যাঁতে, ভেজা, স্বল্প আলোর বনে সবুজ নিসর্গে কতো বিচিত্র প্রজাতির প্রাণী রয়েছে কেউ বলতে পারে না। গোটা পৃথিবীতে বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদে সবচেয়ে সমৃদ্ধ এই বনগুলো।। অবশ্য এদেরকে পৃথিবীর অন্য বনেও পাওয়া যাবে। বানর, ধারালো দাঁতের ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, মাকড়সা, হামিংবার্ড ও প্রজাপতির মতো বড়ো বড়ো গোষ্ঠীর প্রাণী তো রয়েছেই। আবার প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বহু বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রাণী। এখানে রয়েছে ৪০ প্রকারের তোতা পাখি, ৭০ ধরনের বানর, ৩০০ ধরনের হামিংবার্ড ও হাজার হাজার প্রকারের প্রজাপতি। আপনার অসতর্ক মুহূর্তে আপনি শত শত প্রকারের মশার আক্রমণের শিকারও হতে পারেন।

১৮৩২ সালে লন্ডন থেকে এইচ. এম. এস. বিগল নামের জাহাজ পাড়ি জমিয়েছিলো সমুদ্রে। উদ্দেশ্য নানা কিছুর অনুসন্ধান। জাহাজ একসময় ভিড়লো এসে রিও ডি জেনেরিও-এর বাইরে একটি বনের ধারে। বনটি দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনের মতোই। এই জাহাজে ছিলেন ২৪ বছর বয়সী ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। একদিন তিনি একটি ছোট জায়গা থেকে একধরনের গুবরে পোকার ৬৮টি প্রজাতি সংগ্রহ করেন। একই ধরনের প্রাণীর এতো প্রজাতির নমুনা দেখে বিজ্ঞানী অবাক হয়ে যান। তিনি যে বিশেষভাবে এসবের অনুসন্ধান করছিলেন তা নয়। ডারউইন ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "ভবিষ্যতে কোনো কীটতত্ত্ববিদ পোকা-মাকড়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নে প্রয়াসী হলে, বিচিত্র নমুনার পোকার

এই সমাবেশ তাকে দুর্ভাবনায় ফেলার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।" ডারউইনের সময়ে প্রচলিত বিশ্বাস ছিলো যে, কোনো প্রজাতির প্রাণীতে কোনো পরিবর্তন সাধিত হবে না এবং ঈশ্বর প্রত্যেক প্রজাতিকে আলাদা আলাদা ও এককভাবে সৃষ্টি করেছেন। ডারউইন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্ম বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। অথচ তিনি একই ধরনের প্রাণীর বিচিত্র নমুনা দেখে গভীরভাবে বিচলিত বোধ করেছিলেন।

বিগল পরবর্তীকালে তিন বছর দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল ধরে চলে কেপ হর্ন ঘুরে আবার উত্তরদিকে চিলির উপকূলে আসে। এরপর অভিযান চলে প্রশান্ত মহাসাগরে। মূল ভূখণ্ড থেকে ৬০০ মাইল দূরে নির্জন গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে এসে জাহাজ নোঙর ফেলে। এখানে এসে ডারউইনের মনে প্রজাতির সৃষ্টি সম্পর্কে আবার প্রশ্ন জাগে। কারণ, এখানে তিনি নূতন ধরনের প্রজাতির সন্ধান পান। তিনি মূল ভূখণ্ডে যে সকল প্রজাতি দেখতে পেয়েছিলেন সেসবের সাথে এই দ্বীপপুঞ্জের প্রাণীদের সাধারণ মিল দেখতে পেলেও এখানকার প্রাণিদেহের নূতন বৈশিষ্ট্য তাঁকে চমৎকৃত করে। ব্রাজিলের নদীতে সন্তরণকারী কালো লম্বা গলার করমোরান্ট বা লিপ্তপাদ পাখি তিনি এখানেও দেখতে পান। কিন্তু গ্যালাপাগোসের পাখিগুলোর পাখা তুলনামূলকভাবে অনেক খাট এবং পাখার পালকও আকারে ছোট। ফলে এখানকার পাখিরা ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে জলচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এখানে ইগুয়ানা নামের একজাতের বড় টিকটিকি রয়েছে। এদের পিঠের মাঝ বরাবর রয়েছে খাড়া আঁশের সারি। মহাদেশের ইগুয়ানারা বৃক্ষচারী, ওদের খাদ্য গাছের পাতা। কিন্তু দ্বীপপুঞ্জে গাছ-পালা লতা-পাতা কম। কাজেই, এদের একটি প্রজাতিকে কেবল সমুদ্রিক গুল্মের উপরই জীবনধারণ করতে হয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের তোড়ে ওদের ভেসে যাবার ভয়। তাই, ওদেরকে পাথর আঁকড়ে ধরে থাকতে হয়। পাথর আঁকড়ে থাকার জন্য পায়ে মজবুত ও দীর্ঘ নখর থাকা চাই। এদের এরকম নখর রয়েছে যা মূল ভূখণ্ডের প্রজাতিতে দেখা যায় না। মূল ভূখণ্ডে যে ধরনের কচ্ছপ রয়েছে এখানেও সে ধরনের কচ্ছপ দেখা যায়। তবে এখানকার কচ্ছপ আকারে অনেক বড়। মানুষ এদের পিঠে সওয়ার হতে পারে। গ্যালাপাগোসের ইংরেজ ভাইস গভর্নর ডারউইনকে জানিয়েছিলেন যে, গ্যালাপাগোসের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কচ্ছপের নমুনায় ভিন্নতা দেখা যায়। প্রতিটি দ্বীপের কচ্ছপের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। কচ্ছপ দেখে বোঝা যায় কোন্‌টা দ্বীপের। অপেক্ষাকৃত বেশি জলবিধৌত দ্বীপগুলোতে, যেখানে প্রচুর গাছপালা জন্মে, বসবাসকারী কচ্ছপের ঘাড়ের উপরের দিকে খোলকের সামনের অংশ ক্রমে নিচু হয়ে বেঁকে গেছে। কিন্তু শুষ্ক দ্বীপে লতাপাতা তেমন জন্মায় না বলে কচ্ছপকে ক্যাকটাস, গাছের পাতা ছিড়ে খেতে হয়। এ কারণে ওদের গলা লম্বা হওয়া চাই। হয়েছেও তাই। এদের ঘাড়ের উপরের খোলক খাড়া হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে যাতে গলা উঁচু করায় কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়।

ডারউইনের মনে সন্দেহের দোলা। তিনি ভাবলেন, প্রজাতিগুলো চিরকাল অপরিবর্তিত থাকে না। এমনও হতে পারে, হাজার হাজার বছর আগে কাঠ বা লতাপাতার ভেলায় চড়ে উত্তর আমেরিকার সরীসৃপ ও পাখি সমুদ্রে এসে পড়েছিলো এবং গ্যালাপাগোস দ্বীপে আশ্রয় পেয়েছিলো, এখানের নূতন পারিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এদের দেহে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এদের বর্তমান রূপ ঐ পরিবর্তনেরই ফল।

মূল ভূখণ্ডের আত্মীয়দের দেহের সাথে দ্বীপপুঞ্জের প্রাণীদের দেহের পার্থক্য খুব কম দেখা গেলেও, যদি এমন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঘটে থাকে তাহলে কোনো প্রাণিগোষ্ঠীতে বড় ধরনের রূপান্তরের সম্ভাবনা কি নেই? এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, মাছের দেহে পেশিবহুল পাখনার সৃষ্টি হয়েছিলো। এই পাখনায় ভর করে মাছ ডাঙায় হামাগুঁড়ি দিয়েছিলো এবং উভচর প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। উভচর প্রাণীর ত্বক জলরোধী ত্বকে পরিণত হওয়ার ফলে উভচরেরা সরীসৃপে পরিণত হয়েছিলো। নরবানরের মতো কতকগুলো প্রাণী খাড়া হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলো। যার দরুণ সম্ভবত এই নরবানরেরাই ছিলো মানুষের পূর্বসূরি।

সত্যি বলতে কি, এই ধারণা সম্পূর্ণ নূতন কোনো ধারণা নয়। ডারউইনের আগে অনেকে পৃথিবীর সকল প্রাণীর আন্তঃসম্পর্কের কথা প্রকাশ করেছেন। ডারউইন তাঁর বৈপ্লবিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এই সকল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। স্বচ্ছ ধারণা আয়ত্ত করার ফলে তিনি দার্শনিক অনুমানের স্থলে বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে বহু প্রমাণ হাজির করেছিলেন। এসব প্রমাণ হাতে-নাতে যাচাই করে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা স্থির করা দিয়েছিলো বলে বিবর্তনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার আর কোনো উপায় থাকলো না।

তাঁর যুক্তির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এরকম : একই প্রজাতির স্বতন্ত্র সকল সদস্য অভিন্ন নয়। উদাহরণ দিয়ে ডারউইন বলেন, "বড় আকারের কচ্ছপের একগুচ্ছ ডিম ফুটে যে সব বাচ্চা বেরোয় জিনের (কোষের ক্রোমোজোম যা দিয়ে গঠিত) গঠন প্রকৃতির কারণে তাদের কতকগুলোর গলা অন্যদের তুলনায় লম্বা হয়ে থাকে। খরার সময় লম্বা গলাওয়ালা কচ্ছপেরা গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। অথচ খাটো গলার সহোদরেরা তখন উপোসে মারা পড়ে। কাজেই, যেসব প্রাণী চারপাশের সাথে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তারাই প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য নির্বাচিত হয়। তাদের অর্জিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। দেখা যাবে কয়েক প্রজন্ম পরে শুষ্ক দ্বীপে লম্বা গলাওয়ালা কচ্ছপের সৃষ্টি হবে। অথচ তখনও জলবিধৌত দ্বীপে তাদের আত্মীয় খাট গলার কচ্ছপেরা বিচরণ করতে থাকবে। এভাবে একটি প্রজাতি থেকে অন্য একটি প্রজাতির উদ্ভব হয়ে থাকে।

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ থেকে চলে যাবার দীর্ঘদিন পর ডারউইনের কাছে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পঁচিশ বছর ধরে তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করেন। ১৮৫৯ সালে, ডারউইনের বয়স যখন ৪৮ বছর, তখনই প্রথম তিনি তাঁর মতবাদ প্রকাশের কথা ভাবেন। অন্য এক তরুণ প্রকৃতিবিদ যদি একই রকম সূত্র উপস্থাপন না করতেন তাহলে হয়তো তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রকাশে আরো বিলম্ব করতেন। সেই তরুণ প্রকৃতিবিদের নাম আলফ্রেড ওয়ালেস। তরুণটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসে গবেষণা করছিলেন। ডারউইন তাঁর বক্তব্য বিশদভাবে যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছিলেন সে গ্রন্থের শিরোনাম : *The Origin of Species by means of Natural Selection Or Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*। বাংলা শিরোনাম : **প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব বা জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা** গোষ্ঠীসমূহের সংরক্ষণ।

সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব বিতর্কিত, পরীক্ষিত, পরিশীলিত, নিয়ন্ত্রিত ও ব্যাখ্যাত হয়ে চলেছে। বংশগতিবিজ্ঞান, অণুজীববিজ্ঞান, জনসংখ্যা বিষয়ক গতিবিজ্ঞান ও আচরণবিজ্ঞান বিষয়ে সর্বশেষ আবিষ্কারসমূহ এতে নূতন নূতন মাত্রা যোগ করেছে। এই তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্ব প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে এই তত্ত্বকে চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। জীবের দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস আছে। দীর্ঘ এই সময়কালে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে অবিরাম পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তিত প্রজাতিসমূহ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আমাদেরকে সাহায্য করেছে ও করছে।

পৃথিবীর মহাফেজখানা হলো পাললিক শিলা। জীবের পরিবর্তনের ইতিহাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আংশিক হলেও, এই মহাফেজখানায় বিধৃত রয়েছে। অধিকাংশ প্রাণীরই মৃত্যুর পর তাদের অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়ায় দুষ্কর। তাদের দেহের মাংস বিনষ্ট হয়, খোলস ও হাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গুঁড়িয়ে যায়। কিন্তু কৃচিৎ কখনো হাজার হাজার প্রাণীর মধ্যে দু'একটির ক্ষেত্রে অন্যরকম ঘটে। একটি সরীসৃপ হয়তো জলাভূমিতে আটকে গিয়ে মারা পড়লো। জলে এর দেহ পচে গেলো কিন্তু হাড় কাদায় ডুবে থাকলো। হাড় জলজ মরা উদ্ভিদের নিচে চাপা পড়লো। শত শত বছর ধরে এভাবে চাপা পড়তেই থাকলো। জমা স্তূপ একসময় পিট–এ রূপান্তরিত হলো। সমুদ্র স্তরের পরিবর্তনের ফলে জলাভূমিতে প্লাবন আসতে পারে এবং পিটের উপর বালির স্তর জমতে পারে। বিশাল সময়ের ব্যবধানে চাপে থাকা পিট কয়লায় রূপান্তরিত হয়। সরীসৃপের হাড় তখনও থেকে যায়। উপরে স্থিত শিলার প্রবল চাপে ও খনিজসমৃদ্ধ দ্রবণের দ্বারা হাড়ের ক্যালসিয়াম ফসফেটে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। শেষ পর্যন্ত হাড় পাথরে পরিণত হয়। কিন্তু তখনো হাড়ের বাইরে আকৃতি প্রাণীর জীবিত অবস্থার হাড়ের আকৃতির মতো থাকে (সামান্য কিছু বিকৃতি সত্ত্বেও), কখনো কখনো হাড়ের বিশদ কৌষিক গঠনও সংরক্ষিত থাকে। এসকল কোষকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করে দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোষে জড়িয়ে থাকা রক্তনালি ও স্নায়ুসূত্রও অণুবীক্ষণযন্ত্রে ধরা পড়ে।

জীবদেহ অশ্মীভূত হবার প্রকৃষ্ট স্থান হলো হ্রদ ও সমুদ্র। এখানে নুড়িপাথর ও চুনাপাথর ধীরে ধীরে জমা হয়। স্থলভাগে পাহাড়ের বেশিরভাগই স্তর জমে সৃষ্টি হয় না, কিন্তু ক্ষয়ে ভেঙে পড়ে। খুব কৃচিৎ বালিয়াড়ি তৈরি হয় এবং তা অটুট থাকে। ফলে, স্থলচর প্রাণীর অশ্মীভূত হতে পারে শুধু তখনই, যদি ওদের দেহাবশেষ কোনো কারণে জলে পড়ে যায়। এটি যেহেতু ব্যতিক্রমী ঘটনা, তাই আমরা কখনো অতীতের স্থলচর প্রাণিকূলের পূর্ণ বিবরণ জীবাশ্মের মাধ্যমে আশা করতে পারি না। মাছ, শামুক, সমুদ্র সজারু (Sea urchin) ও প্রবালজাতীয় জলচর প্রাণীর ফসিল বা জীবাশ্ম সংরক্ষিত থাকা খুব স্বাভাবিক। অশ্মীভূত হবার জন্য কতকগুলো ভৌত ও রাসায়নিক পরিস্থিতি থাকা অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় ভৌত (physical) ও রাসায়নিক (chemical) পরিস্থিতির অবর্তমানে মা শামুক ইত্যাদি জীবাশ্মের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। শিলাস্তরে এদের একটি ক্ষুদ্র অংশ বর্তম পাওয়া যাচ্ছে। আবার আবিষ্কারের আগে এর থেকেও বেশ কিছু ক্ষয়ও নষ্ট হয়ে যায়। অ জীবাশ্ম সংগ্রাহকদের সংগ্রহ অভিযানের আগেই অনেক জীবাশ্ম হারিয়ে যায়। এ

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত যে সংখ্যক জীবাশ্ম সংগৃহীত হয়েছে তা দেখলে বিস্ময় জাগে। এসব জীবাশ্ম থেকে ক্রমশই প্রাণী সম্বন্ধে সুসঙ্গত ও বিশদ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা জীবাশ্মের কাল নিরূপণ করবো কি করে? বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর জানতে পারলেন যে, শিলার ভেতরেই রয়েছে ভূতাত্ত্বিক সময়মাপক ব্যবস্থা বা জিওলজিক্যাল ক্লক। কিছু কিছু রাসায়নিক উপাদান সময়ের সাথে সাথে ক্ষয়িত হয়। ক্ষয় প্রক্রিয়ার কারণেই তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়। পটাশিয়াম ক্ষয়িত হয়ে আর্গন, ইউরেনিয়াম, লেড বা সিসায়, রুবিডিয়াম, স্ট্রনশিয়ামে রূপান্তরিত হয়। কি হারে এই ক্ষয় সাধিত হয় তার পরিমাপ করা যায়। শিলায় প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়িক উপাদানের পরিমাণগত অনুপাত মাপা যায় এবং কোন সময়ে প্রাথমিক উপাদানটি গঠিত হয়েছিলো তার হিসাবও পাওয়া যায়। যেহেতু এ ধরনের বেশ কিছু জোড়া-উপাদান বিভিন্ন গতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেহেতু এসকলের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে ক্ষয়েরও সময় বের করে নেয়া যায়। এই কৌশলের জন্য উন্নতমানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি আবশ্যক। এটি কেবল বিশেষজ্ঞদের এক্তেয়ারাধীন। কিন্তু যে কেউ তুলনামূলক বিচার করে, সাধারণ যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বহু শিলার গঠনকাল নিরূপণ করতে পারে। এভাবে জীবাশ্মের ইতিহাসে সংঘটিত বড় ধরনের ঘটনাপ্রবাহেও জানা সম্ভব হয়। যদি শিলাসমূহ স্তরীভূত থাকে এবং তা এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত না হয়, তাহলে অবশ্যই উপরের স্তর থেকে নিচের স্তরের বয়স বেশি হবে। কাজেই, আমরা স্তর বিবেচনা করে প্রাণীর ইতিহাস অনুসরণ করতে পারি। ভূগর্ভের গভীর থেকে গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রাণীসমূহের অতীত ইতিহাস নির্ণয় করতে পারি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের গ্র্যান্ড ক্যানিয়নই ভূপৃষ্ঠের গভীরতম ফাটল মুখ। যে সকল শিলা কেটে কলরাডো নদী প্রবাহিত, সেগুলো এখনো মোটামুটি অনুভূমিকভাবে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে—লাল, হলুদ ও বাদামি রঙের রাশি রাশি শিলা, কখনো সকালের আলোয় গোলাপি, দূর থেকে দেখলে কখনো বা নীল। এখানকার মাটি এত শুষ্ক যে কোথাও কোথাও কেবল নিঃসঙ্গ জুনিপার গাছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেনো ঝিমোয়। দূরারোহ পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বিন্দুর মতো খর্বকায় ঝোপঝাড় ঝুলে থাকে। শিলা কোথাও নরম, কোথাও শক্ত, তবে ঝকঝকে ও অনমনীয়। অধিকাংশ শিলাই পলি বা চুনে গঠিত। এসব শিলা এক সময় অগভীর সমুদ্রের তলদেশে জমা পড়েছিলো। একসময় সমগ্র উত্তর আমেরিকা এই সমুদ্রের নিচে ছিলো। নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে শিলাখণ্ডে এর চিহ্ন ধরা পরে। বোঝা যায়, কখন এই স্থলভাগের উত্থান ঘটে, কখন সমুদ্র জলশূন্য ও শুষ্ক হয়ে যায়, পরে সমুদ্র তলদেশে জমা পড়া শিলায় কিভাবে ক্ষয় ধরে এবং পরবর্তীকালে স্থলভাগ আবার জলমগ্ন হয়ে সমুদ্রের সৃষ্টি হয় এবং তলানী জমতে থাকে। এই দুই পর্যায়ের মধ্যেকার বিরতিকাল সত্ত্বেও জীবাশ্মের ইতিহাস স্পষ্ট।

একটি খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে দিনব্যাপী বিহারে আপনি গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কিনারা থেকে গভীর তলদেশের দিকে ধীরে ধীরে নেমে যেতে পারেন। প্রথমে যে সকল শিলা অতিক্রম করবেন সেগুলোর বয়স প্রায় ২০ কোটি বছর। এসব শিলায় স্তন্যপায়ী বা পাখিজাতীয় কোনো প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাবেন না। তবে এখানে সরীসৃপের দেহাবশেষ

দেখতে পাবেন। এর খুব কাছাকাছি আপনি সারি সারি রেখার মতো দেখবেন। এই রেখা বিশাল শিলাখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। রেখাগুলো চতুষ্পদী কোনো ছোট প্রাণীর দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। প্রাণীটি হতে পারে টিকটিকির মতো কোনো সরীসৃপয়া বালুকাবেলায় দৌড়াতো। একই স্তরে অন্য কিছু শিলায় দেখা যাবে ফার্নজাতীয় গুল্মের পাতার ও পতঙ্গের পাখনার ছাপ।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের মাঝ বরাবর এলে আপনি ৪০ কোটি বছরের পুরনো চুনাপাথর দেখতে পাবেন। এই শিলায় সরীসৃপের জীবাশ্ম পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখানে আপনি বিস্ময়ের সাথে বর্মধারী মাছের অবশেষ লক্ষ করতে পারেন। আরো ঘণ্টাখানেক চলার পরে আপনি আরো ১০ কোটি বা ৫০ কোটি বছরের পুরনো শিলার সাথে পরিচিত হবেন। এই শিলায় কোনো প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন না। এখানে কিছু কিছু শামুকের খোলস ও সামুদ্রিক কীট নজরে পড়বে। এ থেকে বোঝা যায় এটি একসময় কাদাময় সমুদ্র তলদেশ ছিলো। চারভাগের তিনভাগ পথ পেরিয়ে আসার পরও আপনি চুনাপাথরের স্তর বেয়েই নামতে থাকবেন। কিন্তু এখন এই পাথরে জীবের কোনো হদিশ মিলবে না। বেলাশেষে আপনি একেবারে তলদেশে পৌঁছবেন যেখানে দু'পাশের উঁচু শিলা-প্রাচীরের নিচে দিয়ে বয়ে চলে কলোরাডো নদী। এখন আপনি ফাটল মুখের প্রান্তভাগ থেকে খাড়াখাড়ি এক মাইল (১.৬২ কিলোমিটার) নিচে অবস্থান করছেন, যেখানকার শিলার বয়স ২০০ কোটি বছর। এখানে আপনি জীবনের প্রথম উন্মেষের উৎস পাবার আশা রাখতে পারেন। যদিও এখানে জীবদেহের অবশেষ পাওয়া যাবে না। উপরের মতো এখানে কালো মসৃণ শিলা অনুভূমিক স্তরে সজ্জিত নয়। এই অংশে গোলাপি গ্র্যানিট পাথর শিলাস্তরের বুকে ছড়িয়ে আছে।

পাললিক শিলা এবং চুনাপাথরের গায়ে জীবের চিহ্ন না থাকার অর্থ কি এই যে, এগুলো এত পুরনো যে সবগুলো চিহ্ন ধ্বংস হয়ে একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে? প্রথম দিককার প্রাণীগুলো কি শামুক বা কীটের মতো জটিল গঠনের দেহবিশিষ্ট ছিলো? ভূবিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরে এসকল প্রশ্নে বিভ্রান্তিতে ভুগেছেন। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এ ধরনের শিলায় জীবদেহের অবশেষ খুব সতর্কতার সাথে খুঁজে দেখা হয়েছে। একটা বা দুটো অদ্ভুত আকৃতির বস্তু পাওয়া গেছে। কিন্তু বেশিরভাগ বিজ্ঞানী এগুলোকে জীবাঙ্গ বলে স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে এগুলো শিলা গঠনের ভৌতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এসবকে জীবাঙ্গ বলে মেনে নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ১৯৫০ সালের দিকে গবেষকরা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে কিছু রহস্যময় শিলার পরীক্ষা শুরু করেন।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের এক হাজার মাইল উত্তর-পূর্বে, কলোরাডো নদীর পাশে যে বয়সের শিলা রয়েছে, সে বয়সের শিলা পাওয়া গেছে লেক সুপিরিয়রেও। শিলাসমূহের কোনো কোনোটিতে খণ্ড খণ্ড জোড়া লাগানো চকমকি পাথরের মতো মসৃণ পদার্থ রয়েছে। এসবের নাম দেয়া হয়েছে চার্ট (chert)। গত শতকে এগুলো খুব পরিচিত ছিলো, কারণ খনিশ্রমিকরা গাদা বন্দুকে চার্ট ব্যবহার করতো। শিলার অভ্যন্তরে যত্রতত্র বিস্ময়কর এককেন্দ্রিক বলয়াকৃতির সাদা সাদা দাগ দেখা যেতো। বলয়ের ব্যাস এক বা একাধিক মিটার হয়ে থাকতো। বলয়গুলো কি আদি সমুদ্রের তলদেশে কাদার ঘূর্ণাবর্ত দ্বারা সৃষ্ট, না কোনো জীবসমষ্টির সৃষ্টি, সে ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত জবাব দিতে পারেন নি। ফলে, এগুলোর দায়সারা নাম রাখা হয় স্ট্রোম্যাটোলাইট। স্ট্রোম্যাটোলাইট গ্রিক শব্দ, যার অর্থ পাথুরে

গলিচা। কিন্তু গবেষকরা এসব বলয়ের অংশবিশেষ কেটে, টুকরো টুকরো করে ও গুঁড়িয়ে নিয়ে খুব পাতলা স্বচ্ছ স্তরে পরিণত করেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় তাঁরা এতে সরল জীবের আকৃতি লক্ষ করেন। জীবগুলো ছিলো আকারে এক মিলিমিটারের এক বা দুই ভাগ। কতকগুলোকে দেখাচ্ছিলো শৈবালের সূত্রবৎ দেহের মতো। অন্যগুলো নিঃসন্দেহে জীববস্তু হলেও সেগুলোকে বর্তমানের কোনো জীবের সাথে তুলনা করা চলে না। অবশ্য কতকগুলোকে সম্প্রতি আবিষ্কৃত ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় সরল জীবের মতোও দেখাচ্ছিল।

অণুজীবের ন্যায় এমন ক্ষুদ্র বস্তু যে আদৌ অশ্মীভূত হতে পেরেছিলো তা অনেকের কাছে প্রায় অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়। এগুলোর দেহাবশেষ যে এত দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকবে এমনটি বিশ্বাস করা আরো শক্ত। সিলিকা দ্রবণ মৃত অণুজীবগুলোকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ঘনীভূত হয়ে চার্টে রূপান্তরিত হয়েছিলো মসৃণ দানাদর সংরক্ষণকারী বস্তু হিসেবে। চকমকি পাথরের চার্টে অশ্মীভূত অণুজীব আবিষ্কৃত হওয়ায়, শুধু উত্তর আমেরিকায় নয়, সারা পৃথিবীতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়। অনুসন্ধানের ফলে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় অন্য অণুজীবাশ্ম আবিষ্কৃত হলো। এসবের কোনো কোনোটি, আশ্চর্যজনকভাবে, পূর্বে আবিষ্কৃত অণুজীবের হাজার কোটি বছর আগেকার বলে জানা গেলো। কিন্তু যদি আমাদেরকে জীবনের উদ্ভবের সূত্র বের করতে হয় তাহলে আদিতম অণুজীবাশ্মেরও হাজার কোটি বছর আগে দৃষ্টি দিতে হবে। এ সময়ে পৃথিবী ছিলো জীবশূন্য এবং নবজাত পৃথিবীতে তখনো শীতলীকরণ প্রক্রিয়া চলছিলো।

আমরা এখন যে গ্রহটিতে বাস করছি সে গ্রহের অবয়ব পুরো ভিন্ন রকম ছিলো। গ্রহটির চারপাশ ঘিরে ছিলো জলীয় বাষ্পের মেঘ। এই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সাগরের সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু সাগরের পানি ছিলো গরম। তখনকার ভূখণ্ডের রূপ কি ছিলো আমরা জানি না। গঠন ও অবস্থান বিচারে সে ভূখণ্ড যে আজকের ভূখণ্ডের মতো ছিলো না তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তখন বহু সংখ্যক আগ্নেয়গিরি ছিলো। আগ্নেয়গিরি প্রচুর লাভা ও ছাই উদ্গীরণ করছিলো। বায়ুমণ্ডল ছিলো পাতলা। বায়ুমণ্ডলে ছিলো ঘূর্ণায়মান হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড, এমোনিয়া ও মিথেন। অক্সিজেন ছিলো না। থাকলেও কম। একেবারে কম। তখন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণ অতি বেগনি রশ্মি এসে পড়তো। বর্তমানে পৃথিবীতে যে সকল জীব রয়েছে তারা ঐ পরিমাণ অতি বেগনি রশ্মিতে বেঁচে থাকতে পারতো না। সে সময়েও মেঘে মেঘে ঘর্ষণে বিদ্যুতের ঝড় উঠতো এবং জলে-স্থলে বজ্রপাত হতো ও বিদ্যুৎ চমকাতো।

১৯৫০ সালের দিকে উপরিলিখিত পৃথিবীর আদি অবস্থায় উল্লিখিত রাসায়নিক উপাদানসমূহের কি হাল হয় তা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা হয়। জলীয় বাষ্পের সাথে মিশ্রিত গ্যাসসমূহে বৈদ্যুতিক চার্জ ও অতিবেগনি রশ্মি প্রক্ষেপ করা হয়। এক সপ্তাহ এই প্রক্রিয়া চালানোর পর মিশ্রণে জটিল মৌলসমূহ দেখা দেয়। জটিল মৌলসমূহের মধ্যে ছিলো শর্করা, নিউক্লিক অ্যাসিড ও অ্যামিনো এসিড। এগুলো প্রোটিন তৈরির উপাদান। এই পরীক্ষার ফলে বোঝা গেলো যে পৃথিবীর ইতিহাসের শুরুতে সমুদ্রে এই ধরনের মৌলসমূহ গঠিত হয়েছিলো। পরীক্ষাটি এ বিষয়ে সন্দেহের অবসান ঘটালো।

লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হবার পর এ সকল পদার্থের গাঢ়ত্ব বাড়তে থাকে। মৌলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিক্রিয়া শুরু হয় এবং আরো যৌগিক জটিল পদার্থ গঠিত হতে থাকে। এমনও হতে পারে যে, বহির্বিশ্ব থেকে ধূমকেতুবাহিত কিছু উপাদান এদের সাথে যুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত, বহু বিচিত্র পদার্থের মধ্যে এমন কোনো পদার্থ গঠিত হয়েছিলো যা জীবন সৃষ্টির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। সেই গুরুত্বপূর্ণ পদার্থটির নাম ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (Deoxyribonucleic Acid), সংক্ষেপে ডিএনএ (DNA)। এর গঠন প্রকৃতিই একে দুটি মৌলিক গুণে সমৃদ্ধ করেছে। এক, এটি অ্যামিনো এসিড উৎপাদনের মূল স্থপতি এবং দুই, এটি নিজের প্রতিলিপি নির্মাণে সক্ষম। ডিএনএ-এর কারণেই নবসৃষ্টির সূত্রপাত। ব্যাকটেরিয়ায় ডিএনএ-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় থাকে বলেই ব্যাকটেরিয়া জীব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ব্যাকটেরিয়া সরলতম জীব এবং আবিষ্কৃত জীবাশ্মের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার জীবাশ্মই প্রাচীনতম।

ডিএনএ-এর প্রতিলিপি নির্মাণের ক্ষমতা অনন্য ও একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এটি আকৃতিতে দুটি প্যাঁচানো রশির মতো। কোষ বিভাজনকালে এর দৈর্ঘ্য বরাবর মৌলকসমূহ বিভক্ত হয়ে দুটো প্যাঁচানো রশির আকৃতি ধারণ করে। রশির মতো প্রতিলিপি দুটিতে আরো সরল মৌল যুক্ত হতে থাকে এবং পরবর্তীকালে প্রতিটি প্যাঁচানো রশি দুটি রশিতে পরিণত হয়। ইংরেজিতে এর নাম Double helix [এর বাংলা পরিভাষা দ্বিকুণ্ডলী—অনু]।

প্রধানত যে সকল সরল মৌল দ্বারা ডিএনএ গঠিত হয় সে সব সংখ্যায় চার। কিন্তু প্রতি গ্রুপে থাকে তিনটি মৌল এবং গ্রুপসমূহ নির্দিষ্ট ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্ধতিতে বেশ দীর্ঘ ডিএনএ-তে সজ্জিত থাকে। এই সজ্জা পদ্ধতি দেখেই বোঝা যায় কিভাবে বিশ বা বিশের অধিক বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড একটি প্রোটিন মৌল-এ বিন্যস্ত থাকে। কখন ও কতটুকু ডিএনএ গঠিত হবে তাও এই সজ্জাপদ্ধতি দেখে বোঝা যায়। ডিএনএ-এর দৈর্ঘ্য জুড়ে অবিচ্ছিন্ন উৎপাদনের তথ্যবাহক পদার্থটির নাম হলো জিন (gene)।

দ্বিকুণ্ডলী গঠনকালে বা প্রতিলিপি নির্মাণকালে কোনো পয়েন্টে বা ডিএনএ-এর দৈর্ঘ্য বরাবর কোনো ত্রুটি ঘটে যাবার দরুন এর কোনো অংশ সাময়িকভাবে স্থানচ্যুত হয়ে ভুল জায়গায় সন্নিবেশিত হতে পারে। এ ধরনের ত্রুটিযুক্ত অসম্পূর্ণ ডিএনএ-তে যে প্রোটিন উৎপাদিত হবে তাও একেবারে ভিন্ন। পৃথিবীর প্রথম জীবে যখন এমনটি ঘটেছিলো তখন থেকেই বিবর্তনের সূত্রপাত। প্রতিলিপি নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে জীবে বিবিধায়ন ঘটেছে, নানান বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটেছে। বিচিত্র জীব-বৈশিষ্ট্য থেকেই প্রকৃতি বিবর্তন প্রক্রিয়া চালু রাখতে পেরেছে। অণু-জীবাশ্ম গবেষণা থেকে আমাদের জানা আছে যে ৩০০ কোটি বছর আগে ব্যাকটেরিয়াসদৃশ বহু নির্দিষ্ট গঠনবিশিষ্ট জীবের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিলো।

পৃথিবীর এই বিশাল ভূতাত্ত্বিক কালের কথা ভাবলে কল্পনাও হার মানে। হিসাব বোঝার সুবিধার জন্য চলুন আমরা গোটা কালটাকে এক বছর সময়-সীমায় বন্দী করি। তাহলে আমরা এই কালের ইতিহাসে বড় বড় ঘটনাগুলোকে আপেক্ষিক সময়ের হিসাবে গুণে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতে পারি। আমরা সমস্ত জীবের আদি অবস্থার জীবাশ্ম আবিষ্কার করতে পারিনি। ফলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ৩০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাহলে আমাদের বন্দী করা এক বছর সময়সীমার প্রতিটি দিনকে আমরা প্রায় ১ কোটি বছর সময় হিসাবে ধরে নিতে পারি। এই সময়পঞ্জি অনুযায়ী

আমাদের অতি প্রাচীন আবিষ্কার শৈবালসদৃশ জীবসমূহের আবির্ভাব ঘটেছে আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, যা ঘটেছে জীবজন্মের ইতিহাসের অনেক পরে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের মাটিতে গর্ত খননকারী প্রাচীনতম কীটরা আবির্ভূত হয়েছিলো নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এর এক সপ্তাহ পর সমুদ্রে আবির্ভাব ঘটে মৎস্যকুলের। এই সমুদ্র ছিলো চুনসমৃদ্ধ। সমুদ্রের বেলাভূমিতে ছুটে চলা টিকটিকিরা আসে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। ৩১ ডিসেম্বর বছরের শেষ দিন। ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যার আগেও মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি।

আবার আমাদেরকে বছরের গোড়ায় অর্থাৎ জানুয়ারিতে ফিরে যেতে হচ্ছে। প্রথম দিকে ব্যাকটেরিয়ার মতো জীবেরা নানা ধরনের কার্বনঘটিত যৌগ পদার্থ আহার করতো। কোটি কোটি বছর ধরে এই সকল কার্বন যৌগ আদি সমুদ্রে জমা হতে থাকে। জীবের সংখ্যা বাড়লে খাদ্য সংকট দেখা দেবেই। কোনো জীব যদি খাদ্যের অন্য উৎস আবিষ্কারে সক্ষম হয়ে থাকে তাহলে তা খুবই ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা ঘটেছিলোও তাই। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াসদৃশ জীব তার চারপাশের পরিবেশ থেকে খাদ্য আহরণে বিরতি দিয়েছিলো। তারা তাদের কোষ প্রাচীরের মধ্যেই সৌররশ্মির সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদনকে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া (photosynthesis) বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য হাইড্রোজেন প্রয়োজন। সেসময় অগ্ন্যুৎপাতকালে প্রচুর হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদিত হয়েছিলো।

আদিপর্বে ব্যাকটেরিয়াসদৃশ জীবসমষ্টি যে পরিবেশে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছিলো আজো সে ধরনের পরিবেশ উয়েমিঙ-এর আগ্নেয় এলাকায় দেখা যায়। আগ্নেয় অঞ্চলের ইয়েলোস্টোন বা হলুদ পাথর অতীত ব্যাকটেরিয়াসদৃশ জীবসমূহের অস্তিত্বকে ধারণ করে রেখেছে। এখানে অর্থাৎ আগ্নেয় অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের কয়েক হাজার মিটার নিচে গলিত পাথরের বিশাল চাঁই রয়েছে যা ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত রেখেছে। কোনো কোনো স্থানে ভূগর্ভস্থ জলের তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কের উপরে। ভূগর্ভস্থ চাপ কমে গেলে পাথরের ফাঁক দিয়ে জল উর্ধ্বগামী হয় এবং হঠাৎ উষ্ণ প্রস্রবণরূপে ভূপৃষ্ঠের উপরে জল ও বাষ্প উদ্গীরণ শুরু করে। অন্যত্র উষ্ণ জল পুষ্করিণীর জলের মতো স্থিতাবস্থায় থাকে। চুঁইয়ে আসা জল ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়। চুঁইয়ে আসার সময় জল পাথরের লবণ শুষে নেয় এবং তা বহন করে নিয়ে আসে। ভূগর্ভস্থ গলিত পাথর থেকেও লবণ বেরিয়ে এসে জমা হয়। দুই উপায়ে জমাকৃত এই লবণ কঠিন ও মজবুত তলদেশ গঠন করে যা প্রাচীরঘেরা থাকে। অতি উষ্ণ খনিজসমৃদ্ধ এই জলে ব্যাকটেরিয়ার মতো জীবের জন্ম হয়। এগুলোকে বিবর্ণ সূত্র, জমাট ছানা বা পুরু চামড়ার পাতের মতো দেখায়। কতকগুলোকে খুবই উজ্জ্বল রঙেরও মনে হয়। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে এদের বর্ণেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ব্যাকরিয়াসদৃশ জীবের বর্ণবৈচিত্র্য ও তাদের সৃষ্ট বিবিধ কর্মকাণ্ড বোঝা যায় নিম্নোক্ত নামকরণের মধ্যে দিয়ে—যেমন, এমারল্ড পুল (পান্না পুকুর), সালফার কওলড্রন (গন্ধক কড়াই), বেরিল স্প্রিং (বেরিল প্রস্রবণ), ফায়ারহোল ফলস (অগ্নিগহ্বর প্রপাত), মর্নিং গ্লোরি পুল ইত্যাদি (নানা জীবের বর্ণ ও প্রকৃতির নির্ভর করে এ সকল নাম রাখা হয়।) বহু প্রজাতির ব্যাকটেরিয়াসদৃশ জীবসমৃদ্ধ বিশেষ একটির নাম হলো আর্টিস্ট' পেইন্টপটস (শিল্পীর অঙ্কনপাত্র)।

মনোমুগ্ধকর ভূদৃশ্যাবলির মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আপনার নাকে পচা ডিমের গন্ধের মতো গন্ধকমিশ্রিত হাইড্রোজেনের গন্ধ লাগতে পারে। ভূগর্ভস্থ জল ও মাটির গভীরের গলিত পাথরের মিশ্রণের ফলে এই গন্ধের সৃষ্টি। এই উৎস থেকেই বহু ব্যাকটেরিয়া হাইড্রোজেন সরবরাহ পেয়েছিলো। যতোদিন পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া আগ্নেয় কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল ছিলো ততোদিন পর্যন্ত এদের বিস্তার ঘটেনি। পরিণামে ব্যাকটেরিয়ার অন্য প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। এরা জলের বিস্তৃত উৎস থেকে হাইড্রোজেন সংগ্রহে সক্ষম ছিলো। আগত অন্যান্য জীবের জন্য এই ঘটনা প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। কারণ, পানি থেকে হাইড্রোজেন সরিয়ে নিলে যে উপাদান পড়ে থাকে তা হলো অক্সিজেন। অক্সিজেন গ্রহণকারী এই জীবগুলোর অঙ্গসংগঠন ব্যাকটেরিয়ার অঙ্গসংঘটন থেকে একটু জটিল। এদের বলা যায় ব্লু-গ্রীন অ্যালগী বা নীল-সবুজ শৈবাল। বর্তমানে পুকুরে যে সকল সবুজ শৈবাল দেখা যায় নীল-সবুজ শৈবালকে এদেরই নিকট আত্মীয় বলে মনে হয়। কিন্তু সম্প্রতি এদের আদি বৈশিষ্ট্য শনাক্ত হবার ফলে তাদেরকে বলা হচ্ছে Cyanophytes বা সহজ কথায় নীল-সবুজ শৈবাল। এদের দেহে যে রাসায়নিক উপাদান রয়েছে তা দিয়ে ওরা সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চালাতে পারে। এই রাসায়নিক উপাদানের নাম ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ। সত্যিকারের শৈবাল বা উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে এই উপাদান থাকে।

যেখানে স্থায়ী জলবায়ু রয়েছে সেখানে নীল-সবুজ শৈবাল দেখা যায়। এদের দেখতে বিছানো মাদুর বা কার্পেটের মতো। মাদুরে ছড়িয়ে থাকে অক্সিজেনের রূপালি বুদ্বুদ। এই শৈবাল পুকুরের তলায় পাতানো কম্বলের মতো পড়ে থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে শার্ক বে বা হাঙর উপসাগরে এরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণভাবে ও দর্শনীয়ভাবে সজ্জিত ছিলো। বিশাল এই উপসাগরীয় জলাধারের ছোট একটি শাখার প্রবেশ পথ বালি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। বালির এই বাঁধ জুড়ে রয়েছে ঈল নামের ঘাস। শাখাটির নাম হ্যামেলিন পুল। এই জলাধারের পানি প্রচণ্ড সূর্যতাপে উবে যায়। ফলে জল লবণাক্ত হয়ে পড়ে। এতে করে সামুদ্রিক প্রাণী যথা শামুক ইত্যাদি জীবনধারণ করতে পারলো না। এরা নীল-সবুজ শৈবাল খেয়ে পরিবেশে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতো। নীলাভ-সবুজ শৈবালসমূহ সে সময়কার অগ্রগামী জীব হিসাবে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছিলো পর্যাপ্ত। এরা দেহ থেকে চুন নিঃসরণ করে এবং হ্যামেলিন পুলের তীরের কাছে পাথুরে বালিশের মতো ও দোদুল্যমান স্তম্ভের মতো আকৃতি গঠন করে। গানফ্লিন্ট চার্ট-এ রহস্যময় আকৃতির সে সব চিত্র দেখা যায় তা সম্ভবত এ সবেরই। হ্যামেলিন পুল-এর নীলাভ-সবুজ স্তম্ভগুলো হলো জীবন্ত স্ট্রোম্যাটোলাইট। দলে দলে স্ট্রোম্যাটোলাইট সমুদ্রতলের আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকতো আজ থেকে দুশ কোটি বছর আগে।

নীলাভ-সবুজ শৈবালের আবির্ভাব স্পষ্ট করে তুললো যে জীবের ইতিহাসে এদের আর পুনরাবির্ভাব ঘটবে না এদের উৎপাদিত অক্সিজেন হাজার হাজার বছর ধরে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর অক্সিজেন সরবরাহ করেছিলো। আমাদের ও অন্যান্য জীবের জীবন অক্সিজেনের উপর নির্ভরশীল। আমাদের শ্বসনের জন্যই এই অক্সিজেন আবশ্যক। অক্সিজেন জীবজগৎকে রক্ষাও করে। অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে ওজোন পর্দা নির্মাণ করে। ওজোন পর্দা সূর্যের বেশিরভাগ অতিবেগনি রশ্মি পৃথিবীতে আসায় বাধাদান করে। এই রশ্মি আদি সমুদ্রে অ্যামিনো অ্যাসিড

ও শর্করা সংশ্লেষণেও শক্তি সরবরাহ করতো। কাজেই নীলাভ-সবুজ শৈবালের আবির্ভাব একইভাবে আবার পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়।

জীবনের বিকাশ এই পর্যায়ে বহু কাল ধরে থেমে থাকে। পরবর্তীকালে অবশ্য বিশাল বড়ো এক লাফে এই পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আসে। ঠিক কিভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো তা আমরা এখনো নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে মিঠা পানির যে কোনো নমুনা পরীক্ষা করলে কি ধরনের জীবসমষ্টির উদ্ভব ঘটেছিলো তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে।

পুকুরের এক বিন্দু জলকে অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে রাখলে অনেক জীবের সাক্ষাৎ মিলে। দেখা যাবে জলের মধ্যে কতকগুলো প্রাণী ঘোরাঘুরি করছে, কতকগুলো হামাগুড়ি দিচ্ছে, আবার কতকগুলো রকেটের মতো এদিক-সেদিক সাঁই সাঁই ছুটছে। এই দলের প্রাণীদেরকে প্রোটোজোয়া বলা হয়। এরা এককোষী জীব। এদের কোষ প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগের চেয়ে অনেক বেশি জটিল অঙ্গ রয়েছে। কোষের কেন্দ্রে থাকে ডিএনএসহ নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস কোষের সাংগঠনিক শক্তি বলে মনে হয়। অনেক ব্যাকটেরিয়ার মাইটোকন্ড্রিয়া যেমন করে অক্সিজেন পুড়িয়ে কোষকে শক্তি যোগায়, প্রোটোজোয়ার মাইটোকন্ড্রিয়াও একইভাবে কোষকে শক্তি সরবরাহ করে। অনেক কোষের তাড়না-পুচ্ছ থাকে। একে নলাকৃতির ব্যাকটেরিয়াসদৃশ দেখায়। এই তাড়নাপুচ্ছের নাম স্পাইরোকিট। কতকগুলো প্রোটোজোয়ায় নীলাভ-সবুজ শৈবালের মতো ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টে রয়েছে ক্লোরোফিল বা সবুজ কণিকার প্যাকেট। ক্লোরোফিল সৌর শক্তিকে ব্যবহার করে কোষের জন্য জটিল মৌল উৎপাদন করে। কোষ এই উপাদানকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। প্রতিটি ক্ষুদ্রকায় জীব মিলে সরল জীবগোষ্ঠী গঠন করে। কোনো কোনো গবেষক বিশ্বাস করেন যে এরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে পূর্বেও একই অবস্থায় ছিলো। এমনো হতে পারে যে কোনো কোনো প্রোটোজোয়ার চারপাশের ভাসমান খাদ্যকণা গ্রহণের অভ্যাস ছিলো। এরা ব্যাকটোরিয়া ও নীলাভ-সবুজ শেওলাকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। এই খাদ্য হজম না হয়ে কোষের মধ্যে বেঁচে থাকে এবং মিথোজীবী জীবনযাপন করতে থাকে। এরকমটি যে ঘটেছিলো তা ১২০ কোটি বছর পূর্বেকার অণু-জীবাশ্ম দেখে বোঝা যায়। ধরুন, এ ব্যাপারটি জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের পূর্বে উল্লেখিত এক বছর সময়পঞ্জির সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে ঘটেছিলো।

প্রোটোজোয়া দেহকে সরাসরি দ্বিখণ্ডিত করে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। ব্যাকটোরিয়াও তাই করে। তবে প্রোটোজোয়ার অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-সংগঠন অনেক বেশি জটিল এবং প্রজনন ক্রিয়াও প্রলম্বিত। এই দলের ভিন্ন ভিন্ন গঠন-প্রকৃতিবিশিষ্ট সদস্যরা নিজেদেরকে দ্বিখণ্ডিত করে। প্রত্যেক কোষের ভিতরে মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট তাদের স্ব স্ব ডিএনএ সহ স্বতন্ত্রভাবে বিভাজিত হয়। নিউক্লিয়াসের মধ্যে ডিএনএ বিশেষ জটিল পদ্ধতিতে এমনভাবে প্রতিলিপি নির্মাণ করে যাতে এর সকল জিন নিশ্চিতভাবে দুটো প্রতিলিপিতে সন্নিবেশিত হতে পারে এবং প্রতিটি অপত্যকোষ একটি পরিপূর্ণ প্রতিলিপি পেতে পারে। অবশ্য কখনো কখনো বিভিন্ন ধরনের প্রোটোজোয়া প্রজননের জন্য অন্যান্য পদ্ধতিও অবলম্বন করে। পদ্ধতিসমূহের মধ্যেও রকমফের রয়েছে। সমস্ত প্রজনন কৌশলের মধ্যে অপরিহার্য ঘটনা হলো জিনের দেনা-পাওনা সংগঠিত হওয়া। কতকগুলো ক্ষেত্রে দুটি কোষ সংযুক্ত হলে এই দেনা-পাওনার পালা চলে। কোষটি ভেঙে আবার দুটো কোষে পরিণত হবার আগেই এই

কাণ্ড ঘটে যায়। পরে ভেঙে যাওয়া দুটি কোষে কোষ-বিভাজন সম্পন্ন হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোষ স্বাভাবিকভাবে দুটি পূর্ণ জিন সেট ধারণ করে। জিনের দেনা-পাওনার পালা সংগঠিত হবার পর কোষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটো নূতন কোষে পরিণত হয়। এবং প্রতিটি কোষ একসেট জিন লাভ করে। কোষসমূহ দুই প্রকারের, একটি তুলনামূলকভাবে অন্যটি থেকে বড় ও অনড়। অন্যটি ছোট ও সচল। ছোট কোষ ফ্ল্যাজেলা বা কশাকাম দ্বারা চালিত হয়। অনড় বড় কোষটি ডিম্ব ও ছোট সচল কোষটি শুক্রকীট হিসাবে পরিচিত। এভাবেই যৌন প্রজননের সূত্রপাত। দু'ধরনের কোষ বা ডিম্ব ও শুক্রকীট মিলিত হয়ে একটি মিশ্র কোষে পরিণত হয়। তখন জিনগুলো পুনরায় দুই সেটে নূতন করে সন্নিবেশিত হয়। সন্নিবেশ ঘটানোয় কেবল মাতৃ বা পিতৃ জিন নয়। উভয়েরই জিন অংশগ্রহণ করে। এটিকে একটি অনন্য সমাবেশ বলা যেতে পারে যা সামান্য ভিন্ন ধরনের নূতন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জীবের উৎপত্তি ঘটাতে পারে। যেহেতু যৌন প্রজনন জিনের ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে, সেহেতু নূতন পরিবেশ জয় করায় সক্ষম জীবসমূহের বিবর্তনের হার বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

পৃথিবীতে প্রায় ১০,০০০ প্রজাতির প্রোটোজোয়া আছে। কতকগুলো প্রোটোজোয়ায় চুল বা সুতার মতো ঘন পাতলা অঙ্গ থাকে। এগুলো সমন্বিতভাবে আন্দোলিত হয়। আন্দোলনের ফলে ওরা জলে চলাচল করতে পারে। অ্যামিবাসহ অন্যান্যরা মূল দেহ থেকে অঙ্গুলীবৎ অঙ্গ প্রসারিত করে এবং সেই প্রলম্বিত অঙ্গে মূল দেহের উপাদান পরিচালনার মাধ্যমে চলাচল করে। সমুদ্রবাসী অনেক প্রোটোজোয়া দেহ থেকে খোলক নিঃসরণ করে। খোলকের মূল উপাদান হলো বালি বা চুন। অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে চমৎকার গঠনের অনেক খোলক আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন। কতকগুলোকে শামুকের খোলকের মতো, কতকগুলো ফুলদানির মতো এবং অন্যান্য খোলককে বোতলের মতো দেখায়। এদের মধ্যে সর্বপেক্ষা সুন্দর হলো চকচকে অস্বচ্ছ বালি দ্বারা গঠিত, সুইয়ের মতো বস্তু দ্বারা এ ফোঁড়-ওফোঁড় বিদ্ধ করা কেন্দ্রানুগ বলয় গঠিত খোলক। এ ছাড়া রয়েছে জার্মান সৈন্যের শিরস্ত্রাণের মতো, ফরাসী চার্চের ঘন্টার মতো, কাঁটা পরিবৃত মহাকাশ ক্যাপসুলের মতো খোলকসমূহ। এই সকল খোলকের অধিকারী জীবেরা ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ সূত্রের মতো অঙ্গ বের করে খাদ্য সংগ্রহ করতো।

অন্য এককোষী জীবেরা অন্য উপায়ে আহার সংগ্রহ করতো। ওরা দেহস্থিত ক্লোরোফিলের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীয় দেহে খাদ্য উৎপাদন করতো। এগুলোকে উদ্ভিদ বলা যেতে পারে। বাদবাকি যারা এদেরকে উদরস্থ করে জীবনধারণ করে তাদের প্রাণী বলা যায়। এই পর্যায়ে দুই দলের মধ্যে পার্থক্য খুব স্পষ্ট ও অর্থবহ নয়। কারণ তখনো অনেক প্রজাতির প্রোটোজোয়া উপরিলিখিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুই উপায়েই আহার করতে পারতো।

খালি চোখে দেখার মতো কিঞ্চিৎ বড় কতকগুলো প্রোটোজোয়া রয়েছে। বার বার চেষ্টা করলে এক ফোঁটা পুকুরের জল থেকে সঞ্চরণশীল জেলির পিণ্ড বা অ্যামিবা সংগ্রহ করা যায়। এককোষী জীবের দেহের বৃদ্ধিসীমা রয়েছে। কারণ আকারে সীমাহীন বাড়তে থাকলে কোষের ভিতরে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অপ্রতুলতা ও সংকট দেখা দেয়। অন্যভাবে অবশ্য

ওরা আকারে বড় হতে পারে। কোষসমূহ একত্রে দলবদ্ধ হয়ে কলোনি সৃষ্টির মাধ্যমে বড় হয়ে থাকে।

Volvox নামের প্রোটোজোয়া এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। অনেকগুলো *Volvox* মিলে শূন্য গোলকের সৃষ্টি করেছে যা দেখতে একটি পিনের মাথার অনুরূপ। প্রতিটি *Volvox*-র রয়েছে একটি কশাকাম। এই ইউনিটের ব্যাপারে বিস্ময়ের কথা হলো, এরা একক কোষ হিসাবে যেভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখে ও সাঁতার কাটে, কলোনি জীবনেও ওরা তা বজায় রাখে। *Volvox* কলোনির সকল সদস্যের মধ্যে সমঝোতা থাকে। গোলকের বাইরে সকল কশাকাম সুশৃঙ্খল ও সমন্বিতভাবে নড়াচড়া করে। ফলে ক্ষুদ্র এই গোলকটি নির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালিত হয়। আমাদের বর্ষপঞ্জিতে অক্টোবরের কোনো এক সময়ে ৮০–১০০ কোটি বছর আগে কলোনি গঠনকারী প্রোটোজোয়ার মধ্যে এ ধরনের সমন্বয়-সহযোগিতা লক্ষ করা যায়। এ সময় স্পঞ্জেরও উদ্ভব ঘটেছিলো। স্পঞ্জের বেশ বড়সড় রকমে বৃদ্ধি পেতে পারে। কতকগুলো স্পঞ্জ প্রজাতি সমুদ্রতলের দুই মিটার বা এরও বেশি জায়গা জুড়ে আকৃতিহীন নরম স্পঞ্জের আস্তরণ সৃষ্টি করে। স্পঞ্জের দেহ ছিদ্রযুক্ত। স্পঞ্জের বড় পায়ুপথে এই পানি বের হয়ে যায়। দেহের অভ্যন্তরে প্রবাহিত জলপ্রবাহ থেকে স্পঞ্জ জল ছেঁকে খাদ্য সংগ্রহ করে। স্পঞ্জ গঠনকারী কলোনির কোষসমূহের মধ্যে বন্ধন খুব শিথিল। স্বতন্ত্র কোষসমূহ অ্যামিবার মতো স্পঞ্জের পৃষ্ঠদেশে হামাগুড়ি দিয়ে চলাচল করতে পারে।

যদি দুটো স্পঞ্জ খুব কাছাকাছি থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে ওরা পরস্পরের সংস্পর্শে এসে শেষাবধি একটি স্পঞ্জে পরিণত হয়। একটি স্পঞ্জে জোর করে চালুনি ঢোকানো হলে এটি ভেঙে অনেকগুলো স্বতন্ত্র কোষে পরিণত হয়। পরে প্রতিটি কোষই ক্রমে এক একটি স্পঞ্জের রূপ লাভ করে। কলোনির ভেতরে প্রত্যেক ধরনের কোষ তখন যার যার উপযুক্ত ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়। খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার যে, যদি দুটো স্পঞ্জে উপরিবর্ণিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় এবং দুটোর কোষসমূহ মেশানো হয় তাহলে কোষসমূহ নিজেদের পুনর্গঠিত করে মিশ্রিত পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

কতিপয় স্পঞ্জ তাদের কোষের চারপাশে নরম নমনীয় একপ্রকার পদার্থ নির্গত করে যা পুরো প্রাণীটিকে সুসংগঠিত করে। স্পঞ্জ সেদ্ধ করে ও ধুয়ে নেওয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকে তা হলো এই পদার্থ যাকে আমরা স্নানের সময় শরীর ঘষার কাজে ব্যবহার করি। অন্যান্য স্পঞ্জ সুইয়ের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পিকিউল বা কাঁটা নির্গত করে। কাঁটাগুলো চুন বা বালিঘটিত। এগুলো ভেঙে-চুরে একটা মাচান তৈরি হয় যেখানে কোষগুলো প্রবিষ্ট থাকে। কি করে একটি কোষের প্রতিস্থাপন হয়, কোষ কিভাবে স্পিকিউল উৎপাদন করে এবং কলোনির নির্মিত সার্বিক নকশার সাথে খাপ খায় তা একেবারেই অজানা। ভেনাস ফ্লাওয়ার বাস্কেট হিসেবে পরিচিত প্রাণীতে বালি দ্বারা তৈরি স্পিকিউল গঠিত হয়। এই স্পিকিউল গঠিত স্পঞ্জাস্থির দিকে যখন তাকাবেন তখন আপনার সব কল্পনা হার মেনে যাবে। আণুবীক্ষণিক প্রায় স্বাধীন কোষগুলো একযোগে কিভাবে লক্ষ লক্ষ স্বচ্ছ সুচালো কাটা নির্গত করে এবং জাফরি-কাটা এমন জটিল বাক্স তৈরি করে তা আমরা জানি না। স্পঞ্জের এ ধরনের অবিশ্বাস্য জটিল আকৃতির কাঠামো গড়ে তোলার পরও এদেরকে সমন্বিত বহুকোষী প্রাণী হিসেবে গণ্য করা বেশ মুশকিল। এদের দেহে স্নায়ুতন্ত্র নেই। নেই পেশিসূত্রও। এ সকল শারীরিক বৈশিষ্ট্য সরল প্রাণী জেলিফিশ ও তাদের স্বগোত্রদের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

একটি সাধারণ জেলিফিশ দেখতে সসার বা পিরিচের মতো। যার দেহে রয়েছে হুল ফোটানোর কর্ষিকা। এই আকৃতির প্রাণীটির নাম মেডুসা। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীর হতভাগ্য রমণীটির নামে এর নাম রাখা হয়। সমুদ্রের দেবতা মেডুসা নামের নারীকে ভালোবাসতেন। কিন্তু সমুদ্রের দেবতার স্ত্রী একে সহজভাবে নেননি। তাঁর মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠে। দেবী মেডুসার চুলকে অভিশাপ দিয়ে সাপে পরিণত করে দেন। জেলিফিশের দেহ দুটি স্তর দ্বারা গঠিত। দুই স্তরের মাঝখানে থাকে জেলি। জেলি প্রাণীটির দেহকে মজবুত রাখে যাতে সমুদ্রের জলের প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করে এরা টিকে থাকতে পারে। জেলিফিশ একটি জটিল প্রাণী। স্পঞ্জের কোষ স্বতন্ত্রভাবে জীবনধারণে সক্ষম কিন্তু জেলিফিশের কোষ স্বতন্ত্রভাবে জীবনধারণে অক্ষম। জেলিফিশের কতকগুলো কোষ বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সঞ্চালনের উপযোগী হবার জন্যে রূপান্তরিত হয় এবং একটি জালচক্র গঠন করে। এই জালচক্রের সাথে স্নায়ুতন্ত্রের তুলনা করা যায়। অন্য কতকগুলো কোষ এদের দৈর্ঘ্য বরাবর সংকুচিত হবার ক্ষমতা রাখে। এসব কোষের সাথে সরল পেশির তুলনা করা যায়। এগুলোর মধ্যে অবশ্য হুল নির্গমনকারী কোষ বা হুল-কোষ থাকে। হুল-কোষ সুতার মতো অঙ্গকে কোষের ভিতরে গুটিয়ে রাখে। এটি জেলিফিশ গোষ্ঠীর প্রাণীদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। যখন খাদ্যবস্তু বা শত্রু কাছে আসে তখন হুল-কোষ এর সূত্রটিকে ছুঁড়ে দেয়। সূত্র দেখতে ছোট হার্পুনের মতো। কাঁটায় মাঝে মাঝে বিষভর্তি থাকে। কর্ষিকায় এই হুল-কোষই থাকে। সাঁতার কাটার সময় কোনো মানুষ যদি জেলিফিশের কর্ষিকার সংস্পর্শে আসে তাহলে তাকে হুলের আঘাতে জর্জরিত হতে হয়।

জেলিফিশ সমুদ্রে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু বিমুক্ত করার মাধ্যমে প্রজননের কাজ সম্পন্ন করে। নিষিক্ত ডিম্বাণু সরাসরি অপত্য জেলিফিশে বিকাশ লাভ করে না। কিন্তু একটি মুক্ত সন্তরণশীল প্রাণীতে পরিণত হয়। এই প্রাণীটির সাথে জন্মদাতা মা-বাবার দেহের কোনো সাদৃশ্য থাকে না। প্রাণীটি সন্তরণশীল অবস্থা শেষে সমুদ্রের তলায় অবস্থান নেয় এবং ছোট ফুলের মতো আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণীর রূপ ধারণ করে। ফুলের মতো এই প্রাণীটিকে তখন বলা হয় পলিপ। কতকগুলো প্রজাতিতে পলিপ শাখাবিশিষ্ট হয় এবং পলিপ শাখা অঙ্কুরিত হয়। পলিপে কর্ষিকা থাকে। কর্ষিকাগুলো সবসময় নড়াচড়ায় ব্যস্ত থাকে। কর্ষিকার মাধ্যমে পলিপ খাদ্য চুঁইয়ে নেয়। শেষে পলিপ ভিন্ন উপায়ে কুঁড়ির জন্ম দেয় এবং ক্ষুদ্রাকার মেডুসা উৎপাদন করে। মেডুসা পলিপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং পুনরায় মুক্ত সন্তরণশীল জীবন শুরু করে।

বংশধরদের মধ্যে আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে যাবার দরুন এই গোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে সকল ধরনের বৈচিত্র আসার সুযোগ হয়েছে। প্রকৃত জেলিফিশ জীবনের বেশির ভাগ সময় মুক্ত ভাসমান মেডুসা হিসাবে জীবন কাটিয়ে দেয়। খুব স্বল্প সময়ের জন্য ওরা পাথরে লেগে থেকে বদ্ধ জীবনযাপন করে। অন্যরা এর উল্টো জীবনযাপন করে। যেমন সি এনিমোন বা সমুদ্র সজারু। কারণ, এদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনাবস্থায় এরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র পলিপ হিসেবে জীবনধারণ করে। এরা পাথরে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। এদের কর্ষিকা জলে দুলতে থাকে এবং শিকারের জন্য ওৎ পাতে। তৃতীয় এক ধরনের পলিপ কলোনি রয়েছে যারা সমুদ্রের তলদেশের মায়া কাটিয়ে মুক্তভাবে সাঁতার কাটে। উদাহরণ, পর্তুগিজ ম্যান অব ওয়্যার।

ওদের বেলুনের মতো ফাঁপা অংশের নিচে ঝুড়ি ঝুড়ি পলিপ ঝুলে। ফাঁপা অংশ গ্যাসে ভর্তি। প্রতিটি ঝুড়ির বিশেষ কাজ থাকে। এক প্রকারের ঝুড়ি প্রজনন কোষ উৎপাদন করে। অন্য ঝুড়ি শিকারের দেহ থেকে রস শোষণ করে। কতকগুলো ঝুড়িতে থাকে মারাত্মক বিষপূর্ণ হুল কোষ। এই ঝুড়ি ভাসমান কলোনির পেছনে ৫০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এর সংস্পর্শে এলে মাছ বা শিকারের অন্তিমদশা উপস্থিত হয়।

এ থেকে নিশ্চিত ধারণা হয় যে, তুলনামূলকভাবে এই সরল প্রাণীসমূহ জীবের ইতিহাসের গোড়ার দিকে উদ্ভূত হয়েছিলো। কিন্তু বেশ কিছু সময় ধরে, এরা সত্যিকারভাবে কি করছিলো তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে কেবল শিলায়। চার্টে অণুজীব সংরক্ষিত হতে পারলেও জেলিফিশের মতো বড় অথচ ভঙ্গুর ও জলো প্রাণী অশ্মীভূত হয়ে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু ১৯৪০ সালে কয়েকজন ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী প্রাচীন এডিয়াক্যারা বালিপাথরে কতকগুলো অদ্ভূত আকৃতি লক্ষ করেন। এই স্যান্ডস্টোন বা বালিপাথরের অবস্থান স্থল হলো দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ফ্লিন্ডার পর্বতমালা। এই পাথরের বয়স ৬৫ কোটি বছর ধরা হচ্ছে। বিশ্বাস যে, এই পাথর পুরো জীবাশ্মমুক্ত। এই পাথর গঠনকারী বালিকণার আকার ও স্তরতলের তরঙ্গরেখা বিচার করে বোঝা যায় যে, এই পাথর একসময় বালুকাবেলা গঠন করেছিলো। কখনো সখনো এতে ফুলের মতো চিহ্ন দেখা যায়। আকারে কোনোটি ছোট কাপের মতো। কোনো বড় আকারের হলে তা গোলাপের মতো। যেসব জেলিফিশ বালুকাবেলায় আটকা পড়ে ও রোদে শুকিয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে জোয়ার-ভাঁটার দরুণ বালির আস্তরণের নিচে চাপা পড়েছিলো উল্লিখিত ছাপগুলো কি এদের দেহের? আকৃতিসমূহের ছাপ সংগৃহীত হয় এবং এসব নিয়ে গবেষণা হয়। উদ্দেশ্য ওদের প্রকৃত পরিচয় জেনে সন্দেহমুক্ত হওয়া।

কমপক্ষে ষোলটি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি চিহ্নিত হয়েছে। এদের কতিপয় ভাসমান মেডুসা। এদের কয়েকটির পুর্তগিজ ম্যান অব ওয়্যার-এর মতো গ্যাস ভর্তি থলে ছিলো। অসাধারণ এইসব জীবাশ্মের ব্যাপারে লক্ষণীয় যে এদের কলোনিসমূহ সমুদ্র তলদেশে বদ্ধ জীবন নির্বাহ করতো এবং এরা ধূসর বাদামি বেলে পাথরে পাখির দীর্ঘ পালকের আকৃতিতে লেপ্টে থাকতো। কাঁটাগুলো দেখা যেতো আলাদা শাখায়। কাঁটারা পলিপে সারিবদ্ধভাবে থাকতো। প্রাচীন এই বেলাভূমিতে এরা ঝড়ের তোড়ে হয়তো ছিন্নভিন্ন হয়ে ধুয়ে গিয়েছিলো। এদের কয়েকটির গোড়ার অংশে মুদ্রাকৃতির প্লেটের মতো ভুয়া ছাপ লক্ষ করা যায়। প্রথমদিকে এগুলোকে মেডুসা ধরে নিয়ে ব্যাখ্যা করা হতো। কিন্তু কতকগুলো নমুনা পরীক্ষা করে এদের এক অবস্থানে লক্ষ করা গেছে, যা থেকে এগুলোকে মেডুসা নয়, কেবল আঁকড়ে ধরা থাকার চিহ্ন হিসেবেই গণ্য করা সম্ভব হয়।

আপনাকে এসব জীবাশ্মের পাশাপাশি জীবিত অনুরূপ প্রাণীর সন্ধানে বহুদূর যেতে হবে না। ফ্লিন্ডার পর্বতমালার একশ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় অনুরূপ প্রাণীকে সমুদ্রে জন্মাতে দেখা যায়। এগুলোর নাম সি-পেন বা সাগর কলম। মানুষ আগে পাখির পালক দিয়ে লিখতো এজন্য একে খুব উপযুক্ত মনে করা হতো। পাখির পালকের সাথে সমুদ্রের এই প্রাণীর আকৃতিগত মিল ছিলো বলেই এর নাম রাখা হয় সাগর কলম। এটি দেখতে পালকের ন্যায়

তবে এর হাড় শক্ত ও নমনীয়। এরা বালুকাময় সমুদ্র তলদেশে খাড়া হয়ে লেগে থাকে। লম্বায় কয়েক সেন্টিমিটার। কতকগুলো দৈর্ঘ্যে, মানুষের দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক। বিশেষত রাতেই এদের দেখা যায়। কারণ এদের শরীর থেকে ঠিকরে আলো বের হয়। উজ্জ্বল বেগুনি-লাল আলো। স্পর্শ করলে ধীরে ধীরে প্রাণীটির বাহুসমূহ নড়তে থাকে এবং ওগুলো থেকে ভৌতিক আলোর তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়।

সি পেন-কে নরম প্রবালও বলা হয়। পাথুরে প্রবাল ও তাদের স্বগোত্ররা কখনো সখনো সি পেন-এর কাছাকাছি থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রবালেরা কলোনি গঠন করে জীবন নির্বাহ করে। এদের ইতিহাস সি পেন-এর মতো প্রাচীন নয়। এদের এডিয়্যাক্যারা বেলাভূমিতে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এদের উদ্ভবের সাথে সাথে এরা ভয়াবহ রকম বিস্তার করলো। এই প্রাণীরা তাদের দেহ থেকে হাড় নিঃসরণ করে এবং এরা এমন এক পরিবেশে বাস করে যেখানে হাড় ও বালি চুঁইয়ে পড়ে অশ্মীভূত হবার আদর্শ অবস্থা সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় চুনাপাথরের বিশাল পুরুত্বের জন্য প্রবালের দেহাবশেষকে দায়ী করা হয়। এইসব পাথরে এই দলের প্রাণীদের বিকাশের বিশদ উপাখ্যান গ্রন্থিত হয়ে রয়েছে। প্রবালের পলিপ দেহের গোড়ার অংশ থেকে হাড়-পদার্থ নিঃসরণ করে। পলিপেরা পরস্পর পার্শ্বশাখা দ্বারা যুক্ত থাকে। কলোনি বৃদ্ধি পেতে থাকলে নূতন পলিপের জন্ম হয়। অনেক ক্ষেত্রে পার্শ্বশাখার উপরও পলিপ জন্মায়। পার্শ্ব শাখার উপর হাড়-পদার্থও নিঃসৃত হয়। এতে অন্য পলিপদের কোণঠাসা অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে করে চুনাপাথর দ্বারা গঠিত কলোনিতে ঝাঁঝরার মতো ফুটো হয়। এসব ফুটোয় একসময় পলিপ বাস করতো। জীবিত পলিপরা পৃষ্ঠভাগে একটি পাতলা স্তর গঠন করে। প্রবালের প্রতিটি প্রজাতির কুঁড়ি সৃষ্টির স্বতন্ত্র ধরন আছে। এ কারণে প্রতিটি প্রবাল তার স্বীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রবালসৌধ গড়ে তোলে।

পরিবেশের প্রয়োজনে প্রবালের চাহিদা রয়েছে। পরিষ্কার নয় এমন বা কর্দমযুক্ত জলে ওরা বাঁচে না। সূর্যালোক যেখানে পৌঁছায় না সমুদ্রের সেই স্তরে ওরা জন্মায় না। কারণ, ওদের দেহের উপর যে শৈবাল জন্মায় প্রবাল তাদের উপর নির্ভরশীল। শৈবাল স্বীয় প্রয়োজনে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ঘটায়। প্রক্রিয়াকালে পানি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নেয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া প্রবালের অস্থি গঠনে সহায়তা প্রদান করে এবং এ প্রক্রিয়ার ফলে নির্গত অক্সিজেন প্রবালকে শ্বসনেও সাহায্য করে।

প্রবাল দ্বীপে প্রথমে ডুব দিয়ে যে অভিজ্ঞতা হবে তা কখনো ভুলবার নয়। প্রবালসমূহের পছন্দ স্বচ্ছ সূর্যালোকিত পরিবেশ। ত্রিমাত্রিক স্বচ্ছ আলোকিত জলের পরিবেশে মুক্তভাবে সাঁতার কাটা এক বিস্ময়কর মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা। প্রবালের আকৃতি ও রঙ উপর থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। এ বিষয়ে মানসিক পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই ডুব দিতে হয়। প্রবালরা আকৃতিতে কোনোটি গম্বুজ, কোনোটি বৃক্ষশাখা বা কোনোটি পাখা, আবার কোনোটি হরিণের শিঙের মতো। শিঙের অগ্রভাগ নীলাভ। অর্গান পাইপ প্রবাল দেখতে রক্তের মতো লাল। কোনো কোনো প্রবালকে দেখলে মনে হবে ফুল। কিন্তু ফুল মনে করে তুলতে গেলে খোঁচা লেগে হাত কেটে যাবে বা ছড়ে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে বহু প্রজাতির প্রবাল একটার নিচে আরেকটা জন্মায়। প্রবাল সাগর-কলমের সাথে মিলে উপরে স্তম্ভের আকারে থাকে। স্তম্ভের

নিচে থাকে সবুজ সজারু। সমুদ্র সজারুর দীর্ঘ কর্ষিকাসমূহ জলের সাথে দোল খায়। কখনো আপনি বিশাল জলরাশিতে সাঁতার কাটলে দেখবেন যে সেখানে কেবল এক ধরনের প্রবালই জন্মে পড়েছে। কখনো কখনো সাগর কলম ও স্পঞ্জ একীভূত হয়ে গভীর জলে অট্টালিকার মতো আকৃতি গড়ে তোলে। মনে হবে এই অট্টালিকা কৃষ্ণনীল জলের গভীর থেকে উঠে এসেছে।

যদি কেউ দিনের বেলায় সাঁতার কাটে তাহলে এমন সুন্দর কারুকাজের কারিগর প্রবালের সাক্ষাৎ পাবেন না। কিন্তু রাতে টর্চের আলোয় দেখা যাবে একেবারে অন্যরকম দৃশ্য। প্রবাল কলোনির ধারযুক্ত বহিরাবরণ টর্চের শুভ্র আলোর আবছায়ায় ঢাকা পড়ে। চুনা পাথরের গর্ত থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলিপ বেরিয়ে আসে। বেরোনোর কারণ খাদ্য সংগ্রহ। খাদ্য সংগ্রহের জন্য ওরা কাঁটাযুক্ত বাহুগুলোকে বাড়িয়ে দেয়।

প্রবালের পলিপগুলো কয়েক মিলিমিটার দূরে দূরে থাকলেও ওরা কলোনিতে একযোগে কাজ করে। মানুষের শ্রম দিয়ে গড়া বিশাল নির্মাণ কাজের অনেক আগেই প্রবালরা পৃথিবীকে তার চেয়েও বড় নির্মাণ কাজ উপহার দিয়েছে। চাঁদ থেকে বা আকাশ থেকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলের সমান্তরালে হাজার হাজার মাইল জুড়ে যে দ্বীপ দেখা যায় এর নাম গ্রেট বেরিয়ার রিফ। কাজেই ৫০ কোটি বছর আগে কোনো ভিন গ্রহের মানুষ যদি পৃথিবীর পাশ দিয়ে যেতেন তাহলে তিনি খুব সহজে নীল সমুদ্রে রহস্যময় নীলকান্তমণির মতো প্রবালদ্বীপের নকশা দেখতে পেতেন। এ থেকে তিনি সম্ভবত ধারণা করতে পারতেন যে পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ ঘটেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নানা ধরনের দেহগঠন

গ্রেট বেরিয়ার রিফে জীবনের কোলাহল দেখা যায়। প্রবালের রাজ্যে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত জলতরঙ্গ তখন অক্সিজেনে ভরপুর। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সূর্য এই জলকে আলোকিত করে ও এতে উষ্ণতা ছড়ায়। এখানেই প্রচুর প্রধান প্রধান সামুদ্রিক প্রাণী জন্মায়। খোলকের ভিতর দিয়ে উঁকি দেয় জ্বলজ্বলে লাল চোখ; কালো কালো সমুদ্র সজারু (Sea Urchin) কাঁটায় ভর করে লাট্টুর মতো ঘুরপাক খায়; গাঢ় নীল তারা মাছেরা (Star fish) যেনো বালিতে ডুবে থাকা উজ্জ্বল চুমকি; প্রবালের মসৃণ পৃষ্ঠদেশস্থিত ছিদ্র থেকে পলিপেরা যেন প্রস্ফুটিত ফুলের মতো পাঁপড়ি মেলে। স্বচ্ছ জলে ডুব দিন। এক খণ্ড শিলা সরিয়ে দেখুন। দেখবেন হলুদ ও লাল রঙের ডোরা গায়ে ফিতার মতো কোনো প্রাণী অনবদ্য ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে যেনো কেটে পড়লো। আরো দেখবেন লাল সবুজ রঙের এক ধরনের তারা মাছ যেনো মোচড় খাওয়া বাহুতে ভর করে দ্রুত সটকে গিয়ে লুকোনোর জায়গা খুঁজছে।

প্রাণি বৈচিত্র্য আমাদের মনে বিস্ময়ের লালা দেয়। পূর্বে উল্লেখিত আদি প্রাণী যথা জেলি ফিশ ও প্রবাল এবং উন্নত বিকশিত মেরুদণ্ডী মাছের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্যান্য প্রায় সকল প্রাণীকে তিনটি প্রধান দলে ফেলা যায়; এক, খোলকবিশিষ্ট প্রাণী– যেমন, ঝিনুক, শামুক; দুই, দ্বিপার্শ্বীয় সুষম (bilaterally symmetrical) দেহের তারা মাছ ও সমুদ্র সজারু; এবং তিন, কুচিযুক্ত (bristles) প্যাঁচালো দেহের কীট থেকে চিংড়ি ও লবস্টারের মতো দীর্ঘদেহী প্রাণী।

যে ভিত্তিতে এই তিন ধরনের দেহ নির্মিত হয়েছে তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুব বেশি। বিবর্তনের গোড়ায় দৃষ্টি না দিলে এগুলোর মধ্যে যে কোনো সম্পর্ক আছে তা বিশ্বাস করা কঠিন। জীবাশ্ম এই সম্পর্কের প্রমাণ ধরে রেখেছে। যেহেতু এরা সমুদ্রচারী। তিনটি দলের প্রাণীই তাদের পর্যাপ্ত দেহাবশেষ রেখে গেছে। শত শত কোটি বছরের শিলায় তাদের রাজত্বের নমুনা ভিন্ন ভিন্নভাবে বিধৃত রয়েছে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের প্রাচীরে মেরুদণ্ডী মাছের মতো প্রাণীর বহু আগে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। চুনাপাথরের হালকা স্তরের ঠিক নিচে যেখানে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম রয়েছে সেই স্তরে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়। এখানে শিলাস্তর খুবই দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এই স্তরটিই একসময় পর্বতের উত্থান ঘটায়। ক্রমে পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পরে ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বত সাগরে ডুবে যায়। এই স্তরের উপর সমুদ্রে চুনাপাথর জমতে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে কোটি কোটি বছর ধরে। এ সময়ের মধ্যে প্রাণীর দেহাবশেষ জমা পড়া স্থগিত থাকে। ফলে জীবাশ্মের ইতিহাসে একটা বড় বিরতি পরিলক্ষিত হয়। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের উৎস খোঁজার জন্য আমাদেরকে শিলার জন্য পাশে চোখ ফেরাতে হয়। যেখানে এই ক্রান্তিকালে প্রাণীর দেহাবশেষ অবিরাম সঞ্চিত হয়েছিলো এবং তা কম বেশি অবিকৃত অবস্থায় থেকে গিয়েছিলো।

অবশ্য এ ধরনের অঞ্চলের সংখ্যা কম। মরক্কোর এটলাস পর্বতে এরকম একটি অঞ্চল রয়েছে। উত্তর আগাদির পর্বতের পেছনের পশ্চিমাংশ নীল চুনাপাথরে গঠিত। পাথর ভয়ানক শক্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা হাতুড়িতে ঘা দিলে প্রচণ্ড আওয়াজ হয়। পাথরের বিন্যাস এখানে একটু জটিল, তবে ভূ-আন্দোলনে এতে কোনো বিকৃতি ঘটেনি। গিরিখাতের শিখরের শিলায় জীবাশ্ম রয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় তা খুব কম। অতিরিক্ত শ্রম দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে অবশ্য বহু ধরনের প্রজাতির জীবাশ্ম এখান থেকে সংগ্রহ করা যায়। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় শিলায় এই কালে প্রাপ্ত জীবাশ্মকে একটি দলে ফেলা যায়। অথবা গ্রেট বেরিয়ার রিফে প্রাপ্ত ও অলংকৃত তিনটি দলে ফেলা যায়। এই অঞ্চলে পাওয়া জীবাশ্মের মধ্যে কড়ে আঙুলের নখের আকারের ক্ষুদ্র খোলকবিশিষ্ট প্রাণী রয়েছে যাদের নাম Brachiopod। রয়েছে অরীয় সমান দেহবিশিষ্ট, দেখতে বৃন্তযুক্ত ফুলের মতো প্রাণী Crenoid। এ ছাড়া Trilobite ও কীটের মতো দেহখণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী।

মরক্কোর পর্বত শিখরের চুনাপাথর ৬৫ কোটি বছরের পুরনো। শিখরের নিচের কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত স্তরসমূহের বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত। নিশ্চিতভাবে এসব স্তরে আলোচিত অমেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোর উৎস বিষয়ে প্রমাণ সংরক্ষিত থাকবে।

কিন্তু আসলে তা নেই। এই স্তরে নামতে থাকলে হঠাৎ দেখা যাবে জীবাশ্মের কোনো নিশানা নেই। গিরিখাতের শিখরে যেমন চুনাপাথর রয়েছে, এখানেও সেরকম চুনাপাথর রয়েছে। কাজেই, যে সমুদ্রে এগুলো জমা পড়েছিলো সেগুলো জীবাশ্মধারী শিলার মতোই ছিলো। এর ভৌতিক গঠনে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। সাধারণভাবে দেখলে কেবল একটা সময়ে সমুদ্রতলের আবরণকারী কর্দমে প্রাণিদেহের খোলক জমা পড়ে, এর আগে নয়।

আকস্মিকভাবে জীবাশ্ম উদ্ধারের ঘটনা কেবল মরক্কোয় পাওয়া শিলার ক্ষেত্রে ঘটেনি। সর্বত্রই এটি ঘটেছে। তবে মরক্কোর শিলায় তা বিশদভাবে দেখা যায়। সারা পৃথিবী জুড়ে এ সময়ের সকল শিলায় এমনটি ঘটেছিলো। লেক সুপিরিয়র ও দক্ষিণ আফ্রিকার চার্টে প্রাপ্ত অণুজীবের জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে অনেক অনেক আগে জীবনের উদ্ভব হয়েছিলো। আমাদের পূর্বে উল্লেখিত বর্ষপঞ্জিতে খোলকবিশিষ্ট প্রাণী উদ্ভূত হয়েছিলো নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে। ফলে, জীব ইতিহাসের অধিকাংশই শিলায় তা ধরা পড়েনি। কেবল শেষের তারিখে ৬০ কোটি বছর আগে, কতকগুলো স্বতন্ত্র দলের প্রাণী খোলক নিঃসরণের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্বের স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছিলো। কেনো যে হঠাৎ এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিলো তা আমাদের অজানা। সম্ভবত এ সময়ের আগে সমুদ্রের তাপমাত্রা যথাযথ ছিলো না অথবা সমুদ্রের রাসায়নিক গঠন এমন ছিলো না যাতে করে চুন জমা হবার অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিলো। অধিকাংশ সামুদ্রিক প্রাণীর খোলক ও হাড় তো চুন থেকেই নির্মিত হয়েছিলো। কারণ যা-ই হোক না কেনো, আমাদেরকে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎসের ঠিকানা অন্যত্র খুঁজতে হবে।

গ্রেট বেরিয়ার রিফে আমরা অবার দৃষ্টি ফেরালে কিছু জ্বলজ্বলে সূত্র পাই। পাতার আকৃতির কীটেরা তখন প্রবালের উপর দিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছিলো। পাথরের ফাটলের মধ্যে খেলছিলো লুকোচুরি খেলা। অথবা কোনোটি শিলা আঁকড়ে ঝুলে ঝুলে দোদুল দোল দিচ্ছিলো। জেলি ফিশের মতো ওদেরও দেহে একটিই দ্বার উন্মুক্ত ছিলো। একই দরোজা দিয়ে

ওরা দেহের ভিতরে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস নিতো এবং দেহ থেকে মল বের করে দিতো। ফুলকা ছিলো না। শ্বসন প্রক্রিয়া চালাতো ত্বকের সাহায্যে। দেহের অঙ্কভাগ ছিলো সিলিয়া (Cilia–লোমের মতো অঙ্গ) দ্বারা আবৃত। সিলিয়া দিয়ে ওরা গড়িয়ে গড়িয়ে চলতো। দেহের পুরোভাগেই রয়েছে মুখ বা সেই দ্বার। সেখানে আরো রয়েছে কিছু সংবেদী বিন্দু। এই (Spot)দেখে বোঝা যায় প্রাণিদেহে বুঝি মাথা সৃষ্টির সূত্রপাত হলো। যে কীটদের সম্বন্ধে এতোক্ষণ আলোচনা হলো তাদের প্রকৃষ্ঠ অন্যতম প্রতিনিধি হলো ফিতাকৃমি।

চক্ষু বিন্দু (eye Spot) বা সংবেদী বিন্দুকে যদি কার্যকরী হতে হয় তাহলে এর সাথে পেশিসমূহের যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাতে পেশিসূত্র এর সঙ্গে যুক্ত হলে প্রাণী কোনো কিছুর সংস্পর্শে এসে প্রতিক্রিয়া প্রকাশে সক্ষম হবে। ফিতাকৃমিতে যা রয়েছে তা স্নায়ুসূত্রের সরল জাল। স্নায়ুসূত্রের কোনো কোনো অংশ একটু পুরু। এই পুরু অংশকে মস্তিষ্ক বলা মুশকিল। ফিতাকৃমির কিন্তু বিস্ময়কর ক্ষমতা রয়েছে। মিঠাপানির একপ্রকারের ফিতাকৃমিকে প্রশিক্ষণও দেওয়া যায়। মিঠাপানির এই ফিতাকৃমিদেরকে একটি সহজ গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে চলাচলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গোলকধাঁধার দুটি পথ। একটি সাদা রঙের ও অপরটি কালো রঙের। প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সাদা পথ দিয়ে গমনের। ফিতাকৃমিদের কোনোটি যদি ভুল করে কালো পথ দিয়ে যেতে থাকে তখন তাকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। শক খেলে সে ঠিক পথটি বেছে নেয়। এর চেয়ে বিস্ময়কর হলো, এদের দেহের অংশমূহে স্মৃতি সংরক্ষিত থাকে। গোলকধাঁধা অতিক্রম করায় সফল কোনো ফিতাকৃমির মৃত্যু হলে, এর দেহ যদি অন্য কোনা কৃমি খেয়ে ফেলে তখন ভক্ষণকারী ফিতাকৃমি প্রশিক্ষণ ছাড়াই গোলকধাঁধার সঠিক পথ অতিক্রম করতে পারে।

পৃথিবীতে বর্তমানে ৩০০০ প্রজাতির ফিতাকৃমি রয়েছে। এই তিন হাজারের বেশির ভাগই আকারে ক্ষুদ্র ও জলচর। মিঠাপানির স্রোতে এক টুকরো কাঁচা মাংস বা যকৃতের একটা অংশ ফেলে লক্ষ করুন। অধিকাংশ প্রকারের ফিতাকৃমি মাংস বা যকৃৎ খেতে ছুটে আসবে। যদি জলের ভিতরে ঘন আগাছা থাকে তাহলে এর ভিতর থেকে ডজন ডজন ফিতাকৃমি গড়িয়ে এসে খাবার খেতে শুরু করবে। কতিপয় ফিতাকৃমি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র বনাঞ্চলে স্থলভাগে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এদের দেহের অঙ্কভাগ (ventral side) থেকে শ্লেষ্মাঝিল্লি নিঃসৃত হয়। শ্লেষ্মাঝিল্লির (mucous membrane) উপরে ভর করে ওরা দেহকে দোলায়। এরা দৈর্ঘ্যে ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অন্যান্য ফিতাকৃমিরা পরজীবী জীবন গ্রহণ করেছে। এরা মানুষসহ অন্যান্য প্রাণিদেহের অভ্যন্তরভাবে আশ্রয় নিয়েছে। এ কারণে ওদেরকে চোখে পড়ে না। পরজীবীর সংখ্যাও অগুণতি। অদ্যাবধি ফিতাকৃমির আদর্শ রূপ বহন করছে লিভার ফ্লুক। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীতে সচরাচর যে ফিতাকৃমি দেখা যায় তা দেখতে অন্যরকম। এরা পোষকের অন্ত্র খুঁড়ে এর ভিতরে মাথা গুঁজে এবং দেহের পশ্চাৎভাগ থেকে ডিম্ববাহী দেহখণ্ডকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। বিচ্ছিন্ন দেহখণ্ডসমূহ প্রাপ্তবয়স্ক হলে পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি শিকলের রূপ ধারণ করে যা দৈর্ঘ্যে ১০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে কেঁচোর দেহ যে রকম সত্যিকারের দেহখণ্ডে, ফিতাকৃমির ডিম্ববাহী দেহখণ্ডসমূহ প্রকৃত অর্থে সেরকম দেহখণ্ডে বিভক্ত নয়।

ফিতাকৃমি খুবই সরল কীট। মুক্ত সন্তরণশীল দলের ফিতাকৃমিদের দেহে অন্ত্র নেই। বদ্ধজীবনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে প্রবালের মতো এরা মুক্ত সন্তরণশীল (free

swimming) জীবন নির্বাহ করে। যে সকল গবেষক প্রাপ্তবয়স্ক ও শূককীট পর্যায়ের ফিতাকৃমি গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ফিতাকৃমিরা সরল প্রাণী প্রবাল ও জেলিফিশ থেকে বিবর্তিত হয়েছে, তাঁদের সিদ্ধান্ত ভুল এমনটি ভাবার অবকাশ খুব একটা আছে বলে মনে হয় না।

৬০ থেকে ১০০ কোটি বছরের মধ্যে যখন প্রথম সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের উদ্ভব হচ্ছিলো তখন মহাদেশসমূহের ক্ষয়ের ফলে মহাদেশসমূহের প্রান্তসীমার কাছাকাছি সমুদ্রের জলদেশে কাদা ও বালি স্তরের বিশাল ব্যাপ্তি ঘটেছিলো। এই পরিবেশে স্থলভাগ থেকে নেমে আসা জলে জৈবগুঁড়া হিসেবে প্রচুর খাদ্যসম্ভার ছিলো। যে কোনো প্রাণীর বেঁচে থাকার ও নিজেদের সংগোপনে রাখার চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলো এই পরিবেশ। যে সকল প্রাণী এই পরিবেশে ছিলো তারা এই সুযোগ যে ভোগ করেছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফিতাকৃমির আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণীরা অবশ্য গর্ত খোঁড়ায় সমর্থ ছিলো না। নলাকৃতির প্রাণীরা এ কাজে পারদর্শী ছিলো। এরা কাদার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ খনন করে খাদ্যের খোঁজে বের হতো। অন্যান্যদের মুখমণ্ডল থাকতো কাদার উপরে এবং দেহের বাকি অংশ কাদার মধ্যে ডোবানো থাকতো। মুখমণ্ডলের চারপাশে অবস্থিত সিলিয়ার তোড়ে সৃষ্ট জলপ্রবাহ থেকে ওরা খাদ্য ছেঁকে নিতো।

এই প্রাণীদের কেউ কেউ সুরক্ষা নলে বাস করতো। কালে কালে নলের শীর্ষদেশ ছিদ্রযুক্ত কলার বা ঘাড়ে রূপান্তরিত হয়। ফলে কর্ষিকার ওপর জলপ্রবাহের সুবিধা বেড়ে যায়। আরো রূপান্তরিত ও খনিজসমৃদ্ধ হবার দরুণ এদের দেহে দুটো সুরক্ষামূলক খোলকের (shell) সৃষ্টি হয়। এরাই আদি Brachiopod। এদের একটির নাম *Lingulella*. *Lingulella*-র উত্তরসূরিরা এখনো বহাল তরিয়তে আছে। এদের দেহে বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এ কারণে এদেরকে জীবন্ত জীবাশ্ম (living fossil) বলা হয়।

জীবের ইতিহাসে বহু বহু কাল ধরে টিকে থাকা প্রজাতির উদাহরণ মাঝে মাঝে দেখা যায়। একটি প্রাণীর উদ্ভব ঘটে এবং ব্যাপকভাবে তা ছড়িয়ে পড়ে। সময় যতোই এগিয়ে যায়, ততোই এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিবর্তন আসতে থাকে। এদের উত্তরসূরিদের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে এরা নতুন পরিস্থিতিকে আরো সফলভাবে মোকাবেলায় সক্ষম হয়। কিন্তু দু' একটি অঞ্চলে ওদের দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না এবং অঙ্গসংস্থান আদি অবস্থায় থেকে যায়। এ অবস্থায়ও ওরা চারপাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। এদের মধ্যে বিবিধায়ন (variation) ঘটে না। ফলে এরা পরিবেশকে অধিকতর সফলতার সাথে মোকাবেলায় সক্ষম হয় না। কাজেই আদি এই প্রজাতির প্রাণীসমূহ পরিবর্তনের কোনো ধার ধারে না। হাজার হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত থেকে মন্থরগতিতে চলে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এভাবেই জীবন নির্বাহ করে চলে। পরিবর্তনের প্রশ্নে ওরা খুবই সংরক্ষণশীল।

Lingulella-র উত্তরসূরিরা আকারে সামান্য বড়। এদের নাম *Lingula*। যে সকল জায়গায় এদের দেখা যায় তার মধ্যে একটি হলো জাপানের উপকূলীয় জলরাশি। এখানে ওরা বালিতে গর্ত খুঁড়ে এবং গর্তে বাস করে। অথবা বাস করে মোহনার কাদার মধ্যে। দেখতে লম্বা কৃমির মতো। দেহের এক প্রান্তে থাকে দুটো খোলক। দেহ গঠন অবশ্য জটিল। এদের দেহে পরিপাকতন্ত্র রয়েছে। পরিপাকতন্ত্রের শেষে থাকে পায়ু (anus)। মুখের চারপাশে থাকে

এক গ্রুপ কর্ষিকা। মুখ ও কর্ষিকা খোলক দ্বারা আবৃত থাকে। কর্ষিকাকে ঢেকে রাখে সিলিয়া। সিলিয়ার তোড়ে জল-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। জলপ্রবাহে মিশে খাদ্যবস্তু ছুটতে থাকলে কর্ষিকা তা ধরে এবং মুখের ভিতরে ঠেলে দেয়। এই প্রক্রিয়া চলাকালে কর্ষিকা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। কর্ষিকা দ্বারা আনীত অক্সিজেনসমৃদ্ধ জলের সাহায্যে ওরা শ্বসনের কাজ সম্পন্ন করে। কর্ষিকা জল শোষণ করে এবং ফুলকার ভূমিকা পালন করে। কর্ষিকাকে পরিবেষ্টনকারী খোলক বা কপাটিকা (shell valve) কেবল নরম কর্ষিকাকে রক্ষা করে না। জলকে ঘনীভূত করে নিয়মিত জলপ্রবাহ সঞ্চালনে সাহায্য করে যাতে কর্ষিকার উপর নিয়মিত সুষ্ঠু জলপ্রবাহ বজায় থাকে।

১০ কোটি বা এরও বেশি বছর ধরে Brachiopoda-রা এভাবে চলছে। এদের কতকগুলো একটু বড় আকারের। ওদের রয়েছে ভারী চুননির্মিত খোলক (calcareous shell)। অনেক প্রজাতিতে কপাটিকার কব্জাপ্রান্তে (hinge end) একটি কপাটিতে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এই গর্ত দিয়ে কীটের আকৃতির একটি দণ্ড বেরিয়ে থাকে। এই অঙ্গের সাহায্যে ওরা কাদায় আটকে থাকতে পারে। এ অবস্থায় প্রাণীটিকে দেখতে রোমানদের উল্টানো তেল-বাতির মতো দেখায়। দণ্ডটিকে দেখায় বাতির পলিতার মতো। এ কারণে Brachiopoda-দের পুরো গ্রুপকে ল্যাম্প-সেল বা বাতি-খোলক বলা হয়ে থাকে।

Brachiopod কোনোমতেই প্রাচীন শিলায় প্রাপ্ত একমাত্র খোলকবিশিষ্ট প্রাণী নয়। অন্য একপ্রকারের প্রাণীরও উদ্ভব ঘটেছিলো। এরা সাগরতলে বদ্ধজীবন বা স্থায়ী জীবন যাপন করতো না। এরা হামাগুড়ি দিয়ে চলতো এবং দেহ থেকে কোণাকৃতির খোলক নিঃসরণ করতো। বিপদে ওরা পুরো দেহকে খোলকে গুটিয়ে নিতো। খোলকবিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে এটিই ছিলো সবচেয়ে সফল প্রাণী শামুকগোষ্ঠীর পূর্বসূরি। এটিরও একটি প্রতিনিধি এখনো বিদ্যমান। এই জীবন্ত জীবাশ্মটির নাম *Neopilina*। ১৯৫২ সালে একে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর জল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৬০,০০০ প্রজাতির শামুক রয়েছে।

শামুকের দেহের অঙ্কভাগকে বলা হয় ফুট (foot) বা পদ। শামুক খোলক থেকে এই পা বের করে নড়াচড়া করে। অঙ্কদেশ ছোট ছোট তরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে পা নড়াচড়ায় সাহায্য করে। অনেক প্রজাতির প্রাণীর পদ-অংশে ছোট একটি চাকতি থাকে। পা খোলকে ঢোকানোর পর এই চাকতি খোলকের প্রবেশ পথকে আঁটসাঁটভাবে বন্ধ রাখে। দেহের পৃষ্ঠভাগ পাতলা পাত (sheet) দ্বারা গঠিত। এই পাত অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহকে ঢেকে রাখে। এই পাতকে ম্যান্টল mantle বা দেহাবরণী বলা হয়। দেহাবরণী ও দেহের কেন্দ্রস্থলের অঙ্গগুলোর মধ্যে ফাঁপা স্থান বা গহ্বর থাকে। অনেক প্রজাতির প্রাণিদেহে এই গহ্বরে ফুলকা থাকে। ফুলকার উপর দিয়ে অক্সিজেনসমৃদ্ধ জল প্রবাহিত হয়। গহ্বরের এক প্রান্ত দিয়ে জল গৃহীত হয় এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে তা বের হয়ে যায়।

দেহাবরণীর উপরের অংশ থেকে খোলক নিঃসৃত হয়। শামুক গোষ্ঠীর একটি গ্রুপের প্রাণিদেহে কেবল একটি খোলক থাকে। *Neopilina*-র মতো লিমপেট নামের প্রাণী দেহাবরণীর ধার ঘেঁষে সমান দূরত্বে দক্ষিণাবর্তী (dextral) খোলক তৈরি করে। খোলকটি দেখতে পিরামিডের মতো। অন্যান্য প্রজাতির প্রাণীতে দেহের পশ্চাৎভাগের তুলনায় সম্মুখভাগে অধিক দ্রুত হারে খোলক নিঃসরিত হয়। ফলে একটা চ্যাপ্টা ভিতের উপর

একটি প্যাঁচালো খোলকের সৃষ্টি হয়। এটি দেখতে স্প্রিং-এর মতো। অন্য এক প্রকারের শামুকে কেবল একদিকেই খোলক নির্মিত হয়। ফলে খোলকটিকে মিনারের মতো দেখায়। শঙ্খ বা শাঁখ দেহাবরণীর পাশ দিয়ে নিঃসরণ ক্ষমা করে। ফলে, খোলকটি শিথিল মুষ্টির আকৃতি ধারণ করে। শাঁখের তলার ছিদ্র দিয়ে কেবল পা নয়, দেহাবরণীর দুটি অংশ খোলকের দুটি দিকে প্রসারিত হয় এবং শীর্ষদেশে মিলিত হয়। ফলে শঙ্খের পৃষ্ঠদেশ এতো চমৎকার মসৃণ দেখায় যা শঙ্খের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এক খোলকবিশিষ্ট শামুকে Brachiopoda-র মতো খোলকের ভিতরে কর্ষিকার সাহায্যে আহার গৃহীথ হয় না। ফিতা আকৃতির জিহ্বা দিয়ে ওরা খায়। জিহ্বা কর্কশ দাঁত দিয়ে ঢাকা থাকে। শামুকের এই জিহ্বার নাম র‍্যাডুলা (radula)। কোনো কোনো শামুক পাথর থেকে শৈবাল (algae) ছিঁড়ে নেওয়ায় দাঁত ব্যবহার করে। প্যাঁচালো খোলকবিশিষ্ট শামুকে একটি দণ্ডের উপর র‍্যাডুলা থাকে। এরা র‍্যাডুলাকে খোলকের বাইরে প্রসারিত করায় সক্ষম। র‍্যাডুলা দিয়ে ওরা অন্য শামুকের খোলক ফুটো করে। ফুটোর মধ্যে দিয়ে র‍্যাডুলা ঢুকিয়ে দিয়ে ওরা শিকারের মাংস খুবলে খায়। মোচাকৃতির বা শাঙ্কবর শামুকেও দণ্ডযুক্ত র‍্যাডুলা রয়েছে। তবে তা রূপান্তরিত হয়ে বন্দুকের আকৃতি পায়। এরা চতুরতার সাথে র‍্যাডুলাকে শিকারের কাছে নিয়ে যায়। শিকারটি হতে পারে যে কোনো কীট বা মাছ। র‍্যাডুলাকে সন্তর্পণে শিকারের খুব কাছে নিয়ে ছোট স্বচ্ছ হার্পুনের মতো অঙ্গ ছুঁড়ে মারে। শিকার যখন পালানোর চেষ্টা করে তখন ওরা শিকারের দেহে বিষ ঢুকিয়ে দেয়। এই বিষ এতোই মারাত্মক যে মাছের মতো বড়ো প্রাণীও সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে। এই বিষ মানুষের জন্যও মারাত্মক। মৃত শিকারের দেহকে টেনে এনে ওরা ধীরে ধীরে সাবাড় করে।

ভারী খোলকবাহী শামুকের পক্ষে দ্রুত শিকার করা অসুবিধাজনক। কতকগুলো মাংসাশী শামুককে এ কাজটি করতে গেলে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়। ফলে ওরা ওদের পূর্বসূরি ফিতা কৃমির জীবন নির্বাহ পদ্ধতি গ্রহণের দিকে ফিরে গেছে। এরা কুঁড়ে স্বভাবের বা শিথিল গতিবিশিষ্ট শামুক। ইংরেজি নাম সাগর প্লাগ (Sea plug)। সমুদ্রে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এটাই সবচেয়ে সুন্দর ও চমৎকার বর্ণাঢ্য প্রাণী। এদের দেহ দীর্ঘ ও নরম। এদের পৃষ্ঠদেশকে আবৃত করে রাখে দোদুল্যমান কর্ষিকা। কর্ষিকা মনোহারী রঙে সজ্জিত। ফিতার মতো, রেখার মতো, রশির মতো নানা রঙের সমাবেশ ঘটেছে এতে। আরো রয়েছে নানা রঙের আলো-ছায়া। যদিও তাদের দেহে খোলক নেই, তবু এরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ নয়। কারো কারো দেহে দ্বিতীয় পর্যায়ের (Secondary stage) অস্ত্র রয়েছে। এরা পালকের মতো হালকা কর্ষিকায় ভর করে সমুদ্র জলের পৃষ্ঠভাগের কাছাকাছি ডুব সাঁতার দেয় এবং জেলিফিশ শিকার করে। শিকারের পর ধীরে ধীরে আহার করে। জেলিফিশের হুলও ওদের অন্ত্রে ঢুকে যায় এবং তা অক্ষত থাকে। এই হুল শামুকের কোষকলায় প্রবিষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে তা কর্ষিকায় গিয়ে ভীড় করে। জেলিফিশের হুল যেভাবে আত্মরক্ষার কাজে লাগতো, শামুকের কর্ষিকায়ও হুল একই ভূমিকা পালন করে। হুল কোষগুলো এখানে আরো বিকশিত হয়।

শামুকজাতীয় অন্যান্য প্রাণী যথা ঝিনুক, ক্ল্যাম ইত্যাদির খোলক দুই কপাটিকায় বিভক্ত। এ সকল মন্থর গতির প্রাণী। এরা পা প্রসারণের মাধ্যমে গোটা দেহকে বালির মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। এদের অধিকাংশই পরিস্রাবণের মাধ্যমে আহার করে। কপাটিকা উন্মুক্ত করে

ওরা ম্যান্টল গহ্বরের এক প্রান্ত দিয়ে দেহের ভিতরে পানি ঢোকায় এবং নলাকৃতির সাইফন দিয়ে পানিকে দেহ থেকে বের করে দেয়। পানির প্রবাহে বাহিত খাদ্য ওরা ছেঁকে নিয়ে খায়। যেহেতু এদের বেশি নড়াচড়ার প্রয়োজন পড়ে না, সেহেতু দেহ আকারে বড় হলেও কোনো ক্ষতি নেই। গ্রেট বেরিয়ার রিফে পাওয়া দানো শামুক দৈর্ঘ্যে এক মিটার হতে দেখা গেছে। ঝিনুকেরা প্রবালের মধ্যে শায়িত থাকে। ম্যান্টল বা দেহাবরণী থাকে উন্মুক্ত। উন্মুক্ত অংশ দিয়ে দেহের আঁকাবাঁকা উজ্জ্বল সবুজ রঙের মাংসপেশি দেখা যায়। সবুজ রঙের উপরে থাকে কালো কালো ফোঁটা। দেহের ভিতর দিয়ে জলপ্রবাহের সময় মাংস কাঁপে। ডুবুরির পা রাখার জন্য ওদের দেহের আয়তন পর্যাপ্ত বিবেচিত হলেও ডুবুরিকে সতর্ক থাকতে হয় যাতে উন্মুক্ত ম্যান্টলের ফাঁদে পা না পড়ে। এদের মাংসপেশি শক্তিশালী হলেও এরা কপাটিকা বন্ধ করায় সক্ষম নয়। এরা ধীরে ধীরে প্রবলভাবে জোর খাটিয়ে কপাটিকা দুটিকে কাছাকাছি আনতে পারে। কাজেই অন্য প্রাণীরা ওর মতলব বোঝার অবকাশ পায়। যখন খুব বড়ো শামুক কপাটিকাদ্বয়কে পুরো বন্ধ করে তখনো বেশ ফাঁক থাকে। কপাটিকাদ্বয় পরস্পর কেবল কাঁটা পর্যন্ত কাছাকাছি আসতে পারে। তখনো ফাঁক এতো বড়ো থাকে যে, ফাঁক দিয়ে হাত ঢোকালে সে হাত ধরে রাখায় সক্ষম হয় না। এই পরীক্ষণের কাজটি যদিও তেমন ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তবু হাত ঢোকানোর আগে অন্য কিছু ঢুকিয়ে পরখ করা উত্তম।

কতিপয় পরিস্রুত খাদ্যগ্রহণকারী (filter feeder) প্রাণী যেমন স্ক্যালোপ (scalop) (অর্ধ-বৃত্তাকৃতির কপাটিকাবিশিষ্ট ঝিনুক) ভ্রমণে অভ্যস্ত। এরা প্রবলভাবে আলোড়িত করে সশব্দে কপাটিকা দুটিকে বন্ধ করে বাঁকিয়ে লাফ দেয়। সব কিছু বিবেচনা করে দেখা যায় যে, বড় প্রাপ্তবয়সের ঝিনুক স্থিতিশীল জীবন নির্বাহ করে। তরুণ ঝিনুকরা সমুদ্র তলে দূর দূর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শামুকজাতীয় প্রাণীর ডিম ফুটে শূককীট হয়। শূককীট দেখতে দানাদার ও স্বভাবে চঞ্চল। শূককীটে এক সারি সিলিয়া থাকে। এরা বিশাল সমুদ্রে জলপ্রবাহের সাথে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে যায়। কয়েক সপ্তাহ পরে শূককীটের আকৃতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। খোলকের সৃষ্টি হয় এবং স্থায়ী আসনে বসে। প্রবাহতাড়িত জীবনযাত্রায় ওরা অনেক ক্ষুধার্ত প্রাণীর আহারে পরিণত হয়। স্থায়ী জীবন নির্বাহী খাদক প্রাণী থেকে মাছজাতীয় প্রাণী পর্যন্ত ওদের শত্রু। শত্রুর গ্রাস থেকে যারা বেঁচে যায় তারাই পরে বড় হয়। ফলে, বংশরক্ষার তাগিদে শামুকজাতীয় একটি প্রাণীকে অসংখ্য ডিম পাড়তে হয়। একটি শামুক ৪০ কোটিরও বেশি ডিম পাড়ে।

এই প্রাণীর ইতিহাসের আদি পর্বে এদেরই একটি শাখার প্রাণিকুল খুবই চলনশীল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। যদিও তখনও তাদের দেহে ভারী খোলক ছিলো। ওদের শরীরে বিকশিত হয়েছিলো বায়ুপূর্ণ একটি ভাসমান-ট্যাঙ্ক। এ ধরনের প্রাণীর উদ্ভব ঘটে ৫৫ কোটি বছর আগে। শামুকের ন্যায় দেহকে পুরো আবরণকারী খোলক ওদের ছিলো না। ওদের খোলক চ্যাপ্টা ও প্যাঁচানো। খোলকের মধ্যে পুরো শরীর ঢাকা পড়তো না। এদের দেহের পেছনের অংশে একটি প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি হয় যা গ্যাস চেম্বার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাণিদেহের বৃদ্ধির সাথে সাথে আরো গ্যাস চেম্বার সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে দেহ বড় হলেও তা ভার বহনের মতো প্লবতা অর্জন করে। এই প্রাণীটির নাম *Nautilus*। আমরা *Lingula*, *Neopilina* মতো *Nautilus*-ও কিভাবে জীবন্ত জীবাশ্মের মর্যাদা পাচ্ছে সে বিষয়ে সঠিক ধারণা পেতে পারি।

বর্তমানে যে প্রাণীটি টিকে আছে তার নাম পার্লি বা মুক্তা নটিলাস (Pearly *Nautilus*)। দৈর্ঘ্যে ২০ সেমি-এর মতো। দেহের পশ্চাৎভাগের প্রকোষ্ঠ থেকে একটি নল প্লবন প্রকোষ্ঠে গমন করে। এতে প্রাণী প্লাবিত বা ভাসমান হতে পারে এবং সমুদ্রের যে কোনো জল-স্তরে ভাসা (buoyancy) বজায় রাখতে পারে। *Nautilus* কেবল গলিত মাংসই ভক্ষণ করে না, কাঁকড়াজাতীয় প্রাণীও আহার করে। নটিলাসেরই পরিস্রুত খাদ্য গ্রহণকারী স্বজনরা জেট বিমানের কায়দায় চলাচলের কৌশল রপ্ত করেছে। দেহে সাইফনের মাধ্যমে জলের ফোয়ারা সৃষ্টি করে ওরা বিভিন্ন ধরনের প্রবাহ সৃষ্টির কৌশল আয়ত্ত করছে।

ছোট দণ্ডের উপরে বসানো চোখ ও কর্ষিকার সাহায্যে নটিলাস শিকারের খোঁজ করে। কর্ষিকা স্পর্শের মাধ্যমে খাদ্যের রকমসকম ও স্বাদ অনুভব করে। নটিলাসের পা ৯০টি কর্ষিকায় পরিণত হয়েছে। কর্ষিকা দিয়ে ওরা আঁকড়ে ধরতে পারে। শিকার ঝাপটে ধরে ওরা টানা-হেঁচড়া করে। কর্ষিকাসমূহের কেন্দ্রস্থলে টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো একটি শক্ত অঙ্গ থাকে। এটি দিয়ে ঝাপটে ধরা শিকারকে মারাত্মক আঘাত হেনে কাবু করে। এই অঙ্গ দিয়ে খোলক ভাঙাও সহজ ব্যাপার।

১৪ কোটি বছর পরে বিকাশের কোনো এক পর্যায়ে নটিলাসের মধ্যে বিভিন্ন দল গড়ে উঠে। এগুলোর খোলকে আরো বেশি প্লবন-প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি হয়। এই প্রাণীদের নাম Ammonites। এরা খুবই সফল প্রাণী। কতকগুলো শিলায় এদের অনেকগুলোর খোলক ঘনভাবে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ফলে শিলায় ঘন ও কঠিন আস্তরণ সৃষ্টি হয়েছে। এদের কোনো কোনো প্রজাতির প্রাণী আকারে ট্রাকের চাকার মতো বিশাল ছিলো। যখন আপনি ইংল্যান্ডের কেন্দ্রস্থলে মধুবর্ণের চুনাপাথর বা ডরসেটের শক্ত নীল শিলার মধ্যে এই দানবাকৃতির কোনোটিকে দেখতে পান, তখন আপনি ভাববেন যে, এতো বড়ো প্রাণীটির কোনো কিছু করার ক্ষমতা ছিলো অত্যন্ত কম। ওরা কেবল সমুদ্র তলে অতি ধীরে নড়াচড়া করতে পারতো। কিন্তু যেখানে ক্ষয়ের দরুন মাটি থেকে এদের এ ধরনের খোলকগুলো সরে যায়, চমৎকার প্লবন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট প্রাণীগুলোর কথা তখন স্মরণে আসবে যাদের শরীর জলে প্রায় ওজনশূন্য ছিলো। এরাই একদিন প্রাগৈতিহাসিক কালের সমুদ্রে স্পেনীয় নৌকার মতো খোলকের তরীদলের (keel) উপর ভর করে পাড়ি জমিয়েছিলো।

১০ কোটি বছর আগে অ্যামোনাইটের রাজত্ব কি কারণে শুরু হয়েছিলো তা আমাদের জানা নেই। অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তখন অন্যান্য ধরনের প্রাণীর উদ্ভব হতে থাকে যাদের খোলক হয়তো শিথিলভাবে প্যাঁচানো নয়তো সরল সিধে। সাম্প্রতিককালের মন্থর শামুকেরা যেভাবে খোলকহীন হয়েছে, ওদেরও কোনো কোনো দলের প্রাণীও তেমনটি খোলকহীন ছিলো। পার্লি নটিলাস ছাড়া খোলকওয়ালা অন্যান্যরা বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু খোলকহীনরা টিকে যায়। অক্টোপাস ও স্কুইড সকল শামুকজাতীয় প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও ধূর্ত প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত হয়।

স্কুইডের দেহের অভ্যন্তরে অতীত খোলকের অবশেষ এখনো রয়েছে। এই অবশেষকে কাটল বোন (cuttle bone) বলা হয়। এটি চক পাউডারে নির্মিত চ্যাপ্টা পাতার মতো। এটি কখনো কখনো সাগরতীরে ভেসে আসে। অক্টোপাসের দেহে খোলকের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু এদের Argonaut নামের একটি প্রজাতির প্রাণী এর বাহু থেকে নটিলাসের

খোলকের মতো কাগজের ন্যায় পাতলা প্রকোষ্ঠহীন খোলক নির্মাণ করে। Argonaut এই খোলককে দেহ সুরক্ষার কাজে ব্যবহার করে না। খোলক দেখতে নরম কাপের মতো। এর মধ্যে Argonaut ডিম পাড়ে।

স্কুইডে কর্ষিকার সংখ্যা নটিলাসের কর্ষিকার চেয়ে কম। সংখ্যায় মাত্র ১০টি। অক্টোপাস নামটি শুনলেই বোঝা যায় এর কর্ষিকার সংখ্যা আটটি। স্কুইড অক্টোপাসের চেয়ে দ্রুতগামী। এর দেহের দু'পাশে পাখনার মতো বর্ধিত অংশ থাকে। পাখনা এদিক সেদিক দুলে। এর তাড়নায় স্কুইড জলে দ্রুত ছুটতে থাকে। নটিলাসের ন্যায় এরাও জেট ইঞ্জিনের কৌশল প্রয়োগ করে ছুটে।

এদের চোখ অনেক বেশি কার্যকর। এমনকি আমাদের চোখের চেয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী। স্কুইড একীভূত আলো (Polaroied light) প্রত্যক্ষ করে যা মানুষ পারে না। এদের রেটিনা সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা গঠিত। ফলে ওরা আরো সূক্ষ্মভাবে ও বিস্তারিতভাবে দেখতে পারে। এদের সংবেদী অঙ্গসমূহ যে ধরনের সংকেত পাঠায় ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাতে করে বোঝা যায় যে, এদের মস্তিষ্ক মোটামুটি বিকশিত।

স্কুইড আকারে অনেক বড় হয়। ১৯৫৪ সালে নওরয়ের সমুদ্রতীরে একটি স্কুইড ভেসে আসে। দেহের এক প্রান্ত থেকে কর্ষিকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এটি দৈর্ঘ্যে ছিলো ৯ মিটার। ওজন এক টন। এটি অবশ্য সর্ববৃহৎ নয়। ১৯৩৩ সালে ২১ মিটার দৈর্ঘ্যের স্কুইড পাওয়া গিয়েছিলো নিউজিল্যান্ডে। এর চোখের ব্যাস ছিলো ৪০ সেমি। প্রাণিজগতে এর চেয়ে বড় চোখ আর দেখা যায়নি। এর চেয়ে বড় স্কুইডের দেখা পাবার সম্ভাবনাও কম। স্কুইড এতো বুদ্ধিমান ও দ্রুতগতির যে, ওরা খুব সহজে গভীর সমুদ্রে মানুষের সৃষ্ট ফাঁদ থেকেও বেরিয়ে যেতে পারে। স্পার্ম তিমি প্রায়ই ডুবে ডুবে স্কুইডের খোঁজে থাকে। আমাদের যতো কৌশল জানা আছে, তারও বেশি কৌশল ওরা প্রয়োগ করে স্কুইডের বিরুদ্ধে। এই তিমিদের কোনো কোনোটির তুন্ডে গভীর ক্ষত দেখলে ধরে নিবেন যে ওরা নিশ্চয়ই অন্তত ১৩ সেন্টিমিটার চোষকবিশিষ্ট স্কুইডের সাথে লড়াইয়ে নেমেছিলো। তিমিদের পেটে নরওয়েতে প্রাপ্ত স্কুইডের চঞ্চুর চেয়েও বড় স্কুইডচঞ্চু পাওয়া গেছে। কাজেই, এটি অসম্ভব নয় যে, ব্রাকেন বা পৌরাণিক কোনো সমুদ্র দানব সামুদ্রিক জাহাজকে কর্ষিকার উপরে তুলে নিয়ে আসতে পারতো। কর্ষিকা দিয়ে জাহাজ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াতে পারতো এমন কোনো সামুদ্রিক প্রাণীর অস্তিত্ব হয়তো ছিলো। আমাদের হাতে যে সকল প্রমাণ রয়েছে তাতে দেখা যায়, সে সময় বিস্ময়কর বড় প্রাণী উদ্ভূত হয়েছিলো। এরা ছিলো সরল খোলকবিশিষ্ট ছোট প্রাণীর উত্তরসূরি। এদের উদ্ভব ঘটেছিলো আজ থেকে ৬০ কোটি বছর আগে।

প্রাচীন শিলায় ফুলের সমাবেশের মতো ক্রিনয়ডদের ঝাঁক ঝাঁক উপস্থিতি কি দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাণীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য হাজির করে? শিলার উর্ধভাগে এদেরকে সনাক্ত করা হয়েছে। ফলে এদের সম্বন্ধে স্পষ্ট জানাও সম্ভব হয়েছে। শনাক্তকৃত প্রতিটি প্রাণীতে রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় অঙ্গ। অঙ্গটির নাম ক্যালিক্স (Calyx) বা বৃতি। কাণ্ডের মতো একটি অঙ্গ থেকে বৃতি উদ্ভূত হয়েছে। কাণ্ডটি দেখতে পপি গাছের বীজের শীর্ষভাগের মতো। ক্যালিক্স থেকে বেরিয়ে আসে পাঁচটি বাহু। কোনো কোনো প্রজাতিতে বাহু থেকে শাখা-প্রশাখা জন্মায়। ক্যালিক্সের উপরিভাগ চুর্ন নির্মিত প্লেট দিয়ে গঠিত। প্লেটগুলো ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট।

গুটিকার মতো থালার কাণ্ড ও শাখাসমূহও একই উপাদানে গঠিত। শিলায় শায়িত কাণ্ডকে দেখতে তারা নেকলেসের মতো। নেকলেসের স্বতন্ত্র গুটিকাসমূহ কখনো কখনো ইতস্তত ছড়ানো। কখনো সর্পিল স্তম্ভের মতো। দেখতে মনে হয় এ মাত্র কেউ নেকলেসের সুতা ছিঁড়ে নিয়েছে। শিলায় মাঝে মাঝে বড় আকারের প্রাণীর সন্ধান মিলে। যে প্রাণীর কাণ্ড দৈর্ঘ্যে বিশ মিটার। অ্যামোনাইটসদের মতো এদেরও দিন ফুরিয়ে আসে। যদিও এখনো সমুদ্র গভীরে সি লিলি বা সাগর-পদ্ম নামের কিছু কিছু বড় আকারবিশিষ্ট প্রজাতি প্রাণী বিচরণ করে।

জীবন্ত অবস্থায় ওদের দেহে, ত্বকের ঠিক নিচে চুনর্নিমিত প্লেট দেখা যায়। ফলে ওদের দেহের উপরিভাগে হাত বুলালে সামান্য কাঁটা কাঁটা অনুভব করে শরীরে অদ্ভুত শিহরণ জাগে। এদের সাথে সম্পর্কিত পরিবারের সদস্যদের ত্বকে যুক্ত হয়েছে কাঁটা ও সুইয়ের মতো অঙ্গ। এ সকল অঙ্গের দরুণই ওদের নাম একাইনোডার্ম বা কন্টকত্বকী। একাইনোডার্মজাতীয় প্রাণীর দেহ যে মৌলিক স্থাপত্যরীতির ভিত্তিতে নির্মিত তাকে পঞ্চভুজী প্রতিসাম্যবিশিষ্ট বলে অভিহিত করা যায়। এদের ক্যালিপ্সের উপরের প্লেটসমূহ পঞ্চকোণী। একাইনোডার্ম তরল পদার্থের স্থিতিশক্তি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে অনন্য উপায়ে কাজে লাগায়। এদের সংলগ্ন পায়ে রয়েছে পাতলা নালি পা। নালি পায়ের আগায় থাকে চোযক। নালির ভিতরের জলের চাপে পা কোনো বস্তুতে আটকে থাকে। বাহু জুড়ে নালি পা দোল খায় ও কুঁকড়ে যায়। নালি পায়ে জল সঞ্চালন প্রক্রিয়া দেহগহ্বরের জল সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মুখকে পরিবৃত করে থাকা একটি খাতে ছিদ্র দিয়ে পানি পরিবেশিত হয়। এই পানি প্রাণীর পুরো দেহে ও হাজার নালি পায়ে পরিচালিত হয়। যখন কোনো খাদ্যবস্তু বাহুর সংস্পর্শে আসে, তখন নালি পা বস্তুটিকে জড়িয়ে আবদ্ধ করে এবং তা এক পা থেকে অন্য পায়ে চালান যায়। চালান হতে হতে বস্তুটি বাহুর উপরিভাগে হয়। বাহু বস্তুকে পঞ্চভুজের কেন্দ্রে অবস্থিত মুখগহ্বরে পাঠায়।

জীবাশ্ম গঠনের সময় যদিও দণ্ডধর সংখ্যা ছিলো পর্যাপ্ত, কিন্তু বর্তমানে যাদের সচরাচর দেখা যায় তারা দণ্ডহীন। এদের বলা হয় ফেদার স্টার বা পালক তারা মাছ। দণ্ডের পরিবর্তে এদের দেহে রয়েছে কুঞ্চিত গুচ্ছমূলসদৃশ অঙ্গ। এই অঙ্গ দিয়ে ওরা প্রবাল বা শিলা আঁকড়ে ধরে। বেরিয়ার রিফের কোথাও কোথাও এদের পর্যাপ্ত সংখ্যায় দেখা যায়। জোয়ার-ভাটার সন্ধিরেখায় ওরা পাতানো বাদামি কার্পেটের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে।

দেহের পঞ্চভাঁজি প্রতিসাম্য ও নালি পায়ের তরল পদার্থের স্থিতিশক্তি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার এদের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ও প্রকট বৈশিষ্ট্য হিসেবে আদৃত। এই দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে এদেরকে সহজে শনাক্ত করা যায়। তারা মাছ ও তারা মাছের স্বজাতি আরো প্রাণবন্ত ব্রিটল স্টার বা ভঙুর তারামাছেও এ সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এরা ক্রিনয়ডের দলে। যদিও এদের দেহে দণ্ড নেই, গুচ্ছমূলের মতো অঙ্গ নেই। এরা চিৎ হয়ে, মাটিতে মুখ বুঁজে, পাঁচ বাহু মেলে পড়ে থাকে। সমুদ্র সজারুও এদের জাতভাই। মনে হয়, সমুদ্র সজারুর পাঁচটি বাহু মুখের উপরের দিকে বেঁকে উঠে গিয়ে পাঁচটি পাঁজরের আকৃতি নিয়েছে। পাঁচটি পাঁজরকে জোড়া লাগিয়েছে অনেকগুলো পাত মিলে। ফলে এটি গোলাকৃতির প্রাণীর রূপ নিয়েছে।

নলাকৃতির বেলুনসদৃশ সি কুকামবার বা সমুদ্র শশাও কন্টকত্বকী প্রাণী। বেরিয়ার রিফের বালুকাময় অঞ্চলে সমুদ্র শশার হামাগুড়ি প্রদানের চিহ্ন দেখা যায়। এরা মুখ মাটির উপরের

দিকে বা নিচের দিকে রেখে শায়িত থাকে না। এরা এক পাশ হয়ে শায়িত থাকে। দেহের একান্তে থাকে একটি মুক্ত দ্বার। এই দ্বারের নাম পায়ু। জীবজন্তুতে যদিও পায়ু মলত্যাগের কাজ করে কিন্তু সমুদ্র শশায় এটি মলত্যাগ ছাড়াও শ্বসনের কাজ করে। পায়ু দ্বারা জল দেহের ভিতরে আনীত হয় খুব ধীরে। বহিষ্কৃত করা হয় ধীরে। দেহের অভ্যন্তরস্থিত নালিকার উপর দিয়ে এই পানি প্রবাহিত হয়। এদের অপর প্রান্তে অবস্থিত মুখ ঘিরে থাকে নালি পা। নালি পা বৃদ্ধি পেয়ে খাটো কর্ষিকায় পরিণত হয়। কর্ষিকা বালি বা কাদায় খাদ্যবস্তু খোঁজে। কর্ষিকায় খাদ্যবস্তু আটকালে সমুদ্র শশা কর্ষিকা গুটিয়ে আনে এবং খাদ্যবস্তু মুখে পাঠায়। মুখ মাংসল ওষ্ঠের সাহায্যে খাদ্যবস্তু ছেঁকে নেয় ও খায়। সমুদ্র শশা হাতে নেওয়ার সময় সাবধান। আত্মরক্ষার জন্য ওরা বাজে উপায়ের আশ্রয় নেয়। এরা কেবল ওদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহকে দেহের বাইরে আনে। পায়ু থেকে অবিরাম ধীর গতিতে আঠালো নালিকাসমূহ বেরিয়ে আপনার হাতের আঙুলে আঠালো সুতার ফাঁস পরিয়ে দেবে। কৌতূহলী মাছ বা কাঁকড়া যদি ওদের প্ররোচিত করে তাহলে সমুদ্র শশা ওদেরকে ফাঁসে জড়ায় এভাবেই। শিকার তখন মুক্তির জন্য দাপাদাপি করতে থাকে। কিন্তু সমুদ্র শশা ধীরে ধীরে শিকারকে টেনে দেহের অক্কভাগে উদ্ভূত নালি পায়ের দিকে নিয়ে যায়। সমুদ্র শশার বিধ্বস্ত ছিঁড়ে যাওয়া অঙ্গসমূহ আবার গজিয়ে যায়।

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে একাইনোডার্মকে অন্ধ বন্ধু হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে এর কোনো নির্দিষ্ট গুরুত্ব নেই। আমাদেরকে ধারণা করতে হবে যে, জীবন সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক যার প্রত্যেকটি অংশ পরিকল্পিতভাবে অগ্রগতি লাভের মাধ্যমে মানুষের উদ্ভব ঘটিয়েছে। অথবা এমন কোনো প্রাণীর উদ্ভব ঘটিয়েছে যারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারতো। এমতাবস্থায় একাইনোডার্মকে আমল না দিলেও চলে। কিন্তু এই প্রবণতা শিলায় নয়, মানুষের মনে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। জীব ইতিহাসের গোড়ার দিকে একাইনোডার্মের উদ্ভব। এদের দেহে তরল পদার্থের স্থিতিশক্তি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রমাণ করে যে,. বিভিন্ন ধরনের দেহগঠনের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া খুবই সফল ও কার্যকর বিবেচিত হয়েছে। তবে, সুবিন্যস্ত জীববিকাশের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত এর স্থায়ী অবদান অকিঞ্চিৎকর। যে সব অঞ্চল এদের দৈহিক বিকাশের জন্য উত্তম, সে স্থানে ওরা খুব সফল জীবননির্বাহ করছে আজো। বেরিয়ার রিফে একটি তারা মাছ একটি শামুক বা চিংড়ির উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে পারে। শামুক বা চিংড়িকে নালি পায়ের ফাঁসে জড়িয়ে, ওদের খোলক ফাঁক করে মাংস খেতে পারে। গুচ্ছ গুচ্ছ কাঁটাযুক্ত তারা মাছ প্রবালের রাজ্যে হানা দিয়ে কখনো কখনো তছনছ করে বিধ্বংসী কাণ্ড ঘটাতে পারে। গভীর সমুদ্র থেকে ট্রলারে হাজার হাজার ক্রিয়নড উঠে আসে। এই দলের প্রাণীতে কোনো বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে এমনটি প্রমাণ করা মুশকিল। বিগত ৬০ কোটি বছর ধরে পাওয়া প্রমাণ থেকে এও বোঝা অসম্ভব নয় যে, পৃথিবীর তাবৎ সমুদ্রে যতোদিন জীবের বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত এদের বিলুপ্তি ঘটবে না।

গ্রেট বেরিয়ার রিফে প্রাপ্ত তৃতীয় পর্যায়ের প্রাণীসমূহের দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। মরক্কোর পর্বতে পাওয়া গিয়েছিলো Trilobite–দের। রিফে ট্রাইলোবাইটের আগেও খণ্ডযুক্ত দেহবিশিষ্ট প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়ার প্রমাণ আছে। অস্ট্রেলিয়ার এডিয়াকারান অবক্ষেপে জেলিফিশ ও সমুদ্র কলমের সাথে দেহখণ্ডে বিভক্ত কীটেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের একটি প্রজাতির

প্রাণীটির মাথা দেখতে কাস্তের মতো। এর দেহে রয়েছে ৪০টি দেহখণ্ড। দেহখণ্ডের দু'পাশে ঝুলানো রয়েছে পায়ের মতো অঙ্গ। প্রাণীটি দেখতে অসাধারণ কুর্চিযুক্ত কীটের মতো। এডিয়াকারার দিকে এদেরকে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। জীবন্ত এই প্রাণিদেহের পরিবৃত খণ্ডসমূহ ঘরের প্রকোষ্ঠ বিভাজক প্রাচীরের মতো। প্রতি দেহখন্ডে ছিলো স্বগীয় অভ্যন্তরীণ অঙ্গরাজি। দেহের উভয়পাশে পায়ের মতো অঙ্গে থাকে কুঁচি এবং এক জোড়া পালকাকৃতির উপাঙ্গ, যার মাধ্যমে অক্সিজেন বাইরে বের করে দেয়। প্রতি দেহখণ্ডে রয়েছে একটি অন্ত্র, একটি বড় রক্তবাহী নালি ও স্নায়ুরজ্জু। অঙ্গগুলো লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে। ফলে দেহখণ্ডগুলো পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে এবং এসবের মধ্যে কাজের সমন্বয় সম্পন্ন করতে পারে।

এডিয়াকারায় প্রাপ্ত ব্যতিক্রমী প্রাচীন জীবাশ্মেও এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি যে, অন্যান্য আদি গ্রুপের প্রাণীদের সঙ্গে দেহখণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীর কোনো সম্পর্ক ছিলো। যা হোক, প্রাণীর জীবন পরিক্রমার অন্যান্য প্রমাণের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। সে পর্যায় হলো লার্ভা বা শূককীট। দেহখণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীর লার্ভা গোলাকৃতির। দেহের মধ্যভাগ এক ফালি সিলিয়া দ্বারা আবৃত থাকে। দেহের শীর্ষভাগে থাকে গুচ্ছ লোমের মতো অঙ্গ। একই ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় কতিপয় শামুকজাতীয় প্রাণীর লার্ভায়। এতে বোঝা যায় যে, উভয় দলের প্রাণী একটি সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছিলো। অন্যদিকে একাইনোডার্মের লার্ভা একেবারে অন্যরকম। এদের লার্ভার দেহ হঠাৎ যেনো বেঁকে গেছে এবং দেহকে ঘিরে রয়েছে দোদুল্যমান (undulating) সিলিয়া। আসলে, একেবারে আদি পর্বে এই দলটি প্রাচীন ফিতাকৃমির দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো। শামুক ও দেহখণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটার আগেই এই কাণ্ডটি ঘটেছিলো।

প্রাণিদেহে দেহখণ্ড বিকাশের কারণ সম্ভবত এদেরকে গর্ত খোঁড়ায় উপযুক্ত করে তোলা। দেহের দু'পাশে অঙ্কভাগে দুই সারি উপাঙ্গ স্পষ্ট করে দেয় যে, গর্ত খননের কাজে খণ্ডযুক্ত দেহ খুবই কার্যকর, বার বার চেষ্টা করে শিকলের মতো দেহ গড়তে গিয়ে এধরনের খণ্ডযুক্ত প্রাণিদেহের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিবর্তন অবশ্যই এডিয়াকারান কালের আগেই ঘটেছিলো। এটি তখনই ঘটেছিলো যখন অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মৌলিক শ্রেণিবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং এদের জীবাশ্ম শিলীভূত হয়েছিলো। যাহোক, এডিয়াকারান জীবাশ্ম অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের অগ্রগতি বিষয়ে বিচ্ছিন্ন আলোকসম্পাত করেছিলো। এরপর ১০ কোটি বছর ধরে সত্যিকার অর্থে এদের ইতিহাস অদৃশ্য ছিলো। কেবল এই বিশাল সময়ের পর আমরা সেই ৬০ কোটি বছর আগে পৌঁছুই। বর্তমানে এই সময়ে প্রতিনিধিত্ব করছে মরক্কো ও পৃথিবীর অন্যত্র প্রাপ্ত শিলার জীবাশ্ম। আমরা জানি, এ সময়ের মধ্যে অনেক প্রাণিদেহে খোলকের সৃষ্টি হয়েছে।

এই সময়কালের কাছাকাছি সময়ে একটি ব্যতিক্রমী জীবাশ্মের অস্তিত্ব দেখা যায়। জীবাশ্মটি কেবল খোলকবিশিষ্ট প্রাণী থেকে উদ্ভূত প্রাণীর দেহগঠনের বিষয়ে আরো বিস্তৃত তথ্য হাজির করেছে। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার শৈল পর্বতের বার্জেস গিরিখাত দুটি বরফাচ্ছাদিত গিরিশৃঙ্গের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। শৃঙ্গের সন্নিকটে রয়েছে কোমল শিলা। তুলনামূলক বিচারে, পৃথিবীতে ভালোভাবে সংরক্ষিত জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে এই কোমল শিলায়। ৫৫ কোটি বছর আগে সমুদ্রের ১৫০ মিটার গভীরে এই কোমল শিলা জমা পড়েছিলো। শিলাকে

সুরক্ষা করে সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকা কোনো পর্বত। পর্বত জলপ্রবাহ দ্বারা মিহি বালির দানা গঠিত তলানি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং অক্সিজেনসমৃদ্ধ জল যাতে সেখানে প্রবেশ করতে না পারে সেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো। অন্ধকারে বদ্ধ জলে হাতে গোণা কয়েকটি প্রাণী বাস করতো। সেখানকার শিলায় কোনো গমন পথের বা গর্তের চিহ্ন নেই। অবশ্য, কখনো পর্বতের কর্দম হঠাৎ পিছনে পড়ে ঘোলা জলের সৃষ্টি যে করতো না তা নয়। কাদার সাথে যাবতীয় ছোট প্রাণী এই কাদায় চাপা পড়েছিলো। জলে অক্সিজেন না থাকায় প্রাণিদেহে পচন ধরতো না এবং এসব প্রাণিদেহ অন্য কোনো প্রাণীর খাদ্যেও পরিণত হয় নি। ফলে প্রাণিদেহ অক্ষত অবস্থায় কাদায় চাপা পড়েছিলো। শেষাবধি পুরো তলানি ঘন হয়ে কোমল শিলায় পরিণত হয়। ভূ-আন্দোলনের দরুণ শৈল পর্বত গঠনকালে, কোমল শিলার বিশাল অঞ্চল জুড়ে ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছিলো এবং শিলার উত্থান ঘটেছিলো। এর অনেক অংশ বিধ্বস্ত হয়েছিলো এবং গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে উপরে আলোচিত এই জীবাশ্মটি অক্ষতভাবে টিকে গিয়েছিলো।

যে কোনো অঞ্চলের একই সময়ে প্রাপ্ত নমুনাসমূহ থেকে কোমল শিলায় প্রাপ্ত নমুনা অনেক ব্যাপক তথ্য উপস্থাপন করে। এডিয়াকারায় জেলিফিশ পাবার আশা করা যায়। এখানে ছিলে Echinocerms, Brachiopod, আদি শামুকজাতীয় প্রাণী, অর্ধ ডজন দেহখণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী। এডিয়াকারা থেকে গ্রেট বেরিয়ার রিফ পর্যন্ত অদ্যবধি যে সকল প্রাণী পাওয়া গেছে কোমল শিলায় তারও বেশি নমুনার প্রাণী পাওয়া যায়। এখানে কতকগুলো প্রাণী রয়েছে তারা দেহখণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই প্রাণীগুলো আরো জটিল ধরনের। বর্তমানের জীবন্ত ও অশ্মীভূত প্রাণীদের সঙ্গে এদের কোনো মিল নেই।

একটি প্রাণীতে দেহখণ্ডের সংখ্যা পনের। ধড় মুখের উপর দিয়ে প্রলম্বিত এবং এতে রয়েছে পাঁচটি চোখ। একটি চোখ তাক করে ছিলো উপরের দিকে। বিস্মিত ও হতাশ বিজ্ঞানীরা অন্য একটি প্রাণীর নাম দিয়েছিলেন Halusizenia। এই প্রাণীর দেহের নিচের দিকে ছিলো সাত জোড়া পা এবং উপরের দিকে সাতটি দোদুল্যমান কর্ষিকা। প্রতিটি কর্ষিকার শেষে একটি ছিদ্র বা মুখ। প্রাণীর দেহ গঠন নিয়ে প্রকৃতি সম্ভবত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলো। এ ধরনের দেহগঠনবিশিষ্ট প্রাণী উত্তরোত্তর সংগঠিত সংগ্রামে হয়তো সফলভাবে টিকে থাকতে পারেনি। প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে প্রতিযোগিতা আরো বেড়ে যায়। ফলে ওরা ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বার্জেস-এর কোমল শিলায় বহু ধরনের প্রাণীর সমাবেশ, জীবাশ্ম বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করে তোলে। প্রাচীন সমুদ্রসমূহে বহু ধরনের প্রাণী ছিলো যাদের কথা আমরা কখনো জানতে পারবো না। কোমল শিলার এই একটি অঞ্চলে একটা অনন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো বলেই প্রাণিকুলের একটা বড় অংশের সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছিলো। এ থেকে অন্য সব প্রাণীর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়া যে সম্ভব আমরা তার ইঙ্গিত পাই।

মরক্কোর চুনাপাথরে যেমন ট্রাইলোবাইটদের সংরক্ষিত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিলো, বার্জেসের কোমল শিলায়ও তেমনি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত ট্রাইলোবাইটের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছিলো। এদের দেহের খোলক অংশত চুন ও অংশত কাইটিন দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো। প্রাণিদেহের বৃদ্ধির সাথে কিন্তু খোলকের বৃদ্ধি ঘটে না। কাজেই এদেরকে নির্দিষ্ট বিরতিতে

খোলক নির্মোচন (moult) করতে হতো। নির্মোচিত এই খোলকগুলোকেই ট্রাইলোবাইটদের জীবাশ্ম হিসেবে পৃথিবীর স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়েছিলো। খোলক প্রবল জলপ্রবাহ দ্বারা তাড়িত হয়ে যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। যেমনটি বর্তমানে সমুদ্রতীরে গেলে ছড়ানো ছিটানো অনেক খোলক চোখে পড়ে। বার্জেস-এর কোমল শিলার ক্ষেত্রে ট্রাইলোবাইটদের ভাসিয়ে নিয়ে চাপা দিয়েছিলো জলের গভীরে ডুবে থাকা হিমবাহ। প্রাণিদেহের ভিতরে পরিস্রুত কর্দমকণা অনুপ্রবেশের ফলে, তা প্রাণীর অঙ্গসংগঠনকে নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করতে পারে। বার্জেস-এর কোমল শিলায় আমরা জোড়া সন্ধিপদী প্রাণীর সন্ধান পাই। প্রতি জোড়া সন্ধিপদ প্রতি দেহখণ্ডের সাথে যুক্ত। প্রতিটি পায়ের সাথে দণ্ডের উপর পালকের ন্যায় ফুলকা দেখা যায়। মাথার পুরো ভাগে রয়েছে দুটি স্পর্শী। পুরো দেহের দৈর্ঘ্য জুড়ে রয়েছে অন্ত্র। এমনকি প্রাণীর পৃষ্ঠদেশে পেশিসূত্রও নজরে পড়ে। এই পেশিসূত্রের সাহায্যে প্রাণী গড়িয়ে একটি বলের আকৃতি ধারণে সক্ষম হয়।

ট্রাইলোবাইট পৃথিবীর প্রথম প্রাণী, যাদের দেহে উন্নত ধরনের চোখের বিকাশ ঘটেছে। চোখ দেখতে এক গুচ্ছ স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত মোজাইকের মতো। প্রতি চোখে রয়েছে স্ফটিক নির্মিত ক্যালসাইট। ক্যালসাইট এমনভাবে স্থাপিত রয়েছে যাতে যথার্থভাবে আলো প্রতিসৃত হতে পারে। প্রতি চোখে রয়েছে পনের শ'ত উপাদান। উপাদানসমূহ অর্ধবৃত্তাকৃতির প্রতিবিম্ব গঠনে সাহায্য করে। পরবর্তীকালে কতিপয় প্রজাতির ট্রাইলোবাইটে আরো উন্নত চোখ দেখা যায়। এরকম চোখ অন্য প্রাণীতে দেখা যায়নি। এ সকল চোখে উপাদানের সংখ্যা কম, তবে উপাদানগুলো আকারে বড়। শেষোক্ত চোখের অক্ষিপটল বা লেন্স আরো পুরু। ধারণা করা হয় যে এই প্রাণীরা স্বল্পালোকে বাস করতো। সেখানে যে পরিমাণ আলো ছিলো তাতে পুরু লেন্সের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করতো ও চলাফেরার কাজ চালাতো। যাহোক, জলের সংস্পর্শে থাকা সাধারণ ক্যালসাইট লেন্সের দৃষ্টিদানকারী গুণাবলি এমনি ছিলো যাতে আলো ব্যাপক স্থান জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ আলো যেন কেবল একটি ক্ষুদ্র জায়গায় উজ্জ্বল বা তীব্রভাবে না পড়ে। এর জন্য দুই অংশবিশিষ্ট লেন্স বা দ্বিধাবিভক্ত লেন্স চাই। এ ধরনের লেন্সে দুটি উপাদানের সন্ধিস্থলে একটি ঢেউ খেলানো স্তর থাকে। ঠিক এরকম চোখই ট্রাইলোবাইটে বিকাশ লাভ করেছিলো। জোড়া লেন্সের নিচের উপাদান কাইটিন দ্বারা গঠিত ছিলো এবং দুই উপাদানের মধ্যেকার স্তরের আলোক সম্পাত পদ্ধতি গাণিতিক প্রয়োগ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। দূরবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্টি রেখে গোলক সংক্রান্ত ত্রুটি সারাতে গিয়ে মানুষ তিনশত বছর আগে এই গাণিতিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছিলো।

পৃথিবীর সমুদ্রসমূহে ট্রাইলোবাইটরা ছড়িয়ে পড়ার কারণে এরা অনেকগুলো বিচিত্র প্রজাতিতে পরিণত হয়েছিলো। এদের অধিকাংশই সমুদ্রতলের বাসিন্দা। এরা কাদার ভিতরে বাস করার চমৎকার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলো। কতকগুলো ট্রাইলোবাইটে গভীর সমুদ্রে কলোনি স্থাপন করে। এখানে আলো ছিলো খুব কম। ফলে এই প্রাণীরা দৃষ্টিশক্তি হারায়। অন্য ট্রাইলোবাইটদের উপাঙ্গের বা পায়ের আকৃতি দেখলে বোঝা যায় যে, এরা সমুদ্রতলে দেহের উর্ধ্বাংশে স্থিত পা ও বড় চোখের সাহায্যে ঘুরে বেড়াতো।

পরবর্তীকালে বহু ধরনের প্রাণী সমুদ্র তলে বাস করতে থাকলে ট্রাইলোবাইটরা আধিপত্য হারায়। ২৫ কোটি বছর আগে তাদের রাজত্বের অবসান ঘটে। এদের একটি আত্মীয়ই কেবল টিকে থাকে। এর নাম হর্স সু ক্র্যাব বা অশ্ব-জুতো কাঁকড়া। এটি দৈর্ঘ্যে ৩০ সেন্টিমিটার বা এর চেয়ে কিছু বেশি। জানামতে, সবচেয়ে বড় ট্রাইলোবাইটের চেয়ে এটি আকারে বহুগুণে বড় এবং এর দেহবর্ম দেহখণ্ডে যে বিভক্ত হয়েছে এমন চিহ্ন নেই। এর দেহের পুরোভাগে গম্বুজাকৃতির ঢাল রয়েছে। ঢালে রয়েছে সীমের দানার মতো দুটো পুঞ্জাক্ষি। ঢালের কব্জার সাথে আটকানো থাকে কর্কশ আয়তাকৃতির প্লেট। লেজে তীক্ষ্ণ ধারালো কাঁটা। হর্স সু ক্র্যাবের খোলকের ভিতরে কিন্তু দেহখণ্ডবিশিষ্ট দেহের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। এদের দেহে কয়েক জোড়া সন্ধিপদ (jointed foot) ছিলো। পায়ের শেষ প্রান্তে ছিলো সাঁড়াশি (pincer)। সাঁড়াশির পেছনে ছিলো পাতের মতো ফুলকা। ফুলকা আকারে বড় ও চ্যাপ্টা, যেনো বইয়ের পৃষ্ঠা।

হর্স সু ক্র্যাব কখনো কখনো আজো নজরে পড়ে। এরা গভীর সমুদ্রের বাসিন্দা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ও আমেরিকার উত্তর আটলান্টিক উপকূলীয় সমুদ্রে এদের দেখা মিলে। প্রতি বসন্তে ওরা উপকূলের দিকে পরিযায়ী হয়। পূর্ণিমার সময়কালে পর পর তিন রাত পূর্ণ জোয়ারে হাজার হাজার কাঁকড়া সাগর থেকে উপকূলে বেরিয়ে আসে।

চাঁদের আলোয় স্ত্রী কাঁকড়ার বিশাল খোলক থেকে আলো ঠিকরে বের হয়। স্ত্রী কাঁকড়া পুং কাঁকড়াকে পেছনে টেনে আনে। কখনো স্ত্রী কাঁকড়ার সঙ্গলাভের প্রত্যাশায় পুং কাঁকড়ার দল একটার পেছনে আরেকটা আঁকড়ে ধরে কাঁকড়ার শিকল বানায়। স্ত্রী কাঁকড়া জলের কিনারে এলে দেহের অর্ধেক অংশ বালিতে ডুবিয়ে রাখে। এখানে ওরা ডিম পাড়ে। পুং কাঁকড়া শুক্রাণু ছাড়ে। সমুদ্রের তীরে আলো-ছায়ায় কিলোমিটারের পর কিলোমিটার জুড়ে কাঁকড়ার ঘন ফালি তৈরি হয়। দেখলে মনে হয়, সমুদ্রের তীরে খোয়া বিছিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি কাঁকড়াকে উল্টে দেয়, কাঁকড়া বালিতে চিৎ হয়ে পড়ে থেকে পা শূন্যে দোলায় এবং শক্ত লেজ মাটিতে আস্তে আস্তে ঠেসে দিয়ে শরীরটাকে উল্টানোর চেষ্টা করে। অনেক কাঁকড়া উল্টে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে পারে না। ফলে ভাঁটার সময় জলের সাথে নেমে যেতে পারে না এবং মারা পড়ে। অন্যরা স্বল্প জলে সাঁতার কেটে নেমে যায় এবং আবার ফিরে আসার প্রস্তুতি নেয়।

কয়েক কোটি বছর ধরে প্রতি বসন্তে এ দৃশ্য অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যখন এ প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন স্থলভাগে কোনো প্রাণী ছিলো না। সমুদ্রতীরে ডিম থাকতো নিরাপদে। তখন ডিম লুঠেরাদের গ্রাসে পরিণত হতো না। সম্ভবত এ কারণে এদের মধ্যে এ অভ্যেসটি গড়ে উঠেছিলো। বর্তমানে সমুদ্র তীর অতো নিরাপদ নয়। কারণ সি গাল ও অন্যান্য ছোট পাখি একজোটে ডিম ভোজে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু যতক্ষণ না পরবর্তী জোয়ারের জল সেখানে পৌঁছায় ততক্ষণ অপেক্ষা করে। জলের তোড়ে বালি সরে গেলে ডিম ফুটে লার্ভা বা শূককীট বেরিয়ে আসে। শূককীট জলে সাঁতার কেটে সমুদ্রে চলে যায়। শূককীট পর্যায়ে ট্রাইলোবাইটের সাথে হর্স সু ক্র্যাবের আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরা পড়ে। কারণ অপূর্ণবয়স্ক এই ক্ষুদ্র প্রাণীতে খোলক সৃষ্টির আগে, দেহখণ্ডগুলো স্পষ্ট দেখা যায়, এমনকি জলের উপর থেকে

তাকালেও তা বোঝা যায়। আসলে কোনো ট্রাইলোবাইটের শূককীট হিসেবে পরিচিত করানো হয়।

যদিও ট্রাইলোবাইটরা খুব সফল প্রাণী, কিন্তু ওরাই কেবল দেহখণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী থেকে বসবাসী প্রাণীরূপে বিকাশ লাভ করেনি। অন্য একটি গ্রুপ একই সময় বিকাশ লাভ করেছিলো। গ্রুপটির নাম Crustacea। দুই গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য সামান্য, কিন্তু বৈশিষ্ট্য বিচার করলে এক জায়গায় তফাৎ স্পষ্ট। Crustacea গ্রুপের প্রাণীদের মাথায় এক জোড়া শুঙ্কের পরিবর্তে দুই জোড়া শুঙ্ক রয়েছে। এরা কোটি কোটি বছর ধরে ট্রাইলোবাইটের আধিপত্যকালেও একসাথে টিকেছিলো। ট্রাইলোবাইটদের আধিপত্য শেষ হলে, Crustaceaদের রাজত্ব শুরু হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে এ ধরনের ৩৫,০০০ প্রজাতির প্রাণী আছে। এই সংখ্যা পাখির প্রজাতির সংখ্যার চার গুণ। এদের অধিকাংশই শিলা বা পর্বতের পাথরের ফাঁকে খাবারের সন্ধানে ঘুর ঘুর করে। এদের মধ্যে রয়েছে কাঁকড়া, শ্রিম্প, চিংড়ি, লবস্টার ইত্যাদি। কেউ কেউ স্থায়ী বা বদ্ধ জীবনযাপনে অভস্ত। যেমন বার্নাকল। অন্য কেউ কেউ বিস্তীর্ণ চড়া এলাকা জুড়ে সাঁতার কাটে। ক্রাস্ট্যাশিয়া তিমির উপাদেয় খাদ্য। এদের বহিঃখোলক ওদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে। ওয়াটার ফ্লি বা জলমাছিতে যেমন এই বহিঃখোলক কাজে আসে তেমনি জাপানি স্পাইডার ক্র্যাব বা মাকড়সা কাঁকড়ায়ও এটিকে কাজে লাগে। মাকড়সা কাঁকড়ায় বহিঃখোলক দৈর্ঘ্যে পায়ের এক নখর থেকে অন্য পাশের পায়ের নখর পর্যন্ত তিন মিটারের বেশি।

প্রতিটি প্রজাতি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে এর বহু জোড়া পায়ে পরিবর্তন সাধন করেছে। সামনের পাগুলোর নখর পা সাঁড়াশিতে পরিণত হয়েছে। মাঝেরগুলো সাঁতারের উপযোগী দাঁড়ের রূপ নিয়েছে। মাঝের কতকগুলো পা হাঁটার উপযোগী করেও রূপান্তরিত হয়েছে। কোনো কোনো পায়ে পালকের মতো শাখা আঁকড়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। নলাকৃতির ও সন্ধিযুক্ত পাগুলো দেহের ভিতরে পেশি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পায়ের এক খণ্ডের সন্ধি পেরিয়ে অন্য খণ্ডে পেশীর সম্প্রসারণ ঘটে। যখন সংযোগস্থলে বা সন্ধিস্থলে টান পড়ে তখন পা গুটিয়ে যায়। এ ধরনের সন্ধিগুলো শুধু একদিকে ভাঁজ হতে পারে। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পায়ের ২–৩টি খণ্ড একজোটে নানা ধরনের ভাঁজ সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ করে। এ কারণে পায়ের শেষ খণ্ড সন্ধির চারপাশে ঘোরায় সক্ষম হয়।

বহিঃখোলক ট্রাইলোবাইটদের ক্ষেত্রে যেমন সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো Crustaceaতেও অনুরূপ সমস্যার সৃষ্টি করে। ওদের পুরো শরীর খোলকে ঢাকা থাকে। দেহের বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে খোলক বাড়তে পারে না। ফলে নিয়মিতভাবে খোলকের নির্মোচন ছাড়া উপায় থাকে না। নির্মোচনের সময় এগিয়ে এলে ওরা খোলক থেকে যতো পরিমাণ সম্ভব চুন বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট শোষণ করে নেয় এবং তা রক্তে জমা করে। পরে খোলকের নিচে নূতন, নরম ও কুঁচকানো ত্বক নিঃসরণ করে। বহিঃখোলক ফেটে যায় এবং কাঁকড়া নিজে খোলককে টেনে সরিয়ে ফেলে। খোলকহীন কাঁকড়াটিকে তখন খোলকবিশিষ্ট কাঁকড়াটির আবছা প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়। এ সময় নরম ত্বক ঢাকা পড়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু ত্বক দ্রুত

বাড়ে এবং জল শোষণের ফলে ঝুলে পড়ে। এরপর ত্বক টান টান হয় এবং উপরে খোলক নির্মাণের উপযোগী হয়। ত্বক ক্রমে শক্ত হয় এবং তা খোলকের সৃষ্টি করে। কঠিন খোলক ধারণ করে কাঁকড়া প্রতিকূল পৃথিবীর মোকাবেলায় বেরিয়ে পড়ে। হারমিট ক্র্যাব বা সন্ন্যাসী কাঁকড়া এই জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপারটিকে কিছুটা এড়াতে চায়। এদের দেহের পেছনের অংশ খোলকমুক্ত থাকে। এই অংশকে ওরা শামুকের বাতিল খোলকের মধ্যে রেখে রক্ষা করে এবং দু'এক মিনিটের মধ্যে নূতন খোলক নির্মাণ করে। খোলক নির্মাণ শেষ হলে শামুকের খোলক পরিত্যাগ করে। বহিঃখোলকের একটি অদ্ভুত গুণ আছে যা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী হতে পারে। বহিঃখোলক যান্ত্রিকভাবে জলে ও স্থলে সমভাবে ক্রিয়াশীল। ফলে প্রাণীর শ্বসন কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। কাঁকড়া ইচ্ছেমতো শ্বসনের প্রয়োজনে যথেচ্ছা ছুটতে পারে। খোলক প্রাণীকে সরাসরি সমুদ্র থেকে তীরে আসায় বা বালুকাবেলা বেয়ে উঠায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। স্যান্ড শ্রিম্প ও বিচ হপার সমুদ্রতীরের কাছাকাছি বাস করে। পিল বাগ ও পেনি সো পুরো সমুদ্র তীর জুড়ে কলোনি স্থাপন করে। সবচেয়ে অবাক করে স্থলচর রোবার ক্র্যাব। এটি আকারে এতো বড়ো যে এরা পা দিয়ে নারকেল গাছ জড়িয়ে ধরতে পারে। পায়ের সাহায্যে তর তর করে নারকেল গাছে চড়ে এবং সাঁড়াশি দিয়ে নারকেল ফুটো করে খায়। রোবার ক্র্যাবের পৃষ্ঠদেশে, উদরের প্রথম দেহখণ্ডের সাথে খোলকের সন্ধিস্থলে রয়েছে একটি ছিদ্র। ছিদ্রে থাকে রবারের চাকতির মতো ত্বক। এই ত্বক দিয়ে ওরা অক্সিজেন শোষণ করে। রোবার ক্র্যাব ডিম পাড়ার জন্যই কেবল সমুদ্রে যায়। অন্যথায় এদেরকে পুরো স্থলচর প্রাণীই বলা যেতো।

সামুদ্রিক প্রাণিকুলের অন্যান্য উত্তরসূরিরা জল পরিত্যাগ করেছে। মোলাস্কা বা শামুকজাতীয় প্রাণীর মধ্যে শামুক (Snail) ও খোলকহীন স্লাগ স্থলচর। তবে এই গ্রুপের প্রাণীদের উদ্ভব হয়েছে সম্প্রতি। দেহখণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীদের উত্তরসূরিরাই প্রথমে স্থল বিজয়ে এগিয়ে যায়। ৪০ কোটি বছর আগে এরা জলের বাইরে এসে বাঁচার পথ খুঁজে নেয় এবং এরা নূতন পরিবেশে সফল জীবনযাপন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এদের থেকে বহু ধরনের স্থলচর প্রাণীর সৃষ্টি হয়। এ সকলের মধ্যে পোকামাকড়জাতীয় প্রাণী অন্যতম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অরণ্যের শুরু

আগ্নেয়গিরিসমূহ বিস্ফোরণের পর এসবের চারপাশের সমতলভূমি ছাড়াও পৃথিবীতে আরো কিছু কিছু উষর অঞ্চল থেকে গিয়েছিলো। বড় বড় কড়াই থেকে ধাতুমল যেভাবে গড়িয়ে জমতে থাকে, লাভার কালো প্রবাহ সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলো। লাভার গতিবেগ ক্রমে কমে আসে। কিন্তু লাভা বসে যাবার সময় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছিলো এবং চাপের ফলে উৎক্ষিপ্ত নুড়িপাথর কখনো গড়াগড়ি খাচ্ছিলো এখানে সেখানে। লাভা খণ্ডগুলোর মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দে ধোঁয়া উঠছিলো এবং হলুদ গন্ধক আগ্নেয়গিরির মুখ ভরে দিচ্ছিলো। ধূসর, হলুদ বা নীল তরল কর্দমে খানা-খন্দ ভরে গিয়েছিলো। মাটির অভ্যন্তরভাগের তাপে খানা-খন্দে কাদা টগবগ করে ফুটছিলো। চারদিকে ছিলো নীরবতার রাজ্য। ঝড়ো বাতাসে আশ্রয় দেবার মতো কোন ঝোপঝাড় তখনো সৃষ্টি হয়নি। ভস্ম আচ্ছাদিত কালো রঙের সমতলে স্বস্তিদায়ক সবুজের সমারোহ ছিলো না একটুকুও।

পৃথিবীর ইতিহাসের বড় অংশ জুড়েই ছিলো এমনি উষর ভূদৃশ্যাবলি। এই গ্রহটি যখন ঠাণ্ডা হচ্ছিলো তখন এর পৃষ্ঠভাগে যে সকল আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়েছিলো সেগুলোর বিস্ফোরণ এমন প্রচণ্ড ছিলো যে যা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আগ্নেয়গিরিসমূহ লাভা ও ভস্ম দিয়ে পুরো পর্বতমালা গঠন করেছিলো। পরবর্তীকালে কোটি কোটি বছর ধরে বৃষ্টি ও বাতাস এই পর্বতগুলোকে ক্ষয় করেছিলো। পর্বতের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি করে কাদা ও মাটি। স্রোতপ্রবাহ বিন্দু বিন্দু করে সমস্ত জঞ্জাল বয়ে নিয়ে স্থলভাগের প্রান্তসীমায় সমুদ্রের তলদেশে জমা করে। জঞ্জাল জমে একত্রে মিলেমিশে কোমল শিলা ও বেলেপাথরের সৃষ্টি হয়। মহাদেশগুলো স্থির ছিলো না। ওরা পৃথিবীপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্তন করছিলো। পৃথিবীর গভীরে সৃষ্ট প্রবাহের দরুন এই কাণ্ডটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। মহাদেশগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হলে তাদের চারপাশের জমা পড়া পলি চুপসে যায় ও পলিতে ভাঁজ পড়ে। ফলে নূতন পর্বতমালার সৃষ্টি হয়। তিনশ কোটি বছর ধরে ভূতাত্ত্বিক চক্রে ভাঙাগড়ার পর্ব চলতে থাকে। আগ্নেয়গিরিতে বিস্ফোরণ হয় এবং তা নিঃশেষিতও হয়। সমুদ্রে বহু ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু স্থলভাগ বরাবরের মতো থেকে যায় জীবহীন অবস্থায়।

কিছু সামুদ্রিক অ্যালগি বা শৈবাল নিঃসন্দেহে সমুদ্রের কিনারে বেলাভূমি বা উপলখণ্ডকে সবুজের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে বাঁচার সংস্থান করেছিলো। কিন্তু ওরা জলপ্রান্ত থেকে দূরে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। তাহলে ওরা শুকিয়ে মরে যেতো। ৪২ কোটি বছর আগে কোন কোন শৈবালে মোমের আবরণের মতো ত্বকের সৃষ্টি হয়। এই ত্বক শৈবালকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। এরপরও শৈবাল জলের মায়া কাটাতে পারেনি। কারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার জন্য শৈবাল জলের উপর নির্ভরশীল ছিলো।

আজো টিকে থাকা আদিকালের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা রয়েই গেছে। লিভারওর্ট নামক উদ্ভিদের ভেজা ত্বক ও মসের সবুজ আঁশ দ্বারা ঢাকা নলাকৃতির দেহের জন্যও জল অত্যাবশ্যক। এরা জনুক্রমের মাধ্যমে (alternation of generation) বংশবিস্তার করে। অর্থাৎ এরা যৌন-অযৌন উভয় পদ্ধতিতে নূতন প্রজন্মের সৃষ্টি করে। আমাদের পরিচিত সবুজ শৈবাল বা মস যৌন-কোষ উৎপাদন করে। এর কাণ্ডের শীর্ষে ডিম্বাণু সংলগ্ন থাকে। অতিক্ষুদ্র অণুবীক্ষণিক শুক্রাণু জলে বিমুক্ত হয় এবং ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবার লক্ষ্যে ঘুরে ঘুরে অগ্রসর হয়। ডিম্ব শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিম্ব পিতা বা মাতার দেহে তখনও যুক্ত থাকে এবং অযৌন প্রজনন সংঘটিত করে। নিষিক্ত ডিম্ব গজায়। এর কাণ্ড হয় খুব সরু। কাণ্ডের শীর্ষে থাকে ক্যাপসুলের মতো অঙ্গ। ক্যাপসুলের ভিতরে দানার মতো অসংখ্য স্পোর তৈরি হয়। শুষ্ক আবহাওয়ায় ক্যাপসুল আকারে বড় হয়ে হঠাৎ ফেটে যায় এবং বাতাসে স্পোর ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস স্পোর বয়ে নিয়ে এদিক-সেদিক বিতরণ করে। উপযুক্ত আবহাওয়া ও ভেজা মাটিতে স্পোর থেকে মস জন্মায়।

মসের নলাকৃতির দেহ খুব একটা মজবুত নয়। উচ্চতাও মোটামুটি। এরা খুব ঘন হয়ে জন্মায়। দেখতে মনে হয় সবুজের গালিচা। ঘা ঘেঁষে জন্মানোর ফলে ওরা পরস্পরে ঠেস দিয়ে খাড়া থাকতে পারে। একা থাকা অবস্থায় নেতিয়ে পড়ে। দেহ নরম, জলভেদ্য ও জলপূর্ণ হবার কারণে দৃঢ় হতে পারে না। আদিকালের উদ্ভিদের মধ্যে সম্ভবত এ ধরনের উদ্ভিদই স্থলভাগের স্যাঁতস্যাঁতে অঞ্চলসমূহ জয় করেছিলো। তবে পুরনো পৃথিবীতে এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহাতীত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জানামতে, ৪০ কোটি বছর আগে স্থলভাগের প্রথম উদ্ভিদেরা ছিলো সরল দেহের এবং ওদের দেহে পাতা ছিলো না। তবে শাখা ছিলো। সেন্ট্রাল ওয়েলস-এর শিলায় এবং স্কটল্যান্ডের চার্টে কার্বন দণ্ডরূপে এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। মসের মতো এদেরও মূল ছিলো না। অণুবীক্ষণযন্ত্রে খুব সতর্কতার সঙ্গে এদের কাণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কাণ্ডে লম্বা, পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট কোষ ছিলো। এই কোষ উদ্ভিদদেহে জল পরিচালনা করতো। এরকম কোষ মসে নেই। এসকল উদ্ভিদের দেহ দৃঢ় ছিলো। ওরা কয়েক সেন্টিমিটার উঁচু হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো। এসব তথ্য খুব নির্ভরযোগ্য না হলেও, উদ্ভিদজগতে একটা বড়ো ধরনের অগ্রগতি যে হচ্ছিলো তা ধরা পড়ে।

আদি মস ও লিভারওর্টের মতো উদ্ভিদসমূহ স্থলভাগের ভিতরের অঞ্চল থেকে নদী ও নদীর মোহানার কিনারা পর্যন্ত সবুজ গালিচা বা অণু-অরণ্য গড়ে তুলেছিলো। সমুদ্র থেকে প্রাণীরা উঠে এসে এই অরণ্যে বসতি ও কলোনি স্থাপন করে। কলোনি স্থাপন করেছিলো দেহখণ্ডে বিভক্ত প্রাণী (Segmented body)। বর্তমানে যে সকল মিলিপেড বা অযুতপদী প্রাণী দেখা যায় এদের পূর্বসূরি হলো কলোনি স্থাপনকারী সেসকল প্রাণী। এদের দেহ কাইটিন নির্মিত বর্ম দিয়ে আবৃত ছিলো। ডাঙায় বসবাসের জন্যই এদের এই পূর্ব-প্রস্তুতি। প্রথমদিকে ওরা নিঃসন্দেহে জলের কাছাকাছি বাস করতো। মসে জলকণা ছিলো। খাদ্যের জন্য ছিলো মস উৎপাদিত প্রচুর স্পোর (Spore)। স্থলভাগেই প্রথম আগমনকারী এই প্রাণীদের বিকাশ ঘটে। এদের নাম রাখা হয় মিলিপেড বা অযুতপদী প্রাণী। পায়ের সংখ্যা অনেকটা আন্দাজে বলা। বর্তমানে জীবিত কোন প্রাণীতে ২০০-এর উপর পা নেই। কয়েকটিতে রয়েছে মাত্র আটটি পা। বলাবাহুল্য, এদের বিকাশ ঘটে নানাভাবে। কোনো কোনোটি দৈর্ঘ্যে দু'মিটার

লম্বা। দৈর্ঘ্যে তা পূর্ণবয়স্ক গরুর মতোই প্রায়। সবুজ চত্বরে চলার সময় এরা উদ্ভিদের বিস্তর ক্ষতি করতো।

স্থলভাগে জলচর পূর্বসূরিদের কাছ থেকে অর্জিত বহিঃকংকালে কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এদের দেহে শ্বসনের জন্যও একটি ভিন্ন পদ্ধতি গড়ে উঠে। এদেরই জলচর আত্মীয় Crustacea বা কাঁকড়াজাতীয় প্রাণীদের পায়ে পালকের মতো ফুলকা ছিলো। এই ফুলকার সাহায্যে শ্বসন কাজ চালাতো। কিন্তু ডাঙায় ফুলকা কোনো কাজে আসে না। ফুলকার বদলে এদের দেহে শ্বাসনলের সৃষ্টি হয়। শ্বাসনলের নাম ট্র্যাকিয়া (trachia)। প্রতিটি শ্বাসনল খোলকের উপরস্থিত রন্ধ্র দিয়ে উন্মুক্ত হয় এবং দেহের ভিতরে নলটি শাখা-প্রশাখা নলে বিভক্ত হয়ে নলের জাল সৃষ্টি করে। নলের শাখা-প্রশাখা দেহের প্রতি অঙ্গের কলার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কলা থেকে কোষেও প্রবেশ করে এবং কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে।

জলের বাইরে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করায় অযুতপদীদের সমস্যা দেখা দেয়। এদের সমুদ্রজাত পূর্বপুরুষরা অ্যালগি বা শৈবালের অনুরূপ প্রজননের জন্য জলের উপর নির্ভরশীল ছিলো। কারণ, জল ওদের শুক্রাণুকে ডিমের কাছে সাঁতরে যেতে সাহায্য করতো। স্থলভাগে এ সমস্যার সমাধান করতে হলে আলাদা স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর উদ্ভব হওয়া চাই। তাহলে ওরা একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হবে এবং শুক্রাণু বা ডিম্বাণু অন্যের দেহে স্থানান্তর করতে পারবে। হলোও তাই। প্রজনন ঋতুতে পুং প্রাণী যখন স্ত্রী প্রাণীর সঙ্গে মিলে তখন উভয়ের দেহ পরস্পরকে পেঁচিয়ে ধরে। পুং প্রাণী এর সাত নম্বর পায়ের সাহায্যে স্ত্রী প্রাণীর দেহ বেয়ে উঠতে থাকে এবং এর যৌনগ্রন্থি থেকে একগুচ্ছ শুক্রাণু স্ত্রী প্রাণীর যৌন প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় যাতে স্ত্রী প্রাণী তা গ্রহণে সক্ষম হয়। এটি শ্রমসাপেক্ষ হলেও বিপজ্জনক নয়। অযুতপদী পুরোপুরি উদ্ভিদভোজী। যে সব হিংস্র অমেরুদণ্ডী প্রাণী শৈবালের এই অরণ্যে এসব উদ্ভিদভোজী অযুতপদীদের শিকারে এসেছিলো, তাদের সঙ্গে এদের বিশ্বাসযোগ্য সখ্যতার সম্পর্ক কখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি।

এখনো শিকারী প্রাণীদের তিনটি গ্রুপের সদস্যরা টিকে আছে। তিন গ্রুপের নাম: শতপদী (Centiped), বৃশ্চিক (Scorpion) ও মাকড়সা (Spider)। এদেরও দেহ দেহখণ্ডে বিভক্ত। যদিও এদের দেহখণ্ডের সাথে অযুতপদীদের দেহখণ্ডের তফাৎ অনেকখানি। শতপদীর দেহ অযুতপদীদের অনুরূপ বহু খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু বৃশ্চিকের পুচ্ছেই কেবল খণ্ডে খণ্ডে ভাগ দেখা যায়। মাকড়সার দেহের দেহখণ্ডে বিভক্তির কোনো চিহ্ন প্রায়ই নজরে পড়ে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি প্রজাতিতে কেবল দেহখণ্ডে বিভক্তির চিহ্ন আজো রয়ে গেছে।

বর্তমানের বৃশ্চিকদের দেখতে বহুকাল আগে বিলুপ্ত সমুদ্র-বৃশ্চিকের মতো। সমুদ্রকে একসময় মাতিয়ে রাখতো এই বৃশ্চিকেরা। সমুদ্রকে ওরা তোলপাড় করে ছাড়তো। কোনো কোনোটি ছিলো লম্বায় দুই মিটারেরও বেশি। অনেকে পায়ে সাঁড়াশি ছিলো। সাঁড়াশি দিয়ে ছোট প্রাণী শিকার করতো। বর্তমানের স্থলচর বৃশ্চিক এদের সরাসরি উত্তরসূরি নয়। এরা অবশ্য সেই বিশাল সমুদ্র বৃশ্চিক গ্রুপের সদস্য তো বটেই। ওদের থেকেই এরা উত্তরাধিকারসূত্রে বর্বর আচরণ অর্জন করেছে।

বর্তমানে জীবিত বৃশ্চিকদের নখর কেবল ভীতিজনক নয়, এদের সরু পুচ্ছের শেষ প্রান্তে রয়েছে বড় বিষগ্রন্থি ও একটি তীক্ষ্ণ বাঁকানো হুল। এদের সঙ্গমক্রিয়া অযুতপদীদের সঙ্গমক্রিয়ার মতো নয়। অযুতপদী কতকটা অন্ধের মতো হাতড়ায়। এতে সঙ্গমকার্যে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই আসতে পারে। আক্রমণাত্মক প্রজাতির দুটো বিচ্ছু যদি পরস্পরের দিকে ছুটতে থাকে তবুও এমন ভয়ই মনে জাগে। যদিও ওরা কেবল যৌন মিলনের জন্যই এগোয়। তবু বাস্তব ঝুঁকি থাকে। কারণ প্রণয়পিয়াসীরা একে অন্যের ভোজনের বস্তু হয়ে যেতে পারে। ইতিহাসে উদ্ভূত প্রাণীদের মধ্যে বিচ্ছুদের সঙ্গম প্রথমবারের মতো প্রণয়ে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা দাবি করে।

পুরুষ বৃশ্চিক খুব সতর্ক থেকে স্ত্রী বৃশ্চিকের দিকে এগোয়। পুরুষ বৃশ্চিক হঠাৎ স্ত্রী বৃশ্চিকের সাঁড়াশি আটকে ফেলে। ফলে স্ত্রী বৃশ্চিকের প্রধান হাতিয়ার অকেজো হয়ে যায়। সাঁড়াশি আটকানো অবস্থাতেই দুটিতে নাচতে শুরু করে। উভয়ে পরস্পরের পুচ্ছ উঁচিয়ে, পুচ্ছ জড়িয়ে একবার এগোয় একবার পেছোয়। এভাবে নাচের তোড়ে অকুস্থল ছাপ হয়ে যায়। অর্থাৎ পায়ে লেগে আবর্জনা সরে যায়। তখন পুং প্রবর তার বক্ষদেশের নিচে স্থিত জননরন্ধ্র দিয়ে একগুচ্ছ শুক্রাণু বের করে মাটিতে রাখে। সাঁড়াশি দিয়ে বন্ধনে থাকা অবস্থাতেই পুরুষ বৃশ্চিক স্ত্রী বৃশ্চিককে ঝাঁকি মারে এবং জোরে সামনের দিকে ঠেলতে থাকে। ঠেলা ততোক্ষণ বন্ধ হয় না যতোক্ষণ স্ত্রী বৃশ্চিকের দেহের অঙ্কভাগে স্থিত জননরন্ধ্র সরাসরি মাটিতে পড়ে থাকা শুক্রাণুর উপর না আসে। স্ত্রী বৃশ্চিক শুক্রাণু গ্রহণের পর উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয় এবং যে যার পথে চলে যায়। স্ত্রী বৃশ্চিকের ডিম্বথলেতে ডিম ফুটে। শিশু বৃশ্চিক ডিম্বথলে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে আসে এবং মায়ের পিঠে চড়ে। প্রথম নির্মোচন (moulting) না ঘটা পর্যন্ত শিশুরা দুই সপ্তাহ মায়ের পিঠে কাটায়। এরপর শিশু বৃশ্চিক নিজের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণে সক্ষম হয়।

স্পাইডার বা মাকড়সাও প্রণয় ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকে। প্রণয়কালে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকাণ্ড পুরুষ মাকড়সার জন্য প্রাণান্তকর। কারণ পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সা থেকে আকারে ছোট। কাজেই স্ত্রীর সাথে মিলনের আগে পুরুষকে পূর্ব-প্রস্তুতি নিতে হয়। পুরুষ মাকড়সা ত্রিকোণাকৃতির জাল বোনে। জালটি দৈর্ঘ্যে কয়েক মিলিমিটার। দেহের অঙ্কভাগে অবস্থিত গ্রন্থি থেকে পুরুষ মাকড়সা জালে এক ফোঁটা শুক্র জমা রাখে। পরে ওরা পেডিপাল্প (pedipalp) নামক বিশেষ উপাঙ্গের ফাঁপা প্রথম সন্ধি দিয়ে শুক্র ফোঁটা শুষে নেয়। ফাউনটেন পেন-এ যেমন করে টিউবের সাহায্যে কালি চোষণ করা হয় এক্ষেত্রেও তাই করা হয়ে থাকে। পুরুষ মাকড়সা এরপর স্ত্রী মাকড়সার সাথে মিলনের জন্য তৈরি হয়।

মাকড়সার প্রণয় প্রতারণামূলকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সৃষ্টিশীল। জাম্পিং স্পাইডার বা উল্লম্ফনকারী মাকড়সা ও উলফ স্পাইডার বা নেকড়ে মাকড়সা মুখ্যত দৃষ্টির সাহায্যে শিকার করে। এদের রয়েছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখ। প্রণয়ী পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সাকে তার উপস্থিতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতন করার চাক্ষুষ ইঙ্গিত প্রদানকে নির্ভরযোগ্য মনে করে। কোনো দূরের দূরে থাকা অন্য মানুষকে হাত দিয়ে বা পতাকা নেড়ে ইঙ্গিত দিয়ে যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে পুরুষ মাকড়সাও তেমনি তার উজ্জ্বল রঙের নকশা কাটা পেডিপাল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে স্ত্রী মাকড়সার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে নিশাচর মাকড়সারা শিকার ধরার জন্য খুবই হালকা স্পর্শের উপর নির্ভর করে। যখন পুরুষ ও স্ত্রী

মাকড়সা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, ওরা একে অপরকে লম্বা পা দিয়ে অতি সন্তর্পণে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে এবং চূড়ান্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান শেষে নিবিড় সান্নিধ্যে আসে। জাল বুননকারী মাকড়সা তাদের বোনা সিল্কের সুতার কম্পনের প্রতি সংবেদনশীল। কম্পন অনুভব করে ওরা বুঝে নেয় যে, কোনো হতভাগা তাদের জালে পা দিয়েছে। বড় আকারের জালবাসী স্ত্রী মাকড়সা যখন তারই বোনা জালে ঝুলে থাকে বা গোপনে লুকিয়ে থাকে, তখন একই জাতের পুরুষ মাকড়সা স্ত্রীর দিকে এগোনোর সময় জালের এক পাশকে বিশেষ ও অপূর্ব পদ্ধতিতে গুটিয়ে নিতে থাকে। পুরুষ প্রণয়ীর বিশ্বাস, স্ত্রী তার ইঙ্গিতময় আহ্বানে সাড়া দেবে। অন্য আরেক প্রকারের মাকড়সা উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে প্রণয়ীর মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করার প্রয়াস পায়। পুরুষ মাকড়সা একটি পোকা ধরে এবং খুবই সতর্কতার সঙ্গে পোকাটিকে স্ত্রী মাকড়সার অবস্থানস্থল জালের উপরের দিকে বয়ে নিয়ে উপঢৌকন হিসেবে নিবেদন করে। স্ত্রী মাকড়সা উপহার পরীক্ষা করার ফাঁকে পুরুষ মাকড়সা আলিঙ্গনের ঝুঁকি না নিয়ে চটজলদি ছুটে গিয়ে জাল দিয়ে স্ত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে।

এতোসব ফন্দি-ফিকিরের লক্ষ্য একটাই। প্রতি পদে বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে পুরুষ মাকড়সা প্রাণ বাঁচাতে পারলে, তারা স্ত্রী মাকড়সার জননরন্ধ্রে পেডিপাল্পকে সজোরে ঢুকিয়ে দেয়। প্রবেশনের পর শুক্রাণু নির্গত করে এবং চোখের পলকে সটকে পড়ে। সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও পুরুষ মাকড়সা সময়মতো সরে যেতে ব্যর্থ হয়। এর ফল মৃত্যু। স্ত্রী মাকড়সা পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে। প্রজাতির বংশরক্ষায় প্রকৃতির বিবেচনায়, দু'এক পুরুষ সদস্যের জীবনদান খুব একটা বড়ো ব্যাপার নয়। অবশ্য, পুরুষ মাকড়সার এই আত্মনিবেদন, উদ্দেশ্য হাসিলের আগে নয়, পরেই ঘটে থাকে।

প্রথমদিকের দেহখণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীসমূহ যখন আর্দ্র আবহাওয়া পরিত্যাগ করে স্থলচারী জীবনযাপনে অভিযোজনের জন্য দৈহিক উৎকর্ষ লাভ করছিলো, তখন, একই সময়ে উদ্ভিদজগতেও পরিবর্তন দেখা গিয়েছিলো। আদিকালের উদ্ভিদ মস ছিল মূলহীন। মাটির উপরে বা নিচে অনুভূমিকভাবে শায়িত কাণ্ড থেকে এরা উদ্ভূত হতো এবং লম্বভাবে অবস্থান করতো। অনুভূমিক ও লম্ব দেহাংশের বৈশিষ্ট্য ছিলো এক ও অভিন্ন। চারপাশের আর্দ্র পরিবেশে এ ধরনের অবস্থানের জন্য যথার্থ বিবেচিত হয়েছিলো। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ী জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিলো কেবল মাটির নিচে। মাটির নিচ থেকে জল আহরণের জন্য মূলের প্রয়োজন। মূলকে মাটির কণার ভিতরে যেতে হবে এবং কণায় লেগে থাকা জল শোষণ করতে হবে। যেখানে জলের অভাব অর্থাৎ শুষ্ক মাটিতেই কেবল এর ব্যতিক্রম ঘটে। এ সময় তিনটি উদ্ভিদ গ্রুপের বিকাশ ঘটে। এ সকল উদ্ভিদে মূলের মতো অঙ্গের সৃষ্টি হয়। বর্তমানেও সেই তিন গ্রুপের উদ্ভিদসমূহের উত্তরসূরি রয়েছে। আজো এদের দেহে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। উত্তরসূরিদের একটি হলো ক্লাব মস (Clubmoss)। দেখতে মসেরই মতো। তবে ক্লাব মসের কাণ্ড অন্যান্য মসের কাণ্ড থেকে তুলনামূলকভাবে শক্ত। দ্বিতীয় উত্তরসুরী হলো হর্সটেইল (Horsetail)। স্যাঁতস্যাঁতে মাটি ও খানা-খন্দে এরা জন্মায়। এর কাণ্ডের কোথাও কোথাও বলয়াকৃতিতে সজ্জিত সুইয়ের মতো সরু পাতা থাকে। তৃতীয় উত্তরসূরি ফার্ন। তিনটিরই কাণ্ডে মজবুত নালি রয়েছে। মূলের দ্বারা শোষিত জল নালীর সাহায্যে কাণ্ডে পরিচালিত হয়। দৃঢ় কাণ্ডের দরুণ এরা খাড়া হয়ে থাকতে পারে। ফলে

এরা একটা মোটামুটি উচ্চতায় এদের অবস্থান নির্দিষ্ট করেছে। উচ্চতা লাভ করায় এরা খাড়া হয়ে থাকতে পারে ফলে কারণে এদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটে।

সব ধরনের সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের আলো উদ্ভিদের রাসায়নিক কর্মকাণ্ডে শক্তি জোগায়। উদ্ভিদ সাধারণ উপাদানের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দেহবস্তুর সংশ্লেষণ ঘটায়। এ জন্যে উদ্ভিদের উচ্চতা উদ্ভিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি একটি উদ্ভিদ উঁচুতে উঠতে না পারে তাহলে পাশে থাকা উদ্ভিদসমূহের নিচে ছায়ায় পড়ে থাকার ঝুঁকি থাকে। ছায়ায় পড়ে থাকা উদ্ভিদ সূর্যালোক পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। সূর্যালোকের অভাবে এর মৃত্যুও হতে পারে। আদি গ্রুপের উদ্ভিদরাজি কাণ্ডে নূতনভাবে দৃঢ়তা অর্জনের কারণে খুব উঁচুতে উঠতে পেরেছিলো এবং বৃক্ষে পরিণত হয়েছিলো। ক্লাব মস ও হর্সটেইলজাতীয় উদ্ভিদ এখনো স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে জন্মায়। এই মাটিতে ওদের ঘন বসতি গড়ে উঠে। দৈর্ঘ্যে ত্রিশ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কোনো কোনোটিকে কাষ্ঠল কাণ্ডের বেড় দুই মিটারও হয়ে থাকে।

এই নিবিড় অরণ্যরাজির কাণ্ড ও পাতার অবশেষ থেকেই কয়লার জন্ম। পৃথিবীর প্রথম অরণ্যরাজির উদ্ভিদসমূহের সংখ্যা-প্রাচুর্য ও দীর্ঘস্থায়িত্বের নিশ্চিত প্রমাণ হলো কাণ্ডের এই বিশাল পুরুত্ব। স্থলভাগের অভ্যন্তরেও ফার্নের সাথে মিলেমিশে এই গ্রুপের অন্যান্য প্রজাতির উদ্ভিদসমূহ বিস্তার লাভ করেছিলো। এসকল উদ্ভিদে সত্যিকারের পাতার বিকাশ ঘটেছিলো এবং উদ্ভিদ আকারেও বড় হয়েছিলো। আকারের ব্যপ্তি ঘটার দরুন এদের পক্ষে যতো বেশি সম্ভব সূর্যালোক আহরণ করা সম্ভব হয়েছিলো। উষ্ণমণ্ডলীয় বৃষ্টি বিধৌত অরণ্যে এখনো টিকে থাকা ফার্ন বৃক্ষের কাণ্ডের অনুরূপ সে সব উদ্ভিদেরও দীর্ঘ বাঁকানো কাণ্ড ছিলো।

প্রথম অরণ্যরাজির উদ্ভিদসমূহের উচ্চতা অরণ্যে বসবাসকারী প্রাণীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। একসময় মাটি সংলগ্ন উদ্ভিদের প্রচুর পাতা ও স্পোর গগনচুম্বী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আকাশে পাতার চাঁদোয়া সৃষ্টির দরুণ অরণ্যের মাটি আলো বঞ্চিত হয়। ফলে মাটিতে গুল্ম, ঝোপঝাড় জন্মাতো কদাচিৎ। বিশাল অরণ্য অঞ্চল জুড়ে কাঁচা শাক-সবজির লেশমাত্রও তখন ছিলো না। কিছু কিছু শাক-সবজি লতিয়ে লতিয়ে কাণ্ডের গা বেয়ে উপরে উঠে এবং খাদ্যের সংস্থান করে।

উল্লিখিত প্রাণীদের অরণ্য ত্যাগে আরো একটি কারণ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলো। এ সময়ে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাথে যোগ দিয়েছিলো একেবারে নূতন এক ধরনের প্রাণী। নূতন প্রাণিদেহে ছিলো শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড। চারটি পা ও ভেজা ত্বক। এরাই আদি অ্যাম্ফিবিয়া বা উভচর প্রাণী। উভচর প্রাণীরা উদ্ভিদ ও মাংস দুপ্রকারের খাদ্যই গ্রহণ করতো। উভচর প্রাণীদের উদ্ভব ও পরিণতি নিয়ে বর্ণনা শোনার জন্য আপনাদের ততোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে যতোক্ষণ না অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিকাশ কাহিনী চূড়ান্ত পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এই পর্যায়ে উভচরদের কথা উল্লেখ করতে হলো এ কারণে যাতে আদি অরণ্যরাজির অবস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণার অবকাশ না থাকে।

ভূমিসংলগ্ন উদ্ভিদহীন অরণ্যে তখনো নূতন ধরনের একপ্রকার অমেরুদণ্ডী প্রাণী টিকে ছিলো। এরা হলো ব্রিসলটেইল (Bristletail) ও স্প্রিংটেইল (Springtail)। এদের সম্বন্ধে তথ্য বেশি পাওয়া যায়নি। এরা চোখেও পড়ে কদাচিৎ। তবু বলা যায় এদের সংখ্যা ছিলো

পর্যন্ত। ধরণীতে এক কোদাল পরিমাণ মাটি পাওয়া যাবে না যেখানে এরা নেই। তবে এরা আকারে খুব ছোট। মাত্র কয়েক মিলিমিটার। সচরাচর যেটি চোখে পড়ে সেটি হলো সিলভার ফিশ (বইয়ের পোকা নামেই বেশি পরিচিত)। সিলভার ফিশকে খাদ্য গুদামের মেঝেতে তরতরিয়ে চলতে দেখা যাবে। অথবা কখনো সখনো দেখা যাবে বাঁধানো বইয়ের মলাটের ভেতর বা পাতায় পাতায়। বাঁধানো বইয়ের শুকনো আঠা খেতে ওরা পছন্দ করে। সিলভার ফিশের দেহ স্পষ্ট খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। তবে এদের দেহে অযুতপদীদের দেহের চেয়ে দেহখণ্ড কম। সিলভার ফিশের মাথা সুগঠিত। মাথায় এক জোড়া পুঞ্জাক্ষি ও এক জোড়া শুঙ্গ থাকে। বক্ষদেশে রয়েছে তিন জোড়া উপাঙ্গ বা পা। উদর দেহখণ্ডে বিভক্ত। উদরের প্রতি দেহখণ্ডে পা নেই যদিও পা যে কখনো ছিলো তার চিহ্ন স্পষ্ট রয়ে গেছে। বক্ষদেশের তিনটি খণ্ড মিলে একটি খণ্ডে পরিণত হয়েছে। সিলভার ফিশের পুচ্ছের শেষ দিকে তিনটি সুতার মতো অঙ্গ বের হয়। অযুতপদীর ন্যায় সিলভার ফিশও ট্র্যাকিয়া বা শ্বসননালির সাহায্যে শ্বসনের কাজ চালায়। আদি স্থলচর অমেরুদণ্ডী প্রাণীর স্মারক বৃশ্চিকের কায়দায় ওরা প্রজনন ঘটায়। পুরুষ সিলভার ফিশ মাটিতে একগুচ্ছ শুক্রাণু নির্গত করে ফেলে রাখে। এরপর পুরুষটি স্ত্রী সিলভার ফিশকে ছলে বলে কৌশলে প্রলোভিত করে শুক্রাণুর উপরে হাঁটায়। শুক্রাণুর উপর এলে স্ত্রী প্রাণীর দেহে যৌন উত্তেজনা জাগে এবং স্ত্রী স্বীয় জননথলেতে শুক্রাণু সংগ্রহ করে।

এই দলে আছে কয়েক হাজার বিভিন্ন জাতের প্রাণী। সব প্রাণীর দেহে রয়েছে ছয়টি করে পা। সকলের দেহ প্রধান তিন খণ্ডে বিভক্ত। এদের দেহ-বৈশিষ্ট্যের কারণে, বিশাল বিচিত্র গ্রুপের স্থলচর অমেরুদণ্ডী প্রাণী পতঙ্গের দলে এরা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি পেয়েছে। যদিও শারীরস্থান বিচারে সিলভার ফিশজাতীয় প্রাণীর সাথে পতঙ্গদের অনেক গরমিল আছে। পতঙ্গকুলের সরল দেহবিশিষ্ট প্রাণীদলের সদস্য হিসেবে বিবেচনায়, সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল যে, এরা কি আদৌ পতঙ্গকুলের আদি সদস্যদের বংশধর নাকি বিশেষ ধরনের জীবনযাপনে উপযুক্ততা অর্জনের প্রয়োজনে এদের দেহে দ্বিতীয় পর্যায়িক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, এই গ্রুপের সিলভার ফিশ ছাড়া অন্য সদস্যরা অন্ধ। এদের কারো দেহে পাখনা নেই। কতিপয় সদস্যের দেহে শ্বসনের জন্য ট্র্যাকিয়া নেই এবং এরা ত্বকের সাহায্যে শ্বসন কাজ সম্পাদন করে। এদের ত্বক কাইটিন দ্বারা গঠিত। ত্বক পাতলা ও জলভেদ্য। তাহলে এটাই কি ধরে নিতে হবে যে উল্লেখিত অঙ্গসমূহ ওদের দেহে কখনো ছিলো না বা কখনো থাকলেও তা ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে? এসব প্রাণীর শারীরস্থান বহু বিতর্কের জন্ম দেয়। বিজ্ঞান এখনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রথম দিককার ফার্ন বৃক্ষ ও হর্সটেইলের গুঁড়ি বেয়ে কোনো কোনো আদি পোকামাকড় খাবার সংগ্রহ করতো। গুঁড়ি আরোহণ তুলনামূলকভাবে সহজতর ছিলো। উর্ধ্বমুখী পত্রবৃন্ত ডিঙিয়ে ঘুরপথে অবরোহণ পতঙ্গের জন্য অধিকতর শ্রম ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিলো। প্রতিবন্ধকতা বেশি থাকুক আর নাই থাকুক, এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা পতঙ্গের দেহে পরিবর্তী বিকাশে ভূমিকা রেখেছিলো। অবশ্য এ বিষয়ে আমরা পুরো নিশ্চিত নই, তবে এ বিষয়ে জোর দিয়ে বলা যায় যে, আদি পতঙ্গে স্বল্পশ্রমে অধিক দ্রুত অবরোহন-আরোহণের উপায় বিকাশলাভ করেছিলো। সে উপায়টি হলো ওড়া।

পতঙ্গরা কিভাবে ওড়া রপ্ত করেছিলো তার সরাসরি কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। তবে বর্তমানের সিলভার ফিশে এ সমস্যা সমাধানের সূত্র রয়েছে। সিলভার ফিশের বক্ষদেশের

পৃষ্ঠাংশে দু'পাশে কাইটিননির্মিত দুটো ডানার মতো অঙ্গ বেরিয়ে আছে। এ দুটোকে পতঙ্গের ডানার অবশেষরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। আদি পাখনা ওড়ার কাজে ব্যবহৃত নাও হতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর মতো পতঙ্গরাও তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো প্রবলভাবে। দেহের তাপমাত্রা যতো বেশি হবে, দেহে শক্তি উৎপাদনকারী রাসায়নিক কর্মকাণ্ডও দ্রুত হবে এবং দেহ অধিকতর কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। যদি পৃষ্ঠদেশের বর্ধিত অঙ্গে রক্তসঞ্চালন করাতে হয় তাহলে প্রাণীকে সূর্যালোকের সাহায্যে অতি কার্যকরীভাবে দ্রুততার সাথে দেহকে উষ্ণ রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ডানার গোড়ায় যদি পেশি থাকে, তাহলে আরো এক ধাপ এগিয়ে, প্রাণিদেহকে কাত করে ডানা যাতে সূর্যস্নাত হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। পতঙ্গের পাখনা পৃষ্ঠদেশে ডানা হিসেবেই প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিলো এবং ডানায় অবশ্যই রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা ছিলো। যদি এরকমটিই ঘটে থাকে তাহলেই কেবল ডানা থেকে পাখনা উদ্ভবের এই সূত্র ধোপে টিকে থাকবে।

যাহোক, ৩০ কোটি বছরের কোনো একসময়ে পাখনাবিশিষ্ট পতঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছিলো। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পতঙ্গের মধ্যে ড্রাগন মাছি বা দানো মাছির আবির্ভাবই প্রথম লক্ষ করা যায়। সেসময় আরো কতকগুলো প্রজাতি ছিলো তুলনামূলকভাবে যারা বর্তমানের জীবিত প্রজাতিদের সঙ্গে আকারে সমান। কিন্তু নূতন পরিবেশ বিজয়ী অযুতপদী ও অন্যান্য প্রাণীর মতো দানো মাছিদেরকেও কোনো প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করতে হয়নি। ফলে এরা আকারে বিশাল হতে পেরেছে। দানো মাছির পাখনা ছিলো দৈর্ঘ্যে ৭০ সেন্টিমিটার। এটিই পৃথিবীর সর্বকালের সর্বোচ্চ আকারের পতঙ্গ। বাতাস যখন রাশি রাশি পতঙ্গে ভরপুর হয়ে উঠে তখন বিশালকায় দানো মাছিদের বিলুপ্তি ঘটে।

ড্রাগন মাছির পাখনা দু'জোড়া। দু'জোড়ার মধ্যে থাকে সহজ সরল বন্ধন। এই পাখনা কেবল উপর নিচ করতে পারে। গুটিয়ে পেছনে নিতে পারে না। তবে এরা উচুদরের চৌকষ উড্ডয়নকারী পতঙ্গ। এরা পাতলা স্বচ্ছ পাখনায় ভর করে ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে, পুকুরের উপরে ঘুরে ঘুরে শিকার ধরে। এতো দ্রুতবেগে ওড়ার সময় কোনো কিছুর সাথে সংঘর্ষ হতে পারে। সংঘর্ষ যাতে এড়াতে পারে এর জন্য ব্যবস্থা থাকা চাই। এ কারণে এদের সংবেদী অঙ্গ রয়েছে। ওড়ার সময় গতি সোজা আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য দেহের পুরোভাগে রয়েছে একগুচ্ছ লোমের মতো অঙ্গ। এদের মাথার দু'পাশে রয়েছে মোজাইকের মতো দুটি চোখ। ওড়াকালে চোখ প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়। চোখ সঠিকভাবে ও ব্যাপকভাবে দেখায় সাহায্যও করে।

চোখের দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভরশীল বলেই রাতে ওরা সক্রিয় হতে পারে না। দিনের আলোয় এরা শিকার করে। ছয়টি পা কুঁকড়ে বাস্কেটের মতো গুটিয়ে নিয়ে ওড়ে। এই পায়ের সাহায্যেই ছোট ছোট পোকা-মাকড় শিকার করে। এই বাস্তবতা থেকে এটি স্পষ্ট যে অন্যান্য উদ্ভিদভোজী প্রাণী পরবর্তীকালে খেচর জীবনযাপন করতে শুরু করেছিলো। এদের অঙ্গসংস্থানের (anatomy) প্রকৃতি দেখে এরা যে আদিযুগের প্রাণী তা বোঝা যায়। ড্রাগন ফ্লাই বা দানো মাছির পর উপরিলিখিত এই প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে তেলাপোকা, ঘাস ফড়িং, লোকাস্ট ও ক্রিকেট ইত্যাদি।

আদি অরণ্যে ভোঁভোঁ, শোঁ শোঁ শব্দ তুলে অসংখ্য পতঙ্গের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে উদ্ভিদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো।

আদি বৃক্ষেরা পূর্বসূরি মস-এর মতো দুটো জনুক্রমে প্রজনন ঘটাতো। যৌন ও অযৌন প্রজনন। বৃক্ষের উচ্চতা স্পোর বিতরণে কোনো সমস্যার ছিলো না। কোনো সমস্যা হলেও, স্পোর বৃক্ষের শীর্ষে থাকায়, বাতাস সহজে এসবকে বয়ে নিয়ে দূরে ছড়িয়ে দিতো। যৌনকোষ বিতরণের বিষয়টি ছিলো অবশ্য ভিন্ন। এসময় পর্যন্ত, পুরুষ কোষ জলে সাঁতার কেটে এসে নিষেক ঘটানোর দ্বারা যৌনজনন সংঘটিত করতো। এই প্রক্রিয়ার চাহিদামাফিক যৌনজননের জল হতো স্বল্প এবং তা ঘটতো মাটিতে। ফার্ন, ক্লাব মস ও হর্সটেইলে এখনো একইভাবে যৌন প্রজনন সংঘটিত হচ্ছে। এসকল উদ্ভিদের স্পোরসমূহ ফিল্মের মতো পাতলা উদ্ভিদে পরিণত হয়। পাতলা এই উদ্ভিদের নাম থ্যালাস (Thallus)। এটি দেখতে প্রায় লিভারওর্টের মতো। থ্যালাসের অঙ্কভাগ সবসময় আর্দ্র থাকে। থ্যালাস অঙ্কভাগ থেকে যৌনকোষ বিমুক্ত করে। স্ত্রী যৌনকোষ পুরুষ যৌনকোষ বা শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত স্ত্রী যৌনকোষ বা ডিম্ব একটি লম্বা উদ্ভিদে পরিণত হয়। এই উদ্ভিদ আবার স্পোর সৃষ্টি করে।

মাটিতে একা থ্যালাস বিপদাপন্ন হতো। প্রাণীরা একে অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে। জল শুকিয়ে গেলে মারা যেতে পারে। অতি সফল অযৌন প্রজনন সৃষ্ট উদ্ভিদের ধনুকের মতো বাঁকা (পাতাসমূহ সূর্যালোক নিচে পড়ায় বাঁধা সৃষ্টি করাতেও থ্যালাসের ক্ষতি হয়। সুবিধা হতো যদি থ্যালাসও লম্বা হতে পারতো। থ্যালাস লম্বা হলে সেক্ষেত্রে পুরুষ জননকোষকে স্ত্রী জননকোষের কাছে আসার জন্য নূতন কৌশল অবলম্বনের দরকার পড়তো।

এ সমস্যা নিরসনের দুটো পদ্ধতি ছিলো। এর একটা প্রাচীন পদ্ধতি। বাতাস যেভাবে স্পোর বয়ে নিয়ে বিতরণ করে এক্ষেত্রেও বাতাস তাই করতে পারতো। কিন্তু এতে যৌনকোষের ভাগ্য হতো অনিশ্চিত ও বিপদসংকুল। দ্বিতীয়টি পতঙ্গের সাহায্যে যৌনকোষ বহন করানো। বাহক সার্ভিস দেবার মতো সে সময় পতঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছিলো। এরা তখন নিয়মিতভাবে গাছ থেকে গাছে ঘুরে বেড়াতো আর খেতো গাছের পাতা ও স্পোর। উদ্ভিদ দুই পদ্ধতিরই সুযোগ গ্রহণ করে। ৩৫ কোটি বছর আগে কতকগুলো উদ্ভিদ উদ্ভূত হয় যেগুলোর যৌন জনুক্রমে অংশগ্রহণকারী উদ্ভিদেরা থ্যালাসের মতো মাটি সংলগ্ন ছিলো না। এগুলো গাছের উপরে পাতার ভিড়ের মধ্যে যৌন প্রজননের কাজ সম্পাদন করতো। এ সকল উদ্ভিদের মধ্যে একটি গ্রুপের উদ্ভিদ আজো টিকে আছে। একটি নির্দিষ্ট নাটকীয় পর্যায়ে এদের যৌন জনুক্রমের বিকাশ ঘটে। এই উদ্ভিদ গ্রুপের নাম সাইকাড (Cycads)।

ভাসা ভাসা দেখলে সাইকাডকে ফার্নের মতো দেখায়। এর পাতা লম্বা, মোটা ও পালকের মতো। সাইকাডের কতকগুলো সদস্যে (উদ্ভিদে) পুরানো কায়দায় ছোট ছোট স্পোর সৃষ্টি হয়। বাতাস এসব স্পোর ছড়িয়ে দেয়। অন্যান্য সদস্যে (উদ্ভিদে) স্পোর আকারে তুলনামূলকভাবে বড় হয়। এগুলোকে বাতাস উড়িয়ে নেয় না। স্পোরসমূহ জনয়িতার দেহসংলগ্ন থাকে। জনয়িতার দেহের সাথে লেগে থাকা অবস্থায় স্পোর থ্যালাসের মতো এক ধরনের বিশেষ মোচাকৃতির অঙ্গ সৃষ্টি করে। মোচার মধ্যেই অবশেষে ডিম্বের সৃষ্টি হয়। যখন বায়ুবাহিত একটি স্পোর (যাকে পরাগরেণুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে) ডিম্ববাহী মোচায় নেমে আসে তখন সেটি অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরিত হয়ে স্পোরটি পাতলা ফিল্মের মতো থ্যালাসে পরিণত হয় না। কারণ এখন এরকমটি হবার কোনো প্রয়োজন নেই। স্পোরটি একটি লম্বা নলের রূপ ধারণ করে। নল মোচা খনন করতে করতে ভিতরে নেমে যায়। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কয়েক মাস লাগে। শেষ পর্যন্ত নল গঠন সম্পূর্ণ হলে, অবশিষ্ট পরাগরেণু থেকে

একটি শুক্রাণু কোষের সৃষ্টি হয়। সিলিয়াযুক্ত বর্তুলাকৃতির শুক্রাণু কোষটি দেখতে অপূর্ব সুন্দর। উদ্ভিদজগত ও প্রাণিজগতের মধ্যে এ পর্যন্ত শুক্রাণু কোষের মধ্যে এদের শুক্রাণু কোষই আকারে বৃহত্তম। এটি এতো বড়ো যে একে খালি চোখে দেখা যায়। শুক্রাণু কোষ ধীরে নালি পথ বেয়ে নামতে থাকে। তলায় অবতরণের পর শুক্রাণু কোষ এক ফোঁটা জলে প্রবেশ করে। মোচার চারপাশের কলা এই জলবিন্দু নিঃসরণ করে। শুক্রাণু জলবিন্দুতে সিলিয়ার তোড়ে ধীরে ধীরে ঘুরে। সাইকাডদের পূর্বসুরি অ্যালগি বা শৈবাল উদ্ভিদের শুক্রাণু কোষ যেভাবে আদি সমুদ্রে অভিযান করতো, সাইকাডের শুক্রাণু কোষও সীমাবদ্ধ জলে অনুরূপ দৃশ্যের অবতারণা করে। মাত্র কয়েকদিন পর এটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং একীভূত রূপ ধারণ করে। এভাবে সাইকাডে দীর্ঘ নিষেক প্রক্রিয়ায় যবনিকা নামে।

সাইকাডের সমসাময়িককালে উদ্ভূত অন্য একটি গ্রুপের উদ্ভিদরাও সাইকাডের অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করে। এই গ্রুপের নাম কনিফার (Conifer)। পাইন (Pine), লার্চ (Larch), সেডার (Ceder), ফার (Fur) ও এদের স্বগোত্রের উদ্ভিদেরা কনিফার গ্রুপের সদস্য। এরাও তাদের পরাগরেণু বিতরণের ক্ষেত্রে বাতাসের উপর নির্ভরশীল। তবে এরা একই বৃক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ মোচা ধারণ করে যা সাইকাডে দেখা যায় না। পাইন গাছে নিষেক প্রক্রিয়ার জন্য আরো দীর্ঘ সময় লাগে। পরাগনল তৈরি হয়ে নিচে নামতে এবং ডিম্বের কাছে পৌঁছাতে পুরো এক বছর সময় লাগে। তবে অনুপ্রবিষ্ট নালি সরাসরি ডিম্বের সংস্পর্শে আসে এবং শুক্রাণু কোষ নালি বেয়ে জলবিন্দুতে কেলি না করে সরাসরি ডিম্বের সাথে মিলিত হয় নিষেক কাজ সম্পন্ন করে। শেষ পর্যন্ত কনিফারই যৌন জনন প্রক্রিয়ায় জলকে পরিবহণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের পাঠ চুকিয়ে দেয়।

এদের মধ্যে আরো একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নিষিক্ত ডিম্বাণু মোচার মধ্যে এক বছরের অধিক সময় ধরে থাকে। নিষিক্ত ডিম্বের কোষে কোষে সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং ডিম্বের চারপাশের জলরোধী আবরণের সৃষ্টি হয়। অবশেষে নিষেক কাজ শুরুর দু' বছরেরও বেশি সময় পরে মোচা শুকিয়ে কাঠে পরিণত হয়। মোচার খণ্ডসমূহ খুলে যায় এবং নিষিক্ত পূর্ণ বিকশিত ডিম্ব বা বীজের অবমুক্তি ঘটে। বীজটিতে জল না ঢোকা পর্যন্ত বীজ বছরের পর বছর অঙ্কুরিত হবার অপেক্ষায় থাকতে পারে। জল বীজকে উজ্জীবিত করে এবং বীজকে অঙ্কুরিত করে। এভাবে বীজের জীবনে নব বসন্তের সূচনা করে।

যে কোনো বিচারে, কনিফার বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে বলা যাবে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ অরণ্য কনিফারদেরই সৃষ্টি। যে কোনো ধরনের জীবন্ত জীবসমষ্টির মধ্যে কনিফারের সদস্য উদ্ভিদই সর্বাপেক্ষা বড়। ক্যালিফোর্নিয়ার জায়েন্ট রেড উড বা দানো লাল বৃক্ষ উচ্চতায় একশত মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ব্রিসলকোন পাইন (Bristlecone pine) অপর একটি কনিফারজাতীয় বৃক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমের শুষ্ক পর্বতে এরা জন্মায়। যে কোনো স্বতন্ত্র জীবের চেয়ে ব্রিসলকোন পাইনের পরমায়ু বেশি। যে পরিবেশে স্পষ্ট ঋতুভেদ থাকে এবং সেখানে যে সব গাছ জন্মায় তাদের বয়স খুব সহজে গোনা যায়। গ্রীষ্মে গাছ প্রচুর রোগ ও জলের সরবরাহ পায়। ফলে এসময় গাছ দ্রুত বাড়ে এবং বড় বড় কোষ উৎপাদন করে। শীতে পর্যাপ্ত রোদ ও জলের অভাবে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। এসময় ছোট ছোট কোষ উৎপাদিত হয় এবং ফলে কোষসমূহ ঘন হয়ে অবস্থান করে। এভাবে গুড়িতে বর্ষবলয় গড়ে উঠে। ব্রিসল কোন পাইন বৃক্ষসমূহের মধ্যে কয়েকটির গাঁট ও বাঁক

বর্ষবলয় গুনে দেখা গেছে যে এগুলোর বয়স পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি। এসব বৃক্ষের যখন জন্ম হয়েছিলো তখন মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ সবে লেখা উদ্ভাবন করেছে। অর্থাৎ এরা মানবসভ্যতার বিকাশের পুরো সময় ধরেই বেঁচেছিলো।

কনিফার এর গুড়িকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পোকার আক্রমণ থেকে রেজিনের (resin) সহায়তায় রক্ষা করে। একটি বিশেষ ধরনের আঠালো পদার্থের নাম রেজিন। ক্ষত থেকে রেজিন বেরোতে থাকলে প্রথমে তা গড়িয়ে পড়ে। রেজিনের তরল অংশ হলো টারপেনটাইন (turpentine)। টারপেনটাইন দ্রুত উবে যায়। পড়ে থাকে আঠালো বস্তুপিণ্ড। বস্তুপিণ্ড ক্ষতস্থানকে সুষ্ঠুভাবে এঁটে দেয়। বিস্ময়কর হলেও, রেজিন ফাঁদ হিসেবেও কাজ করে। পোকা-মাকড় এর সংস্পর্শে এলে শক্তভাবে এঁটে যায়। পোকার চারপাশে আরো রেজিন জমতে থাকলে ক্রমে পোকার রেজিন সমাধি হয়। জীবাশ্মকরণের যতোগুলো মাধ্যম আছে তার মধ্যে এই রেজিন বস্তুপিণ্ডই সবচেয়ে সুষ্ঠু মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জীবাশ্মসমূহ অম্বরখণ্ড বা হলুদাভ তেলস্ফটিকরূপে টিকে থাকে। অম্বর-এর অস্বচ্ছ সোনালি অভ্যন্তরভাগে আদিকালের পোকারা শায়িত থাকে। অম্বরখণ্ডকে সতর্কভাবে খণ্ডিত করা হলে, অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে পোকামাকড়ের মুখমণ্ডল, আঁশ, লোমবৎ অঙ্গ ইত্যাদি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মনে হবে, যেন গতকালই পোকাটি রেজিনে আটকা পড়েছে। বিজ্ঞানীরা অম্বর খণ্ডে ক্ষুদ্র পরজীবী পোকা, উই ইত্যাদিকে পোকার বড়টি পায়ে ছোট পোকার ঝুলে থাকার দৃশ্যও লক্ষ্য করেছেন।

দশ কোটি বছরেরও পূর্বেকার প্রাচীনতম অম্বরখণ্ড আমরা পেয়েছি। কনিফার ও উড্ডয়নশীল পতঙ্গের প্রথম উদ্ভবকালের অনেক পরে এগুলোর সৃষ্টি। কিন্তু এগুলোতে প্রচুর সংখ্যক জীব অশ্মীভূত হয়ে আছে। বর্তমানে আমরা যে সকল বড় বড় গ্রুপের পতঙ্গ সম্বন্ধে জানি এদের সকল গ্রুপের প্রতিনিধি ধরা আছে এসব অম্বর খণ্ডে। এরা সেসময়েই উড়ার দক্ষতা অর্জন করেছিলো। পতঙ্গের উড্ডয়ন উদ্ভাবন ছিলো একটা বড় ঘটনা।

ড্রাগন ফ্লাই বা দানো মাছি পাখনাদ্বয়কে সমলয়ে নাড়ে। কিন্তু এতে ওদের দেহে যথেষ্ট শারীরবৃত্তিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। এদের পাখনা দুটি সাধারণত পরস্পরের সংস্পর্শে আসে না। তবু দানো মাছি হঠাৎ গতি পরিবর্তন করার সময় সমস্যায় পড়ে। দ্রুত ঘোরার সময় শরীর বেঁকে যায়। ফলে দেহে অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং অগ্র পাখনা ও পশ্চাৎ পাখনা জোড়ার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের দরুণ ফর ফর শব্দ উঠে। দানো মাছি পুকুরের উপর ঘুরপাক খাবার সময় আপনি সহজেই এই শব্দ শুনতে পাবেন।

পরবর্তী পতঙ্গ গ্রুপের সদস্যরা মাত্র এক জোড়া পাখনার সাহায্যে অধিক উড্ডয়ন ক্ষমতা অর্জন করে। মৌমাছি ও বোলতায় অগ্র পাখনা ও পশ্চাৎ পাখনা আংটা দ্বারা বাঁধা থাকে। ফলে দুটো পাখনার পৃষ্ঠতল এক মনে হয়। প্রজাপতিতে এক পাখনা অপর পাখনাকে আংশিক আবৃত করে। দ্রুততম উড্ডয়নক্ষম পতঙ্গ হলো হক মথ (Hawk moth), যার উড়ার গতি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার। হক মথের পশ্চাৎ জোড়া পাখনা খুব খাটো বাঁকা কুচির সাহায্যে হুড়কার মতো যুক্ত থাকে। বিটল বা গুবরে পোকা অগ্রজোড়া পাখনাকে সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। পতঙ্গের জগতে বিটলরা ভারী বর্মে সজ্জিত ট্যাংকের মতো এবং এরা অধিকাংশ সময় মাটিতেই কাটায়। এরা আবর্জনার ভিতর দিয়ে পথ খুঁড়ে চলে। মাটিতে

আঁচড় কাটে এবং কাঠ ক্ষয় করে। এ ধরনের কাজ করতে গেলে নরম পাখনা সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অগ্রজোড়া পাখনাকে অনমনীয় পুরু আবরণে পরিণত করে গুবরে পোকা তার পাখনাকে রক্ষা করে। এই আবরণ উদরের উপরে ফিটফাট অবস্থায় থাকে। পশ্চাৎ পাখনা জোড়া অগ্র জোড়ার নিচে সতর্কভাবে ও সুষ্ঠুভাবে ভাঁজ হয়ে চমৎকারভাবে ঠেসে থাকে। পাখনার শিরায় রয়েছে স্প্রিংয়ের মতো সন্ধি। পাখনার আবরণ উঠে গেলে সন্ধিগুলো খুলে যায় এবং পাখনা স্প্রিংয়ের মতো মুক্ত হয়। বিটলের ক্লান্তিকর ওড়া শুরু হলে অনমনীয় পাখনা জোড়া সাধারণত দেহের পাশে সরে যায়। পাখনার পাশে অবস্থান গ্রহণের এই ভঙ্গি ওদের দক্ষভাবে উড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফুলের বিটলরা অবশ্য এই সমস্যাকে অন্যভাবে মোকাবেলা করেছে। এদের অগ্রজোড়া পাখনার সন্ধির কাছাকাছি পাখনার পাশে খাঁজ থাকে। এতে পশ্চাদজোড়া পাখনা ওড়ার সময় অগ্রজোড়াকে উদরের উপর প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়। ফলে পশ্চাদজোড়া পাখনা পুরো সম্প্রসারিত হয়ে নড়তে পারে।

মাছিরাই সবচেয়ে চৌকষ বৈমানিক। এরা ওড়ার কাজে কেবল সামনের জোড়া পাখনাকে ব্যবহার করে। এদের পেছনের জোড়া পাখনা ক্ষয় হয়ে একজোড়া গাঁটে পরিণত হয়। এই গাঁটজোড়া সব মাছিতে রয়েছে বটে, কিন্তু নজরে পড়ে না। ব্যতিক্রম কেবল ক্রেন মাছির ক্ষেত্রে। কোন মাছির পাগুলো খুবই লম্বা। দীর্ঘপদী এই মাছিতে গাঁটদ্বয় দুটি দণ্ডের আগায় অবস্থিত। দেখতে ড্রাম বাজানোর লাঠির মাথার মতো। বক্ষদেশের সাথে পাখনা যেভাবে যুক্ত থাকে, দণ্ড দুটোও ঠিক একইভাবে যুক্ত থাকে। ক্রেন মাছি ওড়ার সময় দণ্ডদ্বয় একবার উপরে একবার নিচে দোলায়মান থাকে। দোল খাওয়ার সংখ্যা প্রতি সেকেন্ড একশ বা একশরও বেশি। গাঁট অংশত জাইরোস্কোপের (গতি নির্ধারক যন্ত্র) ন্যায় দেহকে স্থির রাখতে সাহায্য করে এবং অংশত সংবেদী অঙ্গের ভূমিকা পালন করে। দেহ বাতাসে কোন অবস্থায় আছে এবং কোনদিকে এর গতি এ বিষয়ে মাছিকে ওয়াকেবহাল রাখে এই সংবেদী অঙ্গ। ওড়াকালে শুঙ্গের উপর দিয়ে সঙ্গত কারণে বাতাসের চাপ পড়ে। এতে শুঙ্গে কম্পন জাগে। কম্পন পরিমাপ করে মাছি তার ওড়ার গতি বুঝতে পারে।

মাছি আশ্চর্যজনকভাবে প্রতি সেকেন্ডে এক হাজার বার পাখনা নাড়াতে পারে। পাখনার গোড়ার সাথে সরাসরি যুক্ত পেশি ব্যবহার না করেও এরা উড়তে পারে। পেশিকে ব্যবহারের পরিবর্তে ওরা পুরো বক্ষদেশ জুড়ে কম্পন সৃষ্টি করে। বক্ষদেশ দেখতে একটি পিপার মতো। এটি নমনীয় দৃঢ় কাইটিন দ্বারা গঠিত। ধাতব একটি পাতলা টিনের পাত্রকে যেমনি ফুলানো ও কোঁচকানো যায়, মাছিও তেমনিভাবে বক্ষদেশকে অবিরামভাবে সংকোচনও প্রসারণ করে এবং এ সময় টিক টিক আওয়াজ হয়। পাখনার গোড়ায় অবস্থিত একটি সরল অঙ্গ দ্বারা বক্ষদেশ পাখনার সাথে যুক্ত থাকে। বক্ষদেশের কম্পন বা সংকোচন-প্রসারণের দরুন পাখনা উপর-নিচ ঝাপটায়।

পতঙ্গরাই প্রথমে আকাশ জয় করে এবং আকাশে কলোনি স্থাপন করে। প্রায় ১০ কোটি বছর ধরে এখানে তাদের একক রাজত্ব চলে। পতঙ্গদের জীবনও বিপদমুক্ত ছিলো না। পতঙ্গের পুরনো শত্রু মাকড়সা তাদেরকে পুরো স্বস্তিতে থাকতে দিয়েছে এমন নয়, মাকড়সার দেহে কখনো পাখনা গজায়নি। তবু ওরা পতঙ্গকে কাবু করতো অন্য কৌশলে। পতঙ্গদের

জন্য পতঙ্গসমূহ বৃক্ষের শাখাগুলের মধ্যে ওরা জালের ফাঁদ পাতে। ফাঁদে পড়া পতঙ্গকে ওরা সাবাড় করে। এভাবে ওরা প্রতিনিয়ত পতঙ্গ সাবাড় করে চলেছে।

পতঙ্গের উড্ডয়ন দক্ষতাকে বৃক্ষকূল তাদের অনুকূলে ব্যবহার করে। বৃক্ষ এতোদিন বীজ-রেণুর বিতরণের জন্য বাতাসের উপর নির্ভরশীল ছিলো। জীববিজ্ঞানের শর্তে এ পদ্ধতি ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। স্পোরসমূহের নিষিক্ত হবার প্রয়োজন পড়ে না। স্পোর যে মাটিতে পড়ে সেখানেই গজায়। তবে মাটিকে হতে হবে ভেজা ও উর্বর। তবু অধিকাংশ স্পোর, তা এমনকি ফার্নের স্পোরসমূহও উল্লিখিত শর্ত পূরণ না হবার দরুন মারা পড়তো। স্পোর গজানোর জন্য আবশ্যকীয় শর্ত যদিও ছিলো অতি কম ও সীমাবদ্ধ তবু বায়ুবাহিত পরাগকেণুর টিকে থাকার সম্ভাবনা ছিলো খুবই স্বল্প। যদি এরা স্ত্রী মোচায় পড়তে পারতো কেবল তখনই এরা বিকশিত হতে পারতো এবং কার্যকর হয়ে উঠতো। এ কারণে পাইন বৃক্ষকে বিপুল পরিমাণ রেণু উৎপাদন করতে হয়। একটি পুং মোচা কয়েক কোটি পরাগরেণু উৎপন্ন করে। যদি বসন্তে একটি মোচার রেণু সংগ্রহ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে সব রেণু মিলে যেন সোনালী মেঘের সৃষ্টি করেছে। পুরো একটি পাইন অরণ্য একটি জলাশয় নষ্ট করে ফেলে। জলাশয়ের জলে রেণুসমূহ দইয়ের মতো ধক ধক করে এবং সব রেণু নষ্ট হয়ে যায়।

পতঙ্গরা দক্ষ পরিবহণ পদ্ধতি গড়ে তুলেছে। এদেরকে যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারলে এরা নিষেকের জন্য আবশ্যকীয় ক্ষুদ্র পরিমাণ পরাগ বহন করতে পারে এবং যেখানে প্রয়োজন অর্থাৎ যে স্ত্রী ফুলের জন্য পরাগ প্রয়োজন সেই নির্দিষ্ট ফুলে তা সরবরাহে সমর্থ হয়। বৃক্ষে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যদি কাছাকাছি অবস্থিত থাকে, তাহলে আরো কম সময়ে প্রজননের কাজটি সম্পন্ন হতে পারে। পতঙ্গ এক ট্রিপেই রেণু সংগ্রহ ও বিতরণে সক্ষম হয়। কাজেই বৃক্ষে এই লক্ষ্যেই ফুলের বিকাশ ঘটতে শুরু করে।

আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম ও সহজতম সুন্দর প্রজনন কৌশল গড়ে উঠতে দেখা যায় ম্যাগনোলিয়াতে। প্রায় দশ কোটি বছর আগে ম্যাগনোলিয়ার উদ্ভব ঘটে। এক্ষেত্রে ডিম্বসমূহ কেন্দ্রে জড়ো হয়। প্রতিটি ডিম্ব একটি সবুজ আবরণের সুরক্ষায় থাকে। আবরণের শীর্ষে থাকে একটি গ্রাহক মঞ্জুরি। গ্রাহক মঞ্জুরির নাম স্টিগমা (Stigma) বা গর্ভমুণ্ড। ডিম্ব নিষেকের জন্য অবশ্যই এর উপর অবশ্যই পরাগরেণু পড়তে হবে। এসব অঙ্গের প্রতি পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণের স্বার্থে সবগুলোর চারপাশে ঘিরে থাকে রূপান্তরিত পত্রগুচ্ছ বা পাঁপড়িগুচ্ছ।

বিটল বা গুবরে পোকাজাতীয় প্রাণী সাইকাডের পরাগ ভক্ষণ করতো। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে এরাই প্রথম আদিকালের ম্যাগনোলিয়া ও পদ্মফুলের দিকে নজর ফেরায়। বিটলরা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে বিচরণ করে খাদ্যের জন্য পরাগরেণু সংগ্রহ করতো। বিনিময়ে গায়ে অতিরিক্ত লেগে থাকা কিছু রেণুও গাছের স্বার্থে বহন করতে হতো। অজান্তে বয়ে বেড়ানো এসব রেণুকে এরা অন্য ফুলে বিচরণকালে অনিচ্ছায় সরবরাহ করতো।

একই ফুলে ডিম্ব ও পরাগরেণু থাকার একটি বিপদও আছে। বিপদ হলো, এতে স্বপরাগায়ন হতে পারে। ফলে পরনিষেকের প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাশিত হয়। এতো সব জটিল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যেই হলো পরনিষেকের সুবন্দোবস্ত করা। পরনিষেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির

সম্ভাবনাকে ম্যাগনোলিয়া নস্যাৎ করে দেয়। অন্যান্য অনেক গাছের মতো, ম্যাগনোলিয়াতেও ডিম্ব ও পরাগরেণু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিকশিত হয়। ফুল ফোটার সাথে সাথে ম্যাগনোলিয়ার গর্ভমুণ্ড পরাগ গ্রহণ করে। ম্যাগনোলিয়ার ডিম্ব, বিচরণকারী পতঙ্গের সরবরাহকৃত পরাগ দ্বারা নিষিক্ত হবার আগে, এর স্বকীয় পুংকেশর পরাগ উৎপাদন করে না।

ফুলের আবির্ভাবে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গেছে। শ্যামলী নিসর্গ এখন রঙের সমারোহে উজ্জ্বল। বৃক্ষকূল আগন্তুকদের পুরস্কৃত করার লক্ষ্যে আনন্দের এই বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে। প্রথমদিককার সেসব ফুল সবার জন্য উন্মুক্ত ছিলো। যারা ফুলের উপর বসতে চাইতো, বসতো। বাধা ছিলো না। ম্যাগনোলিয়া ফুল বা পদ্মফুলের কেন্দ্রে পৌছানোর জন্য কোনো বিশেষ স্বতন্ত্র অঙ্গের প্রয়োজন হতো না। পুংকেশর ভর্তি পরাগ সংগ্রহে বিশেষ কোনো কৌশল প্রয়োগের আবশ্যকতা ছিলো না। ফুলের বিচিত্র সৌন্দর্য বহু ধরনের পোকামাকড়কে আকর্ষণ করতো। বিশেষ করে মৌমাছি ও বিটলকে আকর্ষণ করতো বেশি। বহু ধরনের পরিদর্শকের আগমনে অসুবিধার সৃষ্টি যে হতো না তা নয়। এরা তো অবাঞ্ছিত ফুলে বিচরণের পর আসতে পারে। ফলে এক বৃক্ষের পরাগ অন্য বৃক্ষের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়লে লাভ হয় না, বরং পরাগের অপচয় ঘটে। ফলে সপুষ্পক উদ্ভিদের বিবর্তনের ইতিহাসে বিশেষ ফুলের প্রতি বিশেষ পতঙ্গের আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। ফল যেমন বিশেষ পতঙ্গের রুচি ও মর্জিমাফিক নিজেকে সাজায়, পতঙ্গেরও একটি নির্দিষ্ট স্বাদের প্রতি টান আছে। এতে পতঙ্গের প্রয়োজন মিটে।

দানো হর্সটেইল ও ফার্নের সময় থেকেই পতঙ্গকুল বৃক্ষশীর্ষে স্পোর সংগ্রহের লক্ষ্যে বিচরণ করায় অভ্যস্ত। পরাগ স্পোরের মতোই একই ধরনের খাদ্য। ফলে পরাগ এখনো পতঙ্গের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার। মৌমাছি তাদের উরুর সাহায্যে ঝুরি ঝুরি পরাগ সংগ্রহ করে। পরাগ সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে যাবার পর সঙ্গে সঙ্গে খায় অথবা পরাগ রুটি বানায়। মৌমাছির বাসায় বেড়ে উঠা শিশুদের জন্য পরাগ রুটি একটি প্রয়োজনীয় খাবার। কতকগুলো উদ্ভিদ দু'ধরনের পরাগ উৎপাদন করে। একধরনের পরাগ নিষেকের জন্যে, অন্যটি বিশেষ স্বাদযুক্ত করে তৈরি করা হয় যাতে তা পতঙ্গের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এসব উদ্ভিদের মধ্যে মিটল নামক উদ্ভিদের কথা উল্লেখ করা যায়।

অন্যান্য ফুল সম্পূর্ণ নূতন একটি ঘুষ উৎপন্ন করে। এর নাম মকরন্দ (necter) বা মধু। এই তরল মিষ্ট পদার্থ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পতঙ্গকে মহাখুশি রাখা যাতে এরা এতে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং ফুল ফোটার পুরো মরসুম জুড়ে মকরন্দ সংগ্রহে সম্ভাব্য সকল সময় ব্যয় করে। ফুল মকরন্দের সাহায্যে পুরো একটি নূতন বাহকদলকে নিয়োগ করে। বাহকদলের মধ্যে বিশেষ করে রয়েছে মৌমাছি, মাছি প্রজাপতি।

পরাগ ও মকরন্দকে পুরস্কার হিসাবে বিতরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন হয়। ফুলের উজ্জ্বল রঙ অনেক দূর থেকে ওদের নজর কাড়ে। আগত পতঙ্গদের জন্য পাপড়িতে চিহ্ন নির্দিষ্ট করা থাকে। পতঙ্গ চিহ্ন দেখে এর প্রার্থিত পুরস্কার ঠিক কোথায় আছে তা বুঝতে পারে। কতকগুলো ফুল ভিতরের দিকে রঙকে আরো গাঢ় করে রাখে অথবা সেসঙ্গে অন্য একটি ছায়া সৃষ্টি করে। ফরগেট মি নট (Forget Me Not). বাইন্ডউড (Bindwood) ও হলিহক (Holyhawk) ফুল এ ধরনের ব্যবস্থা রাখে। অন্য কতকগুলো ফুলের পাপড়িতে

রেখা ও ফোঁটা থাকে। দেখতে অনেকটা বিমান অবতরণের ক্ষেত্রের মতো। রেখা ও ফোঁটা গুলি উড়ন্ত পতঙ্গ কোথায় নামবে বা বসবে এবং কোন্ দিকে অগ্রসর হবে তার নির্দেশনা দেয়। এরকম ফুলের উদাহরণ হলো ফক্সগ্লোব (Foxglobe), ভায়োলেট (Violet) ও রডোডেনড্রন (Rhododendron)। আমরা বুঝতে পারি না এমনও অনেক ইঙ্গিত দেওয়া থাকে। অনেক পতঙ্গ বর্ণালির রঙসমূহকে চিনতে পারে যা আমাদের চোখে অদৃশ্য। আমাদের চোখে অনেক ফুলকে সাদামাটা মনে হয়। অতিবেগনি রশ্মির প্রতি স্পর্শকাতর ফিল্মে সে সব ফুলের ছবি তোলা হলে দেখা যাবে ওদের পাপড়িতে অনেক অনেক চিহ্ন রয়েছে।

পতঙ্গদের প্রলোভিত করার জন্য ফুল তার সুগন্ধকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। অনেক ক্ষেত্রে পতঙ্গ যেমন লেভেন্ডার, গোলাপ ও মকরন্দযুক্ত ফুলের গন্ধে আকর্ষণ বোধ করে। তেমনি এসব সুগন্ধ আমাদেরকেও আলোড়িত করে। অবশ্য পতঙ্গ সবসময় ফুলের সুগন্ধ পছন্দ করে এমনও নয়। মাছি পচা মাংস আহার করে। পরাগবাহকদের রুচি অনুযায়ী ফুল সুগন্ধি উৎপাদন করে। ফুল নিখুঁতভাবে এমন সব ঝাঁঝালো গন্ধ তৈরি করে যা মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পক্ষে অসহনীয় হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার শূককীট ধারণকারী স্টেপেলিয়া নামক বৃক্ষ কেবল পচা মাংসের দুর্গন্ধের মতো দুর্বিসহ বোঁটকা গন্ধই সৃষ্টি করে না, এরা মাছিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করার জন্য এমন ফুল উৎপাদন করে যার লোমসদৃশ অঙ্গ দ্বারা আবৃত কোঁচকানো বাদামি রঙের পাপড়ি দেখতে অনেকটা মরা পশুর গলিত চামড়ার মতো। এখানেই শেষ নয়। মাছিদের বিভ্রান্তির ষোলকলা পূর্ণকরণের লক্ষ্যে, পচা মাংসে যেভাবে গরম বাষ্প বের হয়, বৃক্ষ পাপড়িতেও এ ধরনের গরম বাষ্পের সঞ্চার করে। পুরো আয়োজন এমনই দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদক যে, মাছি কেবল ফুলে ফুলে বিচরণ করে পরাগ বহন ও বিতরণই করে না, ওরা নিজের স্বার্থও পূরণের চেষ্টা করে। অর্থাৎ তারা একে পচা মাংস ভেবে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শূককীট বের হয়। বেচারা শূককীট খাবার জন্য পচা মাংস তো পায় না। এমনকি পাপড়িও ওদের কাছে অখাদ্য। ফলে ওরা উপোসে মারা যায়। তবে স্টেপেলিয়ার উদ্দেশ্য কামিয়াব হয়। এদের ফুলে নিষেকের কাজ সম্পন্ন হয়।

যৌন প্রতারণার দ্বারা পতঙ্গকে আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে কতকগুলো অর্কিড অনুকরণের মাধ্যমে যে পথ অনুসরণ করে তা সম্ভবত এক অদ্ভুত ব্যাপার। একপ্রকার অর্কিড স্ত্রী বোলতা দেখতে যেমনটি ঠিক তেমন আকৃতির ফুল উৎপাদন করে। মনে হয় এতে বোলতার চোখ, শুঙ্গ ও পাখনা রয়েছে। বোলতাদের রমনকালে যেরূপ গন্ধ দেহ থেকে নিঃসৃত হয়, এই ফুলও তেমন গন্ধ উৎপন্ন করে। পুরুষ বোলতা প্রতারিত হয়ে এই ফুলের সাথে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়। এসময় বোলতার গায়ে রেণু লেগে যায়। বোলতা পরে অন্য ফুলে গেলে পরাগ স্থানান্তরিত হয়। এভাবে অর্কিডে নিষেক সম্পন্ন হয়।

কখনো কখনো পোকা-মাকড় মকরন্দ পানে আগ্রহী হয় বটে কিন্তু বহনে অনীহা থাকে। পরাগ বহন করলেও এমন অঙ্গে জমা করে যেখান থেকে সেসবের সহজে স্থানান্তরিত হবার জো থাকে না। ফলে ফুলকে এমন অতিথিদের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা রাখতে হয়। এরা প্রথমে পুংকেশর দিয়ে অতিথির দেহে আঘাত করে এবং অতিথি পালানোর আগে পরাগধানী ফাটিয়ে ওদের সর্বাঙ্গে পরাগ বর্ষণ করে। এই ফুলগুলো এমনভাবে গঠিত যাতে পতঙ্গকুল পাপড়ি গঠিত ক্যাপসুলে প্রবেশের সাথে সাথে পুংকেশর দিয়ে পতঙ্গের দেহের নিচ দিকে আঘাত করায় সমর্থ হয়। এতে পতঙ্গের দেহের অঙ্কভাগ পরাগে ছেয়ে যায়। মধ্য আমেরিকার বাকেট

অর্কিড অতিথি পোকা-মাকড়কে নেশাসক্ত করে। ফুলের পিচ্ছিল পাপড়ি বেয়ে মৌমাছি কষ্ট করে নেমে সামান্য মকরন্দ পান করলেই নেশাগ্রস্ত হয়। তখন মৌমাছিটি ঘুরতে থাকে। পিচ্ছিল পাপড়ি বেয়ে উঠতে গেলে বার বার পা হড়কে পড়ে যায়। পড়ে যায় মকরন্দভাণ্ডে। জোরের সাথে উপরে উঠে আসা ছাড়া মৌমাছির গত্যন্তর থাকে না। মৌমাছি যখন ঘুরপাক খায় এবং খাড়া পুংকেশরকে মুচড়িয়ে দেয় তখন পরাগে পরাগে মৌমাছির দেহ সয়লাব হয়ে যায়।

কখনো কখনো উদ্ভিদ ও পোকামাকড় পরস্পর নির্ভরশীল হয়। মধ্য আমেরিকায় আছে ইউকা নামের এক উদ্ভিদ। উদ্ভিদের পাতা দেখতে বর্শার মতো। পাতাগুলো গোলাপের আকৃতি নিয়ে সেজে থাকে। পাতাগুচ্ছের কেন্দ্র থেকে জাহাজের মাস্তুলের মতো একটি দণ্ড উত্থিত হয়। দণ্ডের শীর্ষে থাকে একটি গৌরবর্ণ ফুল। ফুল এক ধরনের মথকে আকর্ষণ করে। মথটির রয়েছে বিশেষ ধরনের বাঁকানো শুঁড়। শুঁড়ের সাহায্যে মথ ইউকার পুংকেশর থেকে পরাগ সংগ্রহ করে। পরাগ নিয়ে ওরা প্রথমে একটি পিণ্ড বানায় এবং পরে তাদের ডিম্বস্থালকের সাহায্যে ফুলের ডিম্বাধারের গোড়া ফুটো করে ডিম্বাধারে নিজের ডিম পাড়ে। এরপর মথ গর্ভকেশর বেয়ে উপরে উঠে এবং গর্ভমুণ্ডে পরাগ পিণ্ড ঠেসে দেয়। ফলে যথানিয়মে গাছে গর্ভাধান হয়। ডিম্ব থলেতে সকল ডিম্ব বীজে পরিণত হয়। যেসব ডিম্বাধারে মথের ডিম থাকে সেসকল বীজ আকারে বড় হয় এবং মথের ডিম ফুটে বেরুনো শূককীটের আহারে পরিণত হয়। অন্য বীজগুলো ইউকার বংশ রক্ষা করে। যদি এই মথ বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে ইউকাতে বীজ জন্মাবে না। অন্যদিকে ইউকা বিলুপ্ত হলে মথের শূককীট সৃষ্টি হবে না। এ কারণে ইউকা ও মথ পরস্পরের কাছে ঋণী।

স্পষ্টভাবে ফুলের কাছে আমাদের আরো একটি ঋণ স্বীকার করার আছে। অসাধারণ সুগন্ধিযুক্ত ও দৃষ্টিনন্দন বিচিত্র বর্ণের ও আকৃতির ফুল পৃথিবীতে উদ্ভূত হয়েছে মানুষ জন্মাবার আগে। ফুলেরা আবির্ভূত হয়েছিলো মানুষের কাজে নয়, পতঙ্গের কাছে নিবেদিত হতে। যদি প্রজাপতি বর্ণান্ধ হতো, মৌমাছি সুগন্ধির প্রতি স্পর্শকাতর না হতো, তাহলে মানুষ প্রকৃতির দান এই মহত্তম আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত থাকতো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঝাঁকে চলা পতঙ্গ

পৃথিবীতে বাস করার সমস্যা অনেক। পতঙ্গ সবগুলো সমস্যার অতি সফল সমাধানে সক্ষম। যে কোন মানদণ্ড বিচারে এ সত্য প্রমাণিত। পতঙ্গরা মরুভূমিতে বাস করতে পারে, অরণ্যে তো পারেই। ওরা জলের গভীরে সাঁতার দিতে পারে। ঘুটঘুটে স্থায়ী অন্ধকার গুহার গভীরে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারে। হিমালয়ের উঁচু শিখরের উপর দিয়ে উড়তে পারে। বিস্ময়ের কথা, বহু ধরনের পতঙ্গ স্বচ্ছন্দে বাস করে মেরুপ্রদেশের তুষার মুকুটের মধ্যে। একটি মাছিকে বাসা বাঁধতে দেখা যায় মাটির নিচ থেকে আহরিত অশোধিত তেলের আধারে। অপর একটি মাছি বাস করে ধূমায়িত উষ্ণ আগ্নেয় উৎক্ষেপের ভিতরে। আবার কোন কোন পতঙ্গ ঘন লবণ জলে বাস করায় আগ্রহী। অন্য কয়টি ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাওয়া পছন্দ করে এবং এই ঠাণ্ডা ওরা সহ্য করে। পতঙ্গরা জীবজন্তুর চামড়া খুঁড়ে বাসা বানায়। আর কেউ পুরু পাতায় লম্বা আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে। এক এক করে পতঙ্গের সংখ্যা গুণে সর্বমোট সংখ্যা নির্ণয় অসম্ভব। কেউ যদি অবাস্তব প্রয়াস নেয়ও তাকে এক সময়ে এমন একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে পৃথিবীতে সর্বমোট একশ কোটি বর্গের পতঙ্গ রয়েছে। অর্থাৎ প্রতি জন মানুষের ভাগে পড়বে দশ লক্ষ পতঙ্গ। এই দশ লক্ষ পতঙ্গ জড়ো করলে তা মানুষের ওজনের বার গুণ ওজন হবে।

সব ধরনের পশু-পাখি, জীবজন্তু মিলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে, পতঙ্গের সংখ্যা হবে এর তিন গুণ। মানুষ এ পর্যন্ত ৭০,০০০ পতঙ্গের বর্ণনা দিতে পেরেছে এবং এদের নামকরণ করেছে। নামকরণ করা হয়নি এমন পতঙ্গের সংখ্যা এরও তিন চার গুণ। বিজ্ঞানজগৎ এখনো সে ধরনের গবেষক কর্মীর অপেক্ষায় আছে, যাঁর ব্যয় করার মতো পর্যাপ্ত সময় আছে, ধৈর্য্য আছে ও প্রগাঢ় জ্ঞান আছে এবং যিনি পতঙ্গ সম্বন্ধে ধারাবাহিক পর্যালোচনা করে নামকরণ করতে পারবেন।

দেহের একটি মূল সাংগঠনিক কাঠামোকে ভিত্তি করে নানান আকৃতির পতঙ্গদেহের উদ্ভব ঘটেছে। দেহ স্পষ্ট তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। এটিই মূল কাঠামো। তিন খণ্ডের একটি হলো মাথা। মাথায় থাকে মুখ ও অধিকাংশ সংবেদী অঙ্গ। দ্বিতীয় বক্ষদেশ। বক্ষদেশ পেশিতে ভরা। বক্ষদেশের নিচে তিন জোড়া পা বা উপাঙ্গ ও উপরে দুই জোড়া পাখা থাকে। বক্ষের পেশি উপাঙ্গ ও পাখাকে পরিচালিত করে। তৃতীয় ও শেষ খণ্ড হলো উদর। পরিপাক ও প্রজননের অঙ্গসমূহ রয়েছে উদরে। মাথা, বক্ষ ও উদর বহিঃকংকালের ভিতরে আবদ্ধ। বহিঃকংকাল মুখ্যত কাইটিন দ্বারা গঠিত। আদিকালের দেহখণ্ডবিশিষ্ট ট্রাইলোবাইট ও ক্রাস্টাশিয়ানজাতীয় প্রাণীসমূহের দেহে ৫৫ কোটি বছর আগে বাদামী আইশবিশিষ্ট এই পদার্থটি তৈরি হয়েছিলো। রাসায়নিকভাবে, কাইটিন ও সেলুলোজ প্রায় একই গঠনের। বিশুদ্ধ কাইটিন নমনীয় এবং এর মধ্যে দিয়ে জল প্রবেশ করতে পারে। পতঙ্গে অবশ্য কাইটিনের উপরে একটি প্রোটিন দ্বারা

গঠিত আবরণ রয়েছে। আবরণটির নাম স্ক্লেরোটিন। স্ক্লেরোটিন কাইটিনকে আরো মজবুত করে। এর দ্বারাই ঘরে পোকাজাতীয় প্রাণী বা বিটলদের অনমনীয় ভারি বর্ম ও ধারালো মুখ-উপাঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। এই মুখ দিয়ে বিটল চিবাতে পারে। এমন কি তামা, সোনাও কেটে ফেলতে পারে।

কাইটিন গঠিত বহিঃকংকাল বিশেষভাবে বিবর্তনের চাহিদা অনুসারে নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা। ভিতরের অঙ্গসমূহের কোনো ক্ষতি না করে কাইটিন ছেঁচে তোলা যায়। নূতন আকৃতির অঙ্গসমূহের একেকটিতে কাইটিনের পরিমাণে হেরফের লক্ষণীয়। যেমন, আদিকালের তেলাপোকার মতো পতঙ্গদের মুখ-উপাঙ্গ ছিলো খাদ্য চিবানোর উপযোগী। কিন্তু এদের উত্তরসূরি তেলাপোকার মুখ-উপাঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে বক্রনল ও সরু ফালিবিশিষ্ট চাকু, করাত, কাস্তে বা সুঁচালো দণ্ডের আকৃতিতে পরিণত হয়েছে। তেলাপোকার দেহের নিচে বা অঙ্কভাগে এ ধরনের উপাঙ্গসমূহকে দেখা যায়। এদের পাগুলো দীর্ঘ গুলতির আকৃতি নিয়েছে। এই রকম পায়ের সাহায্যে তেলাপোকা এর দেহের ওজনের চেয়ে দশ গুণ ভারী ওজন বয়ে হাঁটতে পারে। কোনো কোনো পতঙ্গের পা প্রশস্ত। প্রশস্ত পা দিয়ে ওরা জলে সাঁতার কাটতে পারে। কোনোটির পা সরু চুলের মতো লম্বাটে। অনেকটা রণ পা-এর মতো। জলের পৃষ্ঠভাগে দূরে দূরে রণ পা ফেলে ওরা অনায়াসে দৌড়াতে পারে। কাইটিন দ্বারা ছাঁচ করা বিশেষ অঙ্গটি বহু পা বহন করে। পরাগ মজুদ রাখার থলের মতো অঙ্গ, পুঞ্জাক্ষি পরিষ্কার করার জন্য চিরুনির মতো অঙ্গ, নোঙর করার জন্য আঁকশিযুক্ত অঙ্গ এবং শব্দ সৃষ্টির খাঁজ আছে এমন অঙ্গ তৈরি হয় কাইটিনের বদৌলতে।

বহিঃকংকাল যেন দেহের কারাগার। কারণ এটি সম্প্রসারিত হয় না। আদি সমুদ্রে ট্রাইলোবাইট ত্বক নির্মোচনের প্রক্রিয়ায় বহিঃকংকালের এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছিলো। পতঙ্গদের জন্য ত্বক নির্মোচনই এর একমাত্র সমাধান। এই ত্বক নির্মোচন পদ্ধতি অপচয়মূলক মনে হলেও, পতঙ্গরা পরিমিতভাবে এ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। পুরানো কাইটিন আবরণের নিচে নূতন কাইটিন আবরণ নির্মিত হয়। এটি খুবই ভাঁজযুক্ত ও চাপা। তরল পদার্থের একটি স্তর দুটি আবরণকে পরস্পর থেকে আলাদা রাখে এবং পুরনো কংকাল থেকে কাইটিন শুষে নেয়। ফলে কংকাল কলা বা টিস্যুর সাথে হালকাভাবে আবদ্ধ থাকা শক্ত স্ক্লেরোটিন গঠিত অংশ পড়ে থাকে এবং তা দেহের ভিতরে প্রেরিত হয়। সাধারণত পতঙ্গের পৃষ্ঠদেশ বরাবর ফাটল ধরে ও পতঙ্গ বেরিয়ে আসে। পুরানো কংকাল আলাদা হয়ে যায়। পতঙ্গের পুরানো কংকাল-মুক্ত দেহকে তখন টলটলে দেখায়। নূতন ত্বকের ভাঁজসমূহ ধীরে ধীরে ভরাট হয়। স্বল্পক্ষণের মধ্যে কাইটিন শক্ত হয় এবং নূতন স্ক্লেরোটিন জমা হবার কারণে মজবুত হয়।

আদি পতঙ্গ ব্রিসল টেইল ও স্প্রিং টেইল-এর দেহের বৃদ্ধির সময়ে আকৃতিতে খুব একটি পরিবর্তন সাধিত হয় না। দেহ বৃদ্ধি ঘটাকালে এরা কেবল ত্বক নির্মোচন করে। এমন কি প্রজনন শুরুর পরও এরা ত্বক নির্মোচন প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়। তেলাপোকা, সাইকাডাস, ক্রিকেট, দানো মাছি ইত্যাদি পাখাযুক্ত আদি পতঙ্গেও একইরূপে দেহবৃদ্ধি ঘটে। এদের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়সমূহ দেখতে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ের মতো, তবে পার্থক্য হলো প্রাথমিক পর্যায়ে দেহে পাখা গজায় না। পাখা গজায় চূড়ান্ত ত্বক নির্মোচনের পর। ব্যতিক্রম কেবল ড্যামসেল মাছির ক্ষেত্রে। পাখা গজানোর পরও ওদের দু'বার ত্বক নির্মোচন হয়।

অবশ্য প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার ত্বক নির্মোচন হয় খুব দ্রুত। এভাবে ওরা পাখাকে সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করে। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ভিন্ন উপায়ে অস্তিত্ব বজায় রাখলেও তাদের আকৃতিতে হঠাৎ পরিবর্তন আসে না। সাইকাডদের যে সমস্ত শূককীট গাছের উপরে কর্কশ শব্দ সৃষ্টি করে সে সকল শূককীট মাটির নিচে বাস করে এবং মূলের রস খেয়ে জীবনধারণ করে। দানো মাছির শূককীট পুকুরের তলায় শিকার করে। এরা দীর্ঘ মুখ-উপাঙ্গকে দূরে ছুঁড়ে মেরে কৃমিজাতীয় প্রাণী ও অন্যান্য ছোট প্রাণী শিকার করতে পারে। সাইকাড ও দানো মাছির শূককীট দেখতে প্রাপ্তবয়স্কের মতো।

অতি উন্নত বা বিকশিত পতঙ্গকুলের শূককীট পুরো রূপান্তরিত হয়ে যায়। এদের শূককীট ও পূর্ণবয়স্ক পর্যায়ের মধ্যে সম্ভাব্য যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যদি না পরিবর্তনটা চাক্ষুষ করা যায়। ম্যাগট বা মাছির শূককীট পূর্ণ মাছিতে, বিটল বা গুবরে পোকার গ্রাব বা শূককীট পূর্ণবয়স্ক বিটলে এবং ক্যাটারপিলার বা শুঁয়াপোকা পূর্ণবয়স্ক প্রজাপতিতে পরিণত হয়।

ম্যাগট, গ্রাব ও ক্যাটারপিলারের কাজ হলো খাওয়া। এদের দেহ এই কাজেই নিয়োজিত। যেহেতু এ পর্যায়ে ওদের দেহে প্রজনন সম্পাদিত হয় না, সেহেতু এসময় এদের প্রজনন অঙ্গ থাকে না। ফলে এদেরকে রমণসাথীকে আকর্ষণ করতে হয় না। দৃষ্টি, গন্ধ বা শব্দ দিয়ে সাথীর মনোযোগ কেড়ে নেওয়ার জন্যে কোনো কৌশল গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দেয় না। এ সকল সংকেত ধারণ করার জন্য কোনো সংবেদী অঙ্গ থাকারও প্রশ্ন উঠে না। এদের জনকদের ডিম থেকে শূককীট বেরোনোর পর কেবল একটি সমস্যার কথাই বিবেচনায় রাখতে হয়। তাহলো ওদের চারপাশে খাদ্য মজুদ রাখা। শূককীটের পাখার দরকার নেই। দরকার এক জোড়া মজবুত চোয়াল। আরো দরকার চোয়ালের পেছনে ছোট একটি থলের মতো অঙ্গ। দেহে দ্রুত বেড়ে যাওয়া চর্বি সংরক্ষণের জন্য থলেটির প্রয়োজন। চর্বি বোঝাই হয়ে থলেটি সহজে ঝুলে পড়ে। শূককীটের সরল দেহ স্ক্লেরোটিন গঠিত কংকালের বোঝা দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না। পাতলা ও স্থিতিস্থাপক ত্বক দ্বারা ওদের দেহ আবৃত। ত্বকের সম্প্রসারণ ক্ষমতা অতিক্রান্ত হলে ত্বক ফেটে যায় এবং ত্বক পা থেকে নাইলনের মোজা খোলার মতো গুটিয়ে যায়।

উপরিল্লিখিত শূককীটের দেহ বহি:কংকালহীন। দেহে পেশি আটকে থাকার মতো ভিতও নেই। দেহের ভিতরে এমন কোনো দৃঢ় বস্তু নেই, যার সাহায্যে দেহকে উপরে ওঠাতে বা নিচে নামাতে পারে। কাজেই, ওদের চলার ভঙ্গি স্বতন্ত্র। এরা একবার লাফ দিয়ে অনেক দূর যেতে পারে না। ছোট ছোট লাফও দিতে পারে না বা লাফিয়ে উপরে উঠতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে, ওরা দৌড়ানোর কোন ব্যবস্থা করতে পারে না। কারণ এদের দেহ নলাকৃতির নরম বেলুনের মতো, যাতে গাছের কাটা গুঁড়ির মতো পা থাকে। এই পা খাদক যন্ত্রটাকে বা শূককীটের দেহকে এক খাবারের স্থল থেকে অন্যত্র বয়ে নিয়ে যায়।

বহি:কংকাল না থাকায় শূককীটের দেহ সুরক্ষিত থাকে না। অবশ্য ম্যাগট বা গ্রাবজাতীয় শূককীটের জন্য বহি:কংকাল খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ এদের ভুঁড়িভোজ চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে, আপেলের বুকের ভিতরে বা গাছের কোঠরে। আপেল বা গাছ ওদের আবরণ। ফলে ওরা অন্য প্রাণীর দৃষ্টির বাইরে থাকে। কিন্তু শুঁয়াপোকা বা ক্যাটারপিলারের খাওয়া চলে মুক্ত বিশ্বে। ফলে ওদের জন্য অবশ্যই আত্মরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

ছদ্মবেশী শিল্পীর মতো এরা ছদ্মবেশ ধরায় খুবই পারদর্শী। জিওমিটার মথের শরীরে এমন নকশা ও রঙ থাকে, যাতে মনে হয় এটি একটি গাছের প্রশাখা। গাছের শাখা থেকে প্রশাখা একটি নির্দিষ্ট কোণে যেভাবে গজিয়ে থাকে, এই মথও শাখায় এমনভাবে বসে যে কেউ দূর থেকে দেখলে মনে করবে এটি গাছটির প্রশাখা। তখন একে কীট হিসেবে শনাক্ত করা বেশ কঠিন ব্যাপার। সোয়ালো টেইলের শুঁয়াপোকা পাতায় থাকলে বোঝাই যায় না যে ওখানে একটি শুঁয়াপোকা রয়েছে। এই শুঁয়াপোকার দেহের বর্ণ সবুজ। সবুজের উপর সাদা সাদা ছোপ। দেখতে মনে হয় একটি পাখি গাছ থেকে নেমে আসছে। ছদ্মবেশীদের জারিজুরি যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে অনেক শুঁয়াপোকা আত্মরক্ষার তাগিদে দ্বিতীয় পথ বেছে নেয়। পুশমথের শুঁয়াপোকা মাথা নিচু করে পাতা খেতেই থাকে। ওদের দেহের রং গাছের পাতার রঙের মতো। শত্রু যখন গাছে নাড়া দেয় শুঁয়াপোকা তখন সতর্ক হয় এবং হঠাৎ খাওয়া ছেড়ে মাথা তুলে। মুখের রঙ লাল। সঙ্গে সঙ্গে পুচ্ছ থেকে এক জোড়া রক্ত-লাল সূত্র বের করে ও ফরমিক এসিড ছুঁড়ে দেয়। দক্ষিণ আমেরিকার অন্য একটি মথের শুঁয়াপোকা পুশমথের শুঁয়াপোকার চেয়েও সতর্ক। এদের মাথার উভয় পাশে দুটো গোল চিহ্ন রয়েছে। এরা ভয় পেলে বা উত্তেজিত হলে দেহের অগ্রভাগকে এদিক-সেদিক দোলাতে শুরু করে। দেখতে মনে হয় বড় বড় চোখবিশিষ্ট সাপ মাথা দোলাচ্ছে।

কতকগুলো মথের মাংস বিস্বাদ ও খাওয়ার অনুপযুক্ত। এদের দেহে বিষাক্ত লোমের মতো অঙ্গে ভরা। দেহের মধ্যে এক প্রকার ঝাঁঝালো পদার্থও থাকে। ফলে এই প্রাণী স্পষ্টভাবে নিজেদেরকে প্রদর্শন করতে পারে। গোঁফ-দাড়ি ও লোমশ প্রাণীর দেহের মতো দেখতে এই শুঁয়াপোকার দেহ বেশ জমকালো। বিস্বাদ মাংস যাদের, তাদের ত্বক লাল, হলুদ, কালো ও গাঢ় রক্তবর্ণের হয়ে থাকে। এসব তথাকথিত লোম ও রঙ দেখে খাদকরা সতর্ক হয়। ওরা বুঝে নেয় যে এসব পোকা খাওয়ার উপযুক্ত নয়। অন্য কতকগুলো শুঁয়াপোকার মাংস বিস্বাদ নয় এবং খাদকের জন্য তা প্রার্থিত। কিন্তু এরা কদাচিৎ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ এরা ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলে। এরা অবিকল বিষাক্ত শুঁয়াপোকার বর্ণ ধারণ করে। এই ছদ্মবেশই ওদের পরিত্রাণ করে।

অনেক পতঙ্গ প্রায় পুরো জীবনকালেই শূককীট পর্যায়ে কাটিয়ে দেয়। ওরা ধীরে ধীরে বড়ো হয় এবং দেহে খাদ্যের মজুদ গড়ে তুলে। বিটলের শূককীট কাঠ খুঁড়ে খুঁড়ে সাত বছর কাটিয়ে দেয় এবং সেলুলোজের মতো জটিল বস্তু থেকে পুষ্টি আহরণ করে। শুঁয়াপোকা মাসের পর মাস পাতা চিবায়। ঋতু শেষ হবার আগে তারা তাদের প্রিয় পাতাসমূহ খাবারের জন্য জড়ো করে। কিন্তু একটু আগে বা পরে এরা পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় এবং শূককীট জীবনের নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করে।

শূককীট পর্যায়ের অবসানের পর ওদের জীবনে দুটি নাটকীয় পরিবর্তন আসে। কারো ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। পতঙ্গের শূককীটেই কেবল রেশমগ্রন্থি থাকে। এরা তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য রেশমগ্রন্থির সাহায্যে তাঁবু বানায়। বৃক্ষচারী জীবনটাকে নিরাপদে কাটানোর লক্ষ্যেই এই তাঁবু নির্মাণ। অথবা রেশমগ্রন্থির সূত্রের মাধ্যমে ওরা গাছের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় চলাচল করে। অবশ্য কতকগুলো শূককীট নিজেদের চারপাশে রেশম বুনে, নিজেদেরকে বাইরের জগৎ থেকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে। সিল্ক মথের ক্যাটারপিলার বা শুঁয়াপোকা দেহের চারপাশে এরকম সূতার জাল বোনে, মুন

মথের ক্যাটারপিলার কোকুন বা রূপোর মতো চকচকে গুটিকা বানায়, এরমাইন মথের ক্যাটারপিলার কারুকার্যময় ফিতা দিয়ে ও জালের সূতার মতো বস্তু দিয়ে সুদৃশ্য বাক্স বা ক্যাসকেট নির্মাণ করে। অনেক প্রজাপতির শূককীট দেহকে ঘিরে আবরণ সৃষ্টি করে না। এরা কেবল একটিমাত্র সূতা বয়ন করে বৃক্ষ শাখার সাথে নিজেকে যুক্ত রাখে।

যখন ওরা স্থায়ী হয়ে বসে তখন শূককীটের আবরণ পরিত্যাগ করে। ত্বক ফেটে যায় এবং তা পাকানো অবস্থায় ঝরে পড়ে। ত্বক ঝরার পর মসৃণ বাদামি দৃঢ় কংকালে বা আবরণে ঢাকা মূককীট পর্যায় আসে। মূককীট নড়েচড়ে না। এর সুচালো আগা কালেভদ্রে নড়ে উঠে। মূককীটের দেহের পাশে শ্বাসরন্ধ্র থাকে। এগুলোর সাহায্য ওরা শ্বসন চালায়। মূককটি অবস্থায় খাওয়া ও মল নিষ্কাশন বন্ধ থাকে। মূককীট মৃতের মতো পড়ে থাকে। অথচ দেহের মধ্যে তখন জীবনের স্পন্দন থাকে এবং দেহে পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। শূককীটের দেহ মূককটি পর্যায়ে ভাঙাগড়ার মাধ্যমে পুনঃসংযোজিত হয়।

ডিম থেকে শূককীট বিকাশের আদি পর্যায়ে কোষসমূহ দুটি দলে সন্নিবেশিত হয়। মাত্র কয়েক ঘন্টা পর কতকগুলো কোষের বিভাজন স্থগিত হয়ে যায় এবং সাধারণ কোষের পর্যায়ে থেকে গুচ্ছাকৃতিতে ঘন হয়ে অবস্থান নেয়। অবশিষ্ট কোষ শূককীটের দেহ নির্মাণের কাজ চালিয়ে যায়। ডিম ফুটে বেরোনোর পর শূককীট যখন খেতে শুরু করে তখন কোষ বিভাজন বন্ধ হয়। এ সময় কোষগুলো আকারে বড় হতে থাকে। ইতোমধ্যে শূককীটের দেহের পূর্ণ বৃদ্ধি ঘটে এবং দেহ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। অর্থাৎ দেহ মূল আকারের কয়েক হাজার গুণ বেশি বড় হয়। এমতাবস্থায় আসার সময় পর্যন্ত অপর গুচ্ছাকৃতির কোষসমূহ আকারে ক্ষুদ্র ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। কিন্তু এ পর্যায়ে গুটির ভিতরে এসব কোষের সক্রিয় হবার নমুনা দেখা দেয়। শূককীটের বড় কোষসমূহ মারা যেতে থাকে এবং সুপ্ত গুচ্ছাকৃতিতে থাকা কোষ হঠাৎ দ্রুত কোষ বিভাজন শুরু করে। শূককীটের মরে যেতে থাকা কোষসমূহ আহার করে অন্য বিভাজনরত কোষগুলো পুষ্ট হয়। পতঙ্গেরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের দেহ নিজেরা খেয়ে বেঁচে থাকে। এই কোষেরা ধীরে একটি পুরো নূতন অবয়ব গড়ে তোলে। বাদামি গুটির মধ্যে এদের ছায়া বাইরে থেকে দেখা যায়। পিউপা শব্দটি ল্যাটিন ভাষার। পিউপা অর্থ হলো পুতুল। গুটি পর্যায়ে পতঙ্গকে কাপড় জড়ানো পুতুলের মতোই মনে হয়।

গুটি থেকে পতঙ্গের অবমুক্তি ঘটে অন্ধকারে। প্রজাপতির গুটিকা গাছের শাখায় ঝুলে থেকে ঝাঁকুনি দিতে থাকে। মাথায় দুটো বড়ো চোখ ও পৃষ্ঠদেশে লেপ্টে থাকা শুঙ্গসহ প্রজাপতি গুটিকার এক পাশ থেকে অল্প বেরিয়ে আসে। গুটিকা থেকে পা মুক্ত হয় এবং পা দিয়ে শূন্যে উন্মত্তভাবে থাবা দিতে শুরু করে। ধীরে ও অতি কষ্টে বার বার শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। শক্তি সঞ্চিত হলে এক সময়ে সজোরে গুটিকা থেকে বাইরে চলে আসতে থাকে। গুটিকা থেকে প্রথমে মাথা ও পরে ধড় বের হয়। ধড়ের পৃষ্ঠদেশে লেপ্টে থাকে চ্যাপ্টা ধরনের দুটো জিনিস। এগুলো পতঙ্গের পাখা। দেখতে মনে হয় আখরোটের শাঁস। পতঙ্গ পুরো দেহকে ঝাঁকি দিয়ে গুটিকা থেকে মুক্ত হয় এবং শূন্য গুটিকার উপর ঝুলতে থাকে। এ সময় এর দেহ কাঁপতে থাকে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সাহায্যে পতঙ্গ এর পাখনায় শিরাসমূহে রক্তপ্রবাহ সচল করে। ক্রমে পাখা মেলে। পাখার উপরিভাগের অস্পষ্ট নকশাগুলো সম্প্রসারিত হয় এবং দৃশ্য হয়ে ওঠে। পাখার আই স্পট ও বা চক্ষুবিন্দুতে অলৌকিকভাবে নানা রঙের দাগগুলো বিশদভাবে ভেসে উঠতে থাকে। আধ ঘন্টার মধ্যে পাখা পুরো খুলে যায়। ফলে দু'পাশের

পাখা দুটো শিরাকে ভেতরে রেখে গুটিয়ে একটি অপরটির বিপরীত খাড়া থাকতে পারে। শিরাগুলো তখনো নরম থাকে। এদের কোনোটির আগা ছিড়ে গেলে রক্ত বেরিয়ে আসে। তবে ক্রমে শিরা থেকে রক্ত দেহে চলে যায় এবং শিরা শক্ত হয়ে প্রকট রূপ ধারণ করে এবং পাখা আরো মজবুত হয়। এই সময়ের পূর্বে পর্যন্ত পাখা বইয়ের পাতার মতো গোটানো থাকে। পতঙ্গ এখন শুষ্ক ও মজবুত পাখা দুটো মেলে ধরে পৃথিবীকে নিখুঁত জ্বলজ্বলে বর্ণালি প্রদর্শন করে এবং প্রথম উড়ার অপেক্ষায় প্রহর গোণে।

শূককীট অবস্থায় পতঙ্গ সযত্ন প্রয়াসে যে শক্তি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেছে এখন তা ব্যবহার করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে আহার গ্রহণ গুরুত্ব বিচারে গৌণ ব্যাপার। মে ফ্লাই ও কতকগুলো মথের এমনকি মুখ-উপাঙ্গও নেই। অন্যরা ওদের ক্ষণস্থায়ী জীবনে শক্তি পুন:উজ্জীবনের জন্য মধু পান করে। সুষ্ঠুভাবে ডিম উৎপাদনের জন্য এই শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু কোনো পতঙ্গকে দেহ গড়ার জন্য আহার করতে হয় না, যেহেতু এদের দেহের আর বৃদ্ধি ঘটে না, তাদের জীবনের শেষ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সঙ্গমের জন্য একটি সাথীর অনুসন্ধান করা।

প্রজাপতি সাথীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে পাখা প্রদর্শন করে। এর ডানার বা পাখার অনবদ্য বর্ণিল নকশা দেখে সাথী বুঝে নেয় যে এর সাথে মিলন সার্থক হবে। প্রজাপতির শূককীটের চোখ ছোট। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কের রয়েছে বেশ বড় ও সুদৃশ্য দুটি পুঞ্জাক্ষি। পুরুষ প্রজাপতির চোখ স্ত্রী প্রজাপতির চোখের তুলনায় বড়। কাজেই সাথী খোঁজার মূল দায়িত্ব পুরুষ প্রজাপতির উপর। এদের দৃষ্টিশক্তি বর্ণালির রংগুলোর প্রতি সংবেদনশীল। অথচ এই রঙের সবটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। প্রজাপতির পাখায়, ফুলের মতো আরো জটিল নকশা রয়েছে। অতিবেগুনি রশ্মিতে এগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলোকেও আমাদের দৃষ্টি ধরতে পারে না। পাখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইশ বর্ণ ও নকশা সৃষ্টি করে। আঁইশসমূহে টালির ছাউনির মতো এক অপরকে আবৃত করে। আঁইশের দানাদার রংই এই সকল বর্ণ ও নকশার সৃজক। দানাদার রং অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। এতে আলো পড়লেই কেবল প্রতিফলিত হয়। তাও পুরো নয়, আংশিক। এর উপর এক বিন্দু অতি উদ্বায়ী তেল ফেললে রং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়। যেহেতু তেল এর ভৌতিক অবয়বকে অবরুদ্ধ করে, তরল পদার্থ উড়ে গেলে এবং আলো পড়লে রং দেখা যায় না।

সাত রঙে রাঙা কোমল ঝলমলে পাখা এবং নানা রঙের ছোপযুক্ত পতাকার মতো পত পত উড়তে থাকা পাখায় রয়েছে যেন স্বচ্ছ গবাক্ষ। এতে আরো রয়েছে শিরা, ঝালর ও চমৎকার মনোহারী ফোঁটা। কীট-পতঙ্গের জগতে ব্যাপক দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় পাখা এক অপূর্ব সংযোজন। কোনো কোনো কীট দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অন্য মাধ্যম ব্যবহার করে। এগুলোও সমরূপ জটিল ও শক্তিশালী সংকেতমালা। সাইকাডাস, ক্রিকেট ও ঘাসফড়িং ধ্বনির উপর নির্ভরশীল। সাইকাডাসের বক্ষদেশের দু'পাশে রয়েছে গোলাকৃতির ইয়ারড্রাম বা কর্ণপটহ। ঘাসফড়িং শব্দ অনুভব করে উপাঙ্গ বা পা দিয়ে। ওদের প্রথম জোড়া উপাঙ্গের উরুতে দুটি ফাটল থাকে। ফাটলের গভীরে থাকে পকেট। দুই পকেটের মধ্যবর্তী প্রাচীর একটি ঝিল্লী গঠন করে যা কর্ণপটহের সাথে তুলনীয়। যে কোনো কোণ থেকে ফাটলে আঘাত করা হোক না কেনো তা কর্ণপটহে পৌছায়। ফলে ঘাস ফড়িং উড়ন্ত অবস্থায় উপাঙ্গ দুলিয়ে কোন জায়গা থেকে ডাক আসছে তার নিশানা আবিষ্কারে সক্ষম হয়।

কতকগুলো ঘাস ফড়িং পাখার একটি স্পষ্ট ও মজবুত শিরায় পেছনের উপাঙ্গের চেরা অংশ দিয়ে করাত দিয়ে ঘষার মতো ঘষে ঘষে কাঁপা কাঁপা বোঁ বোঁ শব্দ সৃষ্টি করে। কীট-পতঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু শব্দ তোলে সাইকাড। এদের শব্দ তৈরির অঙ্গটিও জটিল। সাইকাডের উদরে রয়েছে দুটি প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর বা ভেতরের দেয়াল শক্ত। যখন প্রকোষ্ঠ ভেতর-বার নড়াচড়া করে তখন ক্লিক ক্লিক শব্দ হয়। অনেকটা টিনের ঢাকনি খোলার আওয়াজের মতো। ওদের উদরের পেছনে একটি পেশি রয়েছে। পেশি উদর প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীরকে সেকেন্ডে ৬০০ বার সামনে-পেছনে টানতে পারে। ফলে ক্রমে শব্দ বেড়ে যায়। কারণ, কম্পনশীল পাতের পেছনের উদরের অধিকাংশ অঞ্চল ফাঁপা এবং উদর-প্রাচীরের আয়তাকৃতির বড় দুটি অংশ দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে ধ্বনি বিবর্ধক অঙ্গের রূপ ধারণ করে। ধ্বনি বিবর্ধক অঙ্গ বক্ষের নিম্ন কিনারা থেকে উদ্ভূত ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। এই ত্বক ধ্বনি বিবর্ধক অঙ্গকে খুলতে ও বন্ধ করতে পারে। ফলে ধ্বনি একবার উঁচুতে উঠে, পরেরবার থিতিয়ে আসে। একটি বাদ্যযন্ত্রের ঢাকনা খুলে ও বন্ধ রেখে বাজালে যেমনটি হয়। প্রতিটি প্রজাতির ধ্বনি সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র ধরনের। কোনোটিতে করাত দিয়ে লোহা কাটার মতো। কোনোটিতে ঘুরন্ত লোহার চাকায় ছুরি ধার করা মতো। অথবা কোনোটিতে গরম কড়াইয়ে চর্বি ছাড়ার আওয়াজের মতো-ধ্বনি সৃষ্টি হয়। একটি পতঙ্গ এতো তীক্ষ্ণ ও উঁচু শব্দ সৃষ্টি করে যে তা আধ কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যায়। আর সবাই মিলে যখন ঐকতান তুলে তখন ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে অরণ্য মুখরিত হয়ে উঠে।

তীক্ষ্ণ এ সকল ধ্বনিতে আরো ব্যাপক সূক্ষ্ম তরঙ্গ আছে যা আমাদের শ্রুতিগ্রাহ্য নয়। আমাদের শ্রবণশক্তি দুটি শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে ১০-১৫ সেকেন্ডের বিরতি শনাক্ত করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সাইকাদাস ও সেকেন্ডের ১০ ভাগের ১ ভাগ সময়ের বিরতিও শনাক্ত করতে পারে। যখন ওরা ধ্বনি তোলে, তখন স্বতন্ত্র ক্লিক-এর তরঙ্গমাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারে। যেমন সেকেন্ডে ২০০-৫০০ বার ক্লিক করে এবং তা নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত ছন্দে। ক্লিকের পরিবর্তন ও ছন্দ, আমাদের শ্রুতিতে কখনো ধরা পড়ে না। অথচ পতঙ্গরা তাদের স্বপ্রজাতি সৃষ্ট এই শব্দ সৃজনকারী পুরুষ পতঙ্গটির সাথে মিলনের আকাঙ্খায় শব্দের উৎসে উড়ে চলে।

মিলনের আহ্বান জানাতে মশাও ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ধ্বনি উৎপাদন ও ধ্বনি গ্রহণে তারা যে উপায়ের আশ্রয় নেয় তা তাদের একান্তই নিজস্ব। স্ত্রী মশা সেকেন্ডে ৫০০ বার পাখা নাড়ে। ফলে তীক্ষ্ণভেদী শব্দ উৎপন্ন হয়। যে কারণে বিনা মশারিতে ঘুমালে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। পুরুষ মশা এর শুঙ্গের গোড়ায় অবস্থিত কর্ণপটহের সাহায্যে এই ধ্বনি শনাক্ত করে। কারণ পুরুষ মশার শুঙ্গও একই তরঙ্গে কম্পমান থাকে। পুরুষ মশা শব্দের উৎস লক্ষ্য করে স্ত্রী মশার দিকে উড়ে যায়।

অন্যান্য কীট-পতঙ্গ পরস্পর সাথীদের সাথে মিলনের জন্য তৃতীয় ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে। তৃতীয় ইন্দ্রিয় হলো ঘ্রাণেন্দ্রিয়। কতিপয় স্ত্রী মথ এক ধরনের গন্ধ উৎপাদন করে। পুরুষ মথ বড় পালকের মতো শুঙ্গের সাহায্যে গন্ধ শনাক্ত করে। এই গন্ধ খুবই তীক্ষ্ণ। শুঙ্গও অতি স্পর্শকাতর। জানা যায়, একটি স্ত্রী মথ 'গন্ধদূতের' সাহায্যে একটি পুরুষ মথকে ১১ কিলোমিটার দূর থেকে টেনে এনেছিলো। এতো দূর থেকে টেনে আনার জন্য প্রায় এক ঘন মিটার বায়ুতে ন্যূনপক্ষে এক অণু গন্ধ আবশ্যক। তবু এ পরিমাণ গন্ধই পুরুষ মথটিকে গন্ধের

উৎসমুখে টেনে আনার জন্য পর্যাপ্ত। এ জন্যে পুরুষ মথকে দুটো শুঙ্গ ব্যবহার করতে হয়। কেবল একটি দিয়ে গন্তব্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। দুটোর সাহায্যে দেহের কোন পাশে গন্ধটি প্রবলতর তা বিবেচনা করে এবং ধীরে সুস্থে সে দিকেই উড়ে চলে। বিশাল আকারের এক সম্রাজ্ঞী মথ গাছের কোটরে থেকে এক ধরনের গন্ধ ছড়িয়েছিল। এই গন্ধ মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ধরতে পারেনি। কিন্তু তিন ঘন্টার মধ্যে, গন্ধের প্রবল টানে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিশাল বিশাল পুরুষ মথদের সমাবেশ ঘটেছিলো গন্ধের উৎসমুখে।

দেখা যাচ্ছে দৃষ্টি, শ্রুতি ও ঘ্রাণের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক কীট–পতঙ্গ তাদের সাথীদের আকর্ষণ করে। পুরুষ পতঙ্গ স্ত্রী পতঙ্গকে কেবল ক্ষণকালের জন্যে আগলে রাখে। অবশ্য কোনো কোনোটি কয়েক ঘন্টাও ধরে রাখে। একটা ঘোড়ার পেছনে আরেকটা ঘোড়া জুতে দিয়ে যেমন করে এক ধরনের গাড়ী চালানো হয়, তেমনভাবে, দুটো পতঙ্গ পরস্পরের গায়ে লেগে থেকে, রমনকাজ চালানো অবস্থায়, বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পরে স্ত্রী পতঙ্গ নিষিক্ত ডিম পাড়ে। সে সঙ্গে ডিমকে সুরক্ষারও ব্যবস্থা নেয়। প্রজাপতি এমন গাছ ও পাতা বাছাই করে যাতে এর পাতা খেয়ে শূঁয়াপোকা বাঁচতে পারে। বিটল বা গুবরে পোঁকা খণ্ড শক্ত মলে গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে। মাছি শবদেহের গলিত মাংসের মধ্যে ডিম পাড়ে। একক জীবনযাপনকারী বোলতা মাকড়সাকে হুল বিদ্ধ করে এবং অবশ করে। অবশ করা মাকড়াকে ডিমের চারপাশে জড়ো করে যাতে ডিম থেকে শূককীট বেরিয়ে তাজা মাংস খেতে পারে। স্ত্রী ইকনিউমন বোলতার ডিম্বস্থালক দেখতে ছুরির মতো। এরা গাছের কোটরে থাকা বিটলদের শূককীটের অবস্থানস্থল সঠিকভাবে শনাক্ত করে এবং ডিম্বস্থালক দিয়ে সেস্থলে গর্ত খুঁড়ে। পরে শূককীটের নরম মাংস ছিঁড়ে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। বোলতার শূককীট ডিম থেকে বেরিয়েই বিটলের শূককীটের মাংস খেতে শুরু করে। এভাবেই কীট–পতঙ্গের ডিম থেকে শূককীট, শূককীট থেকে মূককীট এবং মূককীট থেকে প্রাপ্তবয়স্ক স্তরগুলো পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হতে থাকে।

পতঙ্গসমূহের দেহবৈচিত্র্য অন্তহীন। এদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা যায় কেবল আকারে। বর্তমানে জীবিত সবচেয়ে বড় আকারের পতঙ্গটি দৈর্ঘ্যে ৩০ সেন্টিমিটার। এই পরিমাপ এটলাস মথের পাখার বিস্তার এবং স্টিক ইনসেক্ট বা লাঠি পোকার দেহের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিটলদের মধ্যে সর্ববৃহৎ হলো হারকিউলিস বিটল। আকারে ৩০ সেমি–এর মতোই। ওজনে প্রায় এক কেজি। একটা বড়ো ইঁদুরের ওজনের সমান। প্রশ্ন উঠতে পারে বিটলরা ভোঁদর বা মথরা বাজপাখির মতো বড়ো আকারের নয় কেন? আকারের এই সীমাবদ্ধতার কারণ ওদের শ্বসন পদ্ধতি। এদেরই নিকট আত্মীয় আদি মিলিপেডদের অনুরূপ এদেরও ট্র্যাকিয়া বা শ্বাসনলের সাহায্যে শ্বসন চলে। মিলিপেডের দেহে শ্বাসনলগুলো স্পাইরাকল বা শ্বাসরন্ধ্রে উন্মুক্ত হয়। প্রতি দেহখণ্ডে থাকে একটি শ্বসনরন্ধ্র। পরিব্যাপনের মাধ্যমে এখানে গ্যাসের আদান–প্রদান ঘটে। শ্বাসনল বায়ু থেকে গৃহীত অক্সিজেনে ভরপুর থাকে। দেহ শ্বাসনল থেকে অক্সিজেন শোষণ করে। অন্যদিকে দেহ থেকে কার্বন ডাই–অক্সাইড শ্বাসনলে ঢোকে এবং তা শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াটি ছোট আকারের শ্বাসনলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। শ্বাসনল আকারে দীর্ঘ হতে থাকলে এটি ক্রমে অকেজো হয়ে পড়ে। কতকগুলো পতঙ্গ উদরের পেশীর সাহায্যে উদরকে সংকোচন ও সম্প্রসারণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ওরা দেহে অক্সিজেন সঞ্চালন করে। ক্ষুদ্র

শ্বাসনলসমূহের দেওয়াল বলয় থাকার কারণে মজবুত হয়। ফলে শ্বাসনল বেশি ফুলতে পারে না। তবে খাটো হয়ে যায় এবং পিয়ানোর রিডের মতো সম্প্রসারিত হয়। কতকগুলো পতঙ্গের শ্বাসনলের দেয়াল সরু। তখন এগুলো বেলুনের মতো ঝুলে থাকে। উদরপেশি দ্বারা উদর যখন উপর-নিচে পাম্প করে তখন এই বেলুনগুলো একবার সঙ্কুচিত ও একবার প্রসারিত হতে থাকে। শ্বসনের এতো সব বাড়তি ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রাণীর আকার বড় হবার জো নেই। কারণ শ্বাসনল, বেলুন, উদরপেশির সহযোগিতা আছে বটে তবে এসবের কোনোটি নির্দিষ্ট আকার ছাড়িয়ে গেলে সেটির কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে। এই শারীরবিদ্যাগত অসুবিধার কারণে আমরা কখনো দানোর মতো তেলাপোকা বা মানুষ শিকারী বোলতার দেখা পাবার দিবাস্বপ্ন দেখতে পারি না।

কিছু কিছু কীট-পতঙ্গ অন্য প্রসঙ্গে সকল ধরনের সীমাবদ্ধতাকে ডিঙিয়ে গেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের সর্বত্র রয়েছে উই পোকার ঢিবি। কোনো কোনো অঞ্চলে এরা ঘন ঝাঁক বেঁধে চলা এন্টেলোপজাতীয় হরিণের পালের চেয়েও দলবদ্ধভাবে ঝাঁক বেঁধে চলে। তুলনাটা পুরো কাল্পনিক নয়। একটি ঢিবির কলোনিতে কয়েক লক্ষ উই বাস করে। মানুষ বিশাল অঞ্চল জুড়ে বসবাস করে। আলাদা আলাদা পরিবারে। এরা এ ধরনের সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার মতো প্রাণী নয়। প্রকৃতি তাদের সেভাবে গড়ে তোলেনি। কারণ, এই লক্ষ লক্ষ প্রাণী একই পরিবারের সদস্য। শুধু তাই নয়, সবগুলো এক জোড়া দম্পতিরই সন্তান। তদুপরি এদের সবার দেহের বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কাজেই এরা আলাদা আলাদা থেকে জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত নয়। উইয়ের কর্মী পোকাগুলো অন্ধ ও প্রজনন ক্ষমতাহীন। এরা ঢিবির টানেলে বা সুড়ঙ্গে সবসময় ছুটোছুটি করে কর্মরত থাকে। কাজ করে কলোনির সকলের স্বার্থে। সৈনিক উই পোকার দল ঢিবির তোরণ পাহারা দেয়। শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে। এদের চোয়াল দুটো বেশ বড়। এতো বড়ো চোয়াল দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। ওরা খাদ্য সংগ্রহ করতে তো পারেই না। তাছাড়া এই চোয়াল নিজেদের আহার গ্রহণে ও কাজে আসে না। কর্মী উই পোকা ওদের খাইয়ে দেয়। রাণী উইয়ের হেরেম হলো ঢিবি বা কলোনির কেন্দ্র। রাণী বন্দী অবস্থায় দিন কাটায়। রাণীর ঘরটি মাটির পুরু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালে ছোট গবাক্ষ থাকে। কিন্তু তা রাণীর দেহের আকারের চেয়ে ছোট। ফলে এই ফাঁক দিয়ে রাণীর বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। রাণীর উদরদেশ বেশ ভারী ও স্ফীত। দেখতে পুরু সসেজের (মাংসের পুর দেওয়া এপ্রকার খাদ্য বিশেষ) মতো। উদর দৈর্ঘ্যে ১২ সেন্টিমিটার। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, রাণী দিনে ৩০,০০০ ডিম পাড়ে। যথারীতি রাণীর সেবাশুশ্রূষা চলতে থাকে। ঘরের একপাশ দিয়ে কর্মী উই তাকে খাবার সরবরাহ করে এবং অন্য পাস দিয়ে রাণীর পাড়া ডিম সরিয়ে নেয়। রাণীর ঘরে বাস করার অধিকার আছে রাজা উই পোকার। এটিই একমাত্র প্রজননক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ উই। আকারে বোলতার মতো। রাজা রাণীর পাশেই থাকে। রাজাকেও কর্মীরা খাইয়ে দেয়।

ঢিবিতে এতো বিপুল সংখ্যক স্বতন্ত্র ধরনের উই পোকাকে সুশৃঙ্খল ও সমন্বিত অতি উন্নত সমাজবন্ধনে রাখার পেছনে অবদান রাখে সফল যোগাযোগ পদ্ধতি। সৈনিক উই চলাচলের পথের দেওয়ালে শক্ত মাথা দিয়ে আঘাত করার মাধ্যমে কলোনির সবাইকে বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়। কর্মী উই নূতন খাদ্যের উৎসের খোঁজ পেলে তাদের অপর সাথীদের জন্য গন্ধের চিহ্ন রেখে যায়। সাথীরা গন্ধ শুঁকে ওদের অনুসরণ করে। ফেরোমন

(Pheromone) নামের একটি রাসায়নিক পদার্থ এক্ষেত্রে অতি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পুরো কলোনিতে গন্ধ-বার্তা বা ফেরোমন অতি দ্রুত নির্দেশনামা পৌছে দেয়। কলোনির সকল সদস্য পরস্পর অবিরাম খাদ্য ও লালা বিনিময় করে। কর্মীরা মুখে মুখে এক স্থান থেকে অন্যত্র খাদ্য বহন করে ও পাচার করে। এরা একে অপরের আংশিক হজমকৃত সংগ্রহ করে এবং পুনরায় তা হজম করে পুষ্টি নিংড়ে নেয় যাতে খাদ্য থেকে পুষ্টির শেষ কণাটিরও অপচয় না হয়। পরে তারা এই খাদ্য শূককীট ও সৈনিকদের খাওয়ায়। নির্দিষ্ট কক্ষে থাকা রাণীকেও তারা পরিচর্যা করে। তারা রাণীর দেহ চাটে এবং পায়ু থেকে চুঁয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু তরল পদার্থ সংগ্রহ করে। এসময় তারা রাণীর শরীর থেকে উৎপাদিত ফেরোমন নিয়ে জমা করে এবং তা দ্রুত পুরো কলোনিতে পৌছে দেয়। রাণীর পাড়া ডিম থেকে পুরুষ ও স্ত্রী শূককীট বের হয়। রাণীর উৎপাদিত ফেরোমন ওদের খাওয়ানো হলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে। তবে ওদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়। ওরা অন্ধ হয় এবং ওদের দেহে পাখা গজায় না। সৈনিক উইরা ফেরোমন উৎপাদন করে। এই ফেরোমনও কলোনিতে চালান হয়। সৈনিক সৃষ্ট ফেরোমনের প্রভাবে শূককীটের সৈনিকে পরিণত হওয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

ফেরোমন স্বল্পক্ষণের জন্য কার্যকর থাকে। কলোনিতে সৈন্য সংখ্য হ্রাস পেলে তখন কলোনিতে ফেরোমনের চালান দেওয়া হয়। রাণী কেবল ফেরোমন উৎপাদন করে না। সে নিজেও ফেরোমন খায়। ফলে রাণী কলোনির সকল সংবাদ অবহিত হতে পারে। কলোনির সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাণী বিশেষ ধরনের ডিম পাড়ে কিনা বা কর্মীরা শূককীটদের সৈন্যে পরিণত করার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেয় কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। সম্ভবত সেনা তৈরির প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্নভাবে হয়। তবে এ ধরনের সেনা ঘাটতির সময়ে নিশ্চিতভাবে সেনা তৈরির ব্যবস্থা নেওয়া হয় যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেনা মজুদ হয়। রাণীও কোনো কোনো সময় ফেরোমন নিঃসরণের প্রকৃতি বদলায় যাতে শূককীটগুলো অবদমিত না হয় এবং ওরা যেন প্রজননক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক উইয়ে পরিণত হতে পারে। এর ফলে কলোনির সুড়ঙ্গগুলো প্রাপ্তবয়স্ক পাখাওয়ালা পতঙ্গের হুড়োহুড়িতে ভরপুর হয়ে উঠে। সুড়ঙ্গের প্রবেশ-দ্বার পাহারায় থাকে সৈনিক উইয়ের দল। পাখাওয়ালা উইয়েরা তখন ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়ে। দেখলে মনে হয় আকাশ যেন ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে উই বেরোনের বিষয়টি অরণ্যের জীবজন্তুর জন্য একটি মহা সুসংবাদ। সরীসৃপ ও ব্যাঙ উইয়ের বেরোনর পথের ধারে ওৎ পেতে বসে থাকে। পোকারা ঢিবিতে বেরনো ও ঢোকার সময় ওরা ওদেরকে ধরে টপাটপ গিলতে থাকে। এ সময়ে আকাশে পাখিরাও ভীড় করে। ওরা এদিক-সেদিক ছোটে পোকা ধরার জন্যে। উই বেশি দূর উড়তে পারে না। খানিকটা গিয়ে ওরা মাটিতে নেমে আসে। মাটিতে নেমে আসার সাথে সাথে পাখা ভেঙে গিয়ে বক্ষদেশের পাশে ভাঁজ হয়ে পড়ে থাকে। পাখা এরপর আর সচল হয় না। পুরুষ উই মাটির উপর স্ত্রী উইকে ধরার জন্যে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করে। যারা শত্রুর হাত থেকে রেহাই পায় তারা আবার জোড় বাঁধে এবং মাটির ফাটল বা গাছের কোটরের সন্ধান করে। ফাটলে বা কোটরে তারা একটি রাজকীয় কোষ বা আবার নির্মাণ করে। আবাসের মধ্যে জোড়া উই পরস্পর মিলিত হয় এবং ডিম পাড়ে। প্রথমে যে সব শূককীট বের হয় মা-বাবা তাদের খাওয়ায়। এই শূককীটগুলো যখন নিজেরা নিজেদের আহার খুঁটে খাবার মতো

বড়ো হয় এবং কাদা দিয়ে মাটির দেয়াল নির্মাণে সক্ষমতা অর্জন করে তখন রাজকীয় দম্পতি কেবল ডিম পাড়ায় সময় কাটায়। ক্রমশই কলোনি বড় হয়ে উঠে।

আদি কীট তেলাপোকাদের সাথে উইপোকারা ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। তেলাপোকায় বক্ষদেশ ও উদরের মাঝখানে কোমরের মতো অংশ নেই। উইপোকাতেও তা নেই। উইয়ের শূককীট দেখতে তেলাপোকার পাখাওয়ালা শূককীটের মতোই। উইয়ের দেহের বৃদ্ধি কয়েকবার ত্বক নির্মোচনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। তবে এদের জীবনচক্রে মূককীট পর্যায় আসে না বা এদের দেহে রূপান্তরও ঘটে না। তেলাপোকার মতো এরাও প্রায় পুরোপুরি শাক-সবজি খেয়ে জীবনধারণ করে। উই পোকাদের প্রায় দুই হাজার প্রজাতি রয়েছে। গাছের কচি পাতা, ডাল ও ঘাস এদের আহার্য। কোনো কোনোটি কাঠ ভক্ষণেও দক্ষ। এরা লম্বা কাঠের খাম্বা ও বড়ো কাঠের খণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং খেয়ে ফাঁপা করে ফেলে। বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় থাকে না। একটু আঘাতে খাম্বার পতন ঘটে ও কাঠের খণ্ড গুঁড়িয়ে যায়।

পোকার জগতে উই সবচেয়ে বড়ো ইমারত নির্মাণ করে। উইয়ের ঢিবি বা দুর্গ দেওয়াল ঘেরা। দেওয়ালে ঠেস দেওয়া থাকে এবং ইমারতের উপরে থাকে মিনার। এক একটি ঢিবিতে দশ টনের বেশি মাটি থাকে। ঢিবি উচ্চতায় সর্বাধিক লম্বা মানুষের চেয়েও ৩-৪ গুণ উঁচু হয়। কয়েক লক্ষ পোকা ঢিবির মধ্যে অনবরত ছুটতে থাকে। ফলে ঢিবির ভিতরে তাপমাত্রা বাড়ে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়াতে দূষিত বায়ুর সৃষ্টি হয়। এ জন্যে ঢিবিতে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা অতি জরুরি। উই পোকা ঢিবির কিনারে লম্বা ও সরু নল বানায় যাকে ফ্যাক্টরির চিমনির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ঢিবির চারপাশে এরকম নল থাকে। বিশাল এই নলে কোনো পোকা বাস করে না। নলের দেওয়াল খুবই মসৃণ। এই নল ঢিবির ভিতরে বায়ু চলাচলে সাহায্য করে। রোদের তাপে নলের দেয়াল গরম হয়। ফলে ঢিবির ভিতরে বায়ু চলাচলে সাহায্য করে। রোদের তাপে নলের দেওয়াল গরম হয়। ফলে ঢিবির কেন্দ্রের বায়ুর চেয়ে নলের বায়ু অধিকতর উষ্ণ হয়ে উঠে এবং হালকা হয়। নলের উষ্ণ ও হালকা বায়ু নল দিয়ে বাইরে চলে যায় এবং ঢিবির ভিতরের বায়ু নলে চলে আসে। এভাবে ঢিবি ও নলের মধ্যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং তা হালকা হয়। নলের উষ্ণ ও হালকা বায়ু নল দিয়ে বাইরে চলে যায় এবং ঢিবির ভিতরের বায়ু নলে চলে আসে। এভাবে ঢিবি ও নলের মধ্যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং বায়ুর আদান-প্রদান হয়। নলের দেওয়ালগুলো আবার ছিদ্রযুক্ত। এ সকল ছিদ্র দিয়ে অক্সিজেনসহ বায়ু পরিব্যাপিত হয়ে নলে ঢুকে। নল থেকে সতেজ বায়ু ঢিবির সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। খুব গরম পড়লে, কর্মীদল সুড়ঙ্গ খুঁড়ে নিচে মাটির গভীরে জলের সন্ধানে ছুটে। ওরা জলাধার থেকে জল নিয়ে এসে বাসার মুখ্য অংশের দেওয়াল ভিজিয়ে দেয়। তাপ এই জলকে বাষ্পে পরিণত করে। ফলে এ প্রক্রিয়ায় ভিতরের উষ্ণতা কমে আসে। এ সকল কৌশল অবলম্বন করে কর্মী উই ঢিবির ভিতরে তাপমাত্রার সমতা রক্ষা করে।

অস্ট্রেলিয়ার কম্পাস বা দিক নির্ণায়ক উই বিশাল চ্যাপ্টা বাটালির আকৃতিবিশিষ্ট বাসা বানায়। বাসার দীর্ঘ অক্ষরেখা সবসময় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থাকে। এতে করে দিনের মধ্যভাগের গনগনে রোদ বাসার খুব কম স্থানেই পড়তে পারে। বরং তুলনামূলকভাবে সকালে ও বিকালের কম রোদের প্রায় সবটুকুই বাসাতে পড়ে। বিশেষ করে শীতকালে বাসার উষ্ণতা

বজায় রাখার ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা উত্তম। পশ্চিম আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো কলোনি গড়ে উঠে। এ সকল আবাসের ছাদ চ্যাপ্টা ধরনের এবং এটি জলের উপরে ছাতার বা আচ্ছাদনের কাজ করে। উই বিশেষজ্ঞরা কলোনির কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ে ফেরোমন কিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা সক্রিয় রাখে, সে সম্পর্কিত গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছেন। তবে কিভাবে লক্ষ লক্ষ অন্ধ উই কর্মী প্রত্যেকে বিন্দু বিন্দু মাটি সঞ্চয় ও বহন করে অতি দক্ষতার সাথে পরিকল্পিত নকশাবিশিষ্ট কার্যকর বিশাল প্রাসাদ নির্মাণের ব্যবস্থা করে তার ব্যাখ্যা অদ্যাবধি কোনো বিজ্ঞানী দিতে পারেন নি।

কলোনিবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্থ অন্য একদল পোকার সঙ্গে উইয়ের কলোনিবদ্ধ জীবনযাপন তুলনা করা যেতে পারে। এই পোকাদের বক্ষ ও উদরের মধ্যে সংকীর্ণ কোমর রয়েছে, রয়েছে দুই জোড়া স্বচ্ছ পাখা এবং একটি মজবুত হুল। এই পোকারা হলো বোলতা (Wasp), মৌমাছি (Bee) ও পিঁপড়া (Ant)। বোলতার জীবনক্রমের পর্যায়সমূহ লক্ষ করলে কলোনি জীবন কিভাবে বিকাশ লাভ করেছিলো তা বোঝা যায়। কতিপয় শিকারী বোলতা সমাজবদ্ধ বা কলোনিবদ্ধ জীবনযাপন করে না। ওরা স্বতন্ত্রভাবে জীবন কাটায়। স্ত্রী বোলতা পুরুষ বোলতার সাথে সঙ্গমের পর বাসা বানাতে শুরু করে। বাসা বানানোর উপকরণ হলো মাটি। বাসায় অনেক খোপ। প্রতি খোপে ডিম পাড়ে এবং খোপে খাদ্য হিসেবে অবশ করা মাকড়সা জড়ো করে। এরপর বাসা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। অন্য এক প্রজাতির বোলতাদের স্ত্রীরা বাসা ত্যাগ করে বটে কিন্তু বাসার পাশেই থাকে। ডিম থেকে শূককীট বেরোলে ওদের জন্য দিনের পর দিন খাবার সংগ্রহ করে আনে। আরেক প্রজাতিতে স্ত্রী বোলতা কেবল ওর জন্য বাসা তৈরি করে। তবে স্ত্রীদের তৈরি বাসাগুলো কাছাকাছিই থাকে। কয়েক সপ্তাহ পর কতকগুলো নিজেদের বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্যদের সাথে মিলেমিশে তাদের জন্যই বাসা বানায়। শেষ পর্যন্ত এই দলের একটি স্ত্রী বোলতা অন্যদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং একাই সব ডিম পাড়ে। সে সময় দলের অন্য স্ত্রী বোলতা বাসা নির্মাণ করে এবং ডিমপ্রসবিনী রাণী বোলতার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে।

মৌমাছিরাও কলোনিবদ্ধ জীবনযাপনের মূল ধারা অবলম্বনে সিদ্ধহস্ত। বরং এরা এতে আরো মাত্রা যোগ করে হাজার হাজার বছর ধরে কলোনি জীবনই যাপন করে চলেছে। রাণী একা মৌচাকে দিন গুজরান করে। কর্মী মৌমাছিদের নির্মিত প্রকোষ্ঠে রাণী ডিম পাড়ে। ডিমকে স্বাগত জানায় কর্মী মৌমাছি। ফেরোমন নামের রাসায়নিক এদেরকেও একই সূত্রে বাঁধে। ফেরোমনকে গোটা মৌচাকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মৌচাকের সকল সদস্য ফেরোমনবাহিত সব ধরনের খবর জানতে পারে। মৌচাকে রাণী আছে কি নেই সেই সংবাদও জানান দেয় ফেরোমন। কিন্তু মৌমাছিদের পরস্পরের সাথে যোগাযোগের অন্য পদ্ধতিও আছে। ওরা খাবারের খোঁজে যখন উড়ে চলে তখন উইয়ের মতো চলার পথে অন্য সদস্যদের জন্য কোনো গন্ধবার্তা রেখে যেতে পারে না বটে তবে ওরা নৃত্যের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে।

যখন একটি কর্মী মৌমাছি মৌসমৃদ্ধ সদ্য ফোটা ফুল দেখে মৌচাকে ফিরে তখন সেটি মৌচাকের প্রবেশ দ্বারে এক বিশেষ ধরনের নাচ প্রদর্শন করে। প্রথমে সে একটি বৃত্তের রেখা বরাবর ছুটি চলে দ্রুতবেগে। এরপর বৃত্তটাকে যেন নাচের মাধ্যমে এফোঁড় ওফোঁড় করে। এ সময় বিশেষ গুরুত্ব বোঝানোর লক্ষ্যে উদর প্রবলভাবে আন্দোলিত করে এবং উত্তেজনাকর

বিশেষ একধরনের ভোঁ ভোঁ আওয়াজ বের করে। সে খাদ্যের উৎসের দিকে ছোটার ভঙ্গি করে নির্দেশ বা সংকেত জানায়। অপর কর্মী মৌমাছিরা তার কাণ্ডকারখানা পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজেদের গন্তব্যে না গিয়ে খাদ্যের জন্য নির্দেশিত পথে উড়তে শুরু করে। নৃত্যরত কর্মী মৌমাছি তখন মৌচাকে ঢুকে এবং নির্দিষ্ট পথ ওড়ার পর আবার নাচতে শুরু করে। নির্দিষ্ট যে পথটুকু সে অতিক্রম করে খাদ্যের উৎস ফুলটিও ঠিক ততোটুকু দূরে অবস্থান করে। অরণ্য ও মৌপালকের ঘরে যে মৌচাক নির্মিত হয়, তার কোষগুলো খাড়াভাবেই নির্মিত হয়। কাজেই মৌমাছির নৃত্যগতি খাদ্য উৎসকে সরাসরি নির্দেশিত করতে পারে না। পরিবর্তে এরা সূর্যের গতিতে লক্ষ করায় প্রেরণা জোগায়। যদি মাছি বৃত্তকে লম্বভাবে পাড়ি দেয় তখন খাদ্য উৎসের অবস্থান হবে মৌচাক থেকে সূর্য বরাবর রেখার কোনো স্থানে। যদি এটি লম্বের ২০° ডিগ্রি ডান কোণে নাচে তাহলে খাদ্য উৎস সূর্য রেখার ২০° ডিগ্রি ডানে অবস্থান করবে। নৃত্যরত মৌমাছির চারপাশে পর্যবেক্ষণরত কর্মী মৌমাছিরা তাদের নৃত্যরত সাথীর অঙ্গভঙ্গি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তা স্মরণে রেখে ফুলের সন্ধানে বের হয়। ফুল থেকে মধু সংগ্রহের পর ওরাও আবার নাচতে শুরু করে যাতে, স্বল্প সময়ে মৌচাকের সকল কর্মী একজোট হয়ে নূতন উৎস থেকে মকরন্দ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।

বোলতা, মৌমাছি ও পিঁপড়ার আত্মীয়রা পোকামাকড়ের জগতে কলোনিবদ্ধ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অতি জটিল ও অত্যধিক বিবর্তিত রীতি প্রবর্তন করেছে। কেউ কেউ গাছের ভিতরে বাস করে। এরা পোষক গাছে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং স্ফীতকায় স্ফোটকের মতো আবাস গড়ে তুলে। বিশেষ গল কোষের সাহায্যেই এই আবাস নির্মিত হয়। সাধারণত গাছের ভিতরে ফাঁপা করে বা গাছের কাঁটার গোড়া ফাঁপা করে আবাসটি গড়া হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার লিফ কাটিং অ্যান্ট (Leaf cutting ant) বা পাতা কর্তনকারী পিঁপড়া মাটির বিশাল বাসা বানায়। বাসা থেকে বেরিয়ে ওরা গাছের ভিতরে বসে রাতদিন গাছের দৈর্ঘ্য জুড়ে সর্বত্র খনন কাজ চালায় এবং গাছের গুঁড়ি, ডালপালা ও পাতা ধ্বংস করে। গাছকে ছোট ছোট খণ্ডে কেটে ওরা বাসায় নিয়ে জড়ো করে। এই কাঠ ওদের আহার্য নয়। ওরা কাঠকে চিবিয়ে সারে পরিণত করে। তারপর সারের উপর একপ্রকার ছত্রাকের চাষ করে। সাদা ছত্রাকটির ফ্রুটিং বডি (Fruiting body) বা জননকারী দেহাংশই ওদের আহার্য হিসেবে গৃহীত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ট্রি অ্যান্ট (Tree Ant) বা গাছ-পিঁপড়া গাছের পাতা সেলাই করে বাসা তৈরি করে। এক ঝাঁক কর্মী পিঁপড়া দুটো পাতার আগা জোরে টেনে কাছে আনে। এক পাতার আগা ধরে চোয়াল দিয়ে এবং অন্য পাতার আগা ধরে পা বা উপাঙ্গ দিয়ে। পাতার ভিতরে থাকা অন্য কর্মী পিঁপড়াসমূহ পাতা দুটোকে সেলাই করতে শুরু করে। প্রাপ্তবয়স্ক পিঁপড়ার দেহ থেকে সুতা উৎপাদিত হয় না। কাজেই ওরা সেলাই এলাকায় তাদের শূককীটদের টেনে আনে। ওরা চোয়াল দিয়ে শূককীটের দেহে ধীরে ধীরে চাপ দেয়। ফলে শূককীটের দেহ থেকে সুতা বেরিয়ে পড়ে। এই সুতা দিয়েই ওরা সেলাই করে। সেলাই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেচারা শূককীটদের টানাহেঁচড়া চলে। অস্ট্রেলিয়ার হানিপট অ্যান্ট (Honeypot ants) বা মধুপাত্র পিঁপড়া মধু সংগ্রহ করে এবং তা জোর করে বিশেষ গোত্রের পিঁপড়াকে গিলতে বাধ্য করে। যে পর্যন্ত ওদের উদর দেহ সীমের দানার মতো আকার না পায় ততোক্ষণ গোলানো চলতে থাকে। ফলে উদরের ত্বক খুব পাতলা হয় এবং স্বচ্ছ দেখায়। এরপর কর্মীদল মধুর থলেবাহী এই পিঁপড়াকে মাটির নিচের আবাসস্থলে গ্যালারিতে ঝুলিয়ে

রাখে। দেহের সামনের দিকের উপাঙ্গে ভর করে ওরা ঝুলে থাকে। জীবন্ত এই মধুভাণ্ড ঝুলতেই থাকে দীর্ঘদিন। অধিকাংশ পিঁপড়া মাংসভুক। অনেক পিঁপড়া উই শিকার করে। উইয়ের ঢিবিতে চড়াও হয় এবং কর্মী উইয়ের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বিজয়ী পিঁপড়া তখন নিরস্ত্র কর্মী উই ও তাদের শূককীটকে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে। অপর কতকগুলো পিঁপড়া বিস্ময়করভাবে একধরনের সামাজিক আচরণ প্রদর্শন করে। সে আচরণটি হলো দাসপ্রথা প্রবর্তন। এরা বিভিন্ন ধরনের পিঁপড়াকে সেবাদাসে পরিণত করে। প্রভু পিঁপড়া অন্য পিঁপড়ার বাসায় হানা দেয় এবং মূককীট সংগ্রহ করে নিজের বাসায় নিয়ে আসে। মূককীট থেকে পিঁপড়া বের হয়ে আশ্রয়দাতা বা হানাদারের সেবা করতে বাধ্য হয়। আশ্রিতেরা খাদ্য সংগ্রহ করে প্রভুকে খাওয়ায়। হানাদার প্রভুর চোয়াল এতো বড়ো যে, তা দিয়ে প্রভু নিজের আহার নিজে মুখে তুলে নিতে পারে না।

সবচেয়ে মারাত্মক পিঁপড়ারা যাযাবরের জীবনযাপন করে। ওদের কোনো বাসা-বাড়ি নেই। এরা সবসময় শিকারের খোঁজে ঘুরে ফিরে দিন কাটায়। দক্ষিণ আমেরিকায় এদের সৈনিক পিঁপড়া বলে। আর আফ্রিকায় বলে চালরু পিঁপড়া। এরা সারিবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে চলে। সারি খুবই দীর্ঘ। একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়। সারির অগ্রে থাকে সেনাবাহিনী বা সংগ্রামী দল। সেনাদল পাখার আকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে খাদ্য লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে। তাদের পেছনে কর্মীরা শূককীট বহন করে। কর্মীবাহিনী ঝোপ-ঝাড় ছেড়ে যখন খোলা জায়গা দিয়ে চলে তখন সতর্ক পাহারায় থাকে সেনাবাহিনী। সেনাদের চোয়াল বড় আকারের এবং এরা অন্ধ। বিপদের সময় সেনারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। শক্তভাবে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে এবং চোয়াল ফাঁক করে কামড়ানোর প্রস্তুতি নেয়। বাধা পেলেই কামড়াতে শুরু করে। সারির পুরোভাগে শিকারের সন্ধান মিললে, এক জোটে সবাই শিকারের উপর চড়াও হয় এবং শিকারকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। ঘাস ফড়িং, বৃশ্চিক, টিকটিকি, পাখির ছানা ইত্যাদি কোনোটাই ওদের হাত থেকে নিস্তার পায় না। পশ্চিম আফ্রিকায় কোনো ব্যক্তি যদি কোনো জন্তুকে গলায় বা পায়ে রশি বেঁধে চড়তে দেয় তাহলে জন্তুটি এসব দস্যুর কবলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আমি একবার পশ্চিম আফ্রিকায় বেশ কিছু সাপ সংগ্রহ করেছিলাম। সাপের মধ্যে ছিলো গ্যাবন (Gabon), ভাইপার (Viper), পাফ এডার (Puff Adder), স্পিটিং কোবরা (Spitting Cobra), ট্রি স্নেক (Tree Snake) ও অজগর (Python)। আমরা সাপগুলোকে মাটির দেওয়ালঘেরা ঘরে রেখে দিয়েছিলাম। ঘরের বাইরে পাহারার ব্যবস্থা ছিলো। পাহারাদারের কাছে রাখা হয়েছিলো মোমের ঢিব্বা। মোম মাটিতে ফেলে আগুন ধরিয়ে পিঁপড়া তাড়ানোই ছিলো উদ্দেশ্য। এতোসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও এক বিকেলে সকলের চোখের অন্তরালে দেওয়ালের পেছনে একটি গর্ত খুঁড়ে এক ঝাঁক পিঁপড়া সাপের ঘরে ঢুকে পড়ে। ইতোমধ্যে ঘরের ভিতরে দাপাদাপি শুনতে পাই। দেখা গেলো, পিঁপড়েরা সব সাপকে আক্রমণ করেছে। সাপগুলো রাখা ছিলো জালে কাপড়ের ঢাকা বাক্সে। কামড়ের ব্যথায় অতিষ্ট হয়ে সাপেরা এই ক্ষুদে শয়তানদের পাগলের মতো ছোবল হানতে থাকে। যদিও তা ছিলো নিষ্ফল চেষ্টা। এই অবস্থায় একে একে সব সাপ বের করে আনা হয় এবং ওদের শরীর থেকে টেনে টেনে পিঁপড়া সরাতে হয়। পিঁপড়া সাপের আঁইশ ফাঁক করে করে মাংসে কামড় বসিয়েছিলো। এতো যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কিছু সাপ মারা পড়ে।

পাখার আকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেনা পিঁপড়ার দল দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলতেই থাকে। শূককীট ফেরোমন উৎপাদন করে। ফেরোমন সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ফেরোমন ওদের চাঙ্গা করে। চাঙ্গা দেহ নিয়ে ওরা চলতে থাকে। কর্মীদের বহন করা ওসব শূককীট মূককীটে পরিণত হয়। তখন ফেরোমন উৎপাদন বন্ধ হয়। এ সময় ওরা খোলা জায়গায় রাত্রি বাস করে। দলে ওরা সংখ্যায় দেড় লক্ষের উপর। গাছের দুটি মূলের মধ্যে বা ঝুলন্ত পাথরের নিচে ওরা বিশাল বলের মতো হয়ে জড়ো হয়। আসলে এটি একটি বলের আকৃতিতে জীবন্ত বাসা। একে অপরের সাথে যুক্ত হয় ঝুলে থেকে এই রকম বাসা বানায়। বাসায় চলালের জন্য পথ থাকে। রাণী সে পথ দিয়ে যায় আসে। রাণী বাসার মধ্যে শূককীট রাখে। রাণীর ডিম্বাশয় এ সময় বিকশিত হতে থাকে এবং এর দেহ বেশ ফুলে উঠে। সপ্তাহখানেক পরে রাণী ডিম পাড়তে শুরু করে। কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় ২৫,০০০ ডিম পাড়ে। ডিম থেকে খুব দ্রুত শূককীট বের হয়। শূককীটদের একাংশ কর্মী ও অপরাংশ সেনা পিঁপড়ায় পরিণত হয়। শূককীট সে সাথে ফেরোমনও উৎপাদন করে। ফেরোমনের প্রভাবে এবং নবসংযোজিত কর্মী ও সেনা লাভ করে দল আরো চাঙ্গা হয় এবং আবার যুদ্ধাভিযানে চলতে থাকে।

এন্টেলোপের ভারি শিঙের সঙ্গে উইয়ের ঢিবি ও কলোনির তুলনা যদি যথার্থ বিবেচিত হয় তাহলে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ হয়ে চলা আক্রমণাত্মক সেনা পিপঁড়াকে শিকারী জন্তুর সাথে তুলনা করা যায়। ক্ষুধার্ত পিঁপড়া অবিরাম নিরলস খাদ্য অন্বেষণে রত এবং অধিকাংশই প্রাণী হত্যায় সক্ষম। প্রাণীরা দৌড়েও ওদের গ্রাস থেকে নিস্তার পায় না। এরা জঙ্গলে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করে। আলাদা করে দেখলে ওরা আকারে ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্রত্ব তাদের জন্য কোনো সমস্যা নয়। হাজার হাজার পিঁপড়া মারা পড়লেও গোটা বাহিনীর শৌর্যবীর্যে ঘাটতি হয় না। সবগুলো পিঁপড়াকে একটা ইউনিট হিসেবে কল্পনা করলে ইউনিটটাকে একটা বড়ো জীবের সাথে তুলনা করা যায়। কল্পিত এই জীবটি সবার চেয়ে শক্তিধর। সবার জন্য ভয় উদ্রেককর এবং সবার চেয়ে দীর্ঘজীবী।

মেরুদণ্ডীদের স্থলজয়ের আগেই পতঙ্গরা স্থলভাগে কলোনি স্থাপন করে। এখনো ওরা স্থলভাগের সব কিছুকে ভোগ করছে। এমন কোনো উদ্ভিদ নেই যেটি কোনো না কোনোভাবে ওদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে মানুষের বোনা ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ যায় ওদের পেটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শস্য রক্ষার জন্য আধুনিক ব্যবস্থা আছে পর্যাপ্ত, কিন্তু সেখানেও শতকরা দশ ভাগ ফসলে ওরা ভাগ বসায়। তুলার ক্ষেত্রে বল উইভিলের আক্রমণে ধনকুবেরদের ব্যাংকে লাল বাতি জ্বলে। কলোরেডোতে গুবরে জাতীয় পোকা আলু ক্ষেত ধ্বংস করে এবং মানুষকে উপোস দিতে হয়। পোকা কেবল মানুষের খাদ্য লুঠ করে না। রক্ত চুষে এবং মানুষের দেহে রোগ সংক্রমণ ঘটায়। মানুষ প্রতিরোধ গ্রহণের জন্যে অনেক উপায় আবিষ্কার করেছে। মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে ওদেরকে আক্রমণ করে। মানুষ আগুন জ্বালিয়ে ওদের পুড়িয়ে মরে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে পুরুষ পোকাকে নির্বীজ করে নির্বীজ পুরুষ পোকাদের ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী পোকাদের প্রজনন রোধ করে কয়েক প্রজন্ম ধরে। মানুষ সংশ্লেষণের দ্বারা নূতন নূতন রাসায়নিক বিষ তৈরি করে এবং ওদের উপর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়। অসংখ্য পোকা-মাকড় বিষের প্রভাবে মারা পড়ে। এতো সব প্রয়াস ও উদ্ভাবন সত্ত্বেও, এতো শ্রম ও অর্থব্যয় করেও মানুষ অদ্যাবধি মাত্র একটি পতঙ্গ প্রজাতিকেও পৃথিবী থেকে নিঃশেষ করতে পারেনি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জলজয়ী প্রাণী

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, সমুদ্রে ভাটার সময়, জেলিফিশের, সি এনিমোন বা সমুদ্র সজারু পরিবারের অনেক সদস্য, বিভিন্ন ধরনের অনাবৃত শিলাখণ্ডে ভেলার মতো নিস্তেজ অবস্থায় লেগে থাকতে দেখা যায়। কেউ যদি ভেলা হাতে নিয়ে চাপ দেয় তাহলে সমুদ্র সজারুর দেহের কেন্দ্র থেকে সামান্য জলে টপটপ ঝরে পড়ে। আবার অন্য কোনো প্রাণীর উপর কেউ যদি মাড়িয়ে যায়, তবে পিচকারী-বেগে জল ফোয়ারার মতো বেরিয়ে পা ভিজিয়ে দেয়। এই কাণ্ড লক্ষ করে আকৃতিহীন এসকল ভেলাকে সমুদ্র ফোয়ারা বলা হয়ে থাকে। জলের নিচে সমুদ্র সজারু ও সমুদ্র ফোয়ারার পার্থক্য সহজে ধরা যায়। সমুদ্র সজারুর দেহের কেন্দ্রীয় একমাত্র দ্বারের চারপাশে ফুলের মতো এক গুচ্ছ কর্ষিকা থাকে। সমুদ্র ফোয়ারায় কর্ষিকা নেই এবং এর দেহে দুট দ্বার থাকে। দ্বারদুটি ইউ-আকৃতির একটি নল দ্বারা যুক্ত। পুরো দেহ পুরু জেলীর আবরণের মধ্যে থাকে। জলের নিচে স্ফীত, অস্বচ্ছ এই থলেটি সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ইউরোপের একটি ফোয়ারা প্রজাতির প্রাণীর দেহ স্বচ্ছ। এর দেহের প্রতি দ্বার ঘিরে ছায়াঘন নীলাভ কম্পমান ছোট ছোট বৃত্তরাজি এবং ভিতরের টিউবে পেশি বলয় রয়েছে। পেশি বলয় টিউবটিকে মজবুত করে। এসবের সমাবেশের ফলে প্রাণীটিকে ভিনিশ দেশীয় কাচের ভিতরকার বুদবুদের মতো দেখায়। অপর এক ফোয়ারা প্রজাতির জেলীর আবরণ অস্বচ্ছ এবং এর বর্ণ পিঙ্গল বা সোনালি। কতকগুলো আঙুরের মতো গুচ্ছে গুচ্ছে জন্মায়। আবার অন্যগুলো অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের। লম্বাটে ধরনের এই প্রাণীগুলো একক জীবন নির্বাহ করে।

এই প্রাণীরা ছাঁকুনি খাদক (filter feeder) অর্থাৎ এরা পরিস্রুত খাদ্য গ্রহণ করে। এরা নলের এক দ্বার দিয়ে জল টেনে নেয় এবং একটি থলের মধ্যে দিয়ে তা প্রবাহিত করায়। থলেটি সচ্ছিদ্র। থলে থেকে জল অন্য নল দিয়ে পুনরায় সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। থলেতে লেগে থাকা খাদ্যবস্তু সিলিয়া দ্বারা তাড়িত হয়ে থলের তলায় জমা পড়ে। থলের তলার সাথে একটা ছোট অন্ত্র যুক্ত থাকে। অন্ত্র বেঁকে গিয়ে বহির্বাহী নলের সাথে মিশে।

সরল দেহের এই প্রাণী সাদাসিধে জীবনযাপন করে। কিন্তু বেশ জটিল দেহের প্রাণীরা এদের আত্মীয়। এদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সাথে একাইনোডার্ম বা কণ্টকত্বকী প্রাণীদের সংযোগ ছিলো। কিন্তু এদের নিকট আত্মীয়রা, খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে, মেরুদণ্ডী বা শিরদাঁড়াবিশিষ্ট প্রাণীদের পূর্বপুরুষ। প্রাপ্তবয়স্ক সমুদ্র-ফোয়ারার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে প্রমাণ হাজির করা খুব কঠিন। কিন্তু এই প্রমাণ মেলে সমুদ্র ফেয়ারার শূককীটে। এদের শূককীট দেখতে ছোট ব্যাঙাচির মতো। শূককীটের গোলাকৃতির পুরোভাগে ইউ-নল ও অন্ত্রের চিহ্ন দেখা যায়। এর পুচ্ছের শেষ প্রান্ত থেকে দেহের মধ্যাংশ পর্যন্ত একটি সরু রড থাকে। মজবুত পুচ্ছ দিয়ে একেঁ বেঁকে ওরা জলে সাঁতার কাটে। এই রডকে কেউ কেউ

মেরুদণ্ড বলতে চান যদিও শূককীটের দেহে তা ক্ষণস্থায়ী। মাত্র কয়েকদিন পর ক্ষুদ্র এই প্রাণী শিলাখণ্ডে "নাক", তারপর পুচ্ছ খসিয়ে স্থায়ী মন্থর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরিস্রুত খাদ্যগ্রহণ করে।

সমুদ্র-ফোয়ারার শূককীটই কেবল একমাত্র ছাঁকুনি খাদক নয় পৃষ্ঠদেশে গুরুত্বপূর্ণ রড থাকে। এদের চেয়ে কিছুটা বড়ো রূপালি বর্ণের ল্যান্সলেট-এর একটা রড থাকে। কৃশকায় পাতার আকৃতির ল্যান্সলেট দৈর্ঘ্যে ৬ সেন্টিমিটার। সমুদ্র তলদেশের বালিতে এরা শরীরকে অর্ধেক ডুবিয়ে রাখে। যে অংশ বালির উপরে থাকে তার দ্বারপ্রান্তের চতুষ্পার্শ্বে ছোট মুকুটের মতো করে কর্ষিকাসমূহ সাজানো থাকে। এই দ্বার দিয়ে ওরা জল শোষণ করে। ল্যান্সলেট-এর দেহও সরল। যুক্তিসম্মতভাবে ওদের দেহে মাথা আছে এমনটি বলা যাবে না। তবে ক্ষুদ্র একটি আলোকসংবেদী বিন্দু থাকে। হৃৎপিণ্ড নেই। কেবল কতকগুলো কম্পনশীল ধমনি থাকে। পাখনা বা উপাঙ্গ নেই। দেহের পশ্চাৎপ্রান্ত একটু প্রশস্ত। একটি তীরের পশ্চাৎপ্রান্ত পালক শোভিত করার ফলে যেমনটি দেখায় এদের পশ্চাৎপ্রান্তও দেখতে সেরূপ। তবু এই সরল গঠনের প্রাণিদেহে মাছের দেহের কিছু কিছু আলামত দেখা যায়। দেহের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে নমনীয় রড থাকে। রডের দু'পাশ আড়াআড়িভাবে থাকা পেশির সাথে যুক্ত থাকে। নিয়মিত ছন্দে প্রাণিদেহ যখন সংকুচিত হয় তখন দেহ জুড়ে তরঙ্গপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। ফলে জল ধাক্কা খেয়ে পেছনে যায় এবং ল্যান্সলেট সামনে এগোয়। এভাবে ল্যান্সলেট সাঁতার কাটে।

পারিবারিক সম্পর্ক নিরূপণের সময় প্রাপ্তবয়স্কের মতোই শূককীটের শারীরবিদ্যা বা অভ্যন্তরীণ গঠনকে অবশ্যই প্রমাণ হিসেবে সার্বিক বিবেচনা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এ পর্যায়টি অনেক বেশি গুরুত্ববহ। কারণ, বিবর্তনের ইতিহাসে এদের পূর্বপুরুষরা যে সমস্ত পর্যায়ে অতিক্রম করেছে, প্রাণীদের মধ্যে তাদের স্বতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রেও সমস্ত পর্যায় পুনরায় অতিক্রমণের প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে লক্ষ করা যায়। উইপোকার শূককীটদের অতি প্রাচীন পতঙ্গ ব্রিসলটেইলের মতো দেখায়। হর্স শু ক্র্যাবের শূককীটের দেহ বাইরে থেকে দেহখণ্ডে বিভক্ত দেখায় যা ট্রাইলোবাইটের দেহখণ্ডের সদৃশ। অথচ প্রাপ্তবয়স্ক ক্র্যাবে তা দেখতে পাওয়া দুষ্কর। মুক্ত সন্তরণশীল মোলাস্কান বা শামুকজাতীয় প্রাণীর শূককীট দেখতে দেহখণ্ডবিশিষ্ট কৃমির মতো। ফলে এই দুটো দলের মধ্যে যোগসূত্র আছে বোঝা যায়। কাজেই ল্যান্সলেট ও সমুদ্র-ফোয়ারার শূককীটের মধ্যে সাদৃশ্যকে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু কোন্ গঠনটি প্রাচীন? এটা কি সমুদ্র ফোয়ারার মতো কোনো প্রাণী ছিলো যাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো স্থায়ী জীবননির্বাহ পদ্ধতি ত্যাগ করেছিলো এবং সে সময় পর্যন্ত শূককীট পর্যায়ে প্রজনন করেছিলো এবং ঐ প্রাণী থেকে অধিক গমনশীল ল্যান্সসেটজাতীয় প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছিলো? অথবা নাকি ল্যান্সসেট গঠন পদ্ধতিই অধিক প্রাচীন যাদের থেকে শিলায় মুখ গুঁজে লেগে থাকা, মাংশপেশিহীন সমুদ্র-ফোয়ারাদের বিকাশ ঘটেছিলো। সমুদ্রের সাথে সংগ্রামে পরাজিত হয়েই কি চলাচলে সক্ষম প্রাণীরা পুনরায় স্থানুজীবন বা স্থায়ীজীবন নির্বাহ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলো?

বহু বছর ধরে প্রথম অনুমানকে সঠিক মনে করা হতো। বর্তমানে পুরো সমুদ্র-ফোয়ারা গ্রুপের তুলনামূলক গবেষণার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে দ্বিতীয় অনুমানই সঠিক। সমুদ্র-ফোয়ারা দলটি বেশ বড় ও বিচিত্র। এখন, অতিসম্প্রতি কানাডার শিলাপর্বতে বার্জেস শেইলে প্রাপ্ত বিস্ময়কর আদি জীবাশ্ম দেখে প্রকৃতভাবে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেছে-

BANGDOO Library

দ্বিতীয় অনুমানই সঠিক। ৫৫ কোটি বছর পূর্বেকার সাগর-কর্দমে পাখনা ও মেরুদণ্ডবিশিষ্ট সাঁতারু প্রাণীর অস্তিত্ব দেখা না গেলেও, ট্রাইলোবাইট, ব্র্যাকিওপড, ব্রিসল ওয়ার্ম ইত্যাদির সঙ্গে বর্তমানে জীবিত ল্যান্সসেটের মতো প্রাণিদেহের ছাপ দেখতে পাওয়া গেছে।

অপর একটি শূককীট মেরুদণ্ডী প্রাণীর ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ের প্রমাণ হাজির করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার নদীসমূহে ল্যাম্প্রেলেটের মতো প্রাণী রয়েছে। তবে এগুলো আকারে আরো বড়ো। দৈর্ঘ্য ২০ সেমি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরাও কাদার গর্তে বাস করে এবং পরিস্রুত খাবার খায়। এদের চোয়াল নেই। পাখনা নেই, পুচ্ছের কাছে একটু পাখনার মতো অংশ আছে। এরা অন্ধ। বহু বছর যাবৎ এদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণী ভাবা হতো এবং এদের বিশেষ নাম রাখা হয়েছিলো এমোসিট। এদেরকে ল্যান্সসেটের আত্মীয় হিসেবে শ্রেণিবিভক্তিতে গণ্য করা হতো। পরে আবিষ্কৃত হলো যে, এরা পরিচিত প্রাণীর শূককীট বই অন্য কিছু নয়। শেষপর্যন্ত এরা গর্ত পরিত্যাগ করে। এদের দেহে সত্যিকারের চোখ ও পিঠের দৈর্ঘ্য বরাবর দীর্ঘ ঢেউ তোলা পাখনা সৃষ্টি হয়। ওরা ক্রমে বড় হয়ে দলের আকার পায় এবং ল্যাম্প্রে-তে পরিণত হয়।

প্রথম দর্শনেই, আপনি যদি ল্যাম্প্রেকে সত্যিকারের মাছ মনে করেন, তবে আপনাকে ক্ষমা করা যাবে। এর দেহে এক প্রকারের মেরুদণ্ড আছে। মেরুদণ্ডটি নমনীয় একটি রডের মতো। কিন্তু এর চোয়াল নেই। এর মাথা বর্তুলাকৃতির চাকতির মতো অংশে গিয়ে শেষ হয়। চাকতির কেন্দ্রে থাকে জিহ্বা। জিহ্বা কাঁটা দ্বারা আবৃত। দুটো ছোট চোখ থাকে। দুই চোখের মাঝখানে রয়েছে একটি নাসারন্ধ্র। নাসারন্ধ্র একটি বদ্ধ থলেতে গিয়ে শেষ হয়। ঘাড়ের দু'পাশে থাকে ফুলকা রন্ধ্রসমূহ। ল্যাম্প্রে চাকতির সাহায্যে মাছের মাংস আঁকড়ে ধরে থাকে এবং জিহ্বা দিয়ে মাছের মাংস ছিঁড়ে খায়। জীবন্ত মাছই ওরা খেতে থাকে। ল্যাম্প্রে ও পুরো জীবনকাল সমুদ্রে বসবাসকারী ল্যাম্প্রের আত্মীয়বর্গ, হ্যাগফিশকে এখনো সর্বত্র পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে আমেরিকার নদীসমূহে এদেরকে বিস্তর সংখ্যায় দেখা যায়। বিশাল সংখ্যক ল্যাম্প্রে চড়াও হয়ে কেবল মরা ও দুর্বল মাছ নয়, সুস্থ সবল মাছও ধ্বংস করে। প্লেগ মহামারীতে যেমন অসংখ্য লোক মারা যায়, ল্যাম্প্রে সৃষ্ট মহামারীতেও তেমনি অসংখ্য মাছের মৃত্যু ঘটে। ছোট ছোট চোখ, রবারের মতো চোষক মুখ ও মোচড়ানো দেহের ল্যাম্প্রে মানুষের দৃষ্টিতে কদাচিৎ আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। এরা দৃষ্টি আকর্ষক বা সমীহ আদায়কারী প্রাণী হিসেবে গণ্য হয়। কারণ এদের পূর্বপুরুষরা একদা সমুদ্রের অতি অগ্রগামী ও বিপুবী প্রাণী ছিলো। ৫৪ কোটি বছর আগের শিলায় এদের দেহাবশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শিলা বার্জেস শেইল শিলার সমসাময়িক। এ সকল নব আবিষ্কৃত প্রমাণসমূহের মধ্যে কেবল দেহের ভগ্নাংশই পাওয়া গেছে। কিন্তু এদের শনাক্ত করা যাবে কারণ পরবর্তীকালের শিলাসমূহে এদের পুরো কংকাল লভ্য হয়েছে।

এসব চোয়ালহীন প্রাক-মাছসমূহের অধিকাংশ আকারে ছোট এবং দেহ বহুল শস্ত্রমণ্ডিত। আকারে বড় আকারের পুঁটির মতো। কতকগুলোতে পুরো মাথা ও দেহ হাড়ের প্লেট গঠিত বর্মের মধ্যে আবদ্ধ। বর্মের পুরোভাগে ল্যাম্প্রের মতো দুটো চোখ ও একটি নাসারন্ধ্র থাকে। বর্মের পশ্চাৎভাগে পেশিবহুল একটি পুচ্ছ থাকে। পুচ্ছে থাকে পাখনা। পুচ্ছ তাড়া করে জলের মধ্যে দিয়ে চলতে পারতো কিন্তু দেহের পুরোভাগে ভারী বর্ম থাকায় এদের মাথা নিচু হয়ে থাকতে বাধ্য হয় এবং সমুদ্রের তলদেশে পড়ে থাকে। যদিও একটি বা দুটি

প্রজাতির প্রাণীর স্কন্ধদেশে বাড়তি ত্বক পাখনার মতো কাজ করে। কিন্তু অধিকাংশ প্রাণীতে আলো পাখনা নেই। সুষ্ঠুভাবে সাঁতার কাটা বা জলে ওদের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুচ্ছ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গের সাহায্য ওরা পায় না। কাজেই, হাতে গোনা কয়টি প্রাণী প্রাথমিকভাবে সমুদ্র তলদেশে সর্বক্ষণ সাঁতারে সক্ষম হয়। সমুদ্রের এই অঞ্চলে জেলী ফিশ ও অন্যান্য ভাসমান অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রাজত্ব। এই চোয়ালহীন প্রাক-মাছ খোলকবিশিষ্ট শামুকজাতীয় প্রাণী শিকার করতে পারে না। সমুদ্রের তলায় কাদার মধ্যে নাক ঘষে চলা, কাদা চোষণ করা এবং চাকতির মতো মুখ দিয়ে কাদা বর্জন করাই ওদের ললাট লিপি। কাদার মধ্যে থাকা খাদ্য ওরা ছেঁকে নেয় এবং গলার দুপাশে থাকা ফুলকা রন্ধ্র দিয়ে বর্জ্য নিষ্কাশন করে।

যাহোক, ক্ষুদ্র প্রাক-মাছ টিকে গেলো এবং সংখ্যায় ও নানান আকৃতিতে বাড়তে লাগলো। খাদ্য থেকে আহৃত খনিজলবণ ওদের শরীরে জমা হয় এবং তা শরীর থেকে বেরিয়ে সম্ভবত ওদের ভারী বর্মপ্লেট (armour plate)গঠন করে। বর্মপ্লেট তাদের শরীরের রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। কেননা, সে সময় দুই মিটার লম্বা ও ভারী চোয়ালবিশিষ্ট বিশাল দেহের নিষ্ঠুর সমুদ্র-বিচ্ছুরা সাগর তোলপাড় করছিলো এবং সমুদ্র তলদেশের ছোট প্রাণীদের খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছিলো।

কতিপয় প্রাক-মাছের মাথার অংশে বিস্তর হাড় জমা পড়েছিলো বিধায় এদের এনাটমী বা শারীরবিদ্যা বিষয়ে ব্যাপক তত্ত্বতালাশ সম্ভব হয়েছিলো। অশ্মীভূত প্রাক-মাছের করোটির অনেকগুলো টুকরো নিয়ে, এসবের মধ্যে স্থিত প্রকোষ্ঠসমূহের আকৃতি আঁকা হয়েছিলো। প্রকোষ্ঠের, মধ্যে স্নায়ু ও রক্তনালি পাওয়া যায়। এই গবেষণা প্রমাণ করে যে, এই ধরনের প্রাণীদের একটি দলের মধ্যে বর্তমানে জীবিত ল্যাম্প্রের মস্তিষ্কের অনুরূপ মস্তিষ্ক ছিলো। এদের মাথায় দেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গেরও সমাবেশ ছিলো। মস্তিষ্কের লম্বভূমিতে সমকোণে দুটো নল ছিলো। এই দুটো নল ভারসাম্য রক্ষা করতো। নলের ভেতরের তরল পদার্থ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে স্পর্শকাতর অংশে নড়াচড়ার মাধ্যমে প্রাক-মাছকে জলে তার অবস্থানের ভঙ্গি বিষয়ে বোধ সঞ্চার করতো। জীবিত ল্যাম্প্রের মস্তিষ্কে অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাক-মাছেদের কোনো কোনোটি দৈর্ঘ্যে ৬০ সেন্টিমিটারও লম্বা ছিলো। এদের অধিকাংশই বেশ ঘুরে বেড়াতে পারতো এবং সম্ভবত সমুদ্রতলের বেশ উপরে হঠাৎ দ্রুতবেগে উঠে আসতো। এদের দেহ আঁইশে আবৃত ছিলো । অবশ্য, এদের কোনোটিকে দক্ষ সাঁতারু বলা যাবে না। ওদের দেহের পৃষ্ঠদেশের মধ্য-রেখা ও অঙ্কভাগের মধ্যরেখা বরাবর মধ্যপাখনা প্রলম্বিত ছিলো যা দেহকে জলে পাক খাওয়ায় বাধাদান করতো। তবে মধ্যপাখনা ওদেরকে জলে স্থির একভাবে অবস্থান করায় সহায়তা দিতো। এদের কারো পার্শ্বপাখনা ছিলো না।

শত শত কোটি বছর ধরে এ অবস্থা চলছিলো। ব্যাপক এই সময়সীমার মধ্যে প্রবাল গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে এবং এরা প্রবাল প্রাচীর গড়ে তোলা শুরু করে, এবং দেহখণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীরা এমন গঠন লাভ করে যাতে ওরা সমুদ্র পরিত্যাগ করে স্থলভাগে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এরা জল ও স্থলে সেতু হিসেবে আদৃত হয়। প্রাক-মাছেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। জল পরিস্রুত করার অঙ্গ হিসেবে উদ্ভূত গলদেশের রন্ধ্রগুলোর প্রাচীরে রক্তনালি দেখা যায়। ফলে রন্ধ্রগুলো ফুলকা রূপে কাজ করায় সক্ষমতা লাভ করে। দুই ফুলকার

মধ্যেকার মাংশপেশি হাড়ের রডদ্বারা মজবুত ও দৃঢ় হয়ে ওঠে এবং হাজার হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে প্রথম জোড়া হাড় মুচড়িয়ে সামনের দিকে বেরিয়ে আসে। এগুলোর চতুষ্পার্শ্বে পেশি সৃষ্টি হয়। ফলে হাড়ের অগ্রপ্রান্ত উপর-নীচ ওঠা-নামা করতে পারে। এভাবে প্রাণীতে চোয়ালের সৃষ্টি হয়। ত্বকের আবরণকারী হাড়-গঠিত আঁশসমূহ আকারে বড় হয় ও তীক্ষ্ণ হয়। এগুলো থেকে দাঁত গড়ে ওঠে। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট সমুদ্রের এই প্রাণীরা এখন কেবল কাদায় ধীরলয়ে চলে না বা জল ছেঁকে খাদ্যও গ্রহণ করে না। এ সময় এরা কামড় দিতেও সক্ষম হয়ে ওঠে। ওদের দেহের পশ্চাৎভাগের দুপাশ থেকে ত্বক প্রসারিত হয়। প্রসারিত পাখনাবৎ এই ত্বক জলের মধ্যে ওদের গতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা দান করে। এই প্রসারিত ত্বকই ক্রমে পাখনায় পরিণত হয়। এ পর্যায়ে ওরা সাঁতারে দক্ষতা অর্জন করে। কাজেই প্রথমবারের মতো মেরুদণ্ডী এই শিকারী প্রাণীরা সমুদ্রে নিপুণতার সাথে ও সুচারুভাবে চলাচলে দক্ষ হয় ওঠে।

চল্লিশ কোটি বছর আগে, সমুদ্রের বালুকাবেলয় প্রাণীর হাঁটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা যে অঞ্চলটির নাম গোগো বলে অভিহিত করে সে অঞ্চলের খুব নিকটে উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার গোচারণ ক্ষেত্র রয়েছে বিস্তীর্ণ এক মরুভূমিতে। সেই সমতল মরুভূমির পাশে রয়েছে ৩০০ মিটার উঁচু খাড়া শিলার পাহাড়। এটি এক বিস্ময়কর ঘটনা। ভূতত্ত্ববিদরা, এ অঞ্চলের মানচিত্র এঁকে অনুসন্ধান চালান। ভূমিক্ষয়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এ ধরনের শিলা গঠনের বিষয়টি অনুধাবন করতে তাঁরা বেশ বেগ পান। যখন তাঁরা এই ধোঁয়াশার রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিশদ প্রয়াস নেন, তখন তাঁরা এই শিলা প্রবাল গঠিত দেখতে পান। একসময় এই অঞ্চল সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত পাহাড়গুলো ছিলো প্রবাল গঠিত। প্রবাল পর্বতের পাদদেশে ছিলো মাছ ভর্তি উপহ্রদ। স্থলভাগ থেকে নদীসমূহ পেছন থেকে এসে উপহ্রদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিলা। নদীর জল ছিলো কর্দমাক্ত। কর্দমাক্ত জলে প্রবাল জন্মাতে পারে না। ফলে দুই প্রবাল পর্বতের মাঝখানে ফাঁক পড়ে গেছে। উপহ্রদগুলো ধীরে ধীরে পলি জমে ভরাট হয়ে যায়। ফলে সমুদ্র সরে যায় এবং চর জেগে উঠে। এভাবে পুরো অস্ট্রেলিয় মহাদেশ সমুদ্র থেকে জেগে উঠে। বৃষ্টি ও নদীর প্রবাহ উপহ্রদের জমে থাকা নরম বালিপাথর ক্ষয় করে ক্রমে তা ঘষে ঘষে উঠে যাওয়ায় প্রবাল পবর্তগুলো ভেসে উঠতে থাকে। পবর্তসমূহ ছিলো উঁচু ও শুষ্ক। এখন সে পর্বতগুলো সমুদ্র থেকে দূরে মরুভূমি খেঁসে অবস্থিত। পর্বতের শিলার কাঁটা ঝোপঝাড়ে, ঘাস ও মুলগা নামের গাছগাছাড়ায় আবৃত। পর্বতের গোড়ায় এককালে যেখানে সমুদ্রের তলদেশ ছিলো সেখানে ছোট ছোট মাটির ভেলা শায়িত দেখা যায়। কোনো কোনো ভেলা থেকে সরু সরু হাড় বেরিয়ে বেড়িয়ে থাকে। উপহ্রদের মৃত মাছের দেহাবশেষ শিলীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া এখানে ধরা পড়ে। অশ্মীভূত মাছেদের চতুষ্পার্শ্বের বালি ও কাদা শক্ত হয়ে গেছে এবং অন্যান্য জমাকৃত পদার্থগুলো গুঁড়িয়ে গেছে। ভূতত্ত্ববিদেরা মাটির ভেলা গবেষণাগারে নিয়ে অ্যাসেটিক অ্যাসিডে কয়েকমাস চুবিয়ে রাখেন। ক্রমে শিলা গলে যায় এবং বিস্ময়করভাবে মাছের প্রথম অবিকৃত পূর্ণ কংকাল আবিষ্কৃত হয়। এরাই পৃথিবীর আদিকালের সত্যিকারের মাছ।

বহু প্রজাতির মাছ ছিলো। এদের অধিকাংশই পূর্বসূরিদের মতো শস্ত্রসজ্জিত ছিলো। ত্বকের হাড়ের প্লেটের সাথে ভারী আঁশ যুক্ত তো ছিলোই, তদুপরি চোয়ালে ছিলো ভীতিজনক দাঁত। এ ছাড়া দেহের অভ্যন্তরে হাড়ের কাঠামো গড়ে উঠছিলো এবং দেহের লম্ব বরাবর নমনীয় রডের চতুষ্পার্শ্বে গড়ে উঠছিলো শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড। সব প্রজাতির প্রাণীতে

পার্শ্বপাখনা বেশ বিকশিত হয়েছিলো। পার্শ্বপাখনা ছিলো দুই জোড়া। বক্ষপাখনা জোড়া ছিলো গলার ঠিক পেছনে এবং পায়ুর কাছে পায়ুপাখনা জোড়া। অবশ্য এদের অঙ্গসংগঠনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ছিলো। এক প্রকার মাছের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে পার্শ্বপাখনা বিস্তৃত ছিলো। অন্যদের বক্ষপাখনা নলসদৃশ হাড়ে আবৃত ছিলো। দেখতে অনেকটা ডাক্তারের প্রোব-যন্ত্রের মতো। এদের কোনোটি ছিলো সমুদ্রের তলদেশবাসী, কোনোটি অবাধ মুক্ত সন্তরণশীল। কোনোটি আকারে বিশাল দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০৭ মিটার। প্রতিযোগিতার এই কালে চোয়ালহীন প্রাক-মাছেদের অনেকগুলো মারা পড়ে যায়।

এই সময়কালেই, মাছের রাজ্যে ভাঙন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি দলের মাছ দেহ থেকে সমস্ত হাড় খুইয়ে বসে এবং দেহে হাড়ের চেয়ে নরম, অধিক নমনীয় ও হালকা, তরুণাস্থি (cartilage) অর্জন করে। এদের উত্তরসূরিরা হলো হাঙ্গর ও রে জাতীয় মাছি। হাড় কমে যাওয়ায় পূর্বপুরুষদের তুলনায় এদের দেহ হালকা হয় অথচ আকারেও সমান থাকে। তবু মাংস ও তরুণাস্থি জলের চেয়ে ভারী বটে। সমুদ্র তলদেশের উপরে থাকার প্রয়োজনে হাঙরদেরকে সাঁতার কাটতে হতো। এরা তাদের পূর্বপুরুষদের কায়দায় সাঁতার কাটে। দেহের নিম্নাংশকে সর্পিল গতিতে নাড়ানো এবং পুচ্ছ দিয়ে জোর ধাক্কা দেওয়ার সাহায্যে ওদের সাঁতারের কাজ পরিচালিত হয়। হাঙলের দেহের অগ্রপ্রান্ত বা মস্তকের দিক ভারী। দেহের পেছন থেকে ধাক্কা এলে স্বাভাবিকভাবে মাথা নিচের দিকে চলে যাবার কথা। কিন্তু তা হয় না। দেহে গতির ভারসাম্য বজায় রাখে বক্ষপাখনা। বক্ষপাখনাদ্বয় সাবমেরিনের ডানা বা পশ্চাতে ইঞ্জিন লাগানো উড়োজাহাজের ডানার মতো লম্বভাবে প্রসারিত থেকে এই ধাক্কা সামলায়। বক্ষপাখনাদ্বয় তুলনামূলকভাবে কম নমনীয়। হাঙর এই পাখনা জোড়াকে হঠাৎ খাড়া করতে পারে না, ফলে এটি ব্রেক হিসেবে গতিরোধ করায় সহায়ক হয়। প্রকৃতপক্ষে ধাবমান হাঙর থামতে পারে না। এটি কেবল একপাশে সরে যেতে পারে। এটি উল্টো হয় সাঁতারও দিতে পারে না। তদুপরি পুচ্ছ দাবড়িয়ে যদিও এরা থামে কিন্তু তখন ডুবে যায়। আসলে, কতকগুলো প্রজাতির হাঙর রাতে সমুদ্রের তলায় বিশ্রাম নেয় ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়।

তরুণাস্থিবিশিষ্ট একটি শাখার মাছেরা সাগরের মধ্য-গভীরতায় প্রায় স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণের উপযোগী অভিযোজন কৌশল আরত্ত করেছে। এরা অনবরত পুচ্ছ তাড়না করে শক্তিক্ষয় করে না। এই মাছেরা হলো রে ও স্কেইট। এদের দেহ বেশ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। এদের বক্ষপাখনা বিস্তৃত হয়ে দোদুল্যমান ত্রিভুজাকৃতির পার্শ্ব পাখনায় রূপান্তরিত হয়েছে। পার্শ্বপাখনা চলাচলের কাজ সম্পন্ন করে। কাজেই, আর পুচ্ছ তাড়নার প্রয়োজন পড়ে না। পুচ্ছ প্রায় সব মাংসপেশি হারিয়ে সরু চাবুকের রূপ নিয়েছে। কোনোটির চাবুকের আগায় থাকে বিষাক্ত কাঁটা। এই পরিবর্তন এদের জন্য উত্তম। তবে মুক্ত সাঁতারু হাঙরের মতো এরা অতো দ্রুত চলতে পারেন না। অবশ্য এদের গতিশীল হবার প্রয়োজনও নেই। এরা সক্রিয় শিকারী নয়। এরা মূলত শামুক ও কাঁকরা খেয়ে জীবনধারণ করে। সমুদ্রের তলা থেকে ওরা খাবার সংগ্রহ করে এবং অগ্রভাগে স্থিত মুখ দিয়ে গুঁড়ো করে খায়। মুখের অবস্থান খাবার গ্রহণের জন্য উপযুক্ত হলেও শ্বসনে বেশ জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হাঙর মুখ দিয়ে জল নেয়। জলকে ফুলকার উপর দিয়ে গড়িয়ে দিয়ে ফুলকারন্ধ্র দিয়ে বের করে। রে যদি এভাবে জল সংগ্রহ করে তাহলে সে জল কাদা ও বালিযুক্ত হয়। কাজেই রে মাছে মাথার উপর দিকে

দুটো দ্বার থাকে। দ্বার দুটি দিয়ে জল নিয়ে ফুলকায় সরাসরি চালান দেয় এবং দেহের অগ্রভাগে স্থিত ফুলকারন্ধ্র দিয়ে জল বের করে দেয়।

মান্টা নামের একজাতের রে মাছ জলের উপরিভাগে সাঁতারু জীবনে পুনরায় ফিরে গেছে। দেহের পার্শ্বত্বকের প্রসারণে সৃষ্ট পাখনা দাঁড়ের মতো স্বল্প শক্তি ব্যয় করে মাছকে ভাসিয়ে রাখে। তবে শক্তিশালী তড়পানো পুচ্ছের মতো এই পাখনা ততো দ্রুত গতি সৃষ্টিতে সক্ষম নয়। ফলে এরা স্বগোত্রের হাঙ্গরদের মতো দ্রুতগামী নয় এবং শিকার ধরায় হাঙ্গরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। পরিবর্তে ওরা ধীরে সাঁতার কাটে। সাঁতার কাটায় সাহায্য করে ত্বকবিশিষ্ট পাখনা। এই পাখনার বিস্তার ৭ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ওরা সরু ছিদ্রওয়ালা মুখ হাঁ করে চলে। ভাসমান শামুক, কাঁকড়া, ছোট মাছ হাঁ-র ভিতরে দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে মুখগহ্বরে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় দলের মাছেদের কংকালে হাড় রয়েছে এবং এরাই পৃথিবীর জলভাগে যারা বর্তমানে অধিপত্য বিস্তার করেছে তাদেরই পূর্বপুরুষ। দেহের ওজন সমস্যা পরোক্ষভাবে সুষ্ঠু সম্পাদনের মাধ্যমে এরা আবির্ভূত হয়েছে। প্রথম দিকে যখন অধিকাংশ মাছের ত্বকে ভারী হাড়বিশিষ্ট আঁশ ছিলো তখন কতিপয় পরিবারের সদস্যরা মুক্ত সমুদ্রে ছেড়ে উপকূলীয় সমুদ্র এবং অবশেষে অগভীর উপহ্রদে বা বদ্ধ জলে চলে যায়। শেষোক্ত জলাধারসমূহে ওদের শ্বসন কাজ দুষ্কর হয়ে পড়ে। উষ্ণ জল কম পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত করে রাখায় সমর্থ হয়। মুক্ত সমুদ্রের জল কখনো উষ্ণ হয় না। কিন্তু অগভীর জল উষ্ণ হয় এবং এতে অক্সিজেনের পরিমাণ থাকে খুবই কম। যে সব মাছ এই জলে বাস করতে আসে তাদেরকে অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত উপায়ের ব্যবস্থা রাখতে হয়। বিচির বহু প্রাচীনকালের এক মাছ। এর দেহে ছিলো ভারী আঁশ। এর বংশধর আফ্রিকার নদী ও হাওরে বাস করে। এটি এখনো শ্বাস গ্রহণে সেই পুরনো পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। এটি নির্দিষ্ট বিরতিতে জলের উপরে উঠে এক বাতাস নেয়। বাতাস গলায় নামে এবং একটি থলেতে জমা পড়ে। অন্ত্রপ্রাচীর থেকে থলেটির সৃষ্টি। থলের পুরু প্রাচীরের রক্তের কৈশিক নালি বায়বীয় অক্সিজেন শোষণ করে। আসলে বিচিরে অন্য যে কোনো মাছের মতো কেবল ফুলকাই নয়, ফুসফুসও রয়েছে।

কিন্তু বায়ুপূর্ণ থলে অন্য সুযোগ-সুবিধাও সৃষ্টি করেছে। এটি মাছকে ভেসে থাকায় সাহায্য করে। বায়ু-শ্বসনকারী অগ্রপথিক এই মাছেদের অসংখ্য উত্তরসূরির জন্য এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়। দেহের ভিতরে ব্যাগ ভর্তি বাতাস নিয়ে ওরা স্বচ্ছন্দে পানিতে ভেসে থাকে। এজন্য নিয়মিত পুচ্ছ তাড়নার কষ্ট পেতে হয় না। শেষপর্যন্ত সমুদ্রে পটকাওয়ালা মাছের আবির্ভাব হলো। বহু বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি এ ধরনের অঙ্গ নিয়ে গোগো পার্বত্যশিলার পাশের উপহ্রদে একদিন সাঁতার কাটতো। সঙ্গী ছিলো আরো বহু প্রাচীন ধরনের প্রাণী।

শীঘ্রই এমন মাছ প্রজাতির উদ্ভব ঘটলো যারা রক্ত থেকে ব্যাপনের মাধ্যমে অক্সিজেন নিয়ে পটকা ভরতে পারে। এদেরকে জলপৃষ্ঠের উপরে উঠে বায়ু ভক্ষণ করতে হয় না। কতকক্ষেত্রে বায়ু থলের ও অন্ত্রের মধ্যেকার নলকে ভরাট সুতার মতো মনে হয়। এভাবে মাছেরা পটকার অধিকারী হলো।

সাঁতারের কৌশলে বিপ্লবও সাধিত হলো। পটকায় ব্যাপনের দ্বারা গ্যাস আনা-নেয়া বা সংযোজী নলের দ্বারা গ্যাস বের করে মাছ নিপুণভাবে জলে দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। এদের বক্ষপাখনা দেহকে উত্তোলনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহিত পায় এবং দেহের গতিকে নিয়ন্ত্রণে অধিক সুষ্ঠু কার্যকরী ভূমিকা নিতে থাকে। ফলে মাছের সাঁতার দক্ষতা প্রায় চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।

জলবায়ুর তুলনায় ৮০০ গুণ ঘন জলের সামান্য ধাক্কা, মাছকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যায়। বাতাসে পাখি বা এরোপ্লেনের ক্ষেত্রে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় তুলনামূলভাবে কম। কাজেই দ্রুতগতির সমুদ্রচারী টুনা, বোনিটো, যারলিন, ম্যাকরেল প্রভৃতি মাছেদের দেহ চমৎকার সাঁতার কাটার উপযোগী। এদের দেহের সম্মুখভাগ সূঁচালো। সম্মুখভাগের পেছনের অংশ স্ফীতকায় এবং পশ্চাৎভাগ ক্রমে সুচারুভাবে সরু হয়ে আসে এবং একেবারে শেষে থাকে দ্বিধাবিভক্ত সূক্ষ্ম পুচ্ছ। পুরো পশ্চাৎভাগ ইঞ্জিনের প্রপেলারের মতো কার্যকর থাকে। মেরুদণ্ডের সাথে পেশি এমনভাবে সংবদ্ধ থাকে যাতে পুচ্ছকে দুপাশে নাড়াতে পারে। মাছ জীবনভর পুচ্ছ থেকে শক্তি সবরবাহ পেয়ে থাকে। আদি মাছে ভারী ও খসখসে যে আঁশ ছিলো সে ধরনের আঁশ বর্তমানের মাছে সরু হয়ে থাকতে দেখা যায় এবং এসব দেহের সাথেও মসৃণভাবে এঁটে থাকে। কোনো কোনো মাছে আঁশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আঁশে শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থ থাকে যার জন্য এটি পিচ্ছিল। ফুলকা আরবণকারী প্লেট দেহের সাথে আঁটসাঁটভাবে লেগে থাকে এবং চোখ মসৃণ দেহের উপরে ঢাকনাহীন ও স্ফীত অবস্থায় থাকে। বক্ষ পাখনা ও পায়ু পাখনা এবং দেহের শিরদাঁড়া বরাবর পৃষ্ঠপাখনা দেহের গতি সৃষ্টিতে সাহায্য করে না। এরা রাড়ার বা দিক নির্দেশক, ভারসাম্য রক্ষক বা গতি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। মাছ যখন দ্রুত গতিতে চলে তখন এসবের কোনো প্রয়োজন হয় না। তখন এগুলো মাছের দেহে সৃষ্ট খাঁজে ও বক্ররেখায় এঁটে লেগে থাকে। দেহের উপর ও নিচ প্রান্তে, পুচ্ছের দুই পাশে ক্ষুদ্র ত্রিকোণাকৃতির ব্লেড থাকে যা মাছকে জলের ধাক্কা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

দেহের নকশায় যে উৎকর্ষ সাধনের কথা আলোচনা হলো সে নকশা একেবারে ভিন্ন পরিবারের মাছেদের ক্ষেত্রেও অভিযোজিত হয়েছে লক্ষ করা যায়। ফলে সকল পরিবারের সদস্যদের অবয়বে একটা চমৎকার সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে। যখন একটি প্রজাতির মাছ মুক্ত সমুদ্রে আসে এবং শিকার ধরার বা শিকারে পরিণত না হবার জন্য দ্রুত গতিতে দৌড়ায় তখন নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক নির্বাচন মাছকে এ ধরনের নকশা অভিযোজনে বাধ্য করে। কারণ এই নকশা উল্লেখিত লক্ষ অর্জনের জন্য গাণিতিক বিচারে খুবই ফলপ্রসূ।

জলের পৃষ্ঠভাগে বসবাসকারী কতিপয় প্রজাতির মাছে শত্রুর শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বক্ষপাখনা ব্যবহৃত হয়। যখন শত্রু তাড়া করে, তারা জলের উপরে লাফ দেয়। তারপর তখনো গুটানো প্রশস্ত ও খুব লম্বা বক্ষপাখনা মেলে ধরে। পাখনায় বাতাস লাগলে, মাছটি ঢেউয়ের উপরে বাতাসে গড়িয়ে শত শত মিটার অতিক্রম করে। শত্রু বোকা হয়ে যায়। কখনো কখনো উড়াকালে দেহকে কাত করে যাতে পুচ্ছ পানিতে ডুবে। পানিতে কয়েকবার পুচ্ছতাড়না করে ওরা পুনরায় দেহে শক্তিসঞ্চার করে এবং উড্ডয়ন সময় প্রলম্বিত করে।

সকল মাছ দ্রুতগতির জীবনে অভিযোজিত হয় না। জলের মধ্যপ্রদেশে বা উপকূলে বসবাসকারী মাছের ভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও পটকা অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কারণ পটকা দেহের সকল ধরনের কাজ কামিয়াবের জন্যে পাখনাকে মুক্ত করে রেখেছে। অর্থাৎ পাখনার দায়িত্ব পালন করছে পটকা বা ফাতনা। পাইক মাছের পাখনাগুলো পাতলা সূক্ষ্ম দাঁড়ে পরিণত হয়েছে। এগুলো দেহের ভিতরের সন্ধির সাহায্যে ধীরে আগু-পিছু ঘুরে। ফলে মাছ জলপ্রবাহে সামান্য ভিন্নতা দেখা দিলে সামাল দিতে পারে এবং শিলার উপর ঝুলে থাকে। মনে হয় অদৃশ্য তারে ঝুলে আছে। গৌরমিস নামের মাছে পায়ু পাখনা সূত্রবৎ স্পর্শীতে পরিণত হয়েছে। স্পর্শীর সাহায্যে গোরমিস গতিপথের সামনের জল সম্বন্ধে আঁচ করতে পারে এবং প্রজনন ঋতুতে এটি দিয়ে প্রিয়তমকে সোহাগ জানাতে পারে। ড্রাগন ফিশ প্রসারণের মাধ্যমে পায়ু পাখনাকে দর্শনীয় আত্মরক্ষার অস্ত্রে পরিণত করেছে। প্রতিটি রে-এর কাঁটা বিষযুক্ত।

সাঁতারে দক্ষতা অর্জনের ফলে মাছের ক্ষেত্রে ওজন সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। কয়েক প্রজাতির মাছ আবার বর্মধারী সাজ নিতে শুরু করলো। বিশাল সংখ্যক প্রাণী অধ্যুষিত ভীষণ বিপদসংকুল প্রবালের রাজ্যে বক্স ফিশ বা তোরঙ্গ মাছ প্রবালের নিবিড় হাড়ের দুর্গের মধ্যে অবলীলায় ঘুরে বেড়ায়। বক্ষপাখনার ঘূর্ণনে ও পুচ্ছপাখনার ঝটপটানিতে প্রবালের রাজ্যে মাতম তুলে। সী-হর্স বা সমুদ্র ঘোটক নামের মাছও শস্ত্রমণ্ডিত ও মজবুত দেহবিশিষ্ট। এর পুচ্ছ পাখনাহীন ও বড়শীর মতো। সমুদ্র ঘোটক এই পুচ্ছ দিয়ে জলজ উদ্ভিদ বা প্রবালে নোঙর ফেলে। জলে এর দেহ খাড়াভাবে অবস্থান নেয়। এদের পৃষ্ঠপাখনা দোদুল্যমান পশ্চাৎ ইঞ্জিনের মতো কাজ করে। দুই পাশের বক্ষপাখনার ঘূর্ণনের দ্বারা দেহকে খাড়া রাখে। খাড়া অবস্থাতেই সমুদ্র ঘোটক অনায়াসে প্রবাল ও আগাছার মধ্যে দিয়ে চলাচল করে। ট্রিগার ফিশ প্রবাল খায়। এরা প্রবাল কলোনির প্রস্তরবৎ শাখা ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলিপগুলো খেয়ে নেয়। এদের দেহের পশ্চাৎভাগেই পাখনার সমাবেশ ঘটেছে। পুচ্ছের ঠিক উপরে পৃষ্ঠপাখনা বেশ প্রসারিত, অগ্রভাগের পাখনাও একই আকারপ্রাপ্ত। ফলে এর মাথা মুক্ত থাকে। হতে এরা প্রবাল শাখার মধ্যে মাথা গলিয়ে দিয়ে চিবানোর শাখা নির্বাচন করতে পারে। এদের পৃষ্ঠপাখনার প্রথম পাখনারশ্মি বা রে হাড়ে পরিণত হয়েছে। এ কারণে এ মাছের নাম ট্রিগার ফিশ রাখা হয়েছে। পরবর্তী দুটো পাখনারশ্মি প্রথমটির গোড়ায় আটকানোর মতো অঙ্গের সৃষ্টি করে। দ্বীপে প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়লে, প্রমত্ত জলপ্রবাহ দেখা দিলে ট্রিগার মাছ সাঁতরে ফাটলে ঢুকে পড়ে এবং পাখনারশ্মির সাহায্যে তালাবদ্ধ থাকার মতো করে পাথরে এঁটে থাকে। এরা এতো শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে যে জলপ্রবাহ এদেরকে একচুল নড়াতে পারে না। ক্ষুধার্ত শিকারীও টেনে বের করতে পারে না। এমনকি ডুবুরীও ওদের সরাতে পারে না।

কতিপয় হাড়বিশিষ্ট মাছ স্কেইট ও রে-জাতীয় তরুণাস্থিবিশিষ্ট মাছকে টেক্কা দিয়ে সমুদ্র তলচর জীবন গ্রহণ করেছে। এদের সফল সাঁতারু হবার মূল শক্তি পটকা বা ফাতনাকে ওরা বর্জন করেছে। আরো বহু উদ্দেশ্যে ব্যবহারের লক্ষ্যে ওরা ওদের বক্ষপাখনাকে পরিবর্তন করেছে। গার্নার্ড মাছ এদের বক্ষপাখনার সম্মুখভাগের রশ্মিপর্দা খসিয়ে দিয়েছে, ফলে পাখনারশ্মি মুক্তাবস্থায় থাকে এবং মাকড়সার পায়ের মতো স্বচ্ছন্দে নাড়াতে পারে। খাদ্য অন্বেষণের জন্যে এই পাখনা দিয়ে ওরা পাথর ওল্টায়। ফ্লাউন্ডার মাছও অতিমাত্রায় সমুদ্র?

তলচর জীবনে অভিযোজিত হয়েছে। আবার এই মাছ জীবজগতের অতীত আবর্তনের প্রবণতাকে জীবনবিকাশের পর্যায়ে প্রদর্শন করায়। ডিম ফুটে বেরোনের পর পূর্বপুরুষদের মতো এদের পোনা সমুদ্রতলের উপরে সাঁতার কাটে। কয়েকমাস পর এদের দেহে পরিবর্তন আসে। দেহ থেকে পটকা খসে পড়ে। মাথা ঘুরে যায় এবং মুখ চলে আসে পাশে। অন্য পাশের চোখ সরে আসে অর্থাৎ একপাশেই দুটো চোখ কাছাকাছি থাকে। এর পর মাছ ভাসমান অবস্থা থেকে তলদেশে নেমে আসে এবং এক পাশের উপর শায়িত থাকে। বক্ষপাখনার ব্যবহার কমে যায়। যদিও এটি আকারে অটুট থাকে। পাশে অবস্থিত সম্প্রসারিত পৃষ্ঠপাখনা ও পায়ু পাখনার তরঙ্গায়িত আন্দোলনের মাধ্যমে ওরা সাঁতার কাটে।

কাজেই মাছেরা সমুদ্রের বিচিত্র পরিবেশে নিপুণতার সাথে দ্রুতগতিতে সাঁতারে পারঙ্গম হলো। এর পেছনে অবদান রাখলো পুচ্ছ, বক্ষপাখনা ও পার্শ্বপাখনা। পুচ্ছ তাড়নার মাধ্যমে মাছ গতি সৃষ্টি করে। বক্ষপাখনা দাঁড়ের মতো দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে ও দেহকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। পার্শ্বপাখনাও অনুরূপ কাজ করে। মাছ সালঙ্করা প্রবাল প্রাচীর থেকে পর্বতে এবং সাগরের সমতল বালুকাবেলায় সমুদ্রের গুল্ম-অরণ্য থেকে নীল সূর্য করোজ্জ্বল মুক্ত জলরাশিতে অবাধে বিচরণ করতে পারে। তবে গতিময়তার সাথে বোধের মেলবন্ধন ঘটাতে হয়। আপনি যদি ভ্রমণে বের হন, আপনি কোন্ পথে যাচ্ছেন সে বিষয়ে কোনো না কোনোভাবে আপনাকে সতর্ক থাকতেই হবে। মাছেদেরও থাকতে হয়।

সকল মাছে একটি সংবেদী অঙ্গ আছে। এর সমকক্ষ সংবেদী অঙ্গ মানুষে নেই। মাছের দেহের দুই পাশ দিয়ে একটি রেখা চলে গেছে। মাছের অবয়ব থেকে রেখাটি দেখতে ভিন্ন। এর নাম পার্শ্বরেখা (lateral line)। এটি মস্তকে শাখা বিস্তার করে। এই রেখাতে বেশ কিছু ছিদ্র থাকে। রেখার ঠিক নিচ দিয়ে প্রলম্বিত নালির সাথে ছিদ্র দ্বারা রেখার সংযোগ রয়েছে। নালি, ছিদ্র ও রেখা মিলে গঠিত পার্শ্বরেখাতন্ত্র জলচাপের পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে। সাঁতার কাটার সময় মাছ একটি ঢেউয়ের চাপ সৃষ্টি করে। ঢেউ আগে আগে চলে। ঢেউ সামনের কোনো বস্তুতে প্রতিহত হলে বা কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এলে, মাছ পার্শ্বরেখার সাহায্যে তা অনুধাবন করতে পারে। বস্তুটির দূরত্ব, পাশে অন্য মাছের অস্তিত্ব ইত্যাদি অনুভব করতে পারে। ঝাঁকে চলা মাছের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা।

মাছের গন্ধ অনুভব করার ক্ষমতা একেবারে নিখুঁত। কাপের মতো অংশে নাসারন্ধ্র উন্মুক্ত হয়। জলের অতি স্বল্প রাসায়নিক পরিবর্তনও নাক ধরতে পারে। স্রোতের অনুকূলে থাকা হাঙর অর্ধ কিলোমিটার দূরে থেকে কোনো প্রাণীর দেহনির্গত রক্তের গন্ধ টের পায়। ঘ্রাণশক্তিই তাদের খাদ্য আহরণে চালিত করে। হাতুড়ি-মাথা হাঙরের অদ্ভুত অবয়ব নির্মিত হবার কারণও হয়তো এটা। মাথার দুপাশে হাতুড়ির মতো প্রসারিত অংশের প্রান্তসীমায় নাসারন্ধ্র অবস্থিত। শিকারের গন্ধ পেলে এরা পাশ থেকে পাশে মাথা দুলিয়ে কোন দিক থেকে গন্ধ আসছে তা নির্ধারণ করে। যখন দুই নাসারন্ধ্রেই গন্ধ কড়াভাবে অনুভূত হয় তখন হাতুড়িমাথা হাঙর সোজা সামনের দিকে এগোয়। কখনো শিকারস্থলে কেবল হাঙরকেই সবার আগে উপস্থিত হতে দেখা যায়।

আদিকাল থেকে মাছ শব্দ শনাক্ত করায় হয়তো সক্ষম ছিলো। প্রাক-মাছ ও ল্যাম্প্রের করোটির দুই পাশে ক্যাপসুলের মধ্যে খিলানযুক্ত দুটি অর্ধচক্রাকৃতির খাত দেখা যায়। এটি

চোয়ালবিশিষ্ট মাছে আরো বিকাশলাভ করে। এদের ক্ষেত্রে অনুভূমিকভাবে তৃতীয় একটি খাত রয়েছে। এই তৃতীয় খাতের নিচে রয়েছে বড় একটি থলে। এই তিন খাত ও থলেতে সংবেদী আরবণ থাকে। তদুপরি থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুনগঠিত কণা। কণাগুলো নড়ে ও কম্পন সৃষ্টি করে। শব্দ বায়ুর তুলনায় জলে চলে অধিক সুষ্ঠুভাবে। মাছের দেহের অভ্যন্তরে তুলনায়মূলকভাবে জলের পরিমাণ বেশি। শব্দতরঙ্গ করোটি ভেদ করে অর্ধচক্রাকৃতি খাতে প্রবেশ করে। বায়ুমণ্ডলে বসবাসকারী মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কর্ণকুহরে শব্দতরঙ্গ পৌছানোর জন্য যেমন বিশেষ পথের ব্যবস্থা থাকে, মাছে তার প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই, মাছ কলনাদ, ধাবমান অন্য মাছ সৃষ্ট চড়চড় শব্দ, কাঁকড়ার শক্ত খোলসে পায়ের আঁচড় কাটার ক্লিক ক্লিক শব্দ এবং প্রবালের মধ্যে বিচরণকারী মাছের খড়খড় শব্দ টের পায়।

মাছে পটকা সৃষ্টি শব্দ গ্রহণ ও প্রেরণের অধিক উন্নতির সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করেছিলো। হাজার হাজার মাছে পটকার সাথে কানের বা শব্দযন্ত্রের সংযোগ স্থাপন করেছে কতিপয় হাড়। যাতে পটকা সংগৃহীত ও বিবর্ধিত অনুনাদ হাড়ের মাধ্যমে অর্ধচক্রাকৃতি খাতে (Semicircular Canal) পৌছাতে পারে। কতকগুলি মাছে বিশেষ পেশি সৃষ্টি হয়েছে। এই পেশি পটকায় কম্পন তোলে এবং ড্রামের শব্দের মতো উচ্চনাদ সৃষ্টি করে। ক্যাটফিশ গোষ্ঠীর সদস্যরা এ ধরনের শব্দ সৃষ্টি করে। মনে হয় অন্ধকার সমুদ্র একে অপরকে ডাক দিচ্ছে।

আদিকাল থেকে মাছেরা দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ছিলো। ল্যান্সলেটের চক্ষুবিন্দু আলো ও অন্ধকারের তফাৎ ধরতে পারতো। চোয়ালহীন মাছেদের মাথা যদিও ভারী বর্মে আবৃত থাকতো তবু চোখের জন্য বর্মে ছিলো ফাঁক। যেহেতু আলোকের আরচণ নিয়ন্ত্রণকারী সূত্রসমূহ বিশ্বজনীন, সেহেতু এটি বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, একটি কার্যকরী চোখের জন্য মৌলিক নকশার সংখ্যা বেশ কম। ট্রাইলোবাইটের ছিলো মোজাইকের মতো চক্ষু। এটি পতঙ্গেও রয়েছে। অন্যদিকে, প্রতিবিম্ব সৃজক চক্ষুরও রয়েছে সমরূপ মৌলিক গঠন। কোন্ অঙ্গ এরূপ গঠন বিকশিত করেছে সেটি কথা নয়, তবে এরমকটি ঘটে গেছে। এই গঠনটি হলো—একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠের সম্মুখভাগে একটি লেন্স বা পরকলা ও স্বচ্ছ একটি দ্বার এবং পশ্চাৎভাগে আলোক-সংবেদী আবরণ। এই একই নমুনার চোখ রয়েছে স্কুইড ও অক্টোপাসে। এদের চোখের নকশা অবলম্বনে ক্যামেরা বা কৃত্রিম চক্ষু বানানো হয়েছে। এরই ভিত্তিতে মাছে চোখের বিকাশ সাধিত হয়। স্থলচর অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীও উত্তরাধিকার সূত্রে এ ধরনের চোখ অর্জন করেছে। আলোকসংবেদী আবরণে দুই আকৃতির কোষ থাকে। কোষদ্বয় হলো রড় ও কোন্। রড় কোষ আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য নিরূপণ করে এবং কোন্ বর্ণ সংবেদী।

অধিকাংশ হাঙর ও রে মাছের চোখে কোন্ কোষ নেই। তাই ওরা বর্ণান্ধ। অথচ এদের দেহে রয়েছে চমৎকার রঙের বাহার। ধূসর মেটে রঙ, বাদামি, জলপাই সবুজ ও ধূসরাভ নীল রঙের হাঙর ও রে মাছ দেখা যায়। সাদাসিধে রঙ যাদের তাঁদের দেহে থাকে বিচিত্র আঁকিবুকি ও বিন্দু। হাড়বিশিষ্ট মাছেদের বর্ণ লক্ষণীয়ভাবে স্বতন্ত্র। এদের চোখে রড় ও কোন্ কোষ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোখের বর্ণ বোঝার ক্ষমতা অসাধারণ এবং দেহের রঙও প্রকট ও বিচিত্র। নীলকান্ত মণির মতো বর্ণবিশিষ্ট দেহে সবুজের আভামণ্ডিত। তাতে ছড়ানো ছিটানো কমলা রঙের বিন্দু। দেহের শেষপ্রান্তে রয়েছে হলুদাভ পুচ্ছ। দেহ আবৃত করে গাঢ়

পিঙ্গল আঁশ। প্রতিটি আঁশের কিনারায় অর্ধবৃত্তাকৃতিতে থাকে ময়ূরকণ্ঠী রঙ। লক্ষভেদে উদ্যত তীরন্দাজের মতো পুচ্ছের গড়ন। পুচ্ছের সোনালি কেন্দ্র ঘিরে পরপর উজ্জ্বল লাল, কালো ও সাদা বর্ণের সমাহার। অথচ মনে হবে ওদের দেহে কোনো কারুকার্য নেই, সপ্ত বর্ণের আলো-ছায়ার খেলা নেই। ওরা দেহকে বর্ণে বর্ণে শোভিত করায় যেনো উৎসাহী নয়।

সূর্যকরবিধৌত স্বচ্ছ জলে খুবই চমৎকার অলংকৃত দেহবর্ণের মাছেদের সহজে দেখা সম্ভব হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় হ্রদ ও নদীতে বিশেষ করে প্রবাল প্রাচীরের চারপাশে অধিক সংখ্যায় এদের দেখা মিলে। এখানে সব ধরনের প্রাণী পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিচরণ করে। এই এলাকায় রয়েছে সমৃদ্ধ খাদ্যভাণ্ডার। ফলে এই জায়গায় বিশাল সংখ্যক মাছ বসবাস করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মাছের অভিযোজন ঘটেছে বিশদভাবে। ফলে এক্ষেত্রে প্রজাতি শনাক্তকরণের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাটারফ্লাই ফিশ বা প্রজাপতি মাছ নাম হয়েছে ওদের সুন্দর রঙের কারণে। এই দলের মাছেদের একটি ছোট পরিবারে কতো নমুনার মাছ যে দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই। আকারে ওরা প্রায় সবাই সমান। কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র। আকৃতিও প্রায় সমরূপ পাতলা আয়তাকৃতি গড়ন। মাথার অগ্রভাগ একটু উঁচু, মুখ বাঁকানো। প্রতিটি প্রজাতির মাছ প্রবাল প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানে, অনুকূল গভীরতায় ও পছন্দমতো খাদ্য-উৎসে বাস করে। কারো চোয়াল দীর্ঘ। প্রবাল শাখার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ চোয়াল চালিয়ে ওরা খাদ্য সংগ্রহ করে। কারো চোয়াল এমনভাবে গঠিত জাতে বিশেষ একপ্রকার ছোট কাঁকড়াজাতীয় প্রাণীসমূহকে খুঁটে খুঁটে ধরতে পারে। ঝাঁকে চলা মাছেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান কল্পে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেওয়ার স্বার্থে এমনটি হয়ে থাকে। একজনের দখল করা বাসস্থানে একই প্রজাতির অন্য সদস্য যেনো হানা না দেয়। অন্যদিকে এক ধরনের পুরুষ মাছের বর্ণ স্ত্রী মাছেকে আকর্ষণ করে। ফলে উভয়ের মিলনে নূতন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। অনেক পরিবেশে শিকারী প্রাণীর ভয়ে এ ধরনের ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারটি সীমিত থাকে। প্রজাপতি মাছের জন্য এই ঝুঁকি একটু কম, কারণ, সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে কঠিন প্রবাল শাঁখার মধ্যে ওরা দ্রুত আত্মগোপন করতে পারে। কাজেই পরিবারের প্রতিটি সদস্য আকারে প্রায় সদৃশ হলেও প্রত্যেকের বর্ণসাজ ভিন্ন ভিন্ন। কারো দেহে ডোরা ডোরা বা ছোপ ছোপ রঙ কারো দেহে বিন্দু বিন্দু রঙ, ফুটকি অথবা নানান আঁকিবুকি।

ডিম ছাড়ার সময় এগিয়ে এলে, প্রজাতি শনাক্তকরণের প্রয়োজনীতা বিশেষভাবে দেখা দেয়। প্রবাল প্রাচীর থেকে দূরে, ভয়াল ও মুক্ত জলে। পুরুষ মাছেরা বিপদের ঝুঁকি নিয়েও উজ্জ্বল বর্ণ অভিযোজিত করে উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় প্রদর্শন ও স্ত্রীমাছকে আকর্ষণ। ওরা উত্তেজিত হলে ওদের ত্বকে রঙের দানাসমূহের ব্যাপন ঘটে। বাহারি রঙ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় একে অপরের চারপাশে চক্রকৃতিতে ঘুরে এবং ষাঁড়ের লড়াইয়ের মতো একে অপরের দিকে পুচ্ছ কাঁপিয়ে ও বেঁকিয়ে আঘাত করার চেষ্টা পায়। এরা জলে জোরে পুচ্ছ তাড়না করে জল তুলে, যাতে ঐ তরল প্রতিদ্বন্দ্বীর পার্শ্বরেখায় চাপ সৃষ্টি করে। এরা একে অপরের পুচ্ছ ছিঁড়ে। শেষপর্যন্ত পর্যুদস্ত মাছটি একসেট কোষের বর্ণ সংকুচিত এবং অন্য সেটে বর্ণ বিস্তৃত করার মাধ্যমে দেহের রঙ পাল্টিয়ে বশ্যতা স্বীকারের ইঙ্গিত দেয়। এভাবে সে আত্মসমর্পণের পতাকা ওড়ায়। বিজয়ী এখন অবাধে স্ত্রীমাছের সাথে প্রণয়ে লিপ্ত হয়। পুরুষ মাছ তখনও

তার বর্ণবিভব বিচ্ছুরিত করে এবং পুচ্ছের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি প্রদর্শন করে। কিন্তু স্ত্রী প্রাণীতে এসব নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং শেষপর্যন্ত স্ত্রীমাছ উদ্দীপিত হয়ে ডিম্ব প্রসব করে।

কতকগুলো মাছ তাদের চারপাশে কি ঘটছে তা তো দেখতে পায়ই তদুপরি জলের উপরে বায়ুতেও কি ঘটছে তা দেখে থাকে। আর্চার ফিশ বা তীরন্দাজ মাছ মাছি ও পতঙ্গ শিকার করে। জলের ধারে তীরে উদ্ভিদের উপরে বসা পতঙ্গই ওদের লক্ষ। জলে প্রতিফলিত বাঁকানো রশ্মি বরাবর উপবিষ্ট পতঙ্গের গায়ে ওরা কয়েক ফোঁটা জল জোরে ছুঁড়ে মারে। জলের ধাক্কায় পোকাটি আসনচ্যুত হয়ে জলে পড়ে। তখন সে ধরে খায়। সেন্ট্রাল আফ্রিকার ছোট একটি মাছ এ ব্যাপারে আরো দক্ষ। এর চোখ আড়াআড়িভাবে বিভক্ত, ফলে দুটি দিয়ে চোখ প্রকৃতপক্ষে চারটি চোখে পরিণত হয়। নিচের দুটি দিয়ে সে জলের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে দেখে এবং উপরের দুটি দেখে বায়ু অঞ্চলের দৃশ্যাবলি। মাছ জলপৃষ্ঠে সাঁতার কাটাকালে একই সময়ে নিচে ও উপরে তাকাতে পারে।

সমুদ্রের ৭৫০ মিটারের কাছাকাছি গভীরে দুঃসহ আবাসনে কিছু মাছ বাস করে। এখানে আলো নেই। কাজেই এক মাছ অন্য মাছের সংকেত দেখার প্রশ্নই আসে না। ফলে এদের অন্য উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। এদের শরীরে বিছু পরিবর্তিত কোষ থাকে। এই কোষে আলো বিচ্ছুরণের ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ থাকে। অন্যদের পুচ্ছে বিশেষ অঙ্গে অনুপ্রভ ব্যাকটেরিয়ার চাষ হয়। মিটমিট করে এই আলো একবার জ্বলেও একবার বন্ধ হয়। কাজেই এভাবে সমুদ্রের গহন অন্ধকার আলো-আঁধারিতে ভরে উঠে। অনুমান করা হয় যে এটা একটা মৎস্য সমাজের সংকেত। এরা ঝাঁকের অন্যদের সঙ্গমের নোটিশ জারে করে আলোর সংকেতের সাহায্যে। অবশ্য এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে। এ সবের যথার্থ কার্যকারিতা কি জানা অত্যাবশ্যক। এক ধরনের আলোক বিচ্ছুরণের ব্যাপারে সাদাসিধে ও নির্ভুল কারণ জানা গেছে। গভীর সমুদ্রের এংলার ফিশ বা বড়শি মাছের পৃষ্ঠ পাখনার সামনের একটি কাঁটা প্রলম্বিত হয়ে একটি সরু সুতার মতো রূপ নিয়েছে। এটি মুখের সামনে ঝুলে থাকে। সুতার আগায় জ্বলন্ত একটি সবুজ বাল্বের মতো বস্তু থাকে। চলন্ত এই আলোক পিণ্ড অনুসন্ধানে আসে কৌতূহলী অন্য মাছেরা। বড়শি মাছ হঠাৎ এর বিশাল মুখগহ্বর মেলে ধরে এবং অনুসরণ করে মাছ গ্রাসে পরিণত হয়।

সমুদ্র ছাড়াও অন্যত্র, অন্য জলাশয়েও অন্ধকার বিরাজ করে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কোনো কোনো নদী ভাসমান উদ্ভিদে পূর্ণ থাকে। ওখানে পাতা পচে। জল কালো ও পিচ্ছিল হয়। এখানে বাসরত মাছেরা একটা উপায় অবলম্বন করেছে যা অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরা শরীরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ছোট ছোট মাছেরা এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার নাইফ ফিশ বা ছুরি মাছ, পশ্চিম আফ্রিকার এলিফ্যান্ট ফিশ বা হস্তী মাছ-এর দেহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। মাছটির ওষ্ঠ দীর্ঘ হয়ে শুঁড়ের আকৃতি নেওয়াতে একে হস্তী মাছ বলা হয়। আপনি যদি এদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে আগ্রহী হন তাহলে আপনাকে দুটো তারকে একটি মেরুর প্রান্তে একটি এম্প্লিফাইয়ারের সাথে যুক্ত করতে হবে। এম্প্লিফাইয়ারের সাথে লাউডস্পীকার জুড়ে দিতে হবে। এম্প্লিফাইয়ার বা শব্দ বিবর্ধক যন্ত্রে শক্তিশালী ব্যাটারী থাকবে। আপনি তারের দুই প্রান্তকে উপরিলিখিত জলে ডুবিয়ে দেবেন

যেখানে কর্দমের তলায় মাছ খাদ্য অন্বেষণে রত। আপনি পরপর ক্লিক ক্লিক শব্দ শুনতে পাবেন। এগুলোই বিদ্যুৎসংকেত যা শব্দে পরিণত হয়ে আপনার কানে বেজে গেলো।

বৈদ্যুতিক মাছেদের মধ্যে সর্ববৃহৎ মাছ হলো ইলেকট্রিক ঈল। এরা আসল ঈলের সাথে সম্পর্কিত নয় তবে বাইরে দেখতে ওদের মতোই। এ কারণেই এদেরও ঈল নামে ডাকা হয়। এটি দৈর্ঘ্যে দেড় মিটার এবং দেখতে সুস্থ সবল মানুষের বাহুর মতো পুরু। কখনো কখনো এরা নদীর তলায় গর্তে বা শিলাখণ্ডে বাসা বানায়। দীর্ঘ এই প্রাণীর পক্ষে গর্ত থেকে পেছনমুখী বের হওয়া বেশ সমস্যার। কিন্তু ঈল বিদ্যুতের সাহায্যে বেরোতে পারে। জলাশয়ে কোনো ঈল এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করাকালে আপনি ক্লিক ক্লিক করে বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্গত হচ্ছে শনাক্ত করতে পারবেন। যতোই মাছটি ওর নির্বাচিত অবস্থান স্থলে গুটিশুটি হয়ে সঠিকভাবে ধীরে থিতু হতে এবং বেরুতে থাকবে ততোই বিদ্যুৎপ্রবাহ ক্রমে বাড়তে দেখা যাবে। ঈল এর গতি নির্ধারণে নিম্ন ভোল্টেজে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়ে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করে বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবলমাত্রায় বেড়ে যেতে পারে। এ সময় রাবারের জুতা ও দস্তানা না পড়ে যদি ঈলের গায়ে হাত লাগান তাহলে আপনি বৈদ্যুতিক শক খেয়ে চিৎ হয়ে পড়তে পারেন। ঈল শিকার ধরার জন্য এরকম বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে থাকে। পৃথিবীতে মাত্র গুটিকয় প্রাণী আছে যারা এরকম বৈদ্যুতিক শক দিয়ে অন্য প্রাণী হত্যার ক্ষমতা রাখে।

পঞ্চাশ কোটি বছর পর সেসব চোয়ালহীন বর্মভারাক্রান্ত প্রাণীরা আজ পুচ্ছতাড়না করছে এবং অতি পুরনো এই সমুদ্রের কর্দমে লুটোপুটি খাচ্ছে, অর্থাৎ ওরা আজ ৩০,০০০ বিভিন্ন প্রজাতির মাছে পরিণত হয়েছে। ইত্যবসরে, ওরা সাগরের, নদীর, হ্রদের সকল অংশে আধিপত্য কায়েম করেছে। জলের উপর ওদের প্রভুত্ব সৃষ্টির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো চমৎকার দুর্জয় সাহসী ও দক্ষ সাঁতারু সলমন মাছ। সলমন এ ধরনের উৎকৃষ্ট মাছেদের প্রতিনিধি।

উত্তর আমেরিকার নদীসমূহে স্যামন পাঁচটি প্রজাতি যাতায়াত করে। এদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটে প্রশান্ত মহাসাগরে। ছোট সলমন সমুদ্রের প্লাঙ্কটন খায়। বড় হতে থাকতে খায় মাছ। প্রতি বছর আগষ্ট মাসে প্রাপ্তবয়স্ক সলমন আমেরিকার সমুদ্রোপকূলের দিকে চলে আসে। উপকূলের অদূরে জমায়েত হয়ে ওরা নদীতে ওঠে আসার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। নদীর নিম্নগামী খরপ্রবাহের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম। ওদের পার্শ্বরেখার তাপসংবেদী ছিদ্রের সাহায্যে ওরা জলের চাপকে এড়িয়ে উজানে আসার চেষ্টা পায়। চেষ্টা সফল হয় এবং মোটামুটি ধীরস্রোতের এলাকায় এসে নদীর স্থানে স্থানে বিরাজমান শান্ত জলাধারে বিশ্রাম নেয়। এখানে ওরা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে।

স্যামন যে কোনো নদীতে যাওয়া স্যামন পছন্দ করে না। প্রতিটি স্যামন যে জলে ওদের জন্ম হয়েছে সে জলের স্বাদে মোটামুটি স্মরণে রাখতে পারে। কাদার খনিজ পদার্থ এবং জলে থাকা প্রাণী ও উদ্ভিদের গন্ধ একত্রিত হয়ে জলের গন্ধ সৃষ্টি হয়। তাদের বাসস্থলের জলের একটি অংশকে কয়েক কোটি গুণে তরল করলেও তারা তরলীকৃত জলের গন্ধ শনাক্ত করতে পারে। এই স্মৃতিশক্তিই তাদেরকে সমুদ্রের হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিতে সাহায্যে করে। এরা নির্দিষ্ট উপসাগরে পৌছায়। সেখানে তাদের স্মৃতির গন্ধ উত্তরোত্তর প্রকটভাবে ধরা পড়ে। তখন ওরা সেই বিশেষ নদীর নির্দিষ্ট স্রোত ধরে চলতে থাকে। আমরা

জানি, গন্ধই মাছকে নির্দেশনা দেয়। কিন্তু স্যামনের দুটো নাসারন্ধ্রই অবরুদ্ধ ও নষ্ট। তবু তাদের নিপুণ স্মরণশক্তি ও সাঁতারে নির্দিষ্ট স্থানে আসা বিস্ময়কর। ডিম থেকে পোনা হয়ে বেরোনোর পরপরই হাজার হাজার মাছে শনাক্তি চিহ্ন দিয়ে দেখা হয়েছে। এদের মাত্র একটি বা দুটি মাছকে জন্মলগ্নের জল ছাড়া অন্য নদীর জলে ফিরে আসতে দেখা গেছে।

ফিরে আসার জোর তাগিদ থাকলেও বাধা কিন্তু বিস্তর। লোনাজল থেকে স্বাদুজলে আসতে হলে দেহের রাসায়নিক শারীরক্রিয়ায় বড় ধরনের খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। স্যামন এই পরিস্থিতিকে সামাল দেয়। উজানে চলার সময় তাদেরকে জলপ্রপাতের মোকাবেলা করতে হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে ওরা প্রপাতের সর্বনিম্ন আঘাতস্থল নির্বাচন করে। শক্তিশালী পেশিসম্পন্ন রূপালি দেহ বাঁকিয়ে লেজের ঝাপটা দিয়ে ওরা জলের উপর লাফ দেয়। এভাবে তাদেরকে কয়েকটা লাফ দিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে আবার যাত্রা শুরু করতে হয়।

শেষ পর্যন্ত ওরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায় যেখানে ওদের পিতামাতা একদিন তাদের জন্ম দিয়েছিলো। এখানে তারা অবসর যাপন করে। মাথাটাকে স্রোতের বিপরীতে রেখেই ওরা বিশ্রাম নেয়। ওরা গায়ে গায়ে লেগে থাকে। ফলে ওদের কালো পিঠের জন্য নদীর ধূসর তলদেশ ঢাকা পড়ে। কয়েকদিনের মধ্যে, আশ্চর্যজনক দ্রুত সময়ের মধ্যে ওদের দেহের আকৃতিতে পরিবর্তন আসে। তাদের পিঠে উঁচু কুঁজের সৃষ্টি হয়। উপরের চোয়াল বাঁকা হয়ে যায় এবং দাঁতগুলো সাঁড়াশির আকৃতি ধারণ করে। এই দাঁত দিয়ে খাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু এদের খাওয়ার পাঠ চুকে যায় অনেক আগেই। এই দাঁত যুদ্ধের জন্য। পুরুষ মাছগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে সমরে অবতীর্ণ হয়, একে অপরের চোয়াল আঁকড়ে ধরে এবং কামড় দেয়। সমরস্থলের জল এতো অগভীর যে, উপর থেকে যুদ্ধরত স্যামনের কুঁচ দৃশ্যমান হয়ে উঠে। শেষমেষ একটি জয়ী হয় ও মসৃণ নুড়ির মধ্যে বাসা বাঁধে। তার সাথে একটি স্ত্রীমাছ সম্বন্ধ গড়ে। খুব দ্রুত ডিম পাড়ে, ডিম পুরুষ মাছের শুক্র দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিম্ব নুড়ির মধ্যে ডুবে থাকে।

প্রাপ্তবয়স্করা এখন পুরোপুরি বিধ্বস্ত। তাদের দেহের ক্ষত পুরণের মতোও পর্যাপ্ত শক্তি থাকে না। আঁশ ঝরে যায়। সেই শক্তিশালী পেশি শিথিল হয়। ওরা মরে যায়। নদীর প্রতিকূলতাকে নস্যাৎ করে উঠে আসা লক্ষ লক্ষ স্যামনের একটিও আর সমুদ্রে ফিরে যায় না। ওদের মৃত দেহ জলের পৃষ্ঠভাগে পচতে থাকে এবং ভেসে এসে নদীর চড়ায় আটকা পড়ে। এখানে সেখানে সর্বশেষ জীবিত মাছটি পাখা নেড়ে শেষ বিদায় জানায়। গাঙচিল ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে ওদের চোখ উপড়ে নেয়। হলুদাভ মাংস ছিঁড়ে খায়।

নুড়ির মধ্যে ডিম থাকে। একটি স্ত্রীমাছ থেকে এক হাজার বা তারও বেশি ডিম পাওয়া যায়। ডিম পুরো কঠিন শীতকাল নিরাপদে কাটিয়ে দেয়। পরবর্তী বসন্তে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরয়। পোনারা জলপ্রবাহে কয়েক সপ্তাহ থাকে। এসময় ওরা পোকা ও কাঁকড়ার বাচ্চা খায়। উষ্ণজলে এসময় কাঁকড়া ও পোকারা উঠে আসে। বড় পোনা নদীর ভাটির টানে সমুদ্রে নেমে যায়। কতিপয় প্রজাতির স্যামন সমুদ্রে দুই ঋতু কাটায়। কতিপয় কাটায় পাঁচ ঋতু। অনেকেই অন্য প্রাণীর আহারে পরিণত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত যারা বেঁচে থাকে তারা আবার নিজেদের নদীতে ফিরে এসে নূতন প্রজন্ম সৃষ্টি করে এবং জন্মস্থলেই মৃত্যুবরণ করে।

পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগই জল। এই তিনভাগ জলই মাছের অধিকারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাণীর স্থলভাগ অভিযান

৩৫ কোটি বছর আগে স্বাদুজলের এক জলাভূমিতে ইতিহাসের অন্যতম চূড়ান্ত নাটক অভিনীত হয়। মাছ টেনে হেঁচড়ে নিজেকে জলের বাইরে নিয়ে আসে এবং প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী এই মাছেরাই স্থলভাগে কলোনি স্থাপন করে। প্রথম স্থলবিজয়ী অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মতো, এদেরকেও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়। দুটো সমস্যা সমাধানই ছিলো এদের জন্য জরুরি : এক, কিভাবে জলের বাইরে চলাচল করবে, এবং দুই, কিভাবে বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন পাবে।

এখনো জীবিত একটি মাছ আছে যেটি উপরিলিখিত দুটি কাজই সম্পাদন করছে। মাছটির নাম মাডস্কিপার। প্রথমদিকে যারা স্থলজয় করেছিলো তাদের সাথে এই মাছের নিকট কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই এর সাথে তুলনা করতে হলে সচেতন থাকা চাই। তবু সেই আদিকালে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণীর স্থলভাগে যে পদচারণা শুরু হয়েছিলো সে সিম্পর্কে আমরা এর থেকে কিছু ইঙ্গিত পেতে পারি।

মাডস্কিপারের দেহ মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা। এদেরকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের বহু অংশে গরানজাতীয় গাছ অধ্যুষিত জলাভূমি ও কর্দমাক্ত নদী মোহানায় দেখা যায়। জলের বেশ উপরে চকচকে কাদার উপরে ওরা বিচরণ করে। কোনো কোনোটিকে জলাভূমির গরান গাছের বায়বীয় মূল আকঁড়ে থাকতে অথবা গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখা যায়। হঠাৎ নড়াচড়া বা গোলমালের শব্দে ওরা চট্‌জলদি জলের নিরাপদ আশ্রয় ঝাঁপিয়ে পড়ে। নরম কাদায় বিচরণকারী পতঙ্গ ও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী আহারের জন্যই ওরা ডাঙায় উঠে আসে। দেহের পশ্চাৎভাগকে হঠাৎ বাঁকা করে ওরা স্কিপিং করার মতো লাফ দেয়। তবে ওরা সামনের পাখনা জোড়ার সাহায্যে ধীরে সুস্থে, চমৎকার ভঙ্গিতে সামনের দিকেই এগোতে পারে। প্রতিটি পাখনার গোড়া পেশিযুক্ত। পেশিকে মজবুত রাখে ভিতরের হাড়। পাখনা কার্যত একটি লাঠির ভূমিকা পালন করে। এর উপর ভর দিয়েই মাডস্কিপার সামনে এগোয়।

আদি সব ধরনের হাড়বিশিষ্ট মাছের মধ্যে যারা বহুকাল আগে প্রথম স্থলাভিযানের সময় বেঁচেছিলো, তাদের পাখনাও মূলত মাডস্কিপারের পাখনার মতো ছিলো। সেই সকল মাছর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সিলাকান্থ।

সিলাকান্থের বহু প্রজাতির প্রাণীকে অশ্মীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এরা আকারে বড় নয়। ৩০ সেন্টিমিটার বা এর কাছাকাছি। কতকগুলো জীবাশ্মে অলৌকিকভাবে এদের প্রতিটি আঁশ ও পাখনারশ্মির বিশদ নমুনা সংরক্ষিত রয়েছে। ইলিনয় রাজ্যের শিলায় একটি কিশোর বয়সের সিলাকান্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার পেটের নিচে রয়েছে ডিম্বথলে। এটিকে খালি চোখে দেখা যায়। ৪০ কোটি বছরের পুরনো শিলায় এদের প্রচুর সংখ্যক জীবাশ্ম পাওয়া যায়।

কিন্তু এর পর এদের সাক্ষাৎ মেলে কালেভদ্রে। ৭ কোটি বছরের আগেরকার শিলায় এদের একটি জীবাশ্মও পাওয়া যায় নি। স্থলাগমনের সময় যখন তাদের সমৃদ্ধি ঘটেছিলো তখন তাদের নিশ্চিতভাবেই সদৃশ পাখনা ছিলো উপাঙ্গর। সম্ভবত এরাই প্রথম প্রাণী যাদের থেকে প্রথম স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছিলো। কাজেই ওদের জীবাশ্ম খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ করা হয়। ঠিক কিভাবে ওরা চলা রপ্ত করেছিলো এবং কিভাবে ওরা শ্বসন চালাতো তা বের করাই ছিলো গবেষণার লক্ষ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ সমস্যার সমাধান নিশ্চিতভাবে কখনো জানা যাবে না বলে সবাই একমত পোষণ করেন। কারণ স্থলজয়ী সে সকল মাছেরা বহু বহু আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

১৯৩৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মৎস্য শিকাররত এক ট্রলার একটি অদ্ভুত মাছ ধরে আনে। মাছটি বড়। প্রায় দুই মিটার লম্বা। চোয়াল বেশ মজবুত। আঁশগুলো ভারী ও শস্ত্রমণ্ডিত। পূর্ব লন্ডনে মাছটিকে ট্রলার থেকে নামানো হলে স্থানীয় মিউজিয়ামের কিউরেটর মিস কার্টেনে ল্যাটিমার মাছটি দেখতে আসেন। তিনি মৎস্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু কিম্ভূত এই মাছটি দেখে তাঁর মনে বদ্ধমূল ধারণা হলো যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাছ হিসেবে বিবেচিত হবে। ল্যাটিমার গ্র্যাহামসটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের আফ্রিকার মৎস্য বিষয়ের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ প্রফেসর জে. বি. এল স্মিথ-কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে চিঠি লেখেন। প্রফেসর মাছটিকে দেখার আগেই এটি এতো বেশি পচে গেলো যে এর অধিকাংশ ফেলে দিতে হলো। অর্থাৎ প্রফেসর শেষ পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ পচা-গলা মাছই দেখতে পেয়েছিলেন। এতদসত্বেও, মাছটি আকার বড় থাকায়, তিনি সহজে সিলাকান্থকে শনাক্ত করতে সক্ষম হন। তিনি এর নাম দিলেন ল্যাটিমারিয়া এবং পৃথিবীকে এই তাজ্জব খবর জানালেন যে আমাদের ধারণায় ৭ কোটি বছর আগে বিলুপ্ত প্রাণী সিলাকান্থ-এর অস্তিত্ব এখনো পৃথিবীর জলাশয়ে রয়েছে।

শতাব্দীর সাড়া জাগানো এই আবিষ্কারকে বিলুপভাবে স্বাগত জানানো হয় এবং আর একটি সিলাকান্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রভূত গবেষণা কাজ উত্তরোত্তর পরিচালিত হয়। আফ্রিকার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলস্থ সমুদ্রোপকূলের অগুণতি জেলে গ্রামে ল্যাটিমারিয়ার ছবি সম্বলিত লিফলেট ও পোস্টারে একটি মাছের জন্য বিশাল অংকের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়। মনে করা হলো যে বিস্ময় মাছের আবির্ভাব ঘটেছিলো একেবারে হারিয়ে যাবার জন্যে। ১৪ বছর পর কিন্তু আরেকটি মাছ ধরা পড়লো। ধরা পড়লো দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে হাজার মাইল দূরে আনজোয়ানে। আনজোয়ানো কমোরো দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত একটি দ্বীপ। ভারত মহাসাগরের বুকে, তানজানিয়া সমুদ্রোপকূল ও মাদাগাস্কারের মাঝামাঝি স্থানে দ্বীপটি অবস্থিত। মনে হয় প্রথম মাছটি তাদের কাছে আকস্মিক ছিলো না, কারণ কমোরোর জেলেরা বলতেন যে সিলাকান্থ তাঁদের কাছে আগন্তুক নয়। তাঁরা প্রতিবছর ২০০-৩০০ মিটার গভীর সমুদ্র থেকে ফি বছর বা ঋতুতে ১/২টি মাছ ধরতেন। তাঁরা স্বেচ্ছায় এ মাছ শিকার করতেন না কারণ সিলাকান্থ বড্ড লড়াকু মাছ। বড়শিতে গাঁথলে একে বিধ্বস্ত করে নৌকায় তুলতে একটা লোকের কয়েক ঘণ্টা সংগ্রাম করতে হয়। এতো কষ্ট স্বীকার করার পর দেখা যায় যে এর মাংস তৈলাক্ত এবং বিশেষ করে খেতেও ভালো নয়। তবে কমোরোবাসীদের কাছে সিলাকান্থের খুব মূল্যবান অংশ হলো এর কর্কশ ভারী আঁশগুলো। রাবার টিউবের ছিদ্র সাড়ানোর সময় রাবার ঘষার জন্য এই আঁশ খুব কাজ আসে।

সে সময় থেকে এ পর্যন্ত কয়েক ডজন সিলাকান্থ ধরা হয়েছে। স্ববিরোধী হলেও এটা সত্যি যে বিজ্ঞান বহুলপ্রাপ্ত মাছেদের চেয়েও ল্যাটিমারিয়া সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে পেরেছে। গর্ভবতী এক সিলাকান্থ ধরা হয়েছিলো। এর কুসুম থলে সংলগ্ন ছিলো শিশু সিলাকান্থ। যেমনটি ইলিনয় জীবাশ্মে ধরা পড়ছিলো। এতে প্রমাণিত যে এরা ডিম পাড়ে না, বাচ্চা প্রসব করে। এরা খুব শক্তিশালী। কাজেই এ ধরনের দুর্দম সংগ্রামী মাছকে গভীর সমুদ্র থেকে টেনে তুলতে তুলতে এরা মারা যায়। ফলে জীবিত সিলাকান্থকে বেলাভূমিতে নিয়ে আসার ঘটনা খুবই কম। একটি জীবন্ত মাছ ডাঙায় তোলার লক্ষ্যে কমোরো দ্বীপে অনেক অভিযাত্রীদল অভিযান চালায়। একটি ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল একটাকে জীবন্ত অবস্থায় কোনোরকমে পাকড়াও করে তীরে এনেছিলো। যদিও একে বড়শিতে গাঁথা হয়েছিলো কয়েক ঘন্টা আগে। তীরে উঠানোর সময় মৃতবৎই ছিলো। তাঁরা একে জলে রেখে উপর থেকে ছবি তোলে। মাছটি তখন মৃদু নড়ছিলো। কিন্তু তারা এর বেশি বিশদ কোনো বিবরণ ছবিতে ধরতে পারেনি।

আমরা নিজেরাই অন্য এক অভিযানে, সিলাকান্থ অনুসন্ধানে, যে অঞ্চলে সিলাকান্থ প্রায়ই ধরা পড়তো, সে অঞ্চলে গিয়ে, সমুদ্রের তলদেশে অতি সংবেদী ইলেকট্রন ক্যামেরা নিচে নামিয়ে, রাতের পর পর চেষ্টা চালিয়েও বিফল হই। দ্বীপ ছেড়ে আমার ঠিক আগে, একটি জেলে তার নৌকার পাশে বেঁধে একটি সিলাকান্থ নিয়ে আসে। এটিও মৃতপ্রায় ছিলো। জেলেকে বুঝিয়ে মাছটিকে উপসাগরে ছেড়ে দেখানো হলো। সমুদ্রের তলার উপর দিয়ে সিলাকান্থের সাঁতার কাটার দৃশ্য তোলার পর্যাপ্ত সুযোগ পাওয়া গেলো। জলের নিচে ক্যামেরায় অনেক ছবি তোলা হলো। দেখা গেলো সিলাকান্থ তার মজবুত বক্ষ পাখনাকে দেহের পাশ থেকে দূরে রেখে সাঁতার কাটে। এটি অনুমান করতে কষ্ট হলো না যে, যদি সে পূর্ণ প্রাণশক্তি নিয়ে সাঁতার কাটতে পারতো তাহলে তার সত্যিকারের পরিবেশে শিলামণ্ডিত সমুদ্রতলায় চলার জন্যে এই বক্ষ পাখনাকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারতো। এ ছাড়া, এটিও পরিষ্কার যে, যান্ত্রিক অর্থে, এ ধরনের পাখনা জলের বাইরেও চলায় মাছকে সত্যিকারভাবে সাহায্য করতে পারবে। অগভীর জলে, আটকে পড়া এদের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা যেভাবে পাখনার সাহায্যে ডাঙা জয় করেছিলো, এরাও এই পাখনার সাহায্যে তা করায় সক্ষম হতো।

আদি মাছেরা তাহলে জলের বাইরে শ্বসনের সমস্যা কি করে সুরাহা করলো? মাডস্কিপারেরা মুখে পানি নিয়ে, মাথা ঘুরিয়ে, মুখের ভিতরের আবরণে জলকে ফুলকুচা করে এবং এভাবে জল থেকে অক্সিজেন টেনে নেয়। এরা ভেজা ত্বকের সাহায্যেও বায়ু থেকে সরাসরি অক্সিজেন শোষণ করে। কিন্তু এসব কৌশল অবলম্বন করেও এরা জলের বাইরে থাকতে পারে ক্ষণকালের জন্যে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওদেরকে জলে নেমে ত্বক ভেজাতে হয় ও মুখে জল নিতে হয়। এ ব্যাপারে জীবিত সিলাকান্থও কোনো সদুত্তর জোগাতে পারেনি। কারণ এদেরকে গভীর জল ছেড়ে যেতে দেখা যায় না। যাহোক, আবার অন্য একটি জীবিত প্রাণীর আলোচনায় আসবো যার কাছে এ সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে।

আফ্রিকার নদীসমূহের বন্যাসৃষ্ট সমতলের চারপাশে বহু হাওড় রয়েছে যেগুলো শুখা মৌসুমে খর রৌদ্রতাপে শুকিয়ে খরখরে হয়ে যায়। এর মধ্যেও লাঙফিশ ঋতুর পর

ঋতু বায়ুতে শ্বসন চালিয়ে বেঁচে থাকে। যখন জলাশয় শুকাতে থাকে তখন এরা কাদা খুঁড়ে নিচে চলে যায়। কাদা শুকিয়ে যখন শেষ জল বিন্দুও নিঃশেষিত হয় তখন মাছের শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থ শুকিয়ে মোটা কাগজের মতো হয়। বিশির ও অন্যান্য আদি মিঠাপানির মাছে অন্ত্র থেকে একটি থলে সৃষ্টি হয় যার সাহায্যে ওরা শ্বসন চালায়। লাঙফিশে এরকম এক জোড়া থলে থাকে। জল না থাকলে ওরা শ্বসনের জন্য পুরোপুরি এই থলেদ্বয়ের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। গত খুঁড়ে নিচে নামাকালে ওরা কাদায় এক সেন্টিমিটার পরিমাণ বা এরও বেশি একটি নল মুক্ত রাখে নলটি গুটিয়ে থাকা মাছের সাথে যুক্ত থাকে। কণ্ঠদেশের পেশি পাম্প করে মাছ বাতাস নিয়ে আসে গর্ত থেকে এবং তা থলেতে জমা করে। থলের প্রাচীর বেশ পুরু এবং এতে থাকে রক্তনালি। রক্তনালি অক্সিজেন শোষণ করে থলের বাতাস থেকে। এই অঙ্গকে সাধারণ ফুসফুস বলা যায়। এর সাহায্যে লাঙফিশ কয়েক মাস, এমনকি কয়েক বছরও বেঁচে থাকতে পারে।

বৃষ্টি নামলে জলাশয় জলে পূর্ণ হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লাঙফিশ যেন জীবন ফিরে পায়। এরা গুটিমুক্ত হয়। কাদা নরম হলে এরা উঠে আসে এবং সাঁতার কাটে। স্বাভাবিক মাছের মতো এরা ফুলকা দিয়ে শ্বসন চালায় কিন্তু বিচিরের মতো এরা ফুসফুসও ব্যবহার করে। এরা ঘন ঘন জলপৃষ্ঠের উপর থেকে বাতাস গ্রহণ করে। এই সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া তাদের জন্য খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় যখন জলাশয়ের জল ঘোলা হয়ে যায় এবং জলে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

আফ্রিকায় ৪ প্রজাতির, অস্ট্রেলিয়ায় ১ প্রজাতির ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অপর ১ প্রজাতির লাঙফিশ পাওয়া যায়। অবশ্য ৩৫ কোটি বছর আগে এরা প্রচুর সংখ্যায় ছিলো। যে ধরনের মাটির স্তরে সিলাকান্থদের জীবাশ্ম পাওয়া যায় সে ধরনের স্তরে এদের জীবাশ্মও কখনো কখনো পাওয়া যায়। এই দুই দলের মধ্যে, প্রাচীন স্থল বিজয়ী মাছেদের অনেক গুণাবলি দেখা যায়। তবে এই মাছের কোনো উত্তরসূরি শেষপর্যন্ত স্থলভাগে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। প্রথমে অশ্মীভূত উভচর প্রাণীর করোটির হাড়ের সাথে এদের করোটির হাড়ের পার্থক্য অনেক বেশি। এই মাছ থেকে অশ্মীভূত উভচর প্রাণীর উদ্ভব ঘটা সম্ভব নয়। কাজেই এই দুই মাছের কোনোটি প্রাণীর স্থলবিজয়ে অবদান রাখতে পারেনি।

যাহোক। সেই আদি ক্রান্তিকালের ভূস্তরে তৃতীয় আরেকটি মাছের সন্ধান পাওয়া যায়। সিলাকান্থ ও লাঙফিশ যে বিশাল দলে অন্তর্ভুক্ত এই মাছটিও সেই দলের অধীন। সিলাকান্থের মতো এরও উপাঙ্গের মতো পাখনা রয়েছে এবং পাখনার গোড়ায় রয়েছে মাংসল পেশি। লাঙফিশ-এ যেমন অন্ত্র থেকে শ্বসনের জন্য থলে উদ্ভূত হয়েছে, এই মাছেও সেরকম শ্বসন থলে আছে। এর করোটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সিলাকান্থ বা লাঙফিশে নেই। মুখের তালুতে রয়েছে নাসারন্ধ্রের মতো রন্ধ্র। স্থলভাগের সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আদি স্থলবিজয়ীদের সঙ্গে এই মাছ নিকট সম্পর্কিত।

এই প্রাণীটিকে ইউসথেনোপটেরন বলা হয়। এর জীবাশ্মকে পাতলা খণ্ড করে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই কৌশলে এর শারীরবিদ্যা সম্পর্কে বিশদ জানা গেছে। এমন কি রক্তবাহী নালিরও বিশদ বিবরণ ধরা পড়েছে। অশ্মীভূত প্রাণীর পাখনা খুব সতর্কভাবে কেটে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পাখনার গোড়াকে মজবুত রেখেছিলো একটি দৃঢ় হাড় যা দেহের খুব

কাছাকাছি অবস্থিত। এই হাড়টির সাথে আরো দুটি হাড় যুক্ত এবং এ ছাড়া রয়েছে এক দল ছোট হাড় ও অঙ্গুলিনলক। এই রকম হাড় রয়েছে স্থলভাগের সকল মেরুদণ্ডীর উপাঙ্গে।

কিন্তু ইউসথেনোপটেরনের পরবর্তী বংশধরদেরকে ডাঙায় আরোহণ করতে এতো শ্রম দিতে হলো কেন? সম্ভবত, আজকের লাঙফিশের মতো ওরা যে জলাশয়ে বাস করতো তা প্রতি বছর শুকিয়ে যেতো এবং এদেরকে অন্যত্র জলের সন্ধানে যেতে হতো। এসময় ওরা পাখনাকে উপাঙ্গের মতো এবং শ্বসন থলেকে শ্বসনের কাজে ব্যবহার করতো। সম্ভবত, মাডস্কিপারের অনুরূপ ওরাও অন্যান্য খাদ্যোৎসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতো। কারণ এ সময়ে স্থলভাগে পর্যাপ্ত সংখ্যক কৃমি, কীট, শামুক ও পতঙ্গ ছিলো। এমনো হতে পারে, স্থলভাগের নিরাপদ জীবন ওদের আকর্ষণ করেছিলো। যেহেতু এই কালে সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেনি, সেহেতু ডাঙার পরিবেশ তাদের বসবাসের জন্য আদর্শ ছিলো। সম্ভবত সবগুলো কারণেই তাদেরকে স্থলবিজয়ে উজ্জীবিত করেছে। যে কোনো লোভের বশে বা যে কোনো কারণে জলের বাইরে ওরা আসুক না কেনো, খাদ্যের খোঁজে খুঁড়িয়ে চলা হাজার হাজার মাছ ডাঙায় ক্রমে চলায় ও শ্বসনে দক্ষ হয়ে ওঠে।

যে জলাভূমির মধ্যে দিয়ে ওরা গদাইলশকরি চালে চলতো সেই জলায় হর্সটেইল, ক্লাব মস ইত্যাদি বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য ছিলো। এই গাছগুলো শেষপর্যন্ত কয়লারূপে অশ্মীভূত হয়। কয়লাখনিতে আজকাল যে সকল হাড়ের সাক্ষাৎ মিলে তা ছিলো স্থলভাগের প্রথম মেরুদণ্ডী অ্যাম্ফিবিয়া বা উভচরজাতীয় প্রাণীর।

উভচরদের মধ্যে কতকগুলো ছিলো ভয়ংকর। এগুলো দৈর্ঘ্যে ছিলো ৩-৪ মিটার এবং চোয়ালে শাঙ্কবাকৃতির তীক্ষ্ম দাঁত ছিলো। পরবর্তী ১০ কোটি বছর ওদের রাজত্ব চলে। শেষপর্যন্ত সরীসৃপরা ওদের দাপট খর্ব করে এবং ওরা সংখ্যায় কমে যায়। ফলে, এর পরবর্তী ভূতাত্ত্বিককালে উভচরদের জীবাশ্ম পাওয়া যায় কালেভদ্রে। জীবাশ্মের ইতিহাসে এ জায়গায় একটা বড়ো ফাঁক থেকে গেছে। বর্তমানের উভচরদের সাথে প্রথম দিককার উভচরদের বহু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। আদিকালের উভচর ও সমসাময়িক কালের উভচরদের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ক ধারণা সে কারণে আজো অনুমান-নির্ভর ও বিতর্কমূলক।

বর্তমানে জীবিত স্যালাম্যান্ডার ও নিউটের অবয়ব আদিকালের উভচরদের অবয়ব সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ধারণা উপস্থাপনে সহায়ক। এদের সবগুলোকে একত্রে বলা হয় ইউরোডেল বা পুচ্ছধারী প্রাণীসমষ্টি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকারের প্রাণীটি জাপানের নদীতে বাস করে। কোদালের মতো মাথাবিশিষ্ট এই প্রাণীটি যেন নিশার স্বপন। এর দেহের ত্বক কুঁচকানো এবং দেহে তা ভাঁজ হয় ঝুলে থাকে। চোখ দুটো ছোট বোতামের মতো। এটি দৈর্ঘ্যে দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা। সমসাময়িককালের উভচরদের তুলনায় ব্যতিক্রমী আকার হলেও পূর্বপুরুষদের তুলনায় আকারে ওদের এক চতুর্থাংশ। অনেকগুলো আবার অতি ক্ষুদ্র। পুচ্ছধারীদের মধ্যে খুবই লক্ষণীয় হলো নিউট (Newt)। নিউটরা লম্বায় ১০ সেন্টিমিটার বা তারও কম।

নিউটের পা বিকশিত হলেও এর পা-কে সিলাকান্থ বা মাডস্কিপারের পাখনার সঙ্গে তুলনা করা হয়। নিউটের পা খুব কার্যকর নয়। পা খাট ও সরু। পেছনের পায়ে ভর করে সামনের দিকে যেতে হলে, নিউট দেহকে পাশে হেলিয়ে লাফ দেয়। নিউট বেশির ভাগ সময়

ডাঙাতেই কাটায়। শিলার নিচে লুকিয়ে বা স্যাঁতস্যাঁতে শেওলাপূর্ণ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে ওরা কৃমি, শামুক ও কীট-পতঙ্গ খুঁজে। এসব খেয়ে ওরা বাঁচে। কিন্তু এরা জল থেকে বেশি দূর থাকতে পারে না। কারণ একটাই। এদের ত্বক জলভেদ্য। ফলে, শুষ্ক আবহাওয়ায় এদের দেহ খুব দ্রুত জল হারায় এবং ফলে ওরা মারা যায়। এদের ক্ষেত্রে আরো আশংকার বিষয় হলো অন্যান্য উভচর প্রাণীদের মতো নিউটের মুখ দিয়ে জলপান করার কোনো ব্যবস্থা নেই। ত্বক দিয়ে এরা প্রয়োজনমতো জল শোষণ করে নেয়। শ্বসনের জন্যও এদের দেহকে ভেজা রাখতে হয়। এদের ফুসফুস অপেক্ষাকৃত সরল এবং তা এদের প্রয়োজন মেটানোয় সক্ষম নয়। কাজেই মাডস্কিপারের মতো একে ভেজা ত্বকের মাধ্যমে ঘাটতি মেটাতে হয়। ত্বকের জলভেদ্যতা ও ফুসফুসের শ্বসন ক্ষমতার ঘাটতির কারণে উভচরদেরকে স্যাঁতস্যাঁত ভেজা জায়গায় সীমাবদ্ধ জীবনযাপন করতে হয়। তৃতীয় একটি কারণও ওদেরকে জলের কাছে থাকতে বাধ্য করে। সেটি হলো ডিম। মাছের ডিমেও মতো এদের ডিমের জলরোধী খোলক নেই। ফলে এদেরকে ডিম ছাড়ার জন্যে জলের আশ্রয়ে যেতেই হয়।

প্রজনন ঋতুতে, জলচর জীবনযাপনের পর্যায়ে নিউট একেবারে মাছের মতো আচরণ করে। দেহের বাইরে পা ছড়িয়ে দিয়ে পেশিসমূহকে ক্রমান্বয়ে আন্দোলিত করে এবং পুচ্ছ তাড়না করার মাধ্যমে ওরা সাঁতার কাটে। কতিপয় প্রজাতির পুরুষ মাছে পৃষ্ঠপাখনার মতো ঝুঁটি গজায়। পুরুষ মাছ প্রণয়কালে যেমন বর্ণ ধারণ করে, ঝুঁটিও তেমনি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। ঝুঁটি প্রদর্শনের সময় নিউট পুচ্ছ দিয়ে জলে আঘাত করে এবং ঝুঁটি বাঁকা করে। এভাবে সে স্ত্রী নিউট বা প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ নিউটকে জলের ঝড়ো প্রবাহ পাঠিয়ে ইঙ্গিত দেয়। মাথা ও দেহের পাশের সংবেদী রেখা দ্বারা স্ত্রী বা প্রতিদ্বন্দ্বী সে ইঙ্গিত শনাক্ত করে। এই বৈশিষ্ট্য ওরা মাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এটি পূর্বপুরুষ মাছেদের পার্শ্বরেখা তন্ত্রের অনুরূপ। স্ত্রী নিউট বহু ডিম পাড়ে। জলজ উদ্ভিদের প্রতি পাতায় একটি ডিম সংযুক্ত থাকে। যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়, তখন বাচ্চাকে মা বাবার মতো দেখায় না বরং মাছের মতোই দেখায়। কারণ, তখন এদের পা থাকে না, ফুসফুস দিয়ে ওরা শ্বসনের কাজ চালায় না। শ্বসন চালায় পালকের মতো ফুলকা দিয়ে। এ পর্যায়ে ওদের নাম ব্যাঙাচি।

মধ্য আমেরিকার কতিপয় স্যাল্যাম্যান্ডার জলচর ব্যাঙাচি পর্যায়ে দুই পালাক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনযাপনের সুবিধা ভোগ করে। মেক্সিকোর হ্রদে বাস করা এক প্রজাতির স্যাল্যাম্যান্ডার, স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়মিতভাবে ব্যাঙাচি অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে স্থলচর প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীতে পরিণত হয়। কিন্তু বিশেষ কোনো ভেজা মৌসুমে এ অঞ্চলের হ্রদের জল হ্রাস পায় না ও শুকিয়ে যায় না। তখন এর ব্যাঙাচিতে পালকবৎ ফুলকা থেকে যায়। স্বাভাবিকভাবে যে রকম আকারপ্রাপ্ত হলে ওদের দেহে রূপান্তর সাধিত হয়, তখন ফুলকাযুক্ত এই ব্যাঙাচি আকারে তার চেয়ে বড়ো হয়। এমনকি স্থলচর প্রাণী থেকেও আকারে বড়ো হয়। শেষপর্যন্ত, ব্যাঙাচি অবয়ব নিয়ে থাকার সময় ওরা যৌনভাবে পরিপক্ব হয় এবং প্রজনন করে।

উল্লিখিত হ্রদের কাছাকাছি, এ ধরনেরই একটি প্রাণী পূর্বপুরুষদের মতো পুনরায় জলচর জীবনে ফিরে গেছে। এটি সবসময় ব্যাঙাচি পর্যায়ে প্রজনন ঘটায়। ঘাড়ের দু'পাশের ফুলকাগুলো আরো অনেক শাখায় বিভক্ত হয়ে ঝোপের আকৃতি ধারণ করেছে। আযটেকরা

এই অদ্ভুত প্রাণীর নাম দিয়েছিলো এক্সোলোটল, অর্থ "জলদানব"। ব্যাপার হলো এটি আসলে একটি স্যাল্যাম্যান্ডার। থাইরয়ডের নির্যাস খাইয়ে একে পরীক্ষা করা হয়েছে। থাইরয়ড নির্যাস খাওয়ানো হলে এর দেহের বর্হিফুলকা ঝরে যায় ও ফুসফুসের বিকাশ হয় এবং এর দেহের রূপান্তর সাধিত হয়। তখন একে ফ্লোরিডার গর্ত খুঁড়ে বাস করা স্যাল্যামান্ডারের মতো দেখায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূর উত্তরাঞ্চলে একটি উভচর প্রাণী অবিসংবাদিতভাবে জলচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এর নাম মাডপাপি। এর ফুলকা ও ফুসফুস দুটোই রয়েছে। জলপ্রবাহের তলায় স্থিত বাসায় ওরা ডিম পাড়ে এবং সারা জীবন জলেই কাটায়। কোনো বিজ্ঞানী এই প্রাণীকে উদ্দীপকের সাহায্যে এর দেহে রূপান্তর সাধন করতে পারেন নি। তবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে এর পূর্বপুরুষরা খাঁটি উভচর স্যালামান্ডার ছিলো।

কতিপয় স্যালামান্ডার পুনরায় অধিকতর মৎস্যবৎ জীবনযাপনে ফিরে গেছে। এদের দেহে কেবল পা বিলুপ্ত হয়নি, ফুসফুসও বিলুপ্ত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের এক মিটার দীর্ঘ *Siren*-এর পশ্চাৎপদ হারিয়েছে এবং পুরোপদ কেবল খুব খাটই হয়নি, এতে হাড়ও নেই, আছে কেবল তরুণাস্থি। পুরোপদ চলাফেরার কোনো কাজে লাগে না। একই অঞ্চলের *Amphiuma*-র যদিও চারটি পা এখনো রয়েছে কিন্তু সেগুলো এতোই ক্ষুদ্র যে, খুব সতর্কভাবে না তাকালে দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আসলে এটি দেখতে একেবারে মাছের মতো। স্থানীয়ভাবে এদের নাম কঙ্গো ঈল।

ইউসথেনোপটেরনের উত্তরপুরুষদের স্থলভাবে কলোনি স্থাপনকালে যে সকল প্রাণী পুনরায় জলচর জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছিলো সে সকল স্যালাম্যান্ডারদের দেহে বড় পরিবর্তন দেখা গিয়েছিলো। আমেরিকায় অনেক স্যালামান্ডার ফুসফুস হারিয়েছে, তবু ওরা ভেজা ত্বক ও আর্দ্র মুখাভ্যন্তর প্রাচীরের মাধ্যমে শ্বসনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে পেরেছে। কিন্তু এটি সম্ভব হয়েছে দেহের আকার বৃদ্ধি রোধ করার বিনিময়ে। এ ধরনের শ্বসন ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হতে পারে তখনই যদি দেহের আকার ও আকৃতি এমন হয় যেখানে ত্বকাঞ্চলের বিস্তার থাকে খুব বেশি এবং ত্বকাভ্যন্তরে দেহাংশের আকার হয় নিম্নতম। প্রকৃতপক্ষে ফুসফুসহীন স্যালামান্ডারদের ক্ষেত্রে এরকমটিই দেখা যায়। এদের দেহ সরু ও লম্বাটে এবং এদের কেউ মাত্র কয়েক সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা নয়।

এক দলের প্রাণীরা ইত্যেমধ্যে পা হারিয়ে গর্ত খুঁড়ে মাটির নিচে বসবাসে অভ্যস্ত হয়েছে। তাদের অভ্যন্তরীণ দেহগঠন ইউরোডেল বা পুচ্ছধারীদের থেকে এতো ভিন্ন ও বিশিষ্ট যে এদেরকে Caecillian নামে ভিন্ন বর্গে শনাক্ত করা হয়েছে। এরা পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলেই শুধু বাস করে। বেশিরভাগকেই পাওয়া যায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলসমূহে। এদের দেহ থেকে কেবল পা-ই বিলুপ্ত হয়নি, উরঃচক্র ও শ্রোণীচক্রের হাড়ও বিলুপ্ত হয় গেছে। এদের দেহও খুব লম্বা। ইউরোডেলে কশেরুকার সংখ্যা এক ডজনের মতো বা এর কিছু বেশি, কিন্তু সিসিলিয়ানে এই সংখ্যা ২৭০-এর মতো। চোখের ব্যবহার খুব কম। গর্ত খুঁড়ে এরা মাটির নিচে বাস করে। কখনো ত্বক দ্বারা চোখ ঢেকে যায়। দৃষ্টিশক্তির বিনিময়ে কতিপয় প্রজাতির প্রাণীতে চোয়ালের কোণ বৃদ্ধি পেয়ে ছোট স্পর্শীতে পরিণত হয়েছে।

সিসিলিয়ানদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কম। এরা কদাচিৎ দিনের আলোয় বাইরে আসে। নিশাচর এই প্রাণী কখনো খোঁড়াখুঁড়ির ফলে হঠাৎ দিনের আলোয় বেরিয়ে পড়লেও একে

উজ্জ্বল বর্ণিল কেঁচো বলে ভ্রম হবে। কেঁচো পচা শাক-সবজি খায়। কিন্তু এরা মাংসাশী। শিকারী প্রাণীর মতো এদের চোয়াল। চট্ করে ওরা বড়ো হাঁ করে। আপনি যদি সাধারণ নিরীহ কৃমিকীট মনে করে একে নাড়াচাড়া করেন, তাহলে তা আপনার জন্য বিপদ হতে পারে।

জানামতে, সিসিলিয়ান প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১৬০ এবং ইউরোডেল বা পুচ্ছধারী উভচরের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ৩০০। বর্তমানে জীবিত অধিক সংখ্যক উভচর তৃতীয় দলভুক্ত। এরা পুচ্ছহীন এবং এদের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ২৬০০। পুচ্ছহীন উভচরদের আনুরান (Anuran) বলা হয়।

পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে দুই প্রকারের অ্যানুরান রয়েছে। মসৃণ ঈষৎ ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে ত্বকের আনুরান যাদের আমরা সোনা ব্যাঙ বলি এবং দ্বিতীয় প্রকার অ্যানুরান হলো কুনোব্যাঙ, যাদের ত্বক অমসৃণ, উদ্ভেদযুক্ত ও শুষ্ক। পার্থক্য কেবল ত্বকের বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে যেখানে বেশিরভাগ আনুরানের বাস, সেখানে দুই বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যের আনুরান রয়েছে যাদেরকে সোনা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ দুটোই নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।

সিসিলিয়ানদের মতো এদের দেহ লম্বা হবার পরিবর্তে এরা খাট দেহ ধারণ করেছে। এদের কশেরুকাসমূহ একত্রে মিশে গেছে। এরা পা হারানো দূরের কথা, বরং পায়ের বিকাশ ঘটেছে লক্ষণীয়ভাবে এবং কোনো কোনোটি বিশাল লাফ দেওয়াতেও পারঙ্গম। আনুরানদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় হলো পশ্চিম আফ্রিকার গোলিয়াথ সোনা ব্যাঙ। এটি তিন মিটার দূরত্বে লাফ দিতে পারে। বিস্ময়ের ব্যাপার, যদি দেহের আকার বিবেচনা করা হয়, তাহলে আকারের তুলনায় ছোট ছোট ব্যাঙও গোলিয়াথ সোনা ব্যাঙের চেয়ে অধিক দূরত্বে লাফ দিতে পারে। বৃক্ষচারী গুটিকয় প্রজাতির ব্যাঙ বাতাসে ভর করে ১৫ মিটার বা এরও বেশি গড়িয়ে চলে যেতে পারে। এই দূরত্ব ব্যাঙটির দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় শতগুণ বেশি। এদের আঙুলগুলো খুব লম্বা এবং দুই আঙুলের ফাঁকে ত্বক প্রসারিত হয়ে সব আঙুলকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। দেখতে মনে হয় ছোট খাট প্যারাসুট। গাছের কোনো শাখা থেকে লাফ দিলে লিপ্তপদটি এমনভাবে ছড়িয়ে থাকে যাতে ব্যাঙ হুট করে নিচে পড়ার চেয়ে ধীরে ধীরে প্লেনের মতো অন্য গাছের উপরে নামতে পারে।

ব্যাঙ মাটিতে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাওয়ার জন্যে লাফ দেয় না। এটি শত্রু থেকে পলায়নেরও একটি ফলপ্রসূ কৌশল। এটি এতই বিস্ফোরণের মতোও বিস্ময়কর যে, মানুষ বা ক্ষুধার্ত পাখি বা সরীসৃপের পক্ষে একে ধরা খুবই কঠিন কাজ। অ্যানুরানদের দেহ নরম এবং এদেরকে সহজে আহত করা যায়। উপাদেয় খাদ্য হিসেবে ওরা সবারই শিকার। কাজেই এদেরকে আত্মরক্ষার জন্য সম্ভাব্য নানা প্রকার কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। অনেকেই আত্মগোপনের কৌশলকে নির্ভরযোগ্য মনে করে। কোনোটির গায়ের রঙ সবুজ এবং এরা পিচ্ছিল সবুজ পাতার উপর গুটি মেরে বসে থাকে। কোনটির গায়ে বাদামি ও ধূসর রঙের ছোপ। এরা বনের মাটিতে ঝরা পাতার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে পড়ে থাকে। বর্ণচোর এই প্রাণীদেরকে অন্য প্রাণীরা পাতা বলে ভ্রম করে।

কিন্তু কতকগুলো অ্যানুরান শত্রুকে সরাসরি মোকাবেলা করে। ইউরোপের সর্বত্র লভ্য কুনো ব্যাঙ যখন সাপের মুখোমুখি হয় তখন দেহকে ফুলায় এবং পায়ের আঙুলের ডগার ভর

করে দাঁড়িয়ে যায়। যেনো মনে হঠাৎ করে একটা কিছু গজিয়ে উঠলো। ফলে ধরতে আসা সাপ বিভ্রান্ত হয়। আগুন উদরী কুনো ব্যাঙ, বিপদ বুঝলে, হঠাৎ উল্টে যায় এবং উদর প্রদর্শন করে। উদরে হলুদ ও কালো রঙ জ্বলজ্বল করে। এ ধরনের রঙের সমাবেশ প্রাণীদের মধ্যে সাধারণ ভীতি সঞ্চারক বলে প্রমাণিত। আগুন উদরী শুধু প্রতারণাই করে না। এটির অন্য গুণও আছে। সব উভচর প্রাণীর ত্বকে মিউকাস গ্রন্থি রয়েছে। গ্রন্থি নিঃসৃত পিচ্ছিল পদার্থ ত্বককে আর্দ্র রাখে। আগুন উদরের ত্বকের কতিপয় গ্রন্থি তেতো বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কমপক্ষে বিশ ধরনের সোনা ব্যাঙ এই কৌশলের সাথে আরো মাত্রা যোগ করেছে। এদের ত্বক নিঃসৃত বিষ এতোই মারাত্মক যে এর প্রভাবে একটি পাখি বা বানর মুহূর্তের মধ্যে পঙ্গু হয়ে পড়তে পারে। এরা শত্রুর গ্রাসে পরিণত হবার পর বিষের প্রভাবে শত্রুর ভবলীলা সাঙ্গ হলেও সোনা ব্যাঙের তাতে কোনো ফায়দা নেই। কাজেই এরা দেহে চমক লাগানো প্রকট বর্ণের সমাবেশ ঘটিয়েছে। কেবল হলুদ ও কালো রঙ নয়। টুকটুকে গাঢ় লাল, প্রবাল সবুজ ও বেগুনি লাল রঙে ওরা সাজে। সুরক্ষামূলক বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতার বদৌলতে, এই সোনা ব্যাঙগুলো অন্যদের মতো আচরণ করে না। এরা রাতে সক্রিয় না থেকে দিনের আলোতেই সক্রিয় হয়। অরণ্যের ভূমিতে ওরা সাহসের সাথে ঘুরে বেড়ায়। প্রবাল আত্মবিশ্বাস নিয়ে ওরা চমৎকার জীবনযাপন করে।

ইতিহাসের আদিকাল থেকে উভচরেরা শিকারী। এরা কৃমি, পতঙ্গ ও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী শিকার করে। শিকারের অন্বেষাতেই একদিন ওরা জল থেকে ডাঙায় উঠে এসেছিলো। বড় ও শক্তিশালী শিকারীর আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও ওরা আজো শিকারী প্রাণী। তবে বড়দের দাপটের কারণে ওদেরকে সতর্ক আচরণ প্রদর্শনে বাধ্য করে। এখনো কোনো কোনোটি ভয়ংকর প্রকৃতির। দক্ষিণ আমেরিকার হর্ন টোড (Horn toad)–এর হাঁ এতো বড়ো যে এর মধ্যে সহজে পাখির ছানা ও ইঁদুর ছানা ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু উভচরদের কোনোটিকে সত্যিকারের দ্রুতগামী বা অধিক তৎপর প্রাণী বলা যাবে না। শিকার ধরায় দ্রুতির চেয়ে ওরা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে। সেই অন্য কিছু হলো জিহ্বা।

প্রসারণক্ষম জিহ্বা কেবল উভচর প্রাণীতেই উদ্ভাবিত হয়েছে। কোনো মাছে এ ব্যাপারটি ঘটে না। আমাদের মতো ওদের জিহ্বা গোড়ায় লাগানো থাকে না। ওদের জিহ্বা গোড়ায় মুক্ত এবং আগায় লাগানো থাকে। সোনা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাঙ জিহ্বাকে মুখ থেকে বাইরে দূরে ছুঁড়ে দিতে পারে, যা আমরা পারি না। ধড়হীন, ধীরগতির, শিকারী উভচর প্রাণীর জন্য এই চাতুর্য খুবই ফলপ্রসূ। জিহ্বা দিয়ে ওরা একটা কীট বা শামুক ধরে তা মুখের মধ্যে পুরে দেয়।

হর্ন টোডসহ বহু উভচর প্রাণীতে কার্যকর দাঁতের সারি রয়েছে চোয়ালে। এই দাঁতের ব্যবহার আত্মরক্ষার জন্যে অথবা শিকার চেপে রাখার জন্যে। খাদ্য চিবিয়ে অনায়াসে শিকার গলাধঃকরণের জন্যে বা খাওয়ার অযোগ্য শক্ত খাদ্যকে ছিঁড়ে আহার উপযোগী করার জন্যে এই দাঁত কাজে আসে না। উভচর প্রাণী চিবুতে পারে না। একারণে কুনো ব্যাঙ কীটের এক অংশ মুখে ধরে রেখে বাকি অংশ থেকে পুরোপদ দিয়ে আবর্জনা বা মাটি ঝেড়ে ফেলে। জিহ্বা প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণের মাধ্যমে খাদ্য গেলার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। শ্লেষ্মা খাদ্যকে পিচ্ছিল করে। ফলে খাদ্য গলা দিয়ে নামানোর সময় গলায় নরম আবরণ ছিঁড়ে যায় না। জিহ্বা অবশ্য খাদ্য গলায় ঠেলে দেওয়ায়ও যাহায্য করে। এ কাজে চোখও সাহায্য করে। দেখা যায় ব্যাঙ আহার গেলার সময় চোখ পিটপিট করে। এদের চোখের কোটরের নিচে হাড়

নেই। যখন চোখ বন্ধ করে তখন চক্ষুগোলক করোটিতে নেমে আসে এবং মুখগহ্বরের তালুতে একটি বেলুনের মতো অংশে পরিণত হয়, যা খাদ্যকে সংকুচিত করে গলায় নামাতে সাহায্যে করে।

উভচরের চোখের মৌলিক গঠন পূর্বপুরুষ মাছেদের চোখের গঠনের অনুরূপ। জলের ভিতরে মাছের চোখ যেভাবে কাজ করে, বাইরেও একইভাবে সক্রিয় থাকে। তবে বায়ুতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য এতে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কারণ বায়ুতে কাজ করতে হলে চোখের উপরিভাগকে পরিষ্কার ও মসৃণ রাখা অপরিহার্য। ফলে এরা চোখ বোঁজায় সক্ষমতা লাভ করেছে এবং চক্ষুগোলকের উপর দিয়ে একটি পর্দা ওঠা-নামার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাতাসে ধ্বনি তরঙ্গ ধরার জন্য ওরা যে অঙ্গ ব্যবহার করে, তা একেবারে অনন্য। মাছ দেহে যে প্রক্রিয়ায় ধ্বনি তরঙ্গ ধারণ করে তা বাতাসে খুব একটা কার্যকর নয়। মাছ দেহে ধ্বনি তরঙ্গ অনুভব করে। কতিপয় ক্ষেত্রে এই ধ্বনি গ্যাসপূর্ণ ফাতনার সাহায্যে বিবির্ধত হয়। ব্যাঙে কর্ণপটহ বিকাশলাভ করেছে। কর্ণপটহ বাতাসে সুষ্ঠুভাবে ধ্বনি কম্পন শনাক্ত করতে পারে।

শোনার ক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে ওদের মধ্যে শব্দ প্রক্ষেপণের ক্ষমতাও হয়েছে। সোনা ও কোনা ব্যাঙ খুব চৌকষ গায়ক। স্বররজ্জুর ভেতর দিয়ে ফুসফুস বাতাস প্রবাহিত করে। খুবই সরল পদ্ধতিতে এটি ঘটে থাকে যদিও তুলনামূলকভাবে স্বর প্রক্ষেপিত হয় মৃদুভাবে। অবশ্য অনেক ব্যাঙ গলা বিশালভাবে ফুলিয়ে বা শব্দ প্রক্ষেপক থলের সাহায্যে শব্দ বিবর্ধন করে। চোয়ালের কোনা থেকে শব্দ প্রক্ষেপক থলের সৃষ্টি। গ্রীষ্মমণ্ডলের কোনো জলায় সোনা ব্যাঙের দল জড়ো হয়ে এমন সোরগোল তুলতে পারে যে তার মধ্যে মানুষের উচ্চকিত কণ্ঠও তলিয়ে যায়। বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙ বিচিত্র ধরনের শব্দ উৎপাদন করে। যারা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে ব্যাঙের ডাক শুনেছে তাদের মনে এই শব্দ বিস্ময় জাগায়। কোনোটির শব্দ আর্তনাদের, কোনোটির শব্দ ইস্পাতে ঠোক্কর লাগার কোনোটি কেঁউ কেঁউ, কোনোটি ঢেকুর তোলার মতো ও কোনোটি বিলাপের মতো একটানা শব্দ তুলে। অনুমান করতে অবাক লাগে, যদি আপনি কোনো জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে কান বোবা করা বিস্ময়কর সমবেত শব্দরাজি শুনতে থাকেন, তাহলে ভেবে দেখুন একদিন এই শব্দই ছিলো ডাঙায় প্রথম আবির্ভূত উভচরদের। এর আগে ডাঙায় কেবল পতঙ্গের খচখচ ও বোঁ বোঁ আওয়াজ ছাড়া কিছুই ছিলো না। অবশ্য, উভচরদের উদ্ভবের পর কোটি কোটি বছরের মধ্যে ওদের শব্দসৃজনেও নানান পরিবর্তন ঘটে গেছে।

উভচরদের সমবেত সঙ্গীত যখন কোনো জলাশয় বা ডোবা থেকে ভেসে আসে তখন বুঝতে হবে ওদের মিলনলগ্ন আসন্ন। সঙ্গীতের মাধ্যমে সবাইকে একত্রিত হবার এবং প্রজননের ঘোষণা জারি হয়। উভচরদের অধিকাংশ এখনো জলে সঙ্গম সম্পন্ন করে যদিও পুরুষ যথাযথ নিয়মে স্ত্রী ব্যাঙকে আঁকড়ে ধরে, কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ব্যতীত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষেক সম্পন্ন হয় দেহের বাইরে। মাছের শুক্রাণুর মতো এদের শুক্রাণুও সাঁতরে ডিম্বের কাছে যায়। সাঁতারের জন্য জল অপরিহার্য। নিষেক পর্ব শেষে পুরুষরা ডাঙায় ফিরে আসে।

পরিত্যক্ত নিষিক্ত ডিমসমূহ বিপদের মুখে পড়ে। ডিমের বাইরে খোলক নেই। এগুলো পতঙ্গের শূককীট ও চেপ্টাকৃমির সহজলভ্য খাদ্য। যেগুলো রক্ষা পায় এবং ডিম ফুটে বাচ্চা

হয় সেগুলোও জল বিটল, ড্রাগন মাছির শূককীট ও নানা ধরনের মাছের গ্রাসে যায়। ডিম ও পোনার মৃত্যুহার খুব বেশি। আবার ডিম পাড়ার সংখ্যাও তেমন বিশাল। একটি স্ত্রী কুনো ব্যাঙ এক ঋতুতে ২০,০০০ ডিম পাড়ে। এক জীবনে সে চারভাগের এক কোটি বা ২৫ লক্ষ ডিম পাড়ে। এগুলোর মধ্যে কেবল দুটো পোনা যদি প্রাপ্তবয়স্ক হবার সুযোগ পায় তাহলেও উভচরের সংখ্যা-সমতা বজায় থাকে। টিকে থাকার এই কৌশল বহু পুরানো। মাছও এই কৌশল নেয়। যে পরিমাণ জীবন্ত কলা ওদের উৎপাদন করতে হয় সে হিসেবে এটা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। ফলে এরা অন্য সম্ভাব্য উপায়ও অনুসরণ করে।

কতকগুলো সোনা ব্যাঙ অন্য কৌশল অবলম্বন করে। এরা তুলনামূলভাবে কম ডিম পাড়ে কিন্তু এদের প্রতি সতর্ক নজর রাখে, যাতে শত্রু থেকে রক্ষা করা যায়। জলার আনুরানদের মধ্যে *Pipa* নামের কুনো ব্যাঙ সারা জীবন জলে জীবনযাপন করে। এদের দেহ চেষ্টা ও মাথা যেনো থেঁতলানো। দেখতে কিম্ভূতকিমাকার ও হাসি উদ্রেককর। সঙ্গমকালে অন্যান্য জলচর আনুরানদের মতো এদের পুরুষ পা দিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে। এরপর শুরু হয় চমৎকার ও মনোহর ব্যালে নৃত্য। স্ত্রী পা দিয়ে জলে তাড়না করে, যাতে ব্যাঙ দম্পতি জলের উপর দিয়ে উঠে আসতে পারে। দৃঢ়ভঙ্গিতে ডিগবাজী খেয়ে আবার নিচে নামে। নামার সময় স্ত্রী কিছু ডিম ছাড়ে যা সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ নিঃসৃত শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। পুরুষ এর লিপ্তপদের ধীর সঞ্চালনে ডিমগুলোকে জড়ো করে এবং ধীরে তা স্ত্রীর পিঠে ছড়িয়ে রাখে। আঙুলগুলো ছড়ানো অবস্থায় লিপ্তপদকে ফ্যানের মতো দেখায়। বার বার এই ধূর্ত প্রক্রিয়া চলে যতোক্ষণ না শতাধিক ডিম স্ত্রীর পিঠে কার্পেটের মতো ছাড়ানো না হয়। ডিমের নিচের ত্বক ফুলে উঠতে থাকে এবং শীঘ্রই ডিমগুলো ত্বকে দেবে যায়। ডিমের উপরে দ্রুত একটি আবরণ সৃষ্টি হয়। ত্রিশ ঘন্টার মধ্যে ডিম চক্ষুর অন্তরালে ঢাকা পড়ে। স্ত্রীর পিঠের ত্বক আবার মসৃণ ও টান টান হয়ে পূর্ববৎ হয়ে যায়। ত্বকের নিচে ডিমের বিকাশ ঘটে। দুই সপ্তাহ পর, স্ত্রীর পুরো পিঠ জুড়ে ব্যাঙাচির নড়াচড়া শুরু হয়। তখন পিঠে যেনো ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। ২৪ দিন পর বাচ্চাগুলো ত্বক ছিদ্র করে জলে বেরিয়ে পড়ে এবং সাঁতার কেটে আত্মগোপনের জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেয়।

অন্যান্য পুকুরবাসী আনুরান আরো কম ঝুঁকিতে পোনাদের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা করতে পারে। পারিবারিক সাঁতারের পুকুরেও কেউ কেউ ডিম পাড়ে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যে যেখানে ভারি বৃষ্টিপাত হয় এবং সারা বছর সর্বত্র বৃষ্টি চলতে থাকে সেখানে বহু গাছের কোটর স্থায়ীভাবে জলপূর্ণ থাকে। Bromliad গোত্রের বৃক্ষের আকৃতি গোলাপের পাপড়ির মতো, যার মধ্যভাগের গভীর পর্যন্ত জলে ভরা থাকে। এই বৃক্ষদের কতকগুলো মাটির উপরে লম্বা কাণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য কতকগুলো অরণ্যের অন্য বৃক্ষের উপর আসন পাতে এবং আর্দ্র বাতাসে শিকড় ঝুলিয়ে দেয়। বৃক্ষের উচুতে এদের কাণ্ডের মাঝে জল জমে ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। সম্ভবত কোনো মাছের পক্ষে এই জলাশয়ে পাড়ি জমানো সম্ভব নয়। কিন্তু সোনা ব্যাঙের পক্ষে তা সম্ভব। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েক প্রজাতির ব্যাঙ এখানে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলে। এই জলাশয়ে ওরা ডিম পাড়ে এবং পুরো বিকাশ পর্যায় এখানেই সম্পন্ন হয়। এখানে ওদেরকে তেমন বিপদের মোকাবেলা করতে হয় না। কয়েকটি পতঙ্গের শূককীটই কেবল তাদের জন্য ক্ষতিকর। ব্রাজিলে ছোট একপ্রকারের সোনা ব্যাঙ অরেণ্যের জলাশয়ের পাশে নিজস্ব একটি জলাশয় নির্মাণ করে। জলাশয়ের চারপাশে তোলে কাদার দেয়াল।

দেয়ালটি উচ্চতায় ১০ সেন্টিমিটার। এই জলাশয়ে ওরা ডিম পাড়ে। ব্যাঙাচিরা নিজেদের পুকুরে অবাধে বিচরণের সুযোগ পায়। বৃষ্টির জলে পাশের প্রধান জলাশয় ভরে উঠলে ওদের নিজস্ব জলাশয় ডুবে যায় অথবা জলাশয়ের দেয়াল ভেঙে যায়।

উভচরদের প্রথম আবির্ভাবকালে ওদের ডিম ও বাচ্চার জন্য তুলনামূলকভাবে নিরাপদ স্থান ছিলো ডাঙা। সে সময়ে ডাঙায় অন্য কোনো মেরুদণ্ডী প্রাণী ছিলো না। ফলে ডিম চুরি যাবার বা বাচ্চা খেয়ে ফেলার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। বরং জলে ওদের শত্রু ছিলো ক্ষুধার্ত মাছের ঝাঁক। যদি উভচররা জলের বাইরে ডিম পাড়ার ব্যবস্থা করতে পারতো তাহলে ওদের বাচ্চাদের অধিক সংখ্যায় বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকতো বেশি। কিন্তু এতে সমস্যা ছিলো। ডিমকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতো কিভাবে এবং জল ছাড়া ব্যাঙাচির বিকাশ হতো কি প্রকারে? প্রাচীনযুগের উভচরেরা এই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলো কিনা আমাদের জানা নেই। যদি তা সম্ভব হয়েছিলো তাহলে ওরা নিশ্চিত করে ডাঙায় ওদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলো অনেক বেশি। বর্তমানে ডাঙায় প্রজনন সম্পন্ন করায় ওদের গরজ খুব বেশি নয়। কারণ এতে ওরা অভ্যস্থ নয়। সরীসৃপ, পাখি এমনকি স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও উভচরদের ডিম ও ব্যাঙাচি পেলে রসিয়ে রসিয়ে খায়। এতদ্‌সত্বেও এখনো অনেক সোনা ব্যাঙ, কোলাব্যাঙ জলে প্রজনন সম্পন্ন করায় সুবিধাজনক মনে করে।

একটি ইউরোপীয় ব্যাঙ প্রজাতি জীবনের বেশিরভাগ সময় গর্তে কাটায়। গর্তটি জলের অদূরে অবস্থিত। প্রজাতির নাম মিডওয়াইফ টোড বা ধাত্রী কুনোব্যাঙ। এরা ডাঙায় সঙ্গম করে। ডিম পাড়া হলে পুরুষ ব্যাঙ ডিম নিষিক্ত করে। ১৫ মিনিট পর পুরুষ ব্যাঙ ডিমের ছড়াগুলোকে পেছনের পায়ে জড়িয়ে নেয়। পরের কয়েক সপ্তাহ সে যেখানেই যাক না কেনো, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ডিমগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। ব্যাঙের চারপাশের জলহাওয়া ভয়ানক শুষ্ক হয়ে গেলে সে আর্দ্র জলহাওয়ায় চলে যায়। ডিম থেকে ব্যাঙাচি বেরোনর সময় হলে ওরা লাফিয়ে জলাশয়ের কিনারায় যায় এবং পেছনের পা জলে ডুবায়। এ অবস্থায় ঘণ্টাখানেক বা এরও বেশি কাটায় যতোক্ষণ না সকল ব্যাঙাচি ডিম থেকে না বেরোয়। পরে সে তার গর্তে ফিরে যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার বিষ সোনাব্যাঙ একই কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ভিন্ন ধরনে সন্তান রক্ষা করে। স্ত্রী ব্যাঙ আর্দ্র মাটিতে ডিম পাড়ে। পুরুষ ব্যাঙ এগুলোর উপর বসে থেকে পাহারা দেয়। ব্যাঙাচি ডিম থেকে বেরোলে এরা কিলবিল করে পুরুষ ব্যাঙের পিঠে চড়ে বসে। ব্যাঙের পিঠ থেকে একধরনের শ্লেষ্মা (mucous) পর্যাপ্ত নিঃসৃত হয়। শ্লেষ্মা ব্যাঙাচিকে পিঠে আটকে থাকায় সাহায্য করে ও শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। ব্যাঙাচিতে ফুলকা থাকে না। এরা ত্বকের সাহায্যে ও প্রসারিত পুচ্ছের সাহায্যে অক্সিজেন শোষণ করে।

আফ্রিকায় এমন সোনা ব্যাঙ আছে যারা বৃক্ষশাখায় ডিম পাড়ে। এরা বেছে নেয় এমন শাখা যেটি জলের উপরে ঝুলে থাকে। সঙ্গমের পর স্ত্রী ব্যাঙ পায়ুপথে একটি তরল পদার্থ নিঃসরণ করে। স্ত্রী ও পুরুষ মিলে এই তরল পদার্থকে পেছনের পা দিয়ে পিটিয়ে ফেনার সৃষ্টি করে। ফেনার এই বলের মধ্যে ডিম পাড়ে। কতিপয় প্রজাতিতে ফেনার চারপাশ শক্ত হয়ে শুষ্ক কঠিন আবরণে পরিণত হয়। তবে ভিতরটা আর্দ্র থাকে। অন্য কতকগুলো প্রজাতিতে স্ত্রী ব্যাঙ নিচের জলাশয়ে বা জলপ্রবাহে নিয়মিত নেমে ত্বক দিয়ে জল শুষে নেয় এবং ডিমের

কাছে আসে এবং ওদের মূত্র দিয়ে ভিজিয়ে দেয়। ফেনার মধ্যেই ফুটে ব্যাঙাচি বেরোয় ও বিকাশ লাভ করে। যথাসময়ে ফেনার পেছনের অংশ তরল হয়ে যায়। তখন ব্যাঙাচি ফেনামুক্ত হয়ে জলে পড়ে।

অন্যান্য ব্যাঙে ডিমের পর্দার বা আরবণের ভিতরে ব্যাঙাচির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। ফলে ব্যাঙাচির বিকাশের জন্য জলের দরকার পড়ে না। মুক্ত সন্তণশীল ব্যাঙাচির জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন এদের জন্যও তেমন খাদ্যের ব্যবস্থা থাকা চাই। ডিমে প্রচুর পরিমাণ কুসুম থাকে যা ব্যাঙাচি ডিমের ভিতরে বিকাশ পর্যায়ে আহার করে। এতে বোঝা যায় যে, স্ত্রী ব্যাঙ একবারে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক ডিম পাড়ে। ক্যারিবিয়ার শিস দেয়া ব্যাঙ বা লুইসলিং ফ্রগ এই উপায় অবলম্বন করে এবং এক ডজন বা তার কিছু বেশি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো পাড়ে মাটির উপর। ব্যাঙাচির বিকাশ ঘটে খুবই দ্রুত এবং বিশদিনের মধ্যে প্রতিটি ডিম থেকে একটি করে শিশু ব্যাঙ উদ্ভূত হয়। ব্যাঙাচির তুণ্ডে থাকা কাঁটা দিয়ে ওরা ডিমের পর্দা ছিদ্র করে বের হয়। বাইরের জলের সাহায্য গ্রহণ না করেও ওদের বিকাশপর্ব সম্পন্ন হয়। মা-বাবার দেহের অভ্যন্তরে ডিম ও বিকাশশীল ভ্রূণকে আর্দ্র রাখার ব্যবস্থা শারীরিক দিক থেকে জটিল এবং তা চূড়ান্ত কৌশল হিসেবে বিবেচিত। দক্ষিণ আমেরিকার একটি সোনা ব্যাঙের নাম গ্যাস্ট্রোথিকা। স্ত্রী ব্যাঙের পিঠে থাকে একটি ডিম্ব থলে। এতে সামান্য ফাঁক থাকে। ডিম ছাড়ার সময় স্ত্রী ব্যাঙের তুলনায় বহরে ছোট পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রী ব্যাঙের পিঠে চড়ে কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে। স্ত্রী ব্যাঙ পেছনের পা উপরে ওঠায়, নাক নিচে নামায়। মনে হয় ডিগবাজী খাচ্ছে। পৃষ্ঠদেশ এ সময় কাত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় সে একটার পর একটা ডিম পাড়ে। পুরুষ ব্যাঙ ডিম নিষিক্ত করে। ডিম গড়িয়ে প্রথমে পিঠের খাদে ও পরে ডিম্ব থলেতে ঢুকে। ডিম্ব থলের মধ্যে ডিমের বিকাশ ঘটে ও ব্যাঙাচির জন্ম হয়। গ্যাস্ট্রোথিকার একটি প্রজাতি একবারে দু'শ ব্যাঙাচি উৎপাদন করে। এগুলো ডিম্বথলের বাইরে এসে জলে নামে। অন্য একটি প্রজাতি একবারে ২০টি ব্যাঙাচির জন্ম দেয় তবে ওদের জন্য বেশি কুসুম বরাদ্দ থাকে। ফলে ওরা ডিম্বথলের ভিতরে ব্যাঙাচি থেকে শিশু ব্যাঙে পরিণত হয়। ওদের মা পেছনের পায়ের সবচেয়ে লম্বা আঙুল দিয়ে ডিম্বথলের ছিদ্র টেনে বড় করে। ফলে শিশু ব্যাঙ ডিম্ব থলে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীতে প্রজনন দেখায় আমাদের অভ্যস্ত চোখে নিচে বর্ণিত জননকৌশল খুবই উদ্ভট ঠেকতে পারে। এই কৌশলটি দেখা গেছে *Rhinoderma* নামের ছোট একটি সোনা ব্যাঙে। ডারউইন চিলির দক্ষিণাঞ্চলে এই ব্যাঙটিকে দেখেছিলেন। স্ত্রী ব্যাঙ আর্দ্র মাটিতে ডিম পাড়ার পর পুরুষ ব্যাঙগুলো ডিমকে ঘিরে দলে দলে পাহারা দেয়। বিকাশমান ভ্রূণ যখন ডিমের ভিতরে নাড়াচাড়া করে পুরুষ ব্যাঙ সামনে এগিয়ে আসে। ভাবসাব দেখে মনে হয় ওরা গিলে খাবে। তবে গেলার পরিবর্তে ডিমকে ওরা স্বরথলের মধ্যে রাখে। স্বরথলে সাধারণত আকারে বড় এবং তা পুরুষ ব্যাঙের বক্ষদেশ পর্যন্ত সম্প্রসারিত থাকে। স্বরথলের মধ্যে ব্যাঙাচির বিকাশ পর্যায় চলতে থাকে। কোনো এক দিন পুরুষ এক দু'বার ঢেকুর তুলে এবং হঠাৎ হাই তুলে। তখন পূর্ণ বিকশিত ব্যাঙ শিশু ওর মুখগহ্বর থেকে লাফিয়ে বের হয়।

জনিতৃজনন বা শিশুর প্রতি যত্ন নেয়ার ঘটনা উভচরদের মধ্যে নেকটোফ্রাইনয়ডস-দের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। একে পশ্চিম আফ্রিকায় পাওয়া যায়। স্ত্রী ব্যাঙ তাদের শাবককে দেহের ভিতরে যেভাবে রাখে তার সঙ্গে গর্ভফুলধারী স্তন্যপায়ীর শাবক ধারণের তুলনা করা

যায়। এই ব্যাঙ দৈর্ঘ্যে মাত্র ২ সেন্টিমিটার। বছরের প্রায় সময়টুকু ওরা শিলার ফাটলে লুকিয়ে থাকে। বৃষ্টি নামলে, এরা দলে দলে বেরিয়ে আসে, সঙ্গম করে। সঙ্গমকালে পুরুষ স্ত্রীর কুঁচকি জড়িয়ে ধরে। পুরুষ তার পায়ু স্ত্রীর পায়ুতে জোরে চেপে ধরে যাতে শুক্রাণু ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। নিষিক্ত ডিম্বাণুকে স্ত্রী বের করে দেয়ার পরিবর্তে ডিম্বনালির মধ্যে রেখে দেয়। ওখানে ব্যাঙাচির জন্ম হয়। ব্যাঙাচির মুখ ও বর্হিফুলকা থাকে। ডিম্বনালির প্রাচীর থেকে সাদা ছোট আঁশের মতো যে বস্তু বের হয় ব্যাঙাচি তা আহার করে। মুক্তপ্রাণী পুকুরে যেমন করে ঠোকরে ঠোকরে ঘাস খায়ব্যাঙাচিরাও ডিম্বনালিতে ওভাবে ঠুকরে ঠুকরে আঁশ খায়। নয় মাস পর যখন বৃষ্টি নামে তখন স্ত্রী ব্যাঙ ব্যাঙাচিদের প্রসব করে। ব্যাঙের পাকস্থলি ও ডিম্বনালিতে সংকোচন ঘটানোর জন্য কোনো পেশি নেই যেমনটি স্তন্যপায়ীর জরায়ুতে থাকে। ব্যাঙ সামনের পায়ের সাহায্যে দেহকে মাটির সঙ্গে সেঁটে ধরে। এরপর ফুসফুসকে ফোলায় স্ফীত ফুসফুস উদরে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। ভিতরে সৃষ্ট প্রচণ্ড বায়ুর চাপে উপরদেশ চুপসে যায়। ফলে, ব্যাঙের বাচ্চারা বেরিয়ে আসে। প্রসব কার্য সম্পন্ন হয়।

আনুরানরা অপ্রচলিত অনেক কৌশলের বদৌলতে সঙ্গম, ডিম্বপ্রসব ও শাবক লালন-পালনে আর্দ্রতার উপর নির্ভরতা অনেক কমিয়ে আনতে পেরেছে। এদের জলভেদ্য ত্বক এখনো নরম। ত্বকের পরিপার্শ্বে আর্দ্র জলহাওয়া থাকা অপরিহার্য। নতুবা এদেরকে শুকিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। দু'একটি প্রজাতি অবশ্য এই প্রয়োজনও অনেকটা কমিয়ে এনেছে।

মধ্য অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে কখনো কখনো বছরের পর বছর বৃষ্টি হয় না। এ ধরনের পরিবেশ উভচরদের জন্য অনকূল নয়। তবু এখানে গুটিকয় ব্যাঙ বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে। সাইক্লোর‍্যান্যা *Cyclorana* নামের জলধারী ব্যাঙ স্বল্প সময়ের জন্য সবিরাম বৃষ্টি ঝড়কালে মাটির উপরে উঠে আসে। মরুভূমির শিলায় তখন কয়েক দিন বা সপ্তাহ ধরে জল থাকতে পারে। বৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে যে সকল পতঙ্গের আবির্ভাব ঘটে ব্যাঙ ওদেরকে পাগলের মতো ধরে ধরে গিলতে থাকে। এ সময় ওরা সঙ্গম করে এবং উষ্ণ জলে ডিম পাড়ে। আশ্চর্যজনক দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিম থেকে ব্যাঙাচি বের হয় এবং ব্যাঙাচি থেকে শিশু ব্যাঙের সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জল চুঁয়ে মরুভূমি শুকিয়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু ব্যাঙ ত্বকের মধ্যে জল শোষণ করে যতক্ষণ না দেহ ফুলে গোলাকৃতির ও ত্বক টন টান না হয়। এরপর এরা নরম বালি খুঁড়ে নিচে নেমে ছোট একটি ঘর বানায়। এখানে এরা একটি পর্দা নিঃসরণ করে। দেখলে মনে হয় বাজার থেকে আনা প্লাস্টিকে মোড়া ফল। এই পর্দা ত্বক থেকে জলমোচন কার্যকরভাবে রোধ করে। যদিও শ্বসনের সময় নিঃসন্দেহে কিছু জল নষ্ট হয়ে যায়। এর নাসা রন্ধ্রের সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল যুক্ত থাকে, যেগুলো পর্দায় বিমুক্ত হয়। এই নল দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন হয়। জীবনের সমস্ত কর্মচঞ্চলতা বাদ রেখে মৃতবৎ অবস্থায় ওরা কমপক্ষে দু'বছর কাটিয়ে দেয়। উভচরদের অনুসৃত এই কৌশল অতি দূরের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়। এদের প্রাচীন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় লাঙফিশেরা একদা এই কৌশল অবলম্বন করতো।

তৎসত্ত্বেও প্রকৃত ঘটনা হলো, ব্যাঙকে তবু বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়। বৃষ্টি যখনই আসুক না কেন, তখনই ওর জীবনচাঞ্চল্য দেখা দেয়। মরুভূমি ভেজা থাকলে ক্ষণকালের জন্য হলেও জীবনের স্পন্দন সত্যিকারভাবে চলতে থাকে। যেখানে বৃষ্টিপাত খুব কম বা আদৌ বৃষ্টি পড়ে না এবং কোনো মুক্ত জলভাণ্ডার থাকে না সেখানে বাঁচার তাগিদে প্রাণীকে সক্রিয় হতে হয়, প্রজনন সম্পন্ন করতে হয়। ফলে এ সকল প্রাণীর জন্যে জলরোধী ত্বক ও জলরোধী ডিম্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। এখানে উভচরের যুগের শেষ এবং পরবর্তী বড় একটি দলের শুরু। যে দলটির নাম সরীসৃপ (Reptiles)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জলরোধী ত্বক

পৃথিবীর একটি অঞ্চলেও যদি সরীসৃপরা এখনো আধিপত্য বজায় রাখে, সে অঞ্চলটি অবশ্যই রয়েছে গ্যালাপাগোজ দ্বীপপুঞ্জে। দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রোকূল থেকে ১০০০ কিলোমিটার দূরে, প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল শূন্যতায় বিচ্ছিন্ন গ্যালাপাগোজ দ্বীপরাজি অবস্থিত। মানুষ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী এ সকল দ্বীপে পৌছানোর চার শতক আগে সরীসৃপরা এখানে এসেছিলো। দ্বীপে সরীসৃপরা স্বেচ্ছায় আসে নি। দক্ষিণ আমেরিকার নদীর জলের তোড়ে ভেসে আসা গাছ-পালা-গুল্মের ভেলায় আশ্রয় নেওয়া সরীসৃপ নদী থেকে সাগরে ভেসে এসেছিলো। এ সকল দ্বীপে মানুষ সে সময় থেকে অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রবর্তন করে আসছে। কিন্তু এখনো ছোট ছোট দূরবর্তী দ্বীপসমূহের শিলাখণ্ডগুলো টিকটিকি, গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপে ভর্তি। তা ছাড়া এখানে রয়েছে বিশাল বিশাল কচ্ছপ যারা ক্যাকটাসের ভিতর দিয়ে হেঁচড়ে চলাফেরা করে। এখানে পা ফেলার পর, আপনার মনে হবে, আপনি বিশ কোটি বছর আগে পিছিয়ে গেছেন যে সময়ে বিবর্তনের চূড়ান্ত বিকাশ পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করছিলো এই জীবেরা।

বিষুবরেখার ওপারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রৌদ্রদগ্ধ গ্যালাপাগোজ দীপপুঞ্জ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে এদের সৃষ্টি। বড়টির উচ্চতা ৩০০০ মিটার। এতো উঁচুতে যে এরা মেঘকে আকর্ষণ করে এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। এদের গায়ে রয়েছে পাতলা ক্যাকটাস এবং ইতস্তত ছড়ানো ধূলিকীর্ণ ঝোপঝাড়। ছোট ছোট দ্বীপগুলোর অধিকাংশই জলহীন। এদের বিলুপ্ত মুখগহ্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জমানো লাভা। এর উপরিভাগ এবড়োখবড়ো, ঢেউ খেলানো। ফাটল থেকে লাভা চুইয়ে পড়ার সময় এরকমটি ঘটেছিলো। বৃষ্টিপাত এখানে কদাচিৎ। বৃষ্টির জল শিলার উপর গড়িয়ে যেতে না যেতেই তা শুকিয়ে যায়। এখানে ছায়া দেবার মতো বৃক্ষ নেই, ঝোপ নেই, মাত্র গুটিকয় ক্যাকটাস, তাও কাঁটাভর্তি। সূর্যতাপে সেদ্ধ কালো লাভা এতোই উষ্ণ যে খালি হাতে স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। কোনো উভচর এখানে কুঁচকে গিয়ে মুহূর্তে মারা পড়বে। কিন্তু এর মধ্যেও ইগুয়ানাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে। এরা এখানে টিকে থাকে, কারণ ওদের ত্বক জলরোধী যা উভচরদের ক্ষেত্রে নয়।

দ্বীপে দুই প্রকারের ইগুয়ানা আছে। স্থলচর ইগুয়ানা ছোট ঝোপঝাড়ে বাস করে এবং সামুদ্রিক ইগুয়ানারা থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রের ধারে লাভামুক্ত এলাকায়। রৌদ্রস্নান রোদ সহনক্ষমতার পরীক্ষা নয়। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তা প্রয়োজনীয় কাজও বটে। সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মতো প্রাণিদেহের শারীরবিদ্যাগত প্রক্রিয়া তাপ দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। সীমাবদ্ধতার মধ্যে, তাপমাত্রা যতো বাড়বে, যতো দ্রুত ওরা দৌড়াবে, ততো বেশি শক্তি দেহে উৎপাদিত হবে। সরীসৃপ বা উভচর কারো দেহের অভ্যন্তরে তাপ সঞ্চার হয় না। তারা পরিবেশ থেকে সরাসরি তাপ গ্রহণ করে। উভচরের ত্বক জলভেদ্য হবার দরুন

ওরা সরাসরি সূর্যতাপ গ্রহণে সক্ষম নয়। এদেরকে তুলনামূলকভাবে শীতল ও ধীরগতিসম্পন্ন হতে হয়। কিন্তু সরীসৃপের এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই।

সামুদ্রিক ইগুয়ানা দিনপঞ্জি অনুসরণের মাধ্যমে দেহে কার্যকরী তাপমাত্রা সংরক্ষণ করে। উষালগ্নে ওরা লাভা শিলার শিখরে বা পূর্বস্থিত উপলখণ্ডে সমবেত হয় এবং দেহের প্রশস্ত অংশকে সূর্যের দিকে মেলে ধরে এবং সম্ভবমতো তাপ শোষণ করে নেয়। এক ঘণ্টা বা এর বেশি সময়ের মধ্যে দেহের তাপমাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। তখন ওরা পাশ ফিরে। এখন তাদের দেহের বেশির ভাগ অংশ ছায়ায় থাকে। সূর্যরশ্মি পড়ে কেবল বক্ষদেশে। সূর্য যতো বেশি উঠতে থাকে তখন অতি তাপদগ্ধ হবার ঝুঁকি বাড়ে। যদিও সরীসৃপের ত্বকের তুলনামূলক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ জলরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু এই ত্বক ঘর্মগ্রন্থি শূন্য। ফলে জলমোচনের মাধ্যমে ইগুয়ানা তার শরীর ঠাণ্ডা করতে পারে না। যদি এটি সম্ভবও হতো তবু তা তাদের জন্য বাস্তবসম্মত কৌশলরূপে বিবেচিত হতো না। যেহেতু সেই পরিবেশে জলসংকট ছিলো অতিমাত্রায়। কিন্তু এদের ত্বকের নিচে তাপ বৃদ্ধিরোধ করার জন্য এদেরকে অবশ্যই অন্য উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু পরিত্রাণের পথ খুবই বন্ধুর। এরা পা শক্ত করে, রোদে পোড়া কালো শিলা থেকে দেহকে সরিয়ে রাখে যাতে যতদূর সম্ভব কম তাপ শোষণ করতে হয়। অবশ্য এ সময় ওদের দেহের পৃষ্ঠ ও অঙ্কভাগে বাতাস বয়ে যায়। মাত্র কয়েকটি জায়গায় যেখানে ছায়া থাকে সেখানে ওরা গাদাগাদি করে আশ্রয় নেয়। এই জায়গা হতে পারে শিলার ফাটলে, উপলখণ্ডের নিচে বা আরো ভালো সংকীর্ণ গভীর গিরিখাতে যা আগত ঢেউয়ের দরুণ ঠাণ্ডা থাকে। সমুদ্র আরামদায়ক নয়, যেহেতু খুব ঠাণ্ডা। গ্যালাপাগোজ দ্বীপপুঞ্জ হামবোল্ডট্ প্রবাহে অবস্থিত। এই প্রবাহ গ্যালাপাগোজকে বিধৌত করে। কুমেরু থেকে সোজা এই প্রবাহ এখানে এসে পড়ে। সামুদ্রিক ইগুয়ানাদের বাধ্য হয়ে প্রতিদিন দিনের যে কোনো এক সময়ে খাদ্যের খোঁজে এই জলে নামতে হয়। দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের অধিকাংশ আত্মীয়ের মতো এরাও শাক-সবজি ভোজী। লাভায় খাদ্যোপযোগী শাক-সবজি জন্মায় না। কিন্তু সমুদ্রে গভীর জলের শুরুতে, এর ঠিক নিচে সবুজ শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের ঘন আচ্ছাদন থাকে। কাজেই দিনের মধ্যভাগের কোনো একসময়ে, যখন দেহের রক্ত গরম হয়ে সহ্যক্ষমতা অতিক্রম করার উপক্রম হয় এবং রৌদ্রাহত হবার বিপদ দেখা দেয়, তখন ওরা সাঁতারের ঝুঁকি নেয়। ফেনিল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা দক্ষতার সাথে সাঁতার কাটে। জায়ান্ট নিউটের মতো পুচ্ছ তাড়না করে। সমুদ্রের কিনারে কোনো কোনোটি ঝুলে থেকে মুখ দিয়ে সমুদ্র গুল্ম ছিঁড়ে খায়। অন্যরা সাঁতরে আরো দূরে যায় এবং খাদ্য আহরণের জন্য সমুদ্রের তলায় গভীরে ডুব দেয়।

এখন তাদের উল্টো প্রয়োজন দেখা দেয়। তাপ বের করে দেওয়ার পরিবর্তে, দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত তাপ ধরে রাখা সম্ভব তাদেরকে অবশ্যই তার চেষ্টা করতে হবে। এ কাজে সহায়তার জন্য তাদের রয়েছে চমৎকার ও উন্নত শারীরস্থানিক ব্যবস্থা। এরা দেহের উপরিভাগের ধমনিসমূহকে সংকীর্ণ করে ফেলায় সক্ষম যাতে রক্ত দেহের মধ্যভাগে স্বল্প সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ থাকে, ফলে দেহ বেশিক্ষণ গরম থাকে। যদি শরীর খুব ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে এরা ফের সাঁতারের শক্তি হারাবে। এরা শক্তির অভাবে ফেনিল সমুদ্রের ঊর্মি কেটে ফিরে আসতে পারবে না বা উপলখণ্ডে আঁকড়ে থাকা অবস্থায় উত্তাল ঢেউয়ের মোকাবেলা করতে না পেরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। কয়েক মিনিট পর সেই বিপদ ঘনিয়ে আসে। ওদের দেহের

তাপমাত্রা প্রায় ১০ ডিগ্রি কমে আসে, তখন তাদেরকে সমুদ্রের জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসতে হয়।

দীর্ঘ সাঁতারে ঠাণ্ডা ও অবসন্ন শরীর নিয়ে ক্লান্ত ঈগলের অবসাদগ্রস্ত ছড়ানো পাখনার মতো হাত-পা ছড়িয়ে যেমন করে সাঁতারু পড়ে থাক, ইগুয়ানাও শিলার উপর সেভাবে চার পা ছড়িয়ে পড়ে থাকে। যতোক্ষণ না তাদের দেহের তাপমাত্রা বাড়ছে ততক্ষণ তাদের পাকস্থলিতে গেলা খাবার হজম হয় না।

অপরাহ্নে দিনমণি অস্তাচলে গমনের সময় ঘনিয়ে এলে শরীর ঠাণ্ডা হবার ঝুঁকি আসে। তখন ওরা আবার শিলা শিখরে সমবেত হয়ে রাত নামার আগে অস্তাচলগামী শেষ সূর্যের রশ্মি থেকে যতটুকু সম্ভব তাপ শোষণ করে। এই উপায়ে ইগুয়ানা অধিকাংশ সময় তাদের দেহের তাপমাত্রা ৩৭° সে: রাখতে পারে যা মানবদেহের তাপমাত্রার কাছাকাছি। কোনো কোনো টিকটিকি আরো ২-৩° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেশি ধরে রাখতে পারে। সরীসৃপদের যে গড়েই "শীতল শোণিত" প্রাণী বলা হয় তা অনেকটা ভ্রমাত্মক। বরং এদেরকে সত্যিকারভাবে বলা যেতে পারে ইকোথার্মস বা বহির্তাপসংগ্রাহক। কারণ এরা বাইরের পরিবেশ থেকে তাপ সংগ্রহ করে দেহের উষ্ণতা বজায় রাখে। এর বিপরীত হলো এন্ডোথার্মস। স্তন্যপায়ী ও পাখি এন্ডোথার্মস। যারা দেহের অভ্যন্তরে তাপ সঞ্চার করতে পারে।

দেহাভ্যন্তরে তাপ সঞ্চারীদের সুবিধা অনেক। এটি নরম ও জটিল অঙ্গের বিকাশ ঘটানোয় সক্ষম যা তাপমাত্রার হেরফেরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ধরনের অঙ্গধারীরা তাপদানকারী সূর্যের অবর্তমানে রাতেও সক্রিয় থাকতে পারে। এর দরুণ এ ধরনের প্রাণী পৃথবীর শীতল স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করতে পারে। সরীসৃপের পক্ষে যেখানে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এর জন্য উষ্ণশোণিত প্রাণীকে উঁচু মূল্য দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ওদের গৃহীত খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগের মতো ক্যালোরি শক্তি দেহের ধ্রুব তাপমাত্রা বজায় রাখায় ব্যয় হয়। বর্হিতাপ সংগ্রাহক সরীসৃপ সূর্য থেকে সরাসরি তাপ সংগ্রহ করে এবং সরীসৃপের সমান আকারের একটি স্তন্যপায়ীর যে পরিমাণ পুষ্টির প্রয়োজন তার ১০ শতাংশ পুষ্টি খেয়ে সে জীবনধারণ করতে পারে। ফলে, সরীসৃপ মরুভূমিতে বাস করতে পারে যেখানে স্তন্যপায়ীদের উপোস দিতে হয়। সামুদ্রিক ইগুয়ানা যে পরিমাণ শাক-সবজি খেয়ে বাঁচতে পারে সে পরিমাণ শাক-সবজি খেয়ে শশক বাঁচতে পারে না।

জলশূন্য অঞ্চলে সরীসৃপ কেবল বাঁচতে পারে তা নয়, এরা সেখানে প্রজননও করে। কাজেই ওদের ডিমকে দেহের মতো অবশ্যই জলরোধী হতে হয়। ডিম্ জলরোধী করা খুব জটিল কাজ নয়। ডিম্বনালির নিচের অংশে একটি গ্রন্থ রয়েছে। ডিম্বনালি দিয়ে ডিম নেমে আসার সময় গ্রন্থি ডিমের চারপাশে চোষক কাগজের মতো পাতলা খোলক নিঃসরণ করে। ভ্রূণকে শ্বসন চালাতেই হয়। কাজেই খোলক কিছুটা ছিদ্র যুক্ত। ছিদ্র দিয়ে ডিমের ভিতরে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন-ডাই অক্সাইড নিষ্ক্রান্ত হয়। খোলক জটিলতা যেমন সৃষ্টি করে। তেমনি উপকারও করে, স্পষ্টত ডিমকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য খোলক যদি পুরু হয় তাহলে ডিমে শুক্রাণু প্রবেশে বাধা আসবে। কাজেই খোলক জমার আগে স্ত্রী প্রাণীর শরীরের অভ্যন্তরে নিষেক অবশ্যই সম্পন্ন হতে হবে। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য পুরুষ প্রাণীতে শিশ্ন বা লিঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন দলের সরীসৃপে শিশ্নের গঠন ভিন্ন ভিন্ন। কেবল একটি সরীসৃপে শিশ্ন নেই। এটি বিস্ময়কর টিকটিকিসদৃশ এক প্রাণী। নিউজিল্যান্ডের কয়েকটি ছোট দ্বীপে এর বাস। প্রাণীটির নাম টুয়াটারা।

টুয়াটারা অভ্যন্তরীণ নিষেক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করেছে এমন একটি প্রক্রিয়ায় যা কতিপয় স্যালাম্যান্ডার ও সোনা ব্যাঙের নিষেক প্রক্রিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরুষ ও স্ত্রী টুয়াটারা মিলিত হয়ে উভয়ের জননরন্ধ্র পরস্পরের বিপরীতে চেপে ধরে যাতে পুরুষের শুক্রাণু সক্রিয়ভাবে সাঁতরে স্ত্রীর ডিম্বনালিতে চলে যেতে পারে। চমৎকার ব্যাপার হলো টুয়াটারার আরো একটি বৈশিষ্ট্য উভচরদের কথা স্মরণে আনে। টুয়াটারা ৭° সে: এর নিচে তাপমাত্রায় সক্রিয় থাকে যা যে কোনো টিকটিকি বা সাপের পক্ষে সম্ভব নয়। বোঝা যায় এটি অতি আদিকালের সরীসৃপ। এর করোটি এই সপক্ষে রায় দেয়। কারণ, বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিচারে,আদিকালের শনাক্তযোগ্য অশ্মীভূত সরীসৃপের সাথে ওটির মিল দেখা যায়। ২০ কোটি বছর পুরনো শিলায় একই ধরনের প্রাণীর হাড় পাওয়া গেছে। তাহলে টুয়াটারাকে নিয়ে আমাদেরকে অনেক অতীতে ফিরে যেতে হয়। উভচরদের থেকে সরীসৃপরা বিচ্ছিন্ন হবার সময়কালে যদি ফিরে না-ও যাই তবে সরীসৃপের শুরুর স্বর্ণযুগে যখন ওরা নানারকম গঠন ধারণ করে বিশাল দলে বিভাজিত হচ্ছিলো অন্তত সে সময়ে ফিরে যেতেই হবে।

মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সকল অংশে মৌলিক চতুষ্পদী, মজবুত ত্বকের, ডিম্ব প্রসবী বর্হিতাপ সংগ্রাহক সরীসৃপ অভিযোজন করেছে। কেউ কেউ যেমন ইকথাইওসর ও প্লেসিওসর জলচরে পরিণত হয়েছে। ওদের পা রূপান্তরিত হয়েছে দাঁড়ে। আর কারো পুরোপদের আঙুল প্রলম্বিত হয়েছে এবং আঙুলের মধ্যে ত্বক প্রসারিত হয়ে যুক্ত হয়েছে। ফলে তা ত্বকের পাখনার রূপ নিয়েছে। এর সাহায্য ওরা বাতাসে ভর করে উড়ে চলতো। এরকম একটি সরীসৃপ হলো টেরোসর। তখন স্থলাধিপতি ছিলো ডায়নোসররা।

উত্তর আমেরিকার মধ্যপশ্চিমাংশের রাজ্যসমূহ ডায়নোসরের দেহাবশেষ প্রাপ্তির দিক থেকে সমৃদ্ধ। টেকসাস-এর ব্রাজোস নদীর শাখা প্যালাক্স নদী ধীরে এক স্তর কাদা-পাথরের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। এটি একসময় সমুদ্র মোহানার কর্দমাক্ত সমতল ছিলো। একদিন ভাঁটার সময় অনেকগুলো ডায়নোসর এর উপর দিয়ে গিয়েছিলো। এদের একটি হলো থেরোপড। থেরোপড মাংসাশী। এটি পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে চলতো। বর্তমানে নদীর একপাশে ওদের তিন আঙ্গুলবিশিষ্ট পায়ের ছাপ এখনো স্পষ্ট। পায়ের ছাপের মধ্যে ঝুলন্ত লেজসৃষ্ট গভীর খাতও দেখা যায়। ভাটিতে নদী চাপা পড়া শিলা ক্ষয় করার ফলে সমস্তরে বিশাল এক গোলাকৃতি ছাপ আবিষ্কৃত হয়েছে। পায়ের ছাপটি প্রায় ১ মিটার লম্বা। এটি কোনো উদ্ভিদভোজী ডায়নোসরের পায়ের ছাপ। জল যখন ছোট ছোট ঢেউ তুলে ছাপের উপর দিয়ে যায় এটি সহজে কল্পনা করা যায় যে নদীর তলা এখনো পাথর নয় কাদা দ্বারা আবৃত এবং এই দানবেরা মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে জলের মধ্যে দিয়ে হুলস্থূল করে চলে গেছে।

ডায়নোসর জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভে একটি মিউজিয়াম বা জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে, যা পর্বতের দুরারোহ পাশ ঘিরে অবস্থিত। এখানে একস্তরী একটি পাথর রয়েছে যা ৪ মিটার পুরু। এই পাথরে ১৪ রকমের বিভিন্ন প্রজাতির ডায়নোসরের অস্তিত্ব রয়েছে। কতকগুলো ডায়নোসর মুরগির আকারের চেয়ে বড়ো নয়। অন্যগুলো স্থলভাগের সর্ববৃহৎ প্রাণীর

আকারবিশিষ্ট যা পৃথিবী এ পর্যন্ত দেখে এসেছে। ত্রিশটি সম্পূর্ণ কংকাল তুলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানে আরো অনেক হাড় রয়েছে। পর্বতের পাশটি যে শিলা দ্বারা গঠিত সেই পার্শ একদিন ছিলো নদীর মধ্যাঞ্চলের বালিতট। ডায়নোসরের পচা বিশাল ভাসমান শবদেহ ডুবে বালিতটে জমা পড়ে। এখানে শবদেহের আংশিক পচে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অংশত বিনষ্ট করে মাংসাশী অনন্য ছোট ছোট ডায়নোসর। দীর্ঘ সব হাড় যেমন উপাঙ্গ ও মেরুদণ্ডের অংশবিশেষ প্রায় এমন দিক নির্দেশ করে অবস্থিত যা দেখে বোঝা যায় নদীর প্রবাহ কোন্ দিকে ছিলো। ডায়নোসরের বিস্তর দেহাবশেষ সেখানে প্রোথিত রয়েছে। দেখলে মনে হয় একশ বা এর কাছাকাছি বছরের মধ্যে এগুলো জমা পড়েছে। এই প্রদর্শনী এটি স্পষ্ট করে দেয় যে একদা কি বিপুল সংখ্যক ডায়নোসর এই পৃথিবীতে বাস করতো।

কতিপয় প্রজাতির প্রাণীর দেহ এতো বিশাল হবার কারণ কি? কারণ সম্ভবত দুটো। সবচেয়ে বড়ো প্রাণী কয়টির দাঁত প্রমাণ করে যে এরা শাক-সবজিভোজী ছিলো। অ্যাপাটোসরাসকে সাধারণত ব্রন্টোসরাস নামে পরিচয় করানো হয়। এর দাঁতের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ মিটার এবং ওর ওজন ছিলো ৩০ টন। সেই সময়ে উদ্ভিদের মধ্যে ছিলো ফার্ন ও সাইক্যাদ। এগুলো আঁশযুক্ত উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদ হজম করা নিশ্চিতভাবে খুব কঠিন কাজ ছিলো। অ্যাপাটোসরাস ও এর আত্মীয়দের দাঁত সংখ্যায় বেশি হলেও গঠনের দিক থেকে ছিলো সাদাসিধে ও বড় পেরেকসদৃশ। এই দাঁত দিয়ে ভালো চিবানো সম্ভব নয়। বর্তমানের শাক-সবজি ভোজীদের চর্বনদন্ত যেমন গরু, হরিণের চিবানোর দাঁত অনেক বেশি কার্যকর। কাজেই ডায়নোসরের পাকস্থলিকেই খাদ্য গুঁড়ো করতে হতো। বর্তমানের কিছু প্রাণীর মতো ওদের স্ফীত পাকস্থলিতে নুড়িপাথর নেওয়া হতো। এগুলো খাদ্য চূর্ণনে সহায়তা দান করে। বর্তমানে কতকগুলো পাখিও তাদের গিলায় কিছু পরিমাণ নুড়িপাথর জমা করে। কিন্তু তাদেরকে প্রাথমিকভাবে অবশ্যই হজমি রসের জৈব-রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিওলজিক্যাল শক্তির উপর আস্থা রাখতে হবে। প্রতিটি ঘটনায়, প্রতিটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ। শাক-সবজি ভোজী ডায়নোসরের পাকস্থলি বিশাল হতে হবে যাতে এটি বৃহৎ গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ দীর্ঘ গাঁজান প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই গুদামে খাদ্যকে ধরে রাখতে হবে। বিশাল পাকস্থলী বহনের জন্য বিশাল দেহ দরকার। টাইরেনোসরের মতো মাংসাশী ডায়নোসরকে এ ধরনের বিশাল বপুর শাক-সবজিভোজী প্রাণী শিকারের জন্য দৈহিক সামর্থ্যও রাখতে হবে।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সব সরীসৃপের জন্য সর্বকালীন সমস্যা। ডায়নোসরের বড় আকার এই সমস্যার সমাধান দিতে পারে। ওদের দেহ বিশাল হবার এটি দ্বিতীয় কারণ। বড়ো দেহ দীর্ঘক্ষণ তাপমাত্রা সংরক্ষণ করতে পারে এবং পরিবেশে তাপমাত্রার স্বল্পকালীন ওঠা-নামার প্রতি কম স্পর্শকাতর হতে পারে। এদের গৃহীত খাদ্যের পুষ্টিমান খুব কম। ফলে ওদের খেতে হতো অনেক বেশি। খাওয়াতেই এদের অধিকাংশ সময় কেটে যেতো। কাজেই স্বল্প তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রতি নিস্পৃহতা ওদের জন্য খুবই মূল্যবান ছিলো।

কতিপয় প্রজাতির দেহের অদ্ভুত গঠনও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কারণেই হয়ে থাকবে। স্টেগোসরস-এর পিঠে দুই সারি হীরকাকৃতির বিস্ময়কর প্লেট ছিলো। এক সময় ধারণা করা হতো যে এগুলো এক ধরনের অস্ত্র। কিন্তু গভীরভাবে হাড়ের পৃষ্ঠভাগ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, জীবন্ত অবস্থায় প্রতিটি প্লেট ত্বক দ্বারা আবৃত ছিলো। ত্বকে ছিলো ঘন রক্তনালির

জাল। আজকাল সামুদ্রিক ইগুয়ানা যে উপায়ে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, এরা ঠিক একই কৌশলে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতো। প্লেটগুলোকে যদি সূর্যমুখী করে রাখা যেতো তাহলে প্লেটে বাহিত রক্তনালির রক্ত খুব তাড়াতাড়ি উষ্ণ হতো। মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহে প্লেটগুলো শীততাপ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিতো।

তুলনামূলকভাবে ছোট ডায়নোসরসমূহের হাড় দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রয়োজনে অবশ্যই এরা দ্রুত ছুটতে পারতো। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত টানতে পারি যে, অন্তত কোনো এক সময়ে, এদের দেহের তাপ বেশ উচুমাত্রায় ছিলো। এটাও হতে পারে, অনেকে দেহের অভ্যন্তরে তাপ সঞ্চারে সক্ষম হতো। কয়েক ডিগ্রি তাপমাত্রার হেরফেরের মধ্যে কি পরিমাণ ধ্রুব তাপমাত্রা ওরা রক্ষা করতে পারতো এ প্রশ্নে বহু তর্ক হয়েছে। সমসাময়িকালের অভ্যন্তরে তাপ সঞ্চারক সকল প্রাণীর দেহের ত্বকের উপরে বা ঠিক নিচে কোনো না কোনো ধরনের তাপ অপরিবাহী ব্যবস্থা যথা লোম, চর্বি বা পালক থাকে। এসব ছাড়া দেহে তাপ সঞ্চারণের দাবি অগ্রহনীয়। কোনো সরীসৃপের দেহে বর্তমানে তাপ অপরিবাহকের ব্যবস্থা নেই। ডায়নোসরের দেহেও এরকম কোনো ব্যবস্থা ছিলো এমনতরো প্রমাণ নেই।

ডায়নোসর সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হতে পারে দেহের তাপমাত্রা সমস্যা। মন্টানা ব্যাডল্যান্ডের শিলায় স্পষ্টভাবে ওদের অন্তিমকালের দৃশ্য চিত্রিত হয়ে আছে। ৬০ থেকে ৭ কোটি বছর আগে এখানে শায়িত ছিলো বেলেপাথর ও কর্দমপাথরের অনুভূমিক স্তরসমূহ। শীতের গলন্ত তুষার ও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড ঝড় এই স্তরসমূহকে কেটে, ছেঁচে ক্ষতবিক্ষত করে উষর প্রান্তরে পরিণত করে। যে প্রান্তরে সে সঙ্গে গড়ে ওঠে উঁচু শিখরযুক্ত পর্বত। খাত বা মাটির ঢিবি। বিচূর্ণীত শিখরের রেখাযুক্ত পাশে, জলের ট্যাপ থেকে চুঁইয়ে পড়া জলের দাগের মতো বাদামি খণ্ডসমূহ যেনো ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়েছে। আসলে ঝরে পড়া খণ্ডগুলো অশ্মীভূত ডায়নোসরের হাড়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ট্রাইসেরাটপের দেহাবশেষ। ট্রাইসেরাটপ হলো বিশাল শিংযুক্ত ডায়নোসর। জীবিত ট্রাইসেরাটপ উচ্চতায় আট মিটার এবং দৈর্ঘ্যেও প্রায় সেরকম এবং ওজনে নয় টন। এর বিশাল করোটিতে ছিলো তিনটি শিং। দুটি দুই চোখের উপরে ও অন্যটি নাকের ডগায়। মাথার পেছন থেকে হাড়ের ঝালর বেরিয়ে থাকতো যা গলাকে রক্ষা করতো। এরা শাক–সবজিভোজী ছিলো। স্যাঁতস্যাঁতে জলা জায়গায় জন্মানো সাইকাড উদ্ভিদই ছিলো ওদের খাদ্য। ডায়নোসরদের সকলের মগজের চেয়ে এদের মগজ আকারে ছিলো বড়ো। প্রায় এক কিলোগ্রাম। এ থেকে ধারণা করা সম্ভব যে, এরা কেবল বিশালদেহী ও শক্তিশালীই ছিলো না, সেসময়ে জীবিত অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমানও ছিলো। কিন্তু এই মগজও তাদের রক্ষা করতে পারেনি।

খুবই সম্প্রতি ডায়নোসরের হাড় যে স্তরে পাওয়া গেছে, সে স্তরের ঠিক উপরে কালো রেখার মতো কয়লার পাতলা একটি স্তর রয়েছে। মন্টানা ও ক্যানাডা সীমান্ত হয়ে আলবার্তা পর্যন্ত শিখরের পর শিখরে এই সরু কালো লাইন শনাক্ত করা যাবে। এই রেখা ব্যাপক জলাভূমির স্বল্পজীবী অরণ্যানীর স্মারক এবং এই রেখা ডায়নোসরের বিলুপ্তিরও স্বাক্ষর। এই রেখার ঠিক নিচে আপনি কেবল ট্রাইসেরাটপ নয়, কমপক্ষে অন্য আরো দশটি প্রজাতির ডায়নোসরের দেহাবশেষ দেখতে পাবেন। এই রেখার উপরে এদের কোনো দেহাবশেষ মিলবে না।

ডায়নোসর বিলুপ্তি বিষয়ে অনেক ধারণা পাওয়া গেছে। পৃথিবীময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়কেই এর কারণ বলে সবচেয়ে জোরালোভাবে মনে করা হয়ে থাকে। এই ধারণাকে অবজ্ঞা করা যায়। কারণ কেবল ডায়নোসরই সেসময় বিলুপ্ত হয়েছিলো, সব ধরনের প্রাণী নয়। এমন কি সকল সরীসৃপও নয়। অন্য একটি তত্ত্বমতে, এ সময় স্তন্যপায়ীদের ব্যাপক বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটছিলো এবং ওরা খাদ্যের জন্য ডায়নোসরের প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিলো। সম্ভবত উচ্চতর বুদ্ধির সাহায্যে এরা এতো বেশি সাফল্য অর্জন করে যে ফলে ডায়নোসররা সরে যেতে ও বিলুপ্তির দশায় পড়তে বাধ্য হয়। মোন্টানার জীবাশ্ম স্তর এরকম ঘটা যে সম্ভব নয় তার প্রমাণ রেখেছে। এখানে কেবল বড় হাড় নয়, ছোট হাড়ও পাওয়া গেছে। এতো ছোট যে খালি চোখে শনাক্ত করা খুব মুশকিল। সৌভাগ্যবশত এই অঞ্চলের একটি পিঁপড়া জীবাশ্ম শিকারীদের কাজে লাগে। পিঁপড়াটি এর বাসার চারপাশে নিচু দেয়াল তোলে। ঘরের ছাদ বানায় নির্বাচিত বিশেষ মাপের নুড়ি দিয়ে। আপনি যদি অনুসন্ধান চালান দেখবেন যে ছাদের সবটুকু নুড়ি নয়। এর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র শাঙ্কবাকৃতির অনেকগুলো দাঁত। এই দাঁত শ্রু-এর মতো স্তন্যপায়ী প্রাণীর। এটি দৈর্ঘ্যে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার। এটি আদি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি। স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে বহু কোটি বছর আগে। ডায়নোসরের কালে বড় সড় স্তন্যপায়ীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সাক্ষ্য মেলেনি। এটি সম্ভব হতে পারে যে, এ ধরনের ছোট একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী ডায়নোসরের ডিম শিকার করছিলো। কিন্তু স্তন্যপায়ীর পক্ষে এমন হারে পুরো ডায়নোসর গ্রুপকে নয়, একটি প্রজাতির সকল প্রাণীকেও বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। এটাও যুক্তিসিদ্ধ নয় যে, অতি বুদ্ধির জোরে এরা ডায়নোসরের খাদ্য লুটে নিতে পারে অথবা অন্যভাবে ওদের হটিয়ে দিতে পারে।

মন্টানা ব্যাডল্যান্ড অন্য একটি প্রমাণ হাজির করে। এটি আরো দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদী। এই স্তরে কয়লার কালো রেখার উপরে সামান্য তফাতে কতকগুলো গাছের গুঁড়ির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। জীবাশ্মগুলো চমৎকারভাবে সুরক্ষিত ছিলো। ট্রাইসেরাটপ ও অন্যান্য ডায়নোসররা সে সময়ে সাইকাড ও ফার্নের অরণ্যে বাস করতো। গুঁড়িগুলো ছিলো ভিন্ন ধরনের সিকোয়া বৃক্ষের। এটি মোচাকৃতির রেডউড নামে পরিচিত। বর্তমানে, নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, রেডউড ঠাণ্ডা আবহাওয়া পছন্দ করতো। এখানে রেডউডের উপস্থিতি অনেকগুলো প্রমাণের মধ্যে একটি বড়ো প্রমাণ হিসাবে সাক্ষ্য দেয় যে প্রায় ৬.৩ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে আবহাওয়ায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো। সমকালীন সময়ের খুব কাছাকাছি সময়ে ডায়নোসররাও হারিয়ে গিয়েছিলো। এ সময়ে আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা ছিলো।

এই ঠাণ্ডাই ডায়নোসরের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এটা সত্যি যে বড়ো দেহ দীর্ঘসময় ধরে তাপ ধরে রাখতে পারে। এটাও সমান সত্যি যে, দেহ একবার তাপ হারালে তা পুনরায় উষ্ণ হতে অতি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়ে। এমন কি ডায়নোসরদের কোনো কোনোটি দেহের অভ্যন্তরে কিছুটা তাপ উৎপাদনে সমর্থ হলেও, পরপর কয়েক রাতের প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডায় বড়ো দেহের ডায়নোসরের দেহ থেকে তাপ নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তাপ উদ্ধারের কোনো উপায় থাকে না। মারাত্মক শীতার্ত অবস্থায় এরা অতো বড়ো শরীরকে টেনে নেওয়া এবং খাদ্য সংগ্রহ ও জাবর কাটার মতো পর্যাপ্ত শক্তি পেতো না। মন্টানায় এখনো আবহাওয়ার স্থিরমাত্রায় শীতলীকরণ এবং শীত ঋতুর দীর্ঘ স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই ঠাণ্ডা

বিশাল দেহী শাক-সবজিভোজী ডায়নোসরদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে। এদের সাথে মাংসাশী ডায়নোসররাও মারা যেতে পারে যেহেতু এরা ওদেরকে শিকার করতো এবং খাদ্যের জন্য ওদের উপর নির্ভরশীল ছিলো। পর্বত শিখার গাদাগাদি করে থাকা টেরোসরদের এ কারণে আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা ছিলো। এই সংকটে ইকথাইওসর ও প্লেসিওসরদের প্রসঙ্গ আসে না। আরো বহু কোটি বছর আগে, কতিপয় কারণে এই ধারার ডায়নোসরেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো।

ক্রমবর্ধমান শৈত্যের দাপট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুটো উপায় আছে যা বর্তমানের নানা ধরনের সরীসৃপ অনুসরণ করে থাকে। এদেরকে শিলার ফাটল খোঁজ করতে হয় অথবা গর্ত খুঁড়ে মাটির গভীরে চলে যেতে হয় যাতে ভয়াবহ তুষারপাত থেকে অনেক দূরে থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে এবং পরে জৈবনিক কর্মকান্ড স্থগিত রেখে শীতনিদ্রা যেতে পারে। এটি সম্ভব যদি প্রাণীটি কেবল বছরে ছোট হয়। অ্যাপটোসর বা টাইরেনোসরের পক্ষে এ উপায় অবলম্বনের কোনো সুযোগ ছিলো না। দ্বিতীয় উপায় ছিলো ডায়নোসরদের জলের আশ্রয়ে যাওয়া। জল বায়ুর তুলনায় বেশিক্ষণ তাপ ধরে রাখে। ঠাণ্ডার হঠাৎ আক্রমণ জলকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করে। দীর্ঘস্থায়ী ঠাণ্ডা ঋতুকে এড়িয়ে প্রাণী উষ্ণ জলভাগে পরিযান করতে পারে। দ্বিতীয় এই পথ বড়ো প্রাণীদের জন্য উন্মুক্ত ছিলো। ডায়নোসরের আমল থেকে অদ্যাবধি তিনটি প্রধান দলের সরীসৃপের টিকে থাকা গুরুত্বহীন ব্যাপার নয়। কুমির, টিকটিকি ও কচ্ছপ তিন গ্রুপের প্রাণীরা দুই উপায়ের একটি উপায় অবলম্বন করে টিকে গিয়েছিলো।

জীবিত সরীসপদের মধ্যে কুমিরই আকারে সবার চেয়ে বড়ো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্রচারী বিশাল দেহের কুমির প্রজাতির পুরুষ ৬ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বলে জানা গেছে। ডায়নোসরদের সমসাময়িককালের অশ্মীভূত কুমিরকে আজকের দিনে দানো সদৃশ মনে হবে। এরা অ্যাপটোসরদের পাশপাশি বাস করতো। নি:সন্দেহে এরা এন্টেলোপ হরিণের সমান আকারের ডায়নোসর শিকার করতো। যাঁরা অনুমান করেন যে, ডায়নোসর-শাসিত পৃথিবীটা ছিলো ক্ষুদ্র মগজের অধিকারী, গজেন্দ্রগমনে হিজিবিজি চলা, কম বোধসম্পন্ন প্রাণী পরিকীর্ণ তাহলে বর্তমানের কুমিরদের দেখে খুব দ্রুত মত পরিবর্তন করবেন এবং আগের ধারণার অসারত্ব বুঝতে পারবেন।

নীলনদের কুমির দিনের বেশি ভাগ সময় নদী তীরে রোদ পোহায়। এভাবে ওরা গ্যালাপাগোজের ইগুয়ানাদের মতো দেহের তাপসাম্য বজায় রাখে। ইগুয়ানাদের মতো এর সমস্যা অতো তীব্র নয়। কারণ এদের দেহ আকারে তুলনামূলকভাবে এতো বড়ো যে, স্বল্পস্থায়ী তাপমাত্রার ওঠা-নামায় এরা কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুমির দেহকে ঠাণ্ডা করার জন্য বিশেষভাবে অতিরিক্ত একটি কৌশল ব্যবহার করে। এদের দেহের আবরণের তুলনায় মুখগহ্বরের ভিতরের আবরণ অনেক বেশি পাতলা ও নরম। এরা বড়ো হাঁ করে এবং নরম আবরণের উপর বায়ু সঞ্চালিত করে। রাতে এরা নদীর গরম জলে নামে। যদিও কুমির অধিকাংশ সময় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কাটায়, কিন্তু প্রয়োজনে এরা খুব দ্রুত চলায় সক্ষম। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, ওদের সমাজবদ্ধ জীবনযাপন সম্পর্কে পূর্বে যে অনুমান করা হতো, তা তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। পুরুষরা প্রজনন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। অঞ্চলটি তীরের অদূরবর্তী। নির্দিষ্ট জলের এলাকায় ওরা পাহারা দেয়। কারো এলাকায় অন্য কোনো পুরুষ গোল বাধাতে এলে এরা গজরায় ও লড়াই করে। স্ত্রী-পুরুষে প্রণয় হয় জলে। স্ত্রী

এগোতে থাকলে পুরুষ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে। পুরুষের গর্জন এতো তীব্র হয় যে ওর সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে এবং বাতাসে জল ছুঁড়ে যেনো মেঘের সৃষ্টি করে। সে লেজ দিয়ে জলে আঘাত করে এবং প্রবল উন্মাদনায় বিশাল চোয়াল দুটো ঘষে শব্দ তুলে। সঙ্গম স্থায়ী হয় মাত্র কয়েক মিনিট। এ সময় পুরুষ চোয়াল দিয়ে স্ত্রীকে আটকে ধরে এবং পরস্পর লেজ প্যাঁচিয়ে রাখে।

স্ত্রী কুমির জলের প্রান্ত রেখার বেশ দূরে এমন একটি স্থান নির্বাচনপূর্বক গর্ত খুঁড়ে যাতে সে গর্তটিকে সারাজীবন ব্যবহার করতে পারে। সে রাতে ডিম পাড়ে। বিভিন্ন ব্যাচে রাখা ডিমের সংখ্যা ৪০। কতটুকু গভীরতায় সে ডিম রাখবে তা মাটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তবে গর্ত বেশ গভীর হয়ে থাকে যাতে তাপমাত্রা ৩° সেলসিয়াসের বেশি ওঠানামা না করে। এমন জায়গায় ওরা গর্ত খুঁড়ে না যেখানে সারাদিন রোদ পড়ে। অন্যান্য প্রজাতির স্ত্রীরা এমনকি আরো গভীরে ডিম রাখে যাতে তাপসাম্য রক্ষা পায়। লোনা জলের কুমির জলজ উদ্ভিদের সাহায্যে বাঁধ দিয়ে বাসা বানায় এবং তাপ খুব বেড়ে গেলে বাসায় প্রস্রাব ছড়িয়ে দেয়। আমেরিকার এলিগেটরও গাছপালা জড়ো করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে এবং নিয়মিতভাবে ডিম উল্টিয়ে দেয় যাতে ডিম নিচের জলকণার স্পর্শ পায় এবং সে সঙ্গে যাতে পচনশীল গাছপালা থেকে ধ্রুব তাপমাত্রা পেতে পারে।

কুমির শাবককে যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে যে আচরণ প্রদর্শন করে তা খুব জটিল ও বিস্ময়কর। নীল নদের কুমিরের ডিম ফোটার সময় ঘনিয়ে এলে, ডিমের ভিতরে বাচ্চারা শিস দেয়। শিসের তরঙ্গ এতো উচ্চভেদী যে তা খোলক ও বালি ভেদ করে কয়েক মিটার দূর থেকে শোনা যায়। স্ত্রী কুমির শব্দ শোনার পর ডিমের উপর ঢাকা বালি আঁচড়িয়ে সরাতে শুরু করে। বাচ্চারা বালি ঠেলে উপরে ওঠার সংগ্রাম চালাতে থাকলে মা চোয়াল দিয়ে ধরে উঠিয়ে নেয়। এ সময় বিশাল দাঁতসমূহ ফরসেপের মতো কাজ করে। অবশ্য খুব ধীরে আলতোভাবে ধরে ওদের উঠায়। এসময় স্ত্রীর মুখের ভিতরে একটি বিশেষ থলে সৃষ্টি হয়। এই থলেতে ছয়টি বাচ্চা রাখার মতো সংস্থান থাকে। থলে পূর্ণ হলে সে বাচ্চাদের নিয়ে জলে নামে এবং সাঁতার দেয়। এ সময় মুখ অর্ধেক খোলা থাকে। তখন বাচ্চারা দাঁতের ঘেরার মধ্যে শিস দেয় ও মারে উঁকি। পুরুষ স্ত্রীকে সাহায্য করে এবং স্বল্প সময়ে জলাভূমিতে বিশেষ পরিষেবা অঞ্চলে বাচ্চাদের নিয়ে যায়। বাচ্চারা এখানে কয়েক মাস কাটায়। ওরা তীরের গর্তে লুকিয়ে থাকে। ব্যাঙ ও মাছ শিকার করে। এ সময় মা-বাবা কাছেপিছে অলস জীবন কাটায় এবং ওদের উপর সুনজর রাখে। এটি অবিশ্বাস করা কষ্টকর যে ডায়নোসরদেরও একই ধরনের প্রণয়রীতি ও জনিতৃজনন ছিলো না।

কুমিরের অনুরূপ কচ্ছপেরও প্রাচীন রীতি ছিলো। এদের ইতিহাসের আদিতে এরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলো। কুমির পিঠের স্কুটের নিচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়ের সাহায্যে চামড়াকে মজবুত করেছে। কচ্ছপ আরো একধাপ এগিয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। কচ্ছপ আঁশকে বিস্তৃত করে কঠিন প্লেটে পরিণত করেছে এবং ভিতর থেকে হাড়ের গাথুনি দিয়ে আটকে রেখেছে। ফলে ওদের দেহ প্রকৃতপক্ষে অভেদ্য বাক্সের ভিতরে ঢাকা পড়ে গেছে। বিপদ এলে এই বাক্সের মধ্যে ওরা মাথা ও উপাঙ্গ গুটিয়ে নিতে পারে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এমন অতি ফলপ্রসূ বর্ম আর কারো নেই। এই বর্ম ওদেরকে উদ্ভবকাল থেকে অদ্যাবধি প্রকৃতপক্ষে অপরিবর্তিত থাকতে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করেছে। ওদের মৌলিক গঠনে একটি বড়

পরিবর্তন এসেছে ওদেরই ইতিহাসের একেবারে আদিতে। এদের একটি দল জলের আশ্রয় নিয়েছে, যাদের বলা হয় টারটল বা কাইট্টা। জলচারী জীবন গ্রহণ এদের জন্য যুক্তিসম্মত ছিলো। অতো বিশাল ভারী বর্ম নিয়ে ডাঙায় চলাচল শ্রমসাধ্য ও শক্তিব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিলো। তবে এদের নূতন অর্জিত সরীসৃপীয় প্রকৃতি ওদেরকে পুরোপুরি জলচর জীবন গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এদের পূর্বপুরুষরা খোলকবিশিষ্ট ডিমের পরিপ্রেক্ষিতে জলচারী জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলো বটে কিন্তু তা এদের ক্ষেত্রে অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। খোলকের নিচের ছিদ্র যুক্ত পর্দা দিয়ে ওরা শ্বসন চালাতো। খোলকের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের লেন-দেন হতো। জলে এ পদ্ধতি কার্যকর নয় এবং বাচ্চা খোলকের মধ্যে জলে ডুবে মরে। কাজেই স্ত্রী কাউট্টা প্রতি প্রজনন ঋতুতে, সমুদ্র ছেড়ে, উপকূলীয় জলে সাঁতরে আসে এবং এক রাতে বালির তীরে অনেক কষ্টে উঠে গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে যেমনটি তাদের ডাঙার আত্মীয়রা করে থাকে।

তৃতীয় দলের জীবিত প্রাণী টিকটিকি, কুমির বা কচ্ছপের দল থেকে সংখ্যায় ভারী। এদের দেহের প্রাচীন গঠনপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এরা নানা পরিবারে বিভক্ত। যেমন ইগুয়ানা, ক্যামেলিওন বা গিরগিটি, স্কিঙ্ক, গোসাপ ও অন্যান্য সরীসৃপ। এরা সবাই এদের মূল্যবান জলরোধী চামড়ার আঁইশ বিকাশ করার মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছে। অস্ট্রেলীয় শিঙ্গলব্যাক স্কিঙ্কের দেহের আবরণ মজবুত ও পালিশ করা যা পরিচ্ছন্ন সারি সারি আঁইশের বর্মের সাথে সম্পৃক্ত। মেক্সিকোর গিলা মনস্টারের কালো গোলাকৃতির বা গোলাপি রঙের পুঁতির মতো আঁইশ দ্বারা ঢাকা। আফ্রিকার সান গ্রেজার দেহে লম্বা ও কাঁটাযুক্ত সাড়ম্বর বর্ম পরিধান করে। আমাদের নখের মতো আঁইশগুলো মৃত শক্ত বস্তু দিয়ে তৈরি এবং ক্রমে তা ক্ষয়ে যায়। কাজেই সরীসৃপকে বছরে কয়েকবার আঁইশ বদল করতে হয়। পুরানো আঁইশের নিচে নূতন আঁইশ জন্মায়। পরে পুরানো খোলস ঝরে পড়ে।

মনে হয় আঁইশ বিবর্তন চাপের কাছে হাড়ের চেয়ে দ্রুত সাড়া দেয় এবং আঁইশ টিকটিকির দেহকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে সরাসরি রক্ষা করা ছাড়াও নানাভাবে একে সাহায্য করে। সামুদ্রিক ইগুয়ানার পৃষ্ঠদেশের কাঁটার সাথে একটি লম্বা ঝুঁটি থাকে। পুরুষ ইগুয়ানা তার অঞ্চলের আধিপত্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করার সময় বিশেষ করে এই ঝুঁটিটিকে আকারে বড় করে দেখায় এবং মনে ভীতির সঞ্চার করে। কতিপয় ক্যামেলিয়নের মাথার আঁইশ থেকে শিং গজায়। শিং-এর সংখ্যা এক, দুই, তিন বা চার হতে পারে। এরা সকল সরীসৃপ থেকে সবচেয়ে নাটকীয় চমক প্রদর্শন করে। মধ্য অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমির চৌকষ টিকটিকির নাম থর্ন ডেভিল বা কন্টকধারী শয়তান। এটি পুরোপুরি পিঁপড়ার উপর নির্ভরশীল। এর প্রতিটি আঁইশ সম্প্রসারিত এবং আঁইশের কেন্দ্র একটি পয়েন্টে গিয়ে মিশে। কোনো কোনো পাখি এ ধরনের প্রাণীকে আয়েশ করে গ্রাস করে। সেক্ষেত্রে এই আঁইশ প্রতিরক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা নেয়। কিন্তু আঁশের আকৃতি সচরাচর দেখা যায় না এমন একটি কাজ করে। আঁশের কেন্দ্র থেকে সরু খাদ ফালির মতো বেরোয়। ঠাণ্ডা রাতে ওতে শিশির জমে। খাদ বেয়ে এই শিশির শেষতক প্রাণীর মুখে গিয়ে পড়ে। সম্ভবত গেকো বা তক্ষকে সবার চেয়ে অতি বিশেষ ধরনের আঁইশের সৃষ্টি হয়। উষ্ণমণ্ডলীর ক্ষুদ্র টিকিটিকি দেয়াল বেয়ে দৌড়াতে পারে, ঘরের ছাদে ডিগবাজী খেতে পারে। এমনকি কাচের খাড়া গায়ে লেগে থাকতে পারে। এগুলো এতো সহজভাবে করে যে, মনে হয় হয়তো এরা কোনো ধরনের

চোষক যন্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু না, এ কাজ করে আঁইশ। আঙুলের নিচে প্যাড থাকে। প্যাডনির্মিত হয় আণুবীক্ষণিক অসংখ্য আঁইশের দ্বারা, যা খালি চোখে ধরা পড়ে না। প্রতিটি আঁইশ এতো ক্ষুদ্র যে একে কেবল ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা যায়। জোরে চাপ দেওয়া হলে সামান্যতম অমসৃণ জায়গাতেই প্যাড লেগে থাকতে পারে। এমনকি এ ধরনের অমসৃণতা কাচে থাকলেও সেখানে ওদের পক্ষে চলাফেরায় অসুবিধে হয় না। প্যাডের এই অসংখ্য আঁইশ তক্ষককে চলায় সাহায্য করে।

টিকটিকির পুরো ইতিহাস জুড়ে নূতন পৃথিবীর স্যাল্যাম্যান্ডারের মতো টিকটিকিরও পা হারানোর প্রবণতা ছিলো। কিছু সংখ্যক স্কিঙ্কে বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশ প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। ব্লু টাঙ্গ বা শিঙ্গলব্যাক জাতীয় অস্ট্রেলীয় স্কিঙ্কে পা বিলুপ্তপ্রায়। এই পা কদাচিৎ কার্যকর ও মজবুত হয়। এর সুঠাম দেহের ভার পায়ের পক্ষে বহন করা সম্ভব হয় না। ইউরোপের একটি টিকটিকি জাতীয় সরীসৃপের নাম স্লো-ওয়ার্ম। এর পা-ই নেই। যদিও দেহে এখনো স্কন্ধ ও শ্রোণী হাড়ের চিহ্ন বর্তমান। দক্ষিণ আফ্রিকার স্নেক লিজার্ড-এর একক গণভুক্ত সরীসৃপদের মধ্যে পা-চ্যুতির বিভিন্ন পর্যায় দেখা যায়। একটিতে চারটি পা আছে। প্রতি পায়ে পাঁচটি আঙুল ; অন্যটিতে খুব ছোট পা এবং প্রতি পায়ে কেবল দুটি পূর্ণ বিকশিত আঙুল রয়েছে ; তৃতীয় অপর একটিতে পেছনের পা আছে। এতে আছে একটি মাত্র আঙুল, সামনের পা বা পুরোপদ নেই।

প্রাচীন টিকটিকিদের মধ্যে দশ কোটি বছর আগে পা বিলোপের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো। ফলে সাপের উদ্ভব ঘটে।

আদি এই গ্রুপের সঠিক পরিচিতি বিতর্কমূলক। সম্ভবত গর্তে জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে সাপে পায়ের বিলুপ্তি ঘটে থাকবে। কতিপয় সূত্র আভাস দেয় যে সাপের পূর্বপুরুষরা একসময় মাটির নিচে বাস করতো। গর্তে শ্রবণঅঙ্গের বিশেষ দরকার পড়ে না। ফলে নরম কান সহজেই বিনষ্ট হয়ে থাকতে পারে। গর্তবাসীদের মধ্যে শ্রবণঅঙ্গ বিলোপের প্রবণতা আছে। সাপের কর্ণপটহ নেই। অন্যান্য সরীসৃপে কম্পন সঞ্চালক হাড় কর্ণপটহের সাথে যুক্ত থাকে। সাপে এই হাড় যুক্ত থাকে নিচের চোয়ালের সাথে। ফলে সাপ আসলে বাতাসে সঞ্চালিত শব্দ শুনতে পায় না। পরিবর্তে ওরা শরীরে কম্পন শনাক্ত করতে পারে। হাঁটার সময় অন্য প্রাণী মাটিতে যে কম্পন তোলে তা মাটির মাধ্যমে সাপের দেহে সঞ্চালিত হয়।

কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে, সাপের চোখ গর্তবাসী হওয়ার সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে। গঠনগত দিক থেকে সাপের চোখ অন্যান্য সরীসৃপ থেকে বেশ স্বতন্ত্র। যদি সাপের পূর্বপুরুষ গর্তবাসী হয়, তাহলে অন্যান্য গর্তবাসীদের মতো, ওদের চোখেও অবনতির প্রবণতা থাকতো। কিন্তু যদি চোখ পুরো বিলুপ্ত হবার আগে ওরা মাটি থেকে উপরে এসে জীবনযাপন করতে থাকে তাহলে আবার দৃষ্টির প্রায়োজন দেখা দেবে এবং তখন বিলুপ্তপ্রায় চোখ পুনঃবিকশিত হবে। কাজেই চোখের গঠন স্বতন্ত্র ধরনের হতেই পারে। এ ব্যাখ্যা প্রত্যয় উৎপাদী হলেও এখনো সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত নয়।

যাহোক, কারো মনে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, একদা সাপের পা ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, একটা পুরো দলের, পাইথন বা অজগর ও বোয়া সাপে শ্রোণিচক্রের অবশেষ রয়েছে। দেহের

বাইরেও এর চিহ্ন স্পষ্ট। পায়ুর দুই পাশে দুটো কাঁটার মতো দেখা যায়। মাটির উপরে পাইন সাপকে চলার জন্য নূতন উপায় বার করতে হয়েছে। এদের দেহে ফিতার মতো একান্তর পেশি রয়েছে। এরা নমনীয় পেশির সাহায্যে দেহকে S আকৃতির বক্রতায় এনে পরিচালিত করে। দেহের নিচে তরঙ্গাকৃতিতে সংকোচন চলতে থাকলে দেহ পাথর বা উদ্ভিদদেহ ইত্যাদি প্রতিবন্ধকে ভর করে সামনে চলতে থাকে। এককথায় সাপ কিলবিল করে বা পাক দিয়ে চলে। মসৃণ কোনো কিছুর উপর রাখলে তার এ কৌশল কোনো কাজে আসে না। সাপ অসহায়ের মতো কেবল দেহকে মোচড়াতে পারে। চলতে পারে না।

বালিময় মরুভূমিতে বসবাসকারী কতকগুলো সাপের চলন-কৌশলে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বালির উপর ওরা এতো দ্রুত দৌড়ায় যে ওদের দেখাই যায় না ফলে তা যথার্থভাবে বর্ণনাও করা যায় না। একে বলা হয় সাইড-ওয়ান্ডিং বা পাশে এঁকেবেঁকে যাওয়া। সাপের দেহ S-আকৃতিতেই সংকুচিত হয় কিন্তু দেহের দুটি অংশ কেবল মাটি বা বালি স্পর্শ করে এবং অংশ দুটি দেহ জুড়ে পর পর দ্রুত চলাচল করে। পেশি নড়া শুরু হয় মাথার নিচ থেকে। সাপ প্রথমে মাথা তুলে এবং বেঁকে বক্রাকৃতি ধারণ করে। বাঁকা স্থানটুকুই ভূমি স্পর্শ করে। পেশি সংকোচনের ফলে এই বক্রাকৃতির অংশ ক্রমে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত নিচের ভূমি স্পর্শ করে চলতে থাকে। অবশ্য এ সময় দেহের অগ্রপ্রান্ত ও মাথা উঁচিয়েই থাকে। দেহ-তরঙ্গ দেহের মধ্যভাগে পৌঁছালে ঘাড় নিচু হয়ে মুহূর্তের মধ্যে ভূমি স্পর্শ করে এবং দেহে নূতন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এভাবে সাপ সামনের দিকে দ্রুত চলে। চলার পথে ৪৫°কোণে দণ্ডের মতো রেখা সাপের চলার স্বাক্ষর বহন করে।

শিকার ধরার সময় সাপের দেহে ন্যূনতম গতি থাকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে শিকার সাপের উপস্থিতি টের পাবে না। সাপ এ সময় দেহকে সোজা রেখে সরাসরি শিকারকে তাক করে। দেহের অগ্রভাগের আঁইশ সংকীর্ণ আয়তাকৃতির। দেহে আঁইশগুলো দেহের প্রস্থ বরাবর সাজানো থাকে। একটা আঁইশ অপর আঁইশকে আবৃত করে। আঁশের মুক্ত অংশ থাকে পশ্চাৎমুখী। সাপ উদরপেশি সংকোচনের মাধ্যমে আঁইশকে দলে দলে তুলে সামনের দিকে আনতে পারে। সংকোচনসৃষ্ট দেহ তরঙ্গ যখন পশ্চামুখী গমন করে তখন আঁইশের পশ্চাৎভাগ বা মুক্ত অংশ ভূমি স্পর্শ করে। এভাবে সাপ নীরবে ও মসৃণভাবে সামনে এগোয়। এ সময় দেহের পার্শ্বদেশে কোনো সংকোচন ঘটে না।

যদি আদি সাপেরা একটা সময়ে গর্তে কাটায় তাহলে তাদের শিকার ছিলো ছোট আকারের। (শিকার সীমাবদ্ধ ছিলো)। অমেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন কৃমি, উই এবং সম্ভবত আদি গর্তবাসী শ্রুর মতো ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীতে । বর্তমান আকারে স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব শুরুর পর যখন সাপেরা মাটির উপরে উঠে আসে তখন তাদের সুযোগ-সুবিধা অধিক হারে বেড়ে যায়। হতে পারে, এই সুযোগের লোভে ওরা গর্ত থেকে উপরে উঠে এসেছিলো। স্বল্পসংখ্যক বোয়া ও পাইথন দৈর্ঘ্যে এতো বড়ো যে এরা ছাগল বা হরিণের মতো বড়ো প্রাণীকে ঘায়েল করতে পারে। শিকারকে মুখ দিয়ে ধরে দ্রুত শিকারের দেহের চারপাশে বেড় দেয় এবং বেড়কে এমন জোরে কষে যাতে শিকার বক্ষপিঞ্জরকে প্রসারিত করে শ্বাস নিতে না পারে। দেহ ছিন্ন ভিন্ন শিকার মারা পড়ে না, মারা পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে । পশ্চাতমুখী দাঁত দিয়ে সাপ শিকারকে যখন কব্জা করতে থাকে তখন শিথিলভাবে সংযুক্ত চোয়াল শিকারকে ভিতরে

ঠেলে দেয়। শিকার গেলার কাজটি কয়েক ঘন্টা ধরে চলে। গেলার পর স্ফীত উদর নিয়ে সাপ অনড়ভাবে পড়ে থাকে।

অধিক করিৎকর্মা সাপ প্যাঁচিয়ে মারার পরিবর্তে শিকারকে বিষ দিয়ে মারে। যে দলের সাপের ভিতরমুখী বিষদাঁত রয়েছে তারা উপরের চোয়ালের পেছনের দিকের বিশেষভাবে অভিযোজিত দাঁত দিয়ে শিকারের দেহে বিষ ঢুকায়। এই দাঁতের ঠিক উপরে বিষগ্রন্থি থাকে। বিষগ্রন্থি থেকে দাঁতের একটি খাদে সহজে ফোঁটায় ফোঁটায় বিষ ঝরে পড়ে জমা হয়। আঘাতের পর এই ধরনের ভিতরমুখী বিষদাঁত বিশিষ্ট সাপকে শিকার চেপে ধরে চিবানোর প্রয়োজন হতে পারে যতোক্ষণ না বিষদাঁত শিকারের মাংসের সংস্পর্শে এসে বিষ ঢালতে না পারে। চোয়ালকে পাশ থেকে পাশে দুলিয়ে ওরা চিবানোর ও বিষ প্রয়োগের প্রক্রিয়া চালায়।

আরো তৎপর সাপ অধিক চৌকষ উপায়ে শিকারকে হত্যা করে। এদের বিষদাঁত থাকে উপরের চোয়ালের সামনের দিকে। দাঁতের ভিতরে নালি থাকে। নালি দিয়ে বিষ বাহিত হয়। কোবরা, ম্যামবাস বা সী স্নেকের বিষদাঁত খাট ও অনড়। কিন্তু ভাইপারের দাঁত এতো লম্বা যে, বেশিরভাগ সময় এগুলোকে পেছনে গুটিয়ে রাখতে হয়। ফলে তা মুখের তালুর সমান্তরালে থাকে। আঘাত করাকালে সাপ বিশাল মুখ ব্যাদান করে। যে হাড়ের সাথে বিষদাঁত যুক্ত থাকে তা ঘুরে গিয়ে বিষদাঁতকে নামিয়ে সামনের দিকে নিয়ে আসে, যাতে সাপ শিকারকে সঙ্গে সঙ্গে কাটতে পারে। মাংসে যখন দাঁত বসায় তখন দাঁতের নালি দিয়ে বিষ শিকারের দেহে ঢুকে। অনেকটা রোগীর দেহে ইনজেকশন দেবার মতো।

বিশাল সরীসৃপ গোষ্ঠীর মধ্যে সাপের উদ্ভব সবার শেষে। এদের মধ্যে সবচেয়ে চৌকষ ও নিপুণ হলো পিট ভাইপার। মেক্সিকার র‍্যাটল স্নেক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমের র‍্যাটলস্নেক পিট ভাইপার দলের সাপ। এদের মধ্যে সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যসমূহের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

অন্যান্য বহু সাপ, কিছু উভচর ও মাছের মতোর র‍্যাটলের স্নেকও ডিমকে রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াস নেয়। এরা দেহের অভ্যন্তরে ডিম রাখে। সরীসৃপের ডিমেই প্রথম খোলক দেখা যায়। র‍্যাটল স্নেকের ডিমের খোলক পাতলা। ফলে ভ্রূণ ডিম্বনালিতে থাকার সময় কেবল ডিমের কুসুমই আহার করে না, মায়ের দেহ থেকে পুষ্টিও গ্রহণ করে। ডিম্বনালির প্রাচীরে বাহিত রক্তনালি থেকে ডিম্বনালি সংলগ্ন ডিমে ব্যাপনের মাধ্যমে পুষ্টি সঞ্চালিত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে গর্ভফুল যে প্রক্রিয়ায় ভ্রূণে পুষ্টি সঞ্চালিত করে। র‍্যাটলা স্নেকের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই হয়ে থাকে।

পূর্ণ গঠিত ভ্রূণ অর্থাৎ শিশু র‍্যাটল স্নেক পায়ুপথে বেরিয়ে আসে। শিশু সাপকে মা পরিত্যাগ করে না। সে সক্রিয়ভাবে বাচ্চা পাহারা দেয়। অনভিপ্রেতদেরকে সে ঝন ঝন শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে হুঁশিয়ার করে দেয়। প্রতিবারই সে ত্বক নির্মোচন করে। প্রতিবার ত্বক নির্মোচনের সময় এর লেজে একটি ফাঁপা আঁইশ কিন্তু দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ নির্মোচনের সময় এটি ঝরে যায় না। প্রাপ্তবয়স্ক একটি সাপে এরকম ২০টি আঁইশ দেখা যায়। মানে সাপের জীবনে বিশ বার ত্বক নির্মোচন ঘটেছে বোঝা যায়।

র‍্যাটল স্নেক রাতে শিকার করে। যে সংবেদী কৌশলের সাহায্যে ওরা শিকার করে তা প্রাণিজগতে একক ও অনন্য। নাক ও চোখের মধ্যে একটি পিট বা ছিদ্র রয়েছে। এর থেকেই

এই দলের নাম পিট ভাইপার। এই ছিদ্র অবলোহিত তেজস্ক্রিয় রশ্মি শনাক্ত করে। অর্থাৎ তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারে। এটি এতোই সংবেদী যে তিনশ ভাগের ১ ভাগ সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লেও সে বুঝতে পারে। এর চেয়েও বড়ো ব্যাপার হলো, এটি সাপের নির্দেশক। সাপ এর সাহায্যে তাপের উৎস সঠিকভাবে নির্ণয় করে। কাজেই পিট বা ছিদ্রের বৈগুণ্যে সাপ নিশ্চিদ্র আঁধারে আধ মিটার দূরে থাকা অনড় ভূমি সংলগ্ন ছোট কাঠবিড়ালির উপস্থিতি অনুভব করতে সক্ষম হয়। সাপ উদর আঁইশে ভর করে মসৃণভাবে গড়িয়ে প্রায় নীরবে শিকারের কাছে যায়। শিকার আঘাতের আওতায় এলে, সেকেন্ডে তিন মিটার গতিতে মাথা সামনে ছুঁড়ে শিকার ধরে। পরে বিশাল জোড়া বিষদাঁত দিয়ে শিকারের মাংসে মারাত্মক বিষ ঢুকিয়ে দেয়। প্রাণিজগতে একে অবশ্যই অন্যতম দক্ষ শিকারী হিসাবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

অন্যান্য সকল সরীসৃপের মতো র‍্যাটল স্নেক সরাসরি সৌরশক্তি শোষণ করতে পারে বিধায় এর খাদ্যের প্রয়োজন কম। বছরে এক ডজন বা এর একটু বেশি খাবার হলেই পর্যাপ্ত। অন্তঃতাপসঞ্চারী স্তন্যপায়ী প্রাণী বা উষ্ণশোণিত স্তন্যপায়ী প্রাণী এমন কি মরুচারী স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য দৈনন্দিন খাদ্য তালাশ আবশ্যক হলেও র‍্যাটল স্নেক–এর জন্য তার দরকার পড়ে না। ওদের মতো এদেরকে দিনের বেলায় শিলার ফাটল বা গর্তের আশ্রয়ে যেতে হয় না। এরা রোদের তাপে হাঁপায় না। বেরোনোর জন্য শীতল রাতের অপেক্ষায় থাকে না। মেক্সিকোর মরুভূমিতে পাথর বা ক্যাকটাসের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওরা পড়ে থাকে। এরা তার নিজস্ব পরিবেশের উপর প্রভূত্ব করে এবং কোনো কিছুর ভয়ে ওরা ভীত নয়। সরীসৃপ ওদের জলরোধী ত্বক ও ডিমের বদৌলতে মরুজয়ী প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলো।। কোথাও কোথাও এখনো তাদের বিজয় নিশান অম্লান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বায়ুরাজ

পালক এক অসাধারণ সৃষ্টি। তাপ-অপরিবাহী হিসেবে মাত্র গুটি কয় বস্তু এর সমতুল্য। মানুষের তৈরি বা প্রাণিদেহে গজানো কোনো বস্তু পালকের চেয়ে ওজনে হাল্কা নয় যা উড্ডয়নের কাজে লাগতে পারে। এটি কেরাটিন দ্বারা গঠিত। এই কঠিন বস্তু দিয়ে সরীসৃপের আঁইশ এবং মানুষের নখ গঠিত। জটিল নির্মাণ পদ্ধতির দরুণ পালকের ব্যতিক্রমী গুণাবলির সৃষ্টি হয়েছে। পালকের মধ্যাঞ্চলে একটি শ্যাফট বা দণ্ড থাকে। শ্যাফটের দু'পাশে থাকে শতাধিক সূত্র। প্রতিটি সূত্রে বা ফিলামেন্টে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় একশ বারবিউল বা সূত্র-কন্টক। বড় পালকের ভিতরে নরম তুরার ফেঁসোর মতো আরেক ধরনের পালক থাকে। এগুলোর নাম ডাউন ফেদার বা অন্তঃপালক। ডাউন ফেদার বাতাস ধরে রাখতে পারে। ফলে এরা চমৎকার তাপ অপরিবাহী হিসেবে কাজ করে। ফ্লাইট ফেদার বা উড্ডয়ন পালকের অতিরিক্ত একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এদের বারবিউলস বা সূত্র কন্টকসমূহ পাশাপাশি থাকা সূত্রের সূত্রকন্টককে প্রাবৃত করে এবং সূত্রকন্টকের কাঁটার সাহায্যে সূত্রগুলোকে একত্রে সংবদ্ধ করে পাখার আকৃতি দান করে। একটি সূত্রকন্টকে হুক বা কাঁটার সংখ্যা কয়েকশ। একটি পালকে সংখ্যায় দশ লক্ষেরও বেশি। হাঁসের মতো একটি পাখিতে পালকের সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। অন্যান্য প্রাণী থেকে পাখিকে প্রায় যেসকল বৈশিষ্ট্য বিচারে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায় তাদের মধ্যে যে কোনো অর্থে পালককেই অন্যতম বলা যায়। পালকই পাখির জন্য নানান সুবিধার সৃষ্টি করেছে, প্রকৃতপক্ষে, যে প্রাণীর দেহে পালক রয়েছে। তাকে নিঃসন্দেহে পাখি বলা যাবে।

১৮৬০ সালে, ব্যাভারিয়ার সোলনহোফেনে, চুনা পাথরের খণ্ডে সাত সেন্টিমিটার দীর্ঘ একক স্বতন্ত্র পালকের সূক্ষ্ম ও অভ্রমাত্মক রেখাচিত্র পাওয়ার পর খুব সাড়া পড়ে যায়। রেড ইন্ডিয়ানদের দেহে আঁকা বিচিত্র নকশার মতোই এর ছাপ পাথরে খোদিত ছিলো। নকশাটি জানিয়ে দিলো যে, কোনো সময় এখানে একটি পাখি ছিলো। এই পাথরটি গঠিত হয় ডায়নোসরের আমলে যখন পাখির অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না।

পাথর সৃষ্টিকারী তলানি উষ্ণমণ্ডলীয় অগভীর উপহ্রদের তলায় জমা পড়েছিলো। উপহ্রদটি চুন-সৃজক শৈবাল ও স্পঞ্জ-প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ ছিলো। হ্রদের জল ছিলো কবোষ্ণ ও স্বল্প অক্সিজেনসমৃদ্ধ। মুক্ত সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ্রদে সামান্য জলপ্রাবাহ হয়তো ছিলো। ক্ষয়শীল প্রাচীর থেকে আংশিক এবং ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট আংশিক চুন হ্রদের তলায় জমা পড়ে। এই পরিবেশ মাত্র কয়েকটি প্রাণীর জন্যই সহনশীল ছিলো। পথভ্রষ্ট হয়ে যে সকল প্রাণী হ্রদে এসে প্রাণ হারিয়েছিলো তারা জলের তলায় জমা পড়ে। স্থির জলে শবদেহের কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি এবং শবদেহ ধীরে ধীরে তলানির আবরণে ঢাকা পড়ে।

BANSDOC Library Dhaka

শতাব্দীব্যাপী সোলনহোফেন চুনাপাথরের খনন কাজ চলছে। কারণ সূক্ষ্ম মিহি এই দানা অট্টালিকা তৈরির জন্য খুবই চমৎকার এবং লিথোগ্রাফিক বা খোদাই শিল্পকর্মের জন্য খুবই উপযুক্ত। এগুলো প্রকৃতির জন্য অলিখিত বিশুদ্ধ বস্তু যাতে বিবর্তনের সূক্ষ্ম অথচ বিশদ সাক্ষ্য বিধৃত রয়েছে। পাথরটি ভালোভাবে ধোয়ামোছা করে পরিষ্কার করলে একে বইয়ের পাতার মতো স্তরীভূত দেখা যাবে আপনি যখন এর একটি ব্লক বা পাতা ওল্টাবেন তখন প্রতি শলাখণ্ডের প্রতিটি পাতা ওল্টানোর প্রলোভন আপনি সামলাতে পারবেন না। মনে হবে আপনার আগে এগুলোর প্রতি কারো দৃষ্টি পড়েনি এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা ১৪ কোটি বছরের মধ্যে অজানা রয়ে গেছে। অবশ্য এসবের অনেকগুলো পাতা খালি। তবে যখন তখন, খনি খননকারীরা অবিশ্বাস্যভাবে প্রায় পূর্ণাঙ্গ জীবাশ্ম দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন পূর্ণ কঙ্কাল ও উজ্জ্বল আঁইশসহ মাছ, কোনো গর্তের শেষ প্রান্তে মৃত্যুর সময় যেমনটি ছিলো তেমনটি থাকা হর্স সু ক্র্যাব, সূক্ষ্ম শূঙ্গসহ লবস্টার, ছোট ডায়নোসর, ইকথাইওসর এবং ভাঙা-টুটা কিন্তু অবিকৃত পাখনা এবং চর্মনির্মিত পাখনার ছাপবিশিষ্ট টোরোডাক্টাইল। কিন্তু ১৯৬০ সালে সেই সুন্দর প্রহেলিকাময় পালকটি প্রথমবারের মতো জানিয়ে দিলো যে সেসময় ওদের মধ্যে পাখিও বিচরণ করতো।

ওটি কোন্ ধরনের পাখির অন্তর্ভুক্ত ছিলো? বিজ্ঞানীরা পালকের উপর ভিত্তি করে এর নাম রাখেন অর্কিওপটেরিক্স বা প্রাচীন পাখি। এক বছর পর, গবেষকরা এর কাছাকাছি কবুতর আকারের আরেকটি পাখি জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। এটিতে পালকসহ প্রায় পুরো কংকাল ছিলো। এটি শিলাখণ্ডে পাখা ও পা ছড়িয়ে পড়েছিলো। পাখা দুটো বিস্তৃত ছিলো। একটি লম্বা পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। অপরটি চারটি নখরযুক্ত আঙুলসহ দেহের সাথে যুক্ত ছিলো। পাখির চারপাশে, অপ্রত্যাশিত ও বিতর্কের উর্ধ্বে স্পষ্ট পালকের ছাপ ছিলো। নিশ্চিতভাবে একে প্রাচীন পাখি বলা সঙ্গত। তবে বর্তমানের জীবিত পাখির সাথে এর বাস্তব পার্থক্য রয়েছে। দেহের পেছনে মেলে ধরা লম্বা পালকযুক্ত পুচ্ছ এবং এতে মেরুদণ্ডের শেষাংশ সম্প্রসারিত। ফলে পুচ্ছটি খুবই মজবুত। পা কেবল নখরযুক্ত নয়, পাখা বা পুরো উপাঙ্গের তিনটি আঙুলেও নখর রয়েছে। এটি যেমনটি সরীসৃপের মতো আবার তেমনটি পাখিরও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যবাহী। অরিজিন অব স্পিসিস বা "প্রজাতির উৎস" শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের দুই বছরের মধ্যে এই পাখি আবিষ্কার ডারউইনের অনুমানকে সত্যে প্রমাণিত করলো। ডারউইন বলেছিলেন একদল প্রাণী অন্যদলে বিকশিত হবার সময়ে উভয় দলের মাঝামাঝি দুই দলেরই বৈশিষ্ট্যবাহী একটি দল সৃষ্টি হয়েছিলো। ডারউইনের অন্যতম অনুসারী হাক্সলি এ ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব অবশ্যই আছে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ভবিষ্যৎ বক্তার মতো এর বর্ণনাও দিয়েছিলেন। প্রাণিজগতে এ ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদী সেতুবন্ধের উদাহরণ আর নেই।

আর্কিওপ্টেরিক্সের প্রথম কঙ্কাল পাওয়ার পর সোলনহোফেন জেলায় আরো দুটো আর্কিওপ্টেরিক্স পাওয়া গেছে। একটি অপরটির তুলনায় পূর্ণাঙ্গ এবং একটিতে পুরো করোটি রয়েছে। এগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশদভাবে জানা গেছে। এদের হাড় দ্বারা নির্মিত চোয়ালে দাঁত ছিলো। ওলন্দাজদের জাদুঘরে কয়েক বছর আগে চতুর্থ আর্কিওপ্টেরিক্সটিকে দেখা গেছে। এটিও পাওয়া গেছে সোলনহোফেনে। প্রথমটির হাড় পাবার ৬ বছর আগে এটিকে পাওয়া যায়। যেহেতু এর পালকের ছাপ খুব অস্পষ্ট ছিলো এবং দেখা প্রায় দুঃসাধ্য ছিলো তাই

একে ভুল করে ছোট টেরোডক্টাইল হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিলো। সরীসৃপের কিছু বৈশিষ্ট্য এদের দেহে থাকার কারণেই এই বিভ্রান্তি ঘটেছিলো। এমনকি গবেষকদের দৃষ্টিও বিভ্রান্ত হয়েছিলো।

এ সকল জীবাশ্ম থেকে আর্কিওপ্টেরিক্সের শারীরস্থানবিদ্যা বিষয়ে বিশদ জানা গেছে। এর মাথা, পা ও গলার উর্ধ্বাংশ ছাড়া বাকি শরীর পালকে ঢাকা ছিলো। নিঃসন্দেহে এগুলো উত্তমভাবে তাপ অপরিবাহী হিসেবে কাজ করতো এবং দেহের উচ্চ তাপসাম্য রক্ষায় সহায়তা দান করতো। যে অসম তাপমাত্রার কারণে এদের নিকটাত্মীয় ডায়নোসরদের ভোগান্তি হয়েছিলো পালকের বৈগুণ্যে এদেরকে সে অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়নি। এ ধরনের উষ্ণ আবরণ নিয়ে এমনকি দিনের ঠান্ডা সময়েও আর্কিওপ্টেরিক্স অবশ্যই দ্রুত চলতে পারতো।

পাখায় পালক থাকলেই তা উড়ার জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না। উড়ার জন্য পাখায় থাকা চাই শক্তিশালী পেশি। সকল উড্ডয়নশীল পাখিতে বক্ষের হাড়ে স্থিত সম্প্রসারিত স্টারনাম বা তরীদলের সাথে শক্তিশালী পেশি সংযুক্ত থাকে। আর্কিওপ্টেরিক্সে ঐ ধরনের কোনো হাড় ছিলো না। কাজেই ওরা পাখা তাড়না করতো মৃদুভাবে এবং তা বায়ুতে উড়ার মতো পর্যাপ্ত ছিলো না। বলা হয় যে এরা পালককে জাল হিসেবে ব্যবহার করতো। পাখাকে বাইরের দিকে সম্প্রসারিত করে ওরা পোকামাকড় ধরার ফাঁদ পাততো। অধিকতরো সরল ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা হলো, এর পূর্বপুরুষরা ছিলো বৃক্ষচারী এদের পালকগুলো প্রাথমিকভাবে সরীসৃপের আঁইশ থেকে বিকশিত হয়েছিলো তাপ পরিবাহী হিসেবে কাজ করার জন্যে। পালক ক্রমে বড়ো থেকে বড়ো হঁয়। শেষ পর্যন্ত আর্কিওপ্টেরিক্স এগুলোর সাহায্যে গাছের ডাল থেকে ডালে গড়িয়ে যেতে পারতো, যেমন করে দেহ থেকে সম্প্রসারিত ত্বকপর্দার সাহায্যে বর্তমানকালের টিকটিকিজাতীয় প্রাণী গড়িয়ে যায়। আর্কিওপ্টেরিক্স অবশ্যই আরোহণে পারদর্শী ছিলো। এর চারটি আঙুল পশ্চাৎমুখী ও অপরটি বিপরীতমুখী। ফলে এরা কোনো কিছুকে জোরে আঁকড়ে ধরায় সক্ষম ছিলো। তদুপরি পাখার অগ্রপ্রান্তের নখরগুলোও ডালপালায় ঝুলে থাকতে সাহায্য করতো।

এ ধরনের আরোহণ প্রক্রিয়া কতোখানি ফলপ্রসূ তা বর্তমানে জীবিত একটি পাখির আচরণ দেখে বোঝা যেতে পারে। হোয়াটযিন একটি অদ্ভুত ভারী মজবুত দেহবিশিষ্ট পাখি। এটি আকারে একটি বড়ো মুরগির মতো। গায়েনা ও ভেনেজুয়েলার জলাজমিতে এর বাস। গাছের ডালপালা দিয়ে এটি যেনোতে নোভাবে বাসা বানায়। বাসা বানায় জলের উপরে। কখনো গরান গাছেও বাসা বাঁধে। সদ্যজাত পাখি–শিশু পালকহীন ও খুবই সক্রিয়। এদের পর্যবেক্ষণ করা সহজ নয়। গাছের ডালের সাথে নৌকার দাঁড়ের আঘাত লাগা যদি সামলানো না যায়, পাখির বাসা যদি নড়ে উঠে, তাহলে পাখির ছানাগুলো ঠেলাঠেলি করে বাসার ডালপালা ছেড়ে গাছের শাখায় জড়ো হয়। এদের আরো উত্যক্ত করা হলে, তাদের দেখার সুযোগ একেবারেই থাকে না। কারণ এরা হঠাৎ বাতাসে উড়ে যায়। তৎপরতার সাথে দেয় জলে ডুব এবং সাঁতরে গরান গাছের শিকড়ের জটের মধ্যে ঢুকে যায়। এরপর এদের দেখা পাওয়া কষ্টকর। ভাগ্য ভালো থাকলে, আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে ওরা গাছের শাখায় আঠার মতো লেগে থাকে এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় চলাচল করে ও আরোহণ করে। প্রতিটি পাখার আগায় দুটো ছোট নখর থাকে। এদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপদের পাখার

বদলে আলাদা আঙুলসহ পুরো উপাঙ্গের স্মারক হিসেবে এই নখরের উপস্থিতি অনুমান করা যায়। ডায়নোসর অধ্যুষিত অরণ্যে আর্কিওপ্টেরিক্সরা কিভাবে শাখা থেকে শাখায় চলাচল করতো তা পালকহীন এই পাখির ছানাদের চলার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায়।

হোয়াটযিন পাখির ছানারা বড় হলে ওদের বিলুপ্তপ্রায় নখর ঝরে পড়ে। প্রাপ্তবয়স্ক হোয়াটযিন পাখি উড়তে পারে কম। এরা খুব শ্রম সহকারে, কষ্টের সাথে পাখা ঝাপটিয়ে নদীপথে চলে। দেখা যায়, ১০০ মিটার বা এর একটু বেশি উড়েই এরা ঝোপ-ঝাড় গাছপালার মধ্যে ধপাস করে পড়ে এবং বিশ্রাম নেয়। তবে, নিঃসন্দেহে এরা আর্কিওপ্টেরিক্সের চেয়ে অনেক বেশি উড্ডয়নক্ষম। কারণ, বর্তমানের পাখিদের মতো অতীতের ১৪ কোটি বছরের মধ্যে, এদেরও উড্ডয়নের সপক্ষে কক্ষকালে বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

উড্ডয়নে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হয় ওজনকে। ওজন হওয়া চাই ন্যূনতম। আর্কিওপ্টেরিক্স-এর হাড় ছিলো সরীসৃপের হাড়ের মতো ভরাট। খাঁটি পাখির হাড় কাগজের মতো হালকা এবং হাড়ের ভিতরেটা ফাঁপা। এরোপ্লেনের পাখা মজবুত করার জন্য যেমন পাখার মধ্যে আড়াআড়ি খিলান থাকে, পাখির হাড়েও প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা থাকে। পাখির ফুসফুস সম্প্রসারিত হয়ে বায়ুথলেতে পরিণত হয়েছে। বায়ুথলে স্ফীত হয়ে দেহগহ্বরের ফাঁপা স্থান পূর্ণ করে রাখে। ফলে দেহ আরো হাল্কা হয়। আর্কিওপ্টেরিক্সের পুচ্ছের মূল শক্তি ছিলো মেরুদণ্ডের প্রসারিত অংশ। পাখিতে এই অংশের স্থানে সৃষ্টি হয়েছে মজবুত বৃন্তযুক্ত বা স্কুইলড পালক। ফলে পুচ্ছে হাড়ের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। উড়ন্ত যে কোনো প্রাণীর জন্যে দাঁতযুক্ত ভারী চোয়াল উড়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ, এটি দেহের ভারসাম্য নষ্ট করতে চায় এবং সামনের দিককে ভারী করে। আধুনিক পাখিতে দাঁত ও চোয়াল নেই। দাঁত ও চোয়ালের পরিবর্তে চঞ্চুর সৃষ্টি হয়েছে। চুঞ্চ কেরাটিন দিয়ে নির্মিত, চঞ্চু ওজনেও হাল্কা। অতি মজবুত চঞ্চু কিন্তু চিবানোর উপযোগী নয়। কাজেই অধিকাংশ পাখির জন্য খাদ্য গুঁড়ো করার ব্যবস্থা থাকা চাই। এ কাজটি করে পাকস্থলির পেশিবহুল বিশেষ অংশ। অংশটির নাম গিজার্ড বা গিলা। দেহের মাঝামাঝি দুই পাখনার মাঝে এটি অবস্থিত। ফলে দেহের ভারসাম্য রক্ষায় বিঘ্ন ঘটে কম এবং দেহের উড়ন্ত অবস্থায় তা ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। চঞ্চু খাদ্য সংগ্রহের চেয়ে অন্য কাজ করে বেশি।

সরীসৃপের আঁইশের মতো, পাখির চঞ্চুর কেরাটিন, বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, চঞ্চুর আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। পাখির খাদ্যভ্যাস পরিবর্তনে চঞ্চু কতো দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে তা বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হানি-ক্রিপার পাখিতে। এই পাখিদের পূর্বপুরুষ খুব সম্ভবত চড়ুই আকারের ছিলো। এর চঞ্চু ছিলো ছোট, সোজা। এরা আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে বাস করতো। কয়েক হাজার বছর আগে, এদের একটা ঝাঁক অবশ্যই বাত্যাতাড়িত হয়ে গহীন সমুদ্রে চলে আসতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত এরা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে। এই দ্বীপগুলো অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তুলনামূলক কাল বিচারে সম্প্রতি সৃষ্টি হয়েছে। এখানে গড়ে উঠেছে রসালো নিসর্গের অরণ্য এবং এতে অন্য কোনো পাখি নাই। এখানে অনেক ধরনের খাবার। ভিন্ন ধরনের খাবার গ্রহণের উপযোগী হবার প্রয়োজনে এরা বিভিন্ন প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়। প্রতিটি প্রজাতি বিশেষ ধরনের খাদ্য গ্রহণে বিশেষ গুণের অধিকারী হয় এবং এ ধরনের খাদ্য সংগ্রহের জন্য যে ধরনের চঞ্চুর দরকার, তা নির্মিত হয়। বীজ খাবার জন্য সৃষ্টি হয় খাটো পুরু চঞ্চু। শক্তিশালী বড়শির মতো চঞ্চু সৃষ্টি হয় শবের

মাংস ছিড়ে খাবার জন্যে। একটি প্রজাতির চঞ্চু দীর্ঘ ও বাঁকা। এটি দিয়ে ওরা লোবেলিয়া ফুলের মধু সংগ্রহ করতে পারে। অন্যটির উপরের হণু (maxilla) বা চঞ্চুর উপরের অংশ নিম্ন হণু বা নিচের অংশের দ্বিগুণ। এর সাহায্যে পাখি গাছের বাকলে ঠোকর মেরে মেরে গুবরে জাতীয় পোকা সন্ধান করে। আবার কোনোটির উর্ধ্ব হণু ও নিম্ন হণু কাঁচির মতো আড়াআড়ি। এ ধরনের চঞ্চু ফুলের কুঁড়ি থেকে পোকা সংগ্রহে সাহায্য করে। ডারউইন গ্যালাপ্যাগোজ দ্বীপপুঞ্জে ফিঞ্চ পাখিদের চঞ্চুতে এ রকম বিভিন্ন আকৃতি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এগুলোকে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের সপক্ষে জোরালো প্রমাণ বলে মনে করেছেন। হাওয়াইয়ে যাবার সৌভাগ্য ডারউইনের হয়নি। যদি যেতে পারতেন, তাহলে তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে হানি-ক্রিপারদের দৃষ্টান্ত দাঁড় করিয়ে আরো নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন।

পক্ষীজগতের অন্যত্রও বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চঞ্চুতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এমনকি এই পরিবর্তন অনেক জটিল প্রকৃতিরও বটে। সোর্ডবিলড বা তলোয়ারচঞ্চু হামিংবার্ডের দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় চঞ্চুর দৈর্ঘ্য ৪ গুণ বেশি। এই চঞ্চু দিয়ে হামিংবার্ড অ্যান্ডিয়ান ফুলের খুব গভীরে থাকা মধু পান করে। ম্যাকাউ পাখির চঞ্চু বড়শির মতো। এটি এতো মজবুত যে এই চঞ্চু দিয়ে ওরা ভীষণ শক্ত ব্রাজিলীয় বাদাম ভাঙতে পারে। কাঠ ঠোকরা পাখি চঞ্চুকে ড্রিল মেশিন বা খোদাইকারী মেশিনের মতো ব্যবহার করে বৃক্ষ থেকে কাঠ খোদাইকারী গুবরে পোকা সংগ্রহ করে। ফ্ল্যামিঙ্গোর বক্র চঞ্চুর ভিতরে সূক্ষ্ম একটি নল থাকে। গলার সাহায্যে এই নল দিয়ে ওরা পানি পাম্প করে উপরে তুলে। এভাবে এরা পানি থেকে ছোট কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী সংগ্রহ করে খায়। স্কিমার পাখির নিম্নহণু বা নিচের ঠোঁট, উপরের ঠোঁটের চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা। এটি নদীর জলের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় নিচের ঠোঁট জলপৃষ্ঠ স্পর্শ করে চলে। ওষ্ঠের সংস্পর্শে কোনো মাছ এলে তৎক্ষণাৎ চঞ্চু বন্ধ হয়ে যায়। মাছ চঞ্চুতে ধরা পড়ে। বিচিত্র আকৃতির চঞ্চুর উদাহরণের কোনো শেষ নেই। এসকল চঞ্চুই প্রমাণ করে যে কেরাটিন-নির্মিত চঞ্চু কি পরিমাণ নমনীয় হতে পারে।

লক্ষ্যণীয়, মাছ, বাদাম, মধু, পতঙ্গের শূককীট, শর্করাবাহী ফল ইত্যাদি অধিকাংশ খাদ্য ক্যালোরিতে ভর্তি। উড়ায় খুব শক্তির দরকার। তাই এগুলো পাখির পছন্দ। তাপ হিসেবে সৃষ্ট শক্তি যাতে বিনষ্ট না হয় এ কারণে তাপ অপরিবাহী বস্তুর গুরুত্ব অনেক বেশি। কাজেই পালক পাখির উড়ার জন্য কেবল আবশ্যক নয়, দেহে পর্যাপ্ত শক্তি সংরক্ষণের জন্যও অপরিহার্য।

তাপ অপরিবাহী হিসেবে পালক লোমের চেয়ে অধিক কার্যকর। পৃথিবীর শীতলতম অঞ্চল দক্ষিণ মেরুতে কেবল একটি পাখিই বেঁচে থাকতে পারে। পাখিটির নাম পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইনের পালক পুরোপুরি তাপ অপরিবাহিতার কাজেই নিয়োজিত। পালকগুলো সূত্রবৎ। পুরো দেহের উপর পালক অবিরাম একটা বায়ুস্তরকে আয়ত্তে রাখে। ত্বকের ঠিক নিচের চর্বিস্তর পালকের সহযোগীরূপে শক্তি যোগায়। গলনাংকের ৪০° সেলসিয়াস নিচে প্রবল তুষারপাতের সময় পালক ও চর্বি উষ্ণশোণিত প্রাণীকে রক্ষা করে। দুর্যোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কয়েক সপ্তাহ এভাবে কাটাতে হয়। এমন কি শক্তির উৎস খাদ্য আহার না করেও তাদের দিন কাটাতে হয়। মানুষ যখন কুমেরুতে যায় তখন খুব বিলাসবহুল ও ফলপ্রসূ উপায় গ্রহণ করে দেহকে উষ্ণ রাখে। কুমেরুতে মানুষের দেহকে উষ্ণ রাখার এটিই মানুষের সর্বশেষ উদ্ভাবন। উপায়টি হলো কুমেরুর হাঁসের নরম পালক দিয়ে তৈরি পোশাক পরিধান।

যে পালকের উপর পাখির জীবন এতো নির্ভরশীল, পাখিরা সেই পালককে সাধারণত বছরে একবার নির্মোচন করে এবং তা আবার গজায়। পাখিকে নিয়মিত পালকের যত্ন নিতে হয় এবং সার্ভিসিং করতে হয়। পালককে জলে ধোয়া হয় এবং ধুলোয় গড়াগড়ি করে এলোমেলো করা হয়। অবিন্যস্ত পালককে সযত্নে বিন্যস্ত করা হয়। পালকে নোংরা লেগে থাকলে বা পালক ভিজা থাকলে, অথবা পালকের অংশবিশেষ বিনষ্ট হলে তা চঞ্চুর সাহায্যে সতর্কভাবে আঁচড়িয়ে ঠিক করা হয়। চঞ্চুর মধ্যে দিয়ে পালকসূত্র অতিক্রম করার সময়, সূত্রকন্টকের কাঁটাগুলো ট্রাউজারের চেইনের মতো কাজ করে। ফলে পালক মসৃণ ও সমতলবিশিষ্ট হয়ে উঠে।

অধিকাংশ পাখিতে লেজের গোড়ায় একটি বড়ো তেলগ্রন্থি থাকে। পাখি চঞ্চু দিয়ে তেলগ্রন্থি থেকে তেল নেয় এবং প্রতিটি পালকে লেপন করে যাতে পালক নমনীয় ও জলরোধী হয়। হেরন, টিয়া ও টাওকন ইত্যাদি পাখিতে তেলগ্রন্থি নেই। এর পালক চকচকে করে মিহি সাবানের গুঁড়োর মতো বস্তু দিয়ে। বিশেষ এক ধরনের পালক ঘষে ঘষে এই গুঁড়ো তোলা হয়। বিশেষ এই পালক স্তূপে স্তূপে বা বিচ্ছিন্নভাবে সারা দেহে বড়ো পালকের মধ্যে গজায়। করমোরান্ট বা লিপ্তপাদ জলচর পাখিগুলো ও এদের আত্মীয় ডার্টার পক্ষীসমূহ অধিকাংশ সময় ডুব সাঁতারে কাটায় এবং এদের পালক এমনভাবে সজ্জিত যাতে পুরোটা জবজবে ভিজে যায়, কিন্তু এতে বরং এদের সুবিধাই হয়। কারণ পালকের নিচে বায়ুধারণের সুযোগ বিনষ্ট হওয়াতে দেহ ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে কম, ফলে অতি সহজে ডুব দিয়ে মাছ ধরতে পারে। মাছ ধরা শেষ হলে ওদেরকে শিলার উপর উঠে আসতে হয়। তখন পাখা মেলে পালক শুকিয়ে নেয়।

পালকের নিচের ত্বক মাছি, উকুন ও অন্যান্য পরজীবীর জন্য অতি আকর্ষণীয় স্থান। ত্বক উষ্ণ, আরামপ্রদ এবং তা দৃষ্টির অন্তরালে থাকে। পাখিকে উত্যক্ত করার মতো অসংখ্য পরজীবী ত্বকে আশ্রয় নেয়। কাজেই পাখিকে নিয়মিত পালক খাড়া করতে হয় এবং পালক বৃন্তের বা কুইলের চারপাশে চঞ্চু চারিয়ে আশ্রিতদের তুলে আনতে হয়। জে. স্টারলিং ও জ্যাকডউ পাখিসহ কতিপয় অন্যান্য পাখি সক্রিয়ভাবে পোকা-মাকড়কে ত্বকে চলাচলে উৎসাহিত করে। পতঙ্গ দ্বারা উকুন বিনাশের জন্যই সম্ভবত এই কৌশলের আশ্রয় নেওয়া। পাখি পিপঁড়ার বাসায় উবু হয়ে বসে, পালক এলোমেলো করে ছড়িয়ে রাখে, যাতে পিপড়া বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হয়ে পালকের উপর চড়াও হয়। কখনো কখনো পাখি চঞ্চু দিয়ে পিপঁড়া ধরে। এমনভাবে ধরে যাতে ছুটে না যায়, অথচ ব্যথা পেয়ে যেনো মরেও না যায়। পাখি ত্বকে খোচা মেরে ওখানে রাখে এবং পালকের মধ্যে রেখে নাড়াচাড়া করে। পাখি সেসব পিঁপড়া বেছে নেয়, সেসব পিপঁড়া বিরক্ত হলে ফরমিক অ্যাসিড ছুঁড়ে দেয়। এই এসিড পরজীবীদের হত্যা করে। এই আচরণ পাখির ব্যষ্টিক স্বাস্থ্যরক্ষার কারণে অনুসৃত হতে পারে। কিন্তু কতকগুলো পাখি বিনোদনের জন্যও এমনটি করে থাকে। ত্বকে সুড়সুড়ি দিয়ে আনন্দদায়ক উত্তেজনা সৃজনই এর লক্ষ্য। বোলতা ও গুবরে পোকা আগুনের কাছ থেকে ধোঁয়া শুঁকে, এমনকি পোড়া সিগারেটের ধোঁয়াও। পিপঁড়া নিয়ে এই কর্মকাণ্ড আধ ঘন্টা বা এর একটু বেশি সময় ধরে চলতে পারে। পাখি কোনো কোনো সময় পিপঁড়ার উপর উত্তেজিত হয়ে পড়ে থাকে যাতে পিপড়া দেহের সে অংশে যাওয়া কষ্টসাধ্য যে অঞ্চলে গিয়ে উত্তেজনার সাড়া জাগাতে পারে।

পাখির উড্ডয়ন স্থগিত থাকাকালে পালক শোধন-পরিষ্করণ ও ত্বক পরজীবীমুক্তকরণ ইত্যাদি চলতে থাকে। উড়ার সময় এই পরিচর্যার সুফল বোঝা যায়। পাখা ও পুচ্ছে নিখুঁত সাজানো পালকই কেবল উড্ডয়নে কেবল সহায়ক হয় না, মাথা ও দেহের পালকও সমভাবে দেহকে সোজা চলায় মূল্যবান সহায়তা দান করে এবং যাতে দেহ ঘুরে না যায় ও নিচের টানে পড়ে না যায় সে ব্যবস্থা করে।

উড়োজাহাজের পাখার চেয়ে পাখির পাখার কাজ অনেক বেশি জটিল। পাখির দেহকে পতন থেকে রক্ষা করা ছাড়াও এটিকে এঞ্জিন হিসেবে অবশ্যই কাজ করতে হয় এবং সমগ্র দেহকে বাতাসের মধ্যে দিয়ে টেনে নিতে হয়। মানুষ তার উড়োজাহাজের নকশা করার সময় বায়ুগতিবিদ্যাবিষয়ক যে নীতি আবিষ্কার করেছিলো তার ধারণা পেয়েছিলো পাখির পাখার নকশা থেকে। যদি আপনি বিভিন্ন ধরনের বায়ুপোত কিভাবে কাজ করে জানতে পারেন, তাহলে বায়ুপোতের সমরূপ আকৃতির পাখির উড্ডয়ন ক্ষমতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন।

খাট, বলিষ্ঠ পাখা ট্যান্যাজার ও অন্যান্য অরণ্যচারী পাখিকে দ্রুতবেগে একটার নিচে অন্যটিকে হঠাৎ পাক খেয়ে সরে যেতে এবং মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে সাহায্য করে যেমনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যোদ্ধা বিমানগুলোকে তাঁদের খাট পাখা সম্মুখ যুদ্ধে সাহায্য করেছিলো। আরো আধুনিক যোদ্ধা বিমানের গতি আরো বেশি। এগুলো উড়ন্ত অবস্থায় দ্রুত পেছনে ও নিচে সরে আসতে পারে। পেরেগ্রিন পাখিও ঘন্টায় ১৩০ কিলোমিটার বেগে ছুটে ছোঁ মেরে নিচে নেমে শিকার ধরে। সবচেয়ে চৌকষ উড্ডয়নকারী পাখির পাখা লম্বা ও সরু। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে উষ্ণ প্রবাহে ওরা উঠে ঘন্টার পর ঘন্টা পাখা স্থির রেখে নিচে নামে। উড্ডয়নশীল পাখিদের মধ্যে সর্ববৃহৎ অ্যালবাট্রসের লম্বা ও সরু পাখা রয়েছে। এর পাখার দৈর্ঘ্য তিন মিটার। এরা সাগরের উপরে ঘন্টার পর ঘন্টা একবারও পাখা না নেড়ে ঘুরে বেড়ায়। শকুন ও ঈগল খুব কম গতিতে বৃত্তানুগ ঘুরে। এদের পাখা আয়তাকৃতির ও সম্প্রসারিত। ধীরগতিসম্পন্ন বিমানের পাখাও অনুরূপ। বাতাসে ভেসে থাকার উপযোগী কোনো পাখা মানুষ উদ্ভাবন করতে পারেনি। মানুষ কেবল হেলিকপ্টারের আড়াআড়ি থাকা ঘূর্ণমান ব্লেড বা পাখা অথবা খাড়া নেমে আসা জেট বিমানের নিম্নমুখী ইঞ্জিন উদ্ভাবন করতে পেরেছে। হামিংবার্ড এ ধরনের উড্ডয়নও রপ্ত করতে পেরেছে। এরা দেহকে উল্টিয়ে প্রায় খাড়া করে এবং এর পর সেকেণ্ডে প্রায় ৮০ বার পাখা নাড়ে। ফলে হেলিকপ্টারের পাখার মতো বাতাসে নিম্নচাপ সৃষ্টি করে স্থিরভাবে উড়তে পারে। কাজেই, হামিংবার্ড বাতাসে ভেসে থাকতে পারে এবং পশ্চাৎমুখী উড়তেও পারে।

পাখির মতো অন্য কোনো প্রাণী এতো দ্রুত উড়তে পারে না। সুইফট পাখির ওড়ার গতি সবচেয়ে বেশি। এশিয়ার একটি সুইফট প্রজাতির পাখি বাতাসে একই উচ্চতায় ঘন্টায় ১৭০ কিলোমিটার উড়ায় সক্ষম এবং এটি প্রতিদিন ৯০০ কিলোমিটার উড়ে। ওড়ার কারণ পতঙ্গ সংগ্রহ। পতঙ্গই এদের একমাত্র খাদ্য। বাতাসে টিকে থাকার জন্য এর দেহে চরম অভিযোজন ঘটেছে। যেমন এর পাগুলো বিলোপ প্রক্রিয়ায় বর্তমানে আঁকড়ে ধরার বড়শির আকারে পরিণত হয়েছে। ছোট বাকা তরবারির মতো পাখা এতো লম্বা যে, মাটিতে বসে একে যথার্থভাবে নাড়ানো যায় না। পর্বতের পাশ বা বাসার কিনারা থেকে ওরা অনায়াসে উড়া শুরু করতে পারে। এদের সঙ্গম সম্পন্ন হয় বাতাসে। স্ত্রী পাখি উপরে ওড়ে এবং পাখাদ্বয়

টান টান করে মেলে ধরে। পুরুষ পাখি পেছন থেকে এসে স্ত্রী পাখির পিঠে চড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য, পরে দুটি পাখি জড়াজড়ি অবস্থায় গড়িয়ে যায়। দুই প্রজনন ঋতুর মধ্যে এরা কখনো নিচে নামে না। অর্থাৎ এরা নয় মাস অনবরত বাতাসে পাখায় ভর করে কাটায়। এদেরকে টেক্কা দেয় সুটি টার্ন। এটি শঙ্খ চিল জাতীয় পাখি। বাসা ছাড়ার পর এদের কখনো জলে নামতে দেখা যায় না। তিন চার বছর পর নেমে ওরা বাসা বানায়।

পাখিদের অনেক প্রজাতি বাৎসরিক দীর্ঘ ভ্রমণে যায়। ইউরোপীয় সারস পাখি প্রতি হেমন্তে আফ্রিকা যায় এবং বসন্তে ইউরোপে ফেরে। দম্পতি যুগল বছরের পর বছর ওড়ার ক্ষেত্রে এতো নিপুণ যে এরা প্রতিবারই একই ছাদে ও একই বাসায় বাস করে।

সুমেরুর শঙ্খচিল সবচেয়ে সেরা পর্যটক। সুমেরু চক্রের উত্তরে কেউ কেউ বাসা বানায়। জুলাই মাসে গ্রীনল্যান্ডের উত্তরাংশে ডিম ফুটে ছানা বেরোনোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১৮,০০০ কিলোমিটার ভ্রমণে বেরিয়ে প্রথমে দক্ষিণে, আফ্রিকা ও ইউরোপের পশ্চিম উপকূল বেয়ে এবং পরে কুমেরু মহাসাগর অতিক্রম করে এদের গ্রীষ্মাবাসে যায়। গ্রীষ্মাবাসটি হলো দক্ষিণ মেরুর অদূরে বরফপুঞ্জে।

অতঃপর পরবর্তী মে মাসে উত্তরে যাত্রার আগে অবিরাম পশ্চিমা মৃদ বাতাসের তোড়ে ওরা পুরো কুমেরু মহাদেশ চককোর দেয়। আরো একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করে এবং উত্তরমুখী চলতে চলতে গ্রীনল্যান্ডে ফিরে আসে। কাজেই এরা কুমেরু ও সুমেরুর গ্রীষ্ম উপভোগ করে যখন সূর্য কদাচিৎ দিগন্তরেখার নিচে ডুবে। এরা পৃথিবীর যে কোনো প্রাণীর চেয়ে অধিক দিবালোক দেখার সুযোগ পায়।

পরিযায়ী এই পাখির অনন্ত ভ্রমণে বিশাল পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়, কিন্তু এরা যে পর্যাপ্ত সুযোগ পায় তা স্পষ্ট। তাদের প্রতিটি ভ্রমণ-পথের শেষে এরা সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ পায়। এ সরবরাহ পায় ছয় মাস ধরে। কিন্তু এতো দূরে যে খাদ্যের উৎস রয়েছে তা এরা আবিষ্কার করে কিভাবে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মনে হয়, এদের ভ্রমণ সবসময় এতো দীর্ঘ ছিলো না। বরফ যুগের শেষে এগার হাজার বছর আগে, পৃথিবীর উষ্ণ হবার সময় পাখিরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সে সময়ের আগে, আফ্রিকার পাখিরা, উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপের দক্ষিণাংশের তুষারশৃঙ্গের কিনারের উত্তরে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে যেতে পারতো। ইউরোপের এই অংশে গ্রীষ্মের মাত্র গুটি কয় মাসে পর্যাপ্ত সংখ্যক পতঙ্গের আবির্ভাব হতো এবং এখানে কোনো স্থায়ী বাসিন্দা ছিলো না যারা এ পতঙ্গকে ভোজ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারতো। যখন বরফ ক্রমে সরতে থাকে তখন বরফ থেকে স্থলভাগের খণ্ডাংশ মুক্ত হয়। বরফমুক্ত স্থলভাগে পতঙ্গের ও বেরি বহনকারী গাছের আবির্ভাব ঘটে। কাজেই, প্রতি বছর পাখিরা উত্তরোত্তর ওড়ার মাধ্যমে খাদ্যের সন্ধান পেতে থাকে। এভাবে ওদের হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি জমানোর কাজ সম্পন্ন হয়। সম্ভবত অনুরূপ জলাহাওয়ার পরিবর্তনসমূহ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার পরিযায়ী পাখিতে যাত্রা দীর্ঘায়িত করার জন্য দায়ী ছিলো। এদের ভ্রমণ পথ ছিলো পূর্ব-পশ্চিম বরাবর মহাদেশের মধ্যাংশ দিয়ে। ভ্রমণ সময় ছিলো গ্রীষ্ম। শীতে ফিরে আসতো উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে। সমুদ্র এই অঞ্চলে উষ্ণতা ছড়াতো।

কিন্তু পাখি পথ চিনতো কি উপায়ে? এর উত্তর একটি নয়। এরা বহু পদ্ধতি ব্যবহার করে। পদ্ধতিগুলোর কয়েকটি সম্পর্কে আমরা সবে বুঝতে শুরু করেছি। কতকগুলো

আমাদের কাছে রহস্যপূর্ণ মনে হয় এবং কতকগুলো ওদের সক্ষমতার উপর নির্ভরশীল যেগুলোকে আমরা এখনো সন্দেহ করিনি। অনেক পাখি অবশ্যই বৃহৎ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে। আফ্রিকার গ্রীষ্মকালীন পারিযায়ী পাখি উত্তর আফ্রিকার উপকূল ধরে চলে এবং সবাই জিব্রাল্টার প্রণালিতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং এই জায়গা অতিক্রম করে। যেখানে ওরা নাকের ডগায় ইউরোপকে দেখতে পায়। এরপর পাখিরা উপত্যকার দিকে যায়, আলপ্‌স বা পাইরেনিজ-এর ভিতর দিয়ে চিহ্নিত গিরিপথের উপর দিয়ে উড়ে তাদের গ্রীষ্মাবাসে এসে পৌছয়। অন্যরা বসফরাস হয়ে পূর্বাঞ্চলীয় পথ ধরে চলে।

তবে সব পাখি এ ধরনের সোজা পথ ব্যবহার করতে পারে না। যেমন সুমেরুর শঙ্খচিল ক্রুমেরু মহাসাগরের উপর দিয়ে কমপক্ষে ৩০০০ কিলোমিটার উড়ে। ওড়ার পথে, পথ নির্দেশনা দেবার মতো কোনো স্থলভাগ থাকে না। আমাদের জানা আছে যে, কতিপয় পাখি রাতে চলে এবং তারা তাদের গতিপথের নির্দেশনা পায়। মেঘলা আকাশে ওরা পথভ্রষ্ট হয়, প্ল্যানেটোরিয়ামে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রপুঞ্জে এদেরকে ছেড়ে দিলে ওরা তারকার অবস্থানের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। এরা কেবল কৃত্রিম ও দৃশ্য তারকাকেই কেবল অনুসরণ করে চলতে থাকে।

দিনে ওড়া পাখি সূর্যকে ব্যবহার করতে পারে। এটি করতে হলে, এদেরকে প্রতিদিনের সূর্য পরিক্রমাকে খেয়ালে রাখতে হবে অর্থাৎ সময় সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যরা পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রকে নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করে। এতে মনে হয় অনেক পরিযায়ী পাখিকে তাদের মগজে একটি ঘড়ি, একটি কম্পাস বা দিক নির্ণায়ক যন্ত্র এবং স্মারক মানচিত্র বহন করতে হবে। কয়েক সপ্তাহ বয়সের সোয়ালো পাখির ছানার ভ্রমণের সাথে পাল্লা দিতে হলে একজন মানুষ নাবিকের জন্য নিশ্চিতভাবে ঘড়ি, কম্পাস ও মানচিত্রের প্রয়োজন হবে।

কোনো কোনো পাখির ক্ষেত্রে উপরিলিখিত পারদর্শিতাও নগণ্য মনে হয়। একটি বিখ্যাত ঘটনার কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। পশ্চিম ওয়েলস-এর স্কোকহোম দ্বীপস্থিত পাখির বাসা থেকে সিয়ারওয়াটার পাখি তুলে এনে বিমানে ৫১০০০ কিলোমিটার দূরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে নিয়ে যাওয়া হয়। বোস্টনে একে ছেড়ে দেওয়া হলে এই পাখি সাড়ে বার দিন পর স্বগৃহে ফিরে আসে। এতো কম সময়ে ফিরে আসতে পারার কারণ এই যে, পাখি অবশ্যই সোজা পথে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাথায় রেখে উড়েছিলো। কোথায় ছিলো পাখি কিভাবে জানলো এবং কিভাবে ঘরে ফিরে এলো, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

পালক দেহকে গরম রাখে এবং পাখির ওড়ায় সাহায্য করে। পালকের এছাড়া আরো একটি কাজ আছে। পালকের প্রশস্ত পৃষ্ঠভাগকে সহজে খাড়া বা ভাঁজ করে চমৎকারভাবে ইঙ্গিত দেওয়া-নেওয়ার নিশান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ পাখি জীবনের অধিকাংশ সময় অনাকর্ষণীয়ভাবে থেকে ফায়দা উঠায় এবং পাখির প্রয়োজনীয় নিপুণ ছদ্মবেশ ধারণ করানোর জন্য পালকে নানা রঙ ও ধরনের সমাবেশ ঘটায়। কিন্তু প্রতি বছর, প্রজনন ঋতুর শুরুতে পাখিদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের খুব বেশি দরকার পড়ে। বাসার কাছে এলাকা দখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় দুই পুরুষ পাখি। পাখি নাটকীয়ভাবে পালকের চূড়া উঁচিয়ে রঙীন বক্ষদেশ স্ফীত করে, পাখনা মেলে এবং এমনি আরো নানান উপায়ে হুমকী ও

চেঁচামেচি প্রদর্শন করে, এসকল দৃষ্টিগ্রাহ্য ইঙ্গিতকে সাধারণত মদদ জোগায় স্বরযন্ত্র নিক্ষিপ্ত শব্দরাজি। দুই ধরনের ইঙ্গিত তিনটি জিনিস বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়—এক, এটি কোন প্রজাতির পাখি জানিয়ে দেওয়া, দুই, এলাকার স্বত্ব কায়েমে সেই প্রজাতির অন্য পুরুষ পাখিকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া এবং তিন, পুরুষ পাখির সাথে যোগ দেয়ার জন্য স্ত্রী পাখিকে আমন্ত্রণ জানানো।

পাখিটি তিনটির মধ্যে কোন ইঙ্গিতকে ব্যবহার করবে তা পুরুষ পাখিটি যে প্রকৃতির রাজ্যের বাসিন্দা এবং তার যা সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার উপর নির্ভর করে লাজুক পাখিরা বনে বা ঘন অরণ্যে সাধারণত ঝঞ্জাটমুক্ত জীবন কাটাতে চায় এবং পারতপক্ষে দৃষ্টির বাইরে থেকে বি শেষত্বমণ্ডিত দীর্ঘ ও সুরেলা গান গায়। আপনি যদি ঝর্ণার মতো তরলিত, হৃদয় কাড়া কম্পমান ধ্বনি শুনতে পান, তাহলে ধরে নেবেন গায়কটি হতে পারে সাদাসিধে পোষাকের অনার্কষণীয় কোন পাখি। হয়তো আফ্রিকার বুলবুল, এশিয়ার ব্যাবলার বা ইউরোপের নাইটেঙ্গল। এদের বিপরীতে ময়ূর, ফ্যাজান্ট ও টিয়া পাখিরা জমকালো সাজসজ্জা বা পালক ধারণ করে। এরা এতো আত্মবিশ্বাসী ও অবিচলিত যে ওরা শত্রুকে ভয় পায় না এবং মুক্তাঙ্গনে নিজেদের প্রকাশ করায় কুণ্ঠাবোধ করে না। যেহেতু এদের প্রধান ইঙ্গিত হলো আকর্ষণীয় সজ্জা প্রদর্শন, কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে এ সকল পাখির শব্দ সাধারণত হ্রস্ব, সরল ও কর্কশ হবে।

প্রজাতি শনাক্তকরণে কণ্ঠের ধ্বনি প্রক্ষেপণ পাখির জন্য গুরুত্বপূণ বিবেচিত হয়। এতে যাদের সাথে উর্বর মিলন সম্ভব নয় তাদের বাদ দিয়ে যাদের সাথে প্রণয় ও সঙ্গম সম্ভব তাদের বেছে নিতে সময় অপচয় হয় কম। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সুরের উপর। একজন পক্ষীবিশেষজ্ঞ ও একটি স্ত্রী পাখি উভয়েই ইংল্যান্ডের বেড়ার ঝোপের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারা বাদামি রঙের ছোট গায়ক পাখি ওয়ার্বলার শনাক্ত করায় ব্যর্থ হতে পারেন। মানুষ ও পাখি কেবল পাখির বহিঃঅবয়ব বিবেচনা করে নিশ্চিত হতে পারে না যে পাখিটির সত্যিকারের পরিচয় কি? যখন সে গাইতে শুরু করে তখন বলা যাবে এটি উইলো ওর্য়াবলার, উড ওর্য়াবলার না চিফ-চফ।

যাহোক, সাধারণত পালকের সাহায্যে পাখিকে শনাক্ত করা হয়। ঘটনা হলো একজন হৃদয়হীন পরীক্ষক চোখ বা পাখার রকম-সকম পাখিতে এঁকে পাখিটিকে এর কাছাকাছি প্রজাতি বলে প্রদর্শন করাতে পারেন এবং এভাবে এ প্রজাতির সাত্যিকারের সদস্য শনাক্ত করার ব্যাপারে সফলভাবে প্রতারিত করতে পারেন। যখন বহু কাছাকাছি প্রজাতির পাখি একই অঞ্চলে বাস করে, তখন প্রজাতি শনাক্ত করায় বিশেষ সমস্যা দেখা দেয় এবং ভ্রম ঘটার বিপদ দেখা দেয়। প্রবাল প্রাচীরে চমৎকার বহুবর্ণী নিকট সম্পর্কিত প্রজাপতি-মাছ শনাক্ত করায় এমনি সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। সমভাবে, যদি অত্যাধিক নকশাকৃত উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট পালকসমূহ নিকট সম্পার্কিত বহু প্রজাতির পাখিতে দেখা যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে এরা প্রায়ই একই বাসভূমিতে ভীড় করে। প্যারাকিট ও ফিঞ্চ অস্ট্রেলিয়ার বিশদ বাহারী রঙের পাখিদের মধ্যে অন্যতম। উভয় দলের, কতিপয় প্রজাতি দেশের একই অঞ্চলে বাস করে। সারা পৃথিবী জুড়ে ভিন্ন প্রজাতির হাঁসেরা মিশে মিলে বসন্তের মুক্ত জলাশয়ে জড়ো হয়। প্রতি প্রজাতির পুরুষ পাঁতিহাস বিশেষ সময়ে পাখায় ও শিরে বৈশিষ্ট্যবাহী নমুনার

ও রঙের পালক ধারণ করে। লক্ষ্য, যাতে স্ত্রী পাখি তাদের চিনতে পারে। এ সকল রঙের বড়ো ভূমিকা হলো বিভ্রান্তি প্রতিরোধে সহায়তা করা। কারণ, যখন একটি পাতিহংসী কোনো দ্বীপে কলোনি স্থাপনে সক্ষম হয় এবং দীর্ঘদিন ওখানে থাকতে থাকতে একটা স্বতন্ত্র গঠন-প্রকৃতি অর্জন করে তখন মূল ভূখণ্ডের স্বগোত্রদের চেয়ে ওদের কণ্ঠস্বর ভিন্ন হয়। এখানে হংসকে অতি উজ্জ্বল পালকের সাহায্যে হংসীকে তার পরিচয় জানানোর আবশ্যক হয় না। কারণ তার চারপাশে অন্য কোনো পাখি থাকে না যাকে দেখে হংসীর ভ্রম হতে পারে।

একইভাবে পাখিরা প্রজাতি চিহ্নিত করালেও স্বতন্ত্র পাখিকে অবশ্যই লিঙ্গ বিষয়ে ঘোষণা দিতে হয়। হংসী এটি করে এর মাথার নকশার সাহায্যে। অবশ্য অনেক প্রজাতিতে যেমন সমুদ্র পাখি ও শিকারী পাখিদের পুরুষ ও স্ত্রীকে সারাবছর একই রকম দেখায়। এদের লিঙ্গ শনাক্ত করা হয় আচরণ ও কণ্ঠস্বর দিয়ে। পুরুষ পেঙ্গুইন তার মনের সাথে মিশ খায় এমন সঙ্গী বাছাই করার জন্যে বিশেষ মনোরম উপায় আবিষ্কার করেছে। সে তার চঞ্চুতে এক খণ্ড নুড়ি কুড়িয়ে নেয় এবং হেলেদুলে একা দাঁড়িয়ে থাকা পেঙ্গুইনের কাছে গিয়ে খুব বিনীতভাবে তার সামনে নুড়িটি রাখে। সে যদি রাগত স্বরে ডেকে উঠে এবং যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রদর্শন করে, তখন সে বুঝতে পারে তার মারাত্মক ভুল হয়েছে। সে বুঝতে পারে এটিও একটি পুরুষ পেঙ্গুইন। যদি নিবেদন করা নুড়িটির প্রতি পেঙ্গুইন উদাসীন থাকে তাহলে বুঝে নেয় যে এটি স্ত্রী পেঙ্গুইন বটে তবে সে এখন প্রজননের জন্য প্রস্তুত নয়, অথবা ইতোমধ্যে তার সঙ্গী নির্বাচন করা হয়ে গেছে। যদি নুড়িটি গভীর শ্রদ্ধার সাথে মাথা নুয়ে পেঙ্গুইনটি গ্রহণ করে তখন সে বুঝে নেয় এটি হবে তার খাঁটি সঙ্গী। সেও বিনিময়ে মাথা নত করে এবং পরস্পর গলাগলি করে এবং রমন সঙ্গীত দিয়ে মিলনোৎসবে মেতে উঠে।

ইউরোপীয় জলচর পাখিদের মধ্যে অন্যতম চমৎকার পাখি হলো মাছরাঙা জাতীয় বড় ঝুঁটির গ্রীব। এরা পেঙ্গুইনের চেয়ে সাজে বেশি। বসন্তে দুই লিঙ্গের পাখির গণ্ডে বাদামের মতো রঙের লম্বা ঝালরের সৃষ্টি হয়। চঞ্চুর নিচে জন্মায় গাঢ় বাদামি রঙের পালক। মাথার উপরে গজায় শিংয়ের মতো দুই গুচ্ছ চকচকে কালো পালক। তবে পুরুষ ও স্ত্রী পাখিকে দেখায় একই রকম। এদের প্রণয়কাণ্ডের মধ্যে রয়েছে কল্পযোগ্য নৈপুণ্য যা মাথায় শোভা জাহির করার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ভঙ্গির প্রতি স্বতন্ত্র পাখির সাড়া থেকে বোঝা যায় যে সে পুরুষ না স্ত্রীর কাছে অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করছে। পুরুষ ও স্ত্রী পাখি উভয়ে গলা উঁচু করে ধরে এবং উভয়ে মাথাকে পাশ থেকে পাশে দোলায়। এ সময় গণ্ডের ঝালর ফেঁপে উঠে। ওরা একে অপরের সামনে ডুব দেয় ও গান করে। এরা চঞ্চু দিয়ে জলজ উদ্ভিদের ডগা সংগ্রহ করে এবং পরস্পর প্রীতি উপহার বিনিময় করে। উপহার বিনিময়কালে গলা জলপৃষ্ঠের সমান্তরালে নিচু করে রাখে। এসব উৎসবের চূড়ান্ত লগ্নে এরা অকস্মাৎ জল থেকে উঠে পাশাপাশি আসে, পা দিয়ে জল কাটে, মনে হয় জলের উপর যেনো দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় একে অপরের পাশে পরম উচ্ছ্বাসে মাথা দোলায়।

এদের প্রণয় বহু সপ্তাহ ধরে চলে এবং পুরো প্রজনন ঋতু ধরে অঙ্গভঙ্গির পুনরাবৃত্তি ঘটে। পাখিরা একে অন্যকে সম্ভাষণ জানানোর সময় বা বাসায় স্থান বদলের প্রাক্কালে অঙ্গ-ভঙ্গির এসব প্রদর্শনী চলতে থাকে। তবু একইভাবে সজ্জিত সঙ্গীদ্বয়কে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পরিচয় বিষয়ে এবং পরস্পরের সম্পর্ক বিষয়ে পুনঃনিশ্চিত হবার প্রয়োজন রয়েছে। এতদসত্ত্বেও বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। যখন পুরুষ সঙ্গমে উদ্যত হয়, স্ত্রী পুরুষকে

পিঠে চড়ানোর পরিবর্তে নিজেই পুরুষের পিঠে চড়ে বসে। মাছারাঙাজাতীয় পাখিদের সঙ্গমকালে হতবুদ্ধিকর অবস্থা সৃষ্টির জন্য এরকম দুর্নাম আছে।

পুরুষ ও স্ত্রী পাখির পালক প্রায় সদৃশ হওয়ায় বোঝা যায় যে পাখিরা এক লিঙ্গভোগী এবং দম্পতি পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করে। বহু প্রজাতির পাখিতে অবশ্য লিঙ্গ নির্দেশক দৃশ্যমান চিহ্ন রয়েছে, সে চিহ্ন হতে পারে অতি ক্ষুদ্র। যেমন, টিট পাখির গোঁফের মতো পালক। চড়ুইয়ের কালো গলকম্বল এবং টিয়ার বিভিন্ন বর্ণের চোখ। এ ধরনের লিঙ্গ নির্দেশক চিহ্নবিশিষ্ট পাখিরা যে সব পখিরা এ ধরনের চিহ্ন নেই তাদের সামনে সগর্বে ভয় প্রদর্শন করে।

কতিপয় গ্রুপের পাখিতে পালকের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পার্থক্য খুবই প্রকট। এদের ক্ষেত্রে অদ্ভুতভাবে পালকের চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ ময়ূর, গ্রাউস, ম্যানাকিন ও বার্ডস অব প্যারাডাইস-এ পালক আকারে অনেক বড় হয় এবং পালকের রঙ হয় অসাধারণ সুন্দর। এরা ওদের পোশাক প্রদর্শনে এতোই মগ্ন থাকে যে, অন্য সব কিছু ভুলে যায়। ওদের স্ত্রী পাখিরা রসবোধহীন। এরা প্রদর্শনী ক্ষেত্রে আসে এবং স্বল্পক্ষণের জন্য পুরুষদের সাথে সঙ্গম করে ও পরে ডিম পাড়তে চলে যায়। স্ত্রীরাই ছানার দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব পালন করে। পুরুষ তখনো সগর্বে পদচারণা করে এবং ঘুরে ঘুরে নাচানাচিতে নিমগ্ন থাকে এবং অন্য স্ত্রী পাখির সঙ্গে মিলনের অপেক্ষায় থাকে।

পুরুষ আরগাস ফ্যাজান্ট তার পাখায় সব পালককে বিশদভাবে সাজায়। কোনো কোনো পালক লম্বায় এক মিটারও হতে পারে। পালকে সারিবদ্ধভাবে থাকে চোখের মতো বিন্দু। বোর্নিওর অরণ্যে ওরা একটা অঞ্চলকে সাফসুরৎ করে প্রদর্শনী ক্ষেত্র বানায় এবং জাকাঁলোভাবে দুটো পাখাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে স্ত্রী পাখিকে আকর্ষণ করে।

অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে নিউগিনি দ্বীপপুঞ্জে বার্ডস অব প্যারাডাইজের ৪০টি প্রজাতি রয়েছে। কোন্‌টা থেকে কোন্‌টার পালক সুন্দর তা নির্ণয় করা খুব মুশকিল। আকারে থ্রাশ পাখির মতো স্যাক্সনী পাখির পুরঃমাথা থেকে দুটি লম্বা পালক গজায়। এতে সারিবদ্ধভাবে কলাই করা নীল নিশান থাকে। সুপার্ব পাখির মাথায় বিশাল মণিগঠিত ঢাল থাকে যেটিকে সম্প্রসারণ করতে পারে পাখির দৈর্ঘ্য যতোখানি এই ঢালকে ততোখানি বিস্তৃত করা সম্ভব হয়। টুয়েলভ উইয়ার্ড বার্ডে স্বল্পালোক বিচ্ছুরক সবুজ গলকম্বল এবং বিশাল হলুদ স্ফীতকরণযোগ্য ওয়েস্টকোট থাকে। তদুপারি এতে রয়েছে সূত্রহীন পালক। এ ধরনের পালকের নাম উইয়ার। এটি অর্থাৎ সূত্রহীন পালক ওয়েস্টকোটের পেছনে গুটিয়ে থাকে।

অলংকৃত পালকসমৃদ্ধ এ ধরনের পাখিদের প্রদর্শনী খুবই চিত্তাকর্ষক ও শিহরণ সৃষ্টিকারী। নিউগিনির অরণ্যের অধিকাংশই অন্ধকার ও ভেজা। বিশাল বৃক্ষেরা উঁচু হয়ে আলো আসায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু অরণ্যে আপনি হঠাৎ এমন একটি জায়গা দেখতে পারেন যেটি ঝেড়েমুছে সাফ করা হয়েছে। পাতা ও আবর্জনাকে পাশে স্তূপাকারে পড়ে আছে দেখা যাবে। বিশ্বাসই হবে না যে মানুষ ছাড়া অন্য কেউ এরকম সাফসুর করতে পারে। কিন্তু খানিকক্ষণ দাঁড়ান। এরকম কাজটি যে প্রাণী করেছে, তা বেরিয়ে আসবে। স্টারলিং-এর আকারের অভাবনীয় সুন্দর এ প্রাণী। এর পুচ্ছ থেকে বেরিয়েছে দুটি সূত্রহীন পালক যা বেঁকে বৃত্তাকৃতি ধারণ করেছে। স্কন্ধদেশে রয়েছে পালকনির্মিত সোনালি কোট,

বক্ষে সবুজ ঢাল। ঢালে সূক্ষ্ম আলো বিচ্ছুরক নীল রেখা। মাথাও ও চক্ষুর চারপাশের পালক মসৃণ ও মনে হয় কালো মখমল। সে কয়েক মিনিট গাছে অপেক্ষা করে এবং প্রদর্শনী ক্ষেত্রে নামার ভঙ্গি করে এবং শাখায় উঁচু হয়ে বসে চারদিকের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে। অকস্মাৎ এর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গজানো গাছের চারায় গিয়ে বসে। দুপা দিয়ে চারাণে জড়িয়ে ধরে, চঞ্চুকে রাখে উর্ধ্বমুখী খাড়াভাবে। গলার সোনালি পালকসমূহ ফোলায় এবং বক্ষ পালকের সম্প্রসারণ-সংকোচন ঘটায়, মনে হয় বুক উঠা-নামা করছে। এ সময় সে গুণগুণিয়ে গান ধরে ও গলায় চঞ্চুতাড়না করে গলার সুদৃশ্য পালক প্রদর্শন করায়। সারাদিনে এরা এরকম কাণ্ড কয়েকবার চালায়, বিশেষ করে সকাল বেলায় এভাবে চলতে থাকে মাসের পর মাস। এর প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে এটি চালিয়ে যায়। সবার উদ্দেশ্য স্ত্রী পাখির হৃদয় হরণ করা।

বার্ডস অব প্যারাডাইসের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের পাখার ভেতর থেকে সূক্ষ্ম রেশমের মতো দীর্ঘ পালক গজায়। কতিপয় প্রজাতির পাখিতে হলুদ, লাল বা সাদাসহ বহু বর্ণের পালকের সমাবেশ দেখা যায়। এরা সকলে মিলে তা প্রদর্শন করে। বিশেষত বড় বড় গাছে ওদের নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই গাছগুলো এই কাজে যুগের পর যুগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাতার ভীড়ের মধ্যে একটি শাখার উপশাখা ও পাতা ছিড়ে ফেলা হয়। গোধূলির ঠিক পরে অপেক্ষাকৃত নিচের শাখাসমূহ হলুদ রঙের চমকে আপনার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে। এ সময় ওরা নিত্যকার নৃত্যানুষ্ঠানের জন্যে জড়ো হতে থাকে। এরা আকারে কাকের মতো। এদের রয়েছে রঙধনুর মতো সবুজ গলকম্বল, হলুদ মাথা ও বাদামি পিঠ। সোনালি পালকগুলো ভাঁজ হয়ে দেহের দুপাশে ঝুলে থাকে। এগুলো দেহের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ বড়ো। শীগগিরই সেখানে প্রায় আধ ডজন পুরুষ পাখি নিচে ঘুর ঘুর করে, কেউ অপরের পিঠে মৃদ আঘাত করে সময় কাটায়। শেষতক একটি পাখি প্রদর্শনী বৃক্ষ শাখায় উড়ে যায়। তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ করে সে মাথা নোয়ায় এবং ডালে চঞ্চু ঘষে। সে পাখা দুটোকে মাথার উপর তুলে তালি দেয় এবং এতে চকচকে রঙের ফোয়ারা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং পাখি এ অবস্থায় দ্রুত ডালের উপরে-নিচে ওঠানামা করে। তার এই কাণ্ড অন্যদের মনে সাড়া জাগায় এবং ওরা তার সাথে যোগ দেয়। অল্প সময়ে প্রায় এক ডজন পাখি জড়ো হয়ে চেঁচামেচি করে ও নিজেদেরকে নৃত্যের মাধ্যমে মেলে ধরে।

বৃক্ষশাখার ছায়ার ঘনায়মান অন্ধকারে হঠাৎ একটা নড়াচড়ার শব্দে আপনার চোখ এই চমৎকার দৃশ্য থেকে অন্যত্র সরে যেতে পারে। চোখ সরে গিয়ে দেখতে পারে সরল পোশাকের বাদামি রঙের স্ত্রী পাখিকে। সে ধীর পায়ে প্রদর্শনী বৃক্ষ শাখা পার হতে থাকে। তখন পুরুষ পাখি একরোখা হয়ে লাফ দিয়ে ওর পিঠে চড়ে বসে। এ মিলন ক্ষণকালের জন্যে। এক বা দুই সেকেণ্ড। স্ত্রী পাখি নিজ বাসগৃহে ফিরে যায়, যে গৃহটিকে সে নিষিক্ত ডিম পাড়ার উপযোগী করে রেখেছিলো।

পুরুষ প্যারাডাইস পাখিতে কিম্ভূতকিমাকার পালকগুলো কয়েক মাস থেকে যায়। প্রজনন ঋতু শেষ হলে পালক ঝরে পড়ে। প্রতি বছর এ ধরনের জমকালো পোশাক সৃষ্টির জন্য পাখির অনেক শক্তি ব্যয় হয়। নিউ গিনির এ ধরনের একটি পাখির একই ধরনের প্রদর্শনী ও বহুগামী হবার ক্ষুধা থাকে। এরা কম শক্তি ব্যয় করে এ ব্যাপারটিকে সামাল দেয়। বাওয়ার পাখি লাঠি, পাথর, ফুল, বীজও হাতের কাছে লভ্য এমন উজ্জ্বল রঙের জিনিস

ইত্যাদি প্রদর্শন করার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করে। তবে লাঠি, পাথর, ফুল, বীজের ও বিশেষ রঙ থাকা চাই। পুরুষ পাখি তার নির্মিত কুঞ্জে এ গুলোকে প্রদর্শন করে। একটি প্রজাতির পাখি একটি চারাগাছের চারপাশে গাছের ডাল জড়ো করে। মে দিবসে বৃক্ষকে যেমন করে সাজানো হয় তেমনিভাবে টুকরো টুকরো লাইকেন দিয়ে একে সাজানো হয়ে থাকে। অন্য একটি পাখি ছাদ দেওয়া গুহা তৈরি করে। গুহায় থাকে দুটি প্রবেশ দ্বার। প্রবেশ দ্বারের সামনে ফুল, ব্যাঙের ছাতা ও বেরী ফল জড়ো করা হয়। ফুল, ব্যাঙের ছাতা ও বেরী আলাদা আলাদা স্তূপে পরিপাটি সাজানো থাকে।

অস্ট্রেলিয়ার আরো দক্ষিণে অন্যান্য বাওয়ার পাখি বাস করে। পুরুষ সাটিন বাওয়ার পাখি আকারে দাঁড়কাকের মতো। রঙ কালচে চকচকে নীল। এরা এক ফুট বা এর বেশি দূরত্বে পরপর গাছের ডালপালা বসিয়ে প্রশস্ত পথ তৈরি করে। ডালপালার উচ্চতা পাখির দেহের দ্বিগুণ। পথটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। উত্তর দিকে সূর্যের আলো পড়ে বেশি এবং এদিকেই এরা তাদের সংগ্রহ জমা করে। সংগৃহীত বস্তুর মধ্যে থাকে অন্য পাখির পালক, বেরীফল ও এমনকি প্লাস্টিকের টুকরো। কি বস্তু সংগ্রহ করে সেটি বড়ো কথা নয়। বস্তুটির কি রঙ সেটিই বিচার্য। বস্তুটিকে হতে হবে হলুদাভ—সবুজ, অথবা আরো উত্তম যদি তাতে নীলের আবছায়া থাকে যার সাথে পাখির চকচকে পালকের সাদৃশ্য থাকে। এরা কেবল কাছে ও দূরের থেকে এগুলো সংগ্রহ করে না, অন্যদের সংগ্রহ থেকেও চুরি করে। সে কখনো কখনো নীল বেরীকে চঞ্চু দিয়ে ভাঙে এবং সবজীর আঁশে নীল রঙ লাগায়। এই আঁশ সে বাসায়ও লাগায়।

আপনি যদি এদের সংগ্রহশালায়, একেবারে ভিন্ন রঙের, যেমন সাদা শামুকের খোলক এনে জড়ো করেন তাহলে দ্রুত বাওয়ার পাখিকে বাসায় ফেরাতে পারেন। সে সাধারণত খুব দ্রুত বাসায় ফেরে এবং নান্দনিকভাবে অপছন্দের বস্তুকে ক্ষুব্ধ চিত্তে সরাতে থাকে। সে চঞ্চু দিয়ে বস্তুটাকে তুলে নিয়ে মাথা ঝাড়া দিয়ে পাশে ফেলে দেয়। এদের স্ত্রী পাখি ম্যাড়ম্যাড়ে রঙের। যখন স্ত্রী পাখি আশেপাশে ভ্রমণ করে তখন প্রতিটি পুরুষ পাখি উত্তেজিতভাবে রত্নালংকার রাজির পুনর্বিন্যাস করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে চঞ্চু দিয়ে অলংকার তুলে নিয়ে স্ত্রী পাখিকে তার গুণাবলি প্রদর্শন করে এবং উত্তেজিত স্বরে ডাকতে থাকে। যদি সে স্ত্রী পাখিকে প্রলুব্ধ করায় সফল হয়, তখন তার নির্মিত প্রশস্ত পথে সঙ্গমে রত হয়। এ সময় পুরুষ পাখির পাখা জোরে জোরে পত পত করে ঝাপটায়। ঝাপটা কখনো এতো প্রবল হয় যে, বাসার দেয়াল ধ্বসে পড়ে।

পাখিদের সঙ্গম কৌশল বেশ অস্পষ্ট মনে হয়। খুব কম সংখ্যক পাখিরই শিশ্ন থাকে। পুরুষ পাখিকে অনেকটা সঙ্গিন অবস্থায় স্ত্রী পাখির পিঠে চড়তে হয় এবং চঞ্চু দিয়ে মাথার পালক আকঁড়ে ধরে স্ত্রী পাখিকে অনড় রাখতে হয়। স্ত্রী পাখি লেজ বাঁকিয়ে এক পাশে নিয়ে যায় যাতে উভয়ের পায়ু পরস্পরের বিপরীতে খাপ খাইয়ে লাগতে পারে। উভয়ের পেশি চালনার দ্বারা শুক্রাণু স্ত্রীর দেহের ভিতরে স্থানান্তরিও হয়। স্ত্রী পাখিকে খুবই অনড় থাকতে হয় এবং পুরুষ পাখিকে উল্টিয়ে পড়ে যাবার মুখে পড়তে হয়। মনে হয় প্রায়ই সঙ্গমকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না।

সব পাখি ডিম পাড়ে। পূর্বপুরুষ সরীসৃপদের কাজ থেকে পাখি বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছে। কোথাও কোনো পাখি এই কর্ম থেকে বিরত হয় নি। এক্ষেত্রে মেরুদণ্ডী

প্রাণীদের মধ্যে পাখি অনন্য। অন্যান্য দলের প্রাণীতে কোনো কোনোটি ডিমকে দেহের মধ্যে রেখে ফুটানো ও শিশু প্রসব করানোকে সুবিধাজনক মনে করেছে। যেমন মাছের মধ্যে হাঙর, গাছি, সী হর্স, উভচরদের মধ্যে স্যালাম্যান্ডার ও সোনা ব্যাঙ এবং সরীসৃপের মধ্যে স্কিঙ্ক র‍্যাটলস্নেক, ইত্যাদি বাচ্চা প্রসব করে। কিন্তু পাখির দলের কেউ বাচ্চা প্রসব করে না। দেহের ভিতরে বড় ডিম রেখে বা ডিম গুচ্ছ রেখে স্ত্রী পাখিকে সপ্তাহব্যাপী ডিমের বিকাশের পর্যায়ে উড়তে থাকার সময় ওদের কাছে সম্ভবত অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে গণ্য হয়। কাজেই ডিম নিষিক্ত হবার সাথে সাথে ওরা ডিম পেড়ে দেয়।

উড়ার জন্য উষ্ণ শোণিত প্রয়োজন। উষ্ণ শোণিতের আয়োজন করার জন্য পাখিকে অবশ্যই খেসারত দিতে হয়। সরীসৃপ গর্ত খুঁড় বা পাথরের নিচে ডিম রাখে ডিম ফেলে রেখে অন্যত্র যেতে পারে। ডিমের বেচেঁ থাকা ও বিকাশের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের মতো চারপাশের স্বাভাবিক তাপমাত্রা থাকলেই চলে। কিন্তু পাখির ভ্রূণকে প্রাপ্তবয়স্কের মতো উষ্ণশোণিত পেতে হয়। যদি এদেরকে অতি ঠান্ডায় থাকতে হয় তাহলে ওরা মারা পড়ে।

পাখিকে এ কারণে ডিমে তা দিতে হয় এবং এটি খুব বিপজ্জনক ব্যাপার। এটি অধিকাংশ পাখির ক্ষেত্রে এমনই একটা সময় যখন ওরা শত্রুকে এড়াতে পারে না এবং মুক্ত আকাশে বিচরণও করতে পারে না। এদের ডিম ও শাবককে আক্রমণের সম্ভাব্য সময় পর্যন্ত বা তার পরও বসে থাকতে হয়। যদি প্রাপ্তবয়স্ক পাখিকে তাড়িয়ে বাসা ত্যাগে বাধ্য করা হয় তাহলে ওদের ডিম ও শাবকের জীবনের ঝুঁকি থাকে। তবু বাসাকে শত্রুর জন্য সুগম রাখা ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ স্ত্রী ও পুরুষ পাখিকে তা দেয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে ঘুরে ঘুরে আসতে হয় এবং নিজের ও বাচ্চাদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে হয়।

কতকগুলো পাখি এমন জায়গায় বাসা বাঁধতে পারে এবং বাঁধে যা অন্য প্রাণীর নাগালের বাইরে থাকে। সমুদ্রের উপরে খাড়া সংকীর্ণ শৈল শিরায় কেবল পাখিই বাসা বাঁধে। যে সকল পাখি শৈল শিরার তাকে বাসা বাঁধে তাদের অধিকাংশই ডিম গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কমানোর জন্য অন্য আকৃতির ডিম পাড়ে। ডিমের এক পাশ সূচালো হয়। ফলে ডিম গড়ানোর সময় বৃত্তাকৃতিতে ঘুরতে থাকে, গড়িয়ে যায় না। কিন্তু কিছু সামুদ্রিক পাখি ডিম লুট করে। মা-বাবা সাবধানে না থাকলে শঙ্খচিল এসে ডিম ফুটো করে ভিতরের সবটুকু সাবাড় করে।

স্বর্ণ ছাতারে পাখি এবং অন্যান্য যেসব পাখিকে বালিময় ও কাঁকরময় উপকূলে বাস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাদেরকে মুক্ত বালিতে ডিম পাড়তে হয়। ডিমের উপর কোনো আবরণ থাকে না। নুড়ির রঙের সাথে এদের ডিমের রঙের মিল থাকে। যেসব শিকারী ডিমগুলোর দিকে নজর রাখে তাদের দ্বারা এগুলো খবুব একটা বিনষ্ট হয় না নষ্ট করে অন্য জীব। যেমন বেকুব মানুষ ওদের মাড়িয়ে ধ্বংস করে।

অধিকাংশ পাখি শ্রমসাধ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ডিম ও শাবককে রক্ষা করে। কাঠঠোকরা বৃক্ষগাত্রে গর্ত করে, মাছরাঙা নদী তীরে খনন চালায়। চঞ্চু আংশিক ফাঁক করে উড়ে গিয়ে ছিলকা কেটে গর্ত করে যাতে ওরা ওখানে পা রেখে কাজ করতে পারে। ভারতের চড়ুই পাখির আকারের টেইলর পাখি গাছের বৃদ্ধিমান পাতা জড়ো করে ও পাতার কিনারায় ছিদ্র করে এবং গাছের আঁশ দিয়ে ছিদ্রে আলাদাভাবে গিঁট দেয়। এটিকে প্রকৃতপক্ষে

মার্জিত ও অদৃশ্য কাপের মতো দেখায়। এই পাতার কাপের মধ্যেই পাখি বাসা চড়ুই পরিবারের এক সদস্য বাবুই পাখি তাল গাছ থেকে আঁশ ছিড়ে বানায় নিচে ঝুলায় এবং কৌশলে বুনে একটি ফাঁপা বলের মতো বাসা বানায়। কখনো এতে দীর্ঘ খাঁড়া নল থাকে যা প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে ওভেন পাখি মুক্তাবস্থায় দিন কাটায়। এসব অঞ্চলে বৃক্ষের সংখ্যা নগণ্য এবং এদেরকে বাসার জন্য হন্যে হয়ে ছুটতে হয়। কাজেই এদেরকে সাহসী হয়ে বেড়ার খুঁটি ও গাছের পত্রহীন শাখা ব্যবহার করতে হয় এবং এখানে কাদা দিয়ে প্রায় অভেদ্য বাসা বানায়। বাসা দেখতে আকারে ফুটবলের মতো। অনেকটা স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহার্য চুলার অনুরূপ। এর প্রবেশ দ্বার বেশ বড়। প্রবেশদ্বার দিয়ে থাবা বা হাত ঢোকানো যায়। কিন্তু ভিতরের দুটি প্রকোষ্ঠের মধ্যেস্থিত আড়াআড়ি দেওয়াল লুঠেরাদেরকে বিভ্রান্ত করে। কারণ প্রকোষ্ঠের ভিতরকার পট্টির মতো ছিদ্র দরোজা থেকে দূরে থাকে। হর্নবিল গাছের গর্তে বাসা বানায়। পুরুষ হর্নবিল ডিম ও তা দেয়ায় রত স্ত্রী হর্নবিলকে আক্রমণকারী থেকে রক্ষার জন্য চরম ব্যবস্থা নেয়। বাসায় দরোজার কাছে সে কাদার দেয়াল তৈরি করে। দেয়ালের কেন্দ্রে থাকে ছোট একটি ছিদ্র। এই ছিদ্র দিয়ে দীর্ঘ ভুক্তভোগীও সন্তানদের খাবার সরবরাহ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কেভ সুইফটলেট পাখি গুহায় বাসা বানায়। গুহায় উপযুক্ত তাক বানানো সম্ভব না হলে এরা আঠালো থুথু দিয়ে কৃত্রিম তাক তৈরি করে। কোনো কোনো সময় এর সাথে কিছু পালক ও গাছের মূল মেশায়। কতিপয় কারণে চীনারা তাদের অধিকাংশ উপাদেয় পানীয় স্যুপে পাখির এই বাসাকে ব্যবহার করে।

কতিপয় পাখি অজ্ঞাতসারে ভীতিকর আক্রমণকারীদের সাহায্য নেয়। অস্ট্রেলিয়ার একটি ওয়ার্বলার পাখি অভ্যাসবশে ভীমরুলের চাকের পাশে বাসা বানায়। বোর্নিওর একটি মাছরাঙা পাখি প্রকৃতপক্ষে এক আক্রমণকারী প্রজাতির মৌমাছির মৌচাকে বাসা বাঁধে। গাছের উইয়ের বাদামি বাসায় অনেক টিয়া নিজেদের থাকার জন্য গর্ত খুঁড়ে। এক পরিবারের পাখিরা খুব খোলামেলা উপায়ে ডিমে পুরো তা দেওয়াকালে ডিমের উপর বসে থাকার ঝুঁকি এড়ানোর ব্যবস্থা করে। অস্ট্রেলিয়ার ম্যালী মুরগি মোরগ নির্মিত বিশাল মাটির ঢিবিতে ডিম পারে। ঢিবির ভিতরে থাকে পচা সবজি এবং তা বালিতে ঢাকা থাকে। ওদের প্রজনন ঋতু অতি দীর্ঘস্থায়ী। প্রায় পাঁচ মাস। পুরো সময় ধরে পুরুষকে বা মোরগকে অবিরাম উপস্থিত থেকে চঞ্চু দিয়ে ঢিবি খুঁটিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হয়। বসন্তে ঢিবির কেন্দ্রে নূতন সংগৃহীত সবজি দ্রুত পচতে থাকলে এতো তাপ হয় যে তা ডিমের জন্য অসহনীয়। এক্ষেত্রে মোরগ খুব শ্রমসহকারে ঢিবির উপর থেকে বালি সরায়-যাতে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে। গ্রীষ্মে দেখা দেয় আরেক বিপদ। প্রখর সূর্যতাপে ঢিবির তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তখন মোরগকে অবশ্যই ঢিবির উপর আরো বালি চাপাতে হয়। হেমন্তে ঢিবির ভিতরের সবজির পচনমাত্রা হ্রাস পায়। তখন মোরগ ঢিবির উপরের স্তর সরিয়ে সূর্যালোক পৌছানোর ব্যবস্থা করে। ফলে ডিমের অকুস্থল উষ্ণ হয়। পড়ন্ত বেলায় ওরা আবার ঢিবিকে বালি দিয়ে ঢেকে দেয় যাতে ঢিবি তাপ ধরে রাখতে পারে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আরো পূর্বে এই পরিবারের আরেক সদস্য বাস করে। এরা একটি বিশেষ পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছে। আগ্নেয়গিরির মোচাকৃতির শীর্ষে ছাইয়ের নিচে খুঁড়ে এরা ডিম পাড়ে। এর অনেক নীচ দিয়ে বাহিত লার্ভা ডিমে প্রয়োজনীয় তাপ সঞ্চালিত করে।

অনেকগুলো প্রজাতির পাখি বিপদ এড়ানোর জন্য এবং ডিমে তা দেওয়ার শ্রম লাঘবের জন্য অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে এবং সেই পালক পাখি ওদের ডিম ও শাবক রক্ষা করে। এই পাখিদের মধ্যে বিখ্যাত হলো কোকিল। পালক পিতামাতা যাতে ডিম বাইরে ফেলে না দেয় সে জন্যে তাদের ডিমের রঙ পালক পিতামাতার ডিমের রঙের মতো হয়। ফলে কোকিলরা নির্দিষ্ট কয়েক প্রজাতির পাখিকে পালক পিতামাতা নির্বাচন করার ব্যাপারটিকে সীমাবদ্ধ রাখে।

ডিমে তা দেওয়ার পদ্ধতি খুব সাদাসিধে বিষয় নয়। ঘটনা হলো পাখির দেহের পালক তাপ অপরিবাহিতার কাজটি খুব ভালোভাবে করে। অর্থাৎ দেহে পালকগুলো দেহ ও ডিমের মধ্যে তাপ-পর্দা হিসেবে সক্রিয় থাকে। ফলে ডিমে তা দেয়ার ব্যাপারে অনেক পাখির দেহে পরিবর্তন সাধিত হয়। তা দেওয়া শুরুর ঠিক আগে দেহের অঙ্কভাগের কিছু পালক নির্মোচিত হয়। অনাবৃত ত্বককে তখন ফ্যাকাশে লাল দেখায়। ত্বকের ঠিক নিচ দিয়ে থাকে বিস্তৃত রক্তবাহী নালি। ডিমগুলো চমৎকারভাবে অনাবৃত ত্বকে লেগে থাকে এবং যথার্থ উষ্ণতা পায়। কিন্তু সব পাখি এরকম পালক নির্মোচন করে না। হাঁস ও হংসী বক্ষদেশ থেকে নিজেরাই পালক খুঁটিয়ে তুলে ফেলে। নীল পায়ের বুবী পাখির পা উজ্জ্বল নীল রঙের। প্রদর্শনীর সময় এরা এই পা-কে কৌতূককর ভঙ্গিতে সঙ্গিনীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে ওঠায় ও নামায়। এটি করে প্রণয় মুহূর্তে। পরে এই পা দিয়ে ডিমে তা দেয়। ডিমের উপর দাঁড়িয়ে ডিমকে উষ্ণ রাখে।

ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। বাচ্চার চঞ্চুর আগায় ছোট কাঁটার মতো ডিম-দাঁত থাকে। ডিম-দাঁত দিয়ে খোলক ফুটো করে ওরা বেরোনর পথ করে। যারা মাটির উপরে বাস করে সেসব বাচ্চার সারা শরীর জুড়ে থাকে ডাউন পালক যা তাদেরকে পারিপার্শ্বের রঙের সাথে মিশে থাকায় সাহায্য করে অর্থাৎ বর্ণচোর হওয়ার সুবিধা প্রদান করে। শরীর শুকিয়ে যাওয়া মাত্র বাচ্চা মায়ের তত্ত্বাবধানে খাদ্য সংগ্রহে বের হয়। যে সব বাচ্চা মাটির উপরে ডিম থেকে বেরোয় এরা সংরক্ষিত থাকে অথবা ওদের বাসস্থান অন্যদের জন্য অগম্য হয়। এদের শরীরে প্রায়ই পালক থাকে না এবং এরা অসহায়। পিতামাতা এদের মুখে খাবার তুলে দেয়।

ক্রমে পাখির ছানার গায়ে নীল, রক্তভরা পালক দণ্ড বা কুইল গজাতে থাকে। সবশেষে গজায় প্রয়োজনীয় পালকসমষ্টি। শিশু ঈগল ও বক, পালক ও ডানাযুক্ত হলে দিনের পর দিন বাসার কিনারে দাঁড়িয়ে থাকে এবং উড্ডয়নের জন্য অপরিহার্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। এরা তখন বাতাসে পাখা ঝাপটায়। পেশিক মজবুত করে ও নড়াচড়ার অভ্যাস করে। সংকীর্ণ শৈল শিরার 'তাকে' গ্যানেট পাখির ছানারাও এ ধরনের কসরত করে। অবশ্য কসরত করার সময় এরা বুদ্ধিমত্তার সাথে ভিতরের দিকে বসে মুখ রেখেই তা করে। এরা অতি শীঘ্রই সাফল্য অর্জন করে। এ ধরনের প্রস্তুতি অবশ্য ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরা হয়। অধিকাংশ শিশু পাখি কসরত ছাড়াই উড্ডয়নে জটিল পেশিচালনায় সক্ষম বলে মনে হয়। পেট্রেলস-এর মতো কতিপয় পাখি, যারা গর্তে বড়ো হয়, তারা প্রথম চেষ্টায় কয়েক কিলোমিটার উঠতে পারে। প্রায় অধিকাংশ শিশু পাখি একদিন বা এরকম সময়ে চোস্ত উড্ডয়ন বিশারদে পরিণত হয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আকাশে বিচরণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষতা এবং যথার্থ উড্ডয়নের সপক্ষে দেহে প্রয়োজনীয় অভিযোজন সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও, পাখিরা যখন সম্ভব তখনি ওড়া বন্ধ করে।

আর্কিওপ্টেরিক্সের দুই কোটি বছর পর প্রাচীন পাখিদের জীবাশ্মের মধ্যে শঙ্খচিলের মতো পাখিরাও রয়েছে যারা দক্ষ উড্ডয়নে সক্ষম ছিলো। ওদের ছিলো তরীদল যুক্ত বক্ষাস্থি এবং হাড়হীন পুচ্ছ। সব দিক বিচারে ওরা আধুনিক পাখির মতোই ছিলো। এদের পাশাপাশি ছিলো বড়ো সাঁতারু পাখি হেসপেরোরনিস আকারে মানুষের মতো বড়ো। এটি ওড়া বন্ধ করেছিলো। এ সময় উড্ডয়নে অক্ষম পেঙ্গুইনের জীবাশ্মও পাওয়া গিয়েছিলো।

বর্তমানেও পাখির স্থলচর হবার প্রবণতা লক্ষণীয়। চতুষ্পদী শিকারী প্রাণীদের আবির্ভাবের পূর্বে যেসব প্রজাতির পাখি কোনো দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছে, তাদের মধ্যে উড্ডয়ন ক্ষমতা রহিত হবার প্রবণতা দেখা গেছে। উওমাশা অন্তরীপের দ্বীপপুঞ্জের রেইল পাখি ফিটের মতো গৃহপালিত মুরগির সামনে পড়লে দৌড়ায় এবং চরম বিপদে পড়লে রেইল পাখা ঝাপটে সামান্য উড়তে পারে। গ্যালাপ্যাগোজের করমোর‍্যান্ট পাখির পাখা ছোট। এরা চেষ্টা করলেও উড়তে পারে না। ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে বড়ো বড়ো উড্ডয়নে-অক্ষম কবুতর রয়েছে। মরিশাসের ডোডো ও রড্রিগস-এর সোলিটায়ার এ ধরনের কবুতর। এদের দুর্ভাগ্য হলো যে, এসকল দ্বীপ চিরকালের জন্য শত্রুমুক্ত ছিলো না। কয়েক শতক আগে এখানে মানুষের আবির্ভাব ঘটে এবং মানুষ এদের বিলুপ্তি ঘটায়। নিউজিল্যাণ্ডেও মানুষের আগমণের আগে অন্য কোনো শত্রু ছিলো না। এখানেও কিছু পাখি উড্ডয়ন ক্ষমতা হারিয়েছিলো। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ পাখি মোয়া। দৈর্ঘ্যে একটি মোয়া পাখি তিন মিটার উচুঁ। আদিকালের মানুষ এদের বিলুপ্ত করেছে। পুরো দলের মধ্যে এদেরই ছিটেফোঁটা কিউই পাখি আজো টিকে আছে। এখানে এখনো আশ্চর্যজনকভাবে উড়ায় অক্ষম কাকাপো নামের টিয়া এবং বিশাল রেইল পাখি টাকহের অস্তিত্ব আছে।

স্থলচর জীবনে প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে যে ওড়ার জন্য যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন এবং শক্তি যোগাতে যে পরিমাণ খাদ্যের দরকার তাতে ঘাটতি পড়ে। ফলে এমটি ঘটে থাকবে। স্থলভাগে নিরাপদে জীবনযাপন সম্ভব হলে তা পাখির জন্য অধিকতরো সুবিধাজনক এবং পাখিরা তাই করেছে। আর্কিওপ্টোরিক্সর আত্মীয় ডায়নোসরদের হয়রানিতে ওরা বৃক্ষচারী হতে বাধ্য হয়েছিলো এবং শিকারী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ভয়ে সেই থেকে ওদের উত্তরসূরিরা খেচর জীবনই যাপন করে চলেছে।

দুই যুগের মাঝে মাত্র কয়েক কোটি বছর পৃথিবীতে কোনো প্রাণীর একাধিপত্য ছিলো না। এ সময়ে ডায়নোসর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরও এমন বিকাশ ঘটেনি যাতে ওরা যথোপযুক্তভাবে পৃথিবীর স্থলভাগে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। মনে হয় এ সময়ে পাখিরা খানিকটা আধিপত্য কায়েম করেছিলো। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে Diatryma নামের উড্ডয়নে অক্ষম বিশাল পাখি উইমিং অঞ্চলের সমতলভূমিতে সদম্ভে চলাফেরা করতো। এটি শিকারী পাখি। লম্বায় মানুষের চেয়ে বড়। এর চঞ্চু ছিলো কুঠারের মতো এবং বেশ বড়ো। এরা এই চঞ্চু দিয়ে বড়ো বড়ো প্রাণী হত্যা করতে পারতো।

কয়েক কোটি বছর পরে Diatryma পাখি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিশাল উড্ডয়নে অক্ষম অন্য পাখিরা এখনো অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উটপাখি, রিয়া পাখি ও ক্যাসোয়ারি পাখি ইত্যাদি। এরা Diatryma'র নিকটআত্মীয় নয়। তবে এরা প্রাচীন বংশোদ্ভূত এবং একই উৎস থেকে বিকশিত হয়েছে। এই উৎসের পাখিদের উড্ডয়ন ক্ষমতা ছিলো। এই সিদ্ধান্তে এ কারণে আসা যায় যে, এই পাখিদের মধ্যে উড্ডয়নের জন্য অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যগুলো আজো বিদ্যমান। যেমন এখনো ওদের দেহে বায়ুথলে, দাঁতহীন কেরাটিন গঠিত চঞ্চু, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফাঁপা হাড় দেখা যায়। এদের পাখা খর্ব হয়ে পুরো পদে পরিণত হয়নি। এগুলো পায়ের সরল সংস্করণ বলা যেতে পারে যা একসময় বায়ু তাড়না করতো। এখনো ডানায় যে প্রক্রিয়ায় পালক গজায় এবং পালকগুলো যেভাবে বিন্যস্ত থাকে তা ওড়ার জন্য উপযুক্ত। বক্ষাস্থির তরীদল অবশ্য প্রকৃতপক্ষে বিলুপ্ত, এতে পেশিসমূহ দুর্বলভাবে আটকানো থাকে। পালক যেহেতু ওড়ার কাজে ব্যবহৃত হয় না, সেহেতু এতে বারবিউল বা সূত্র-কন্টক থাকে না। পালক নরম তুলার মতো। এগুলো প্রদর্শনীতেই প্রদর্শন করার কাজে লাগে।

বিশেষ করে ক্যাসোয়ারি পাখি দেখে আমরা Diatryma কি পরিমাণ ভয়ংকর পাখি ছিলো সে বিষয়ে কিছুটা ধারণা করতে পারি। ওদের পালকে সূত্র প্রায়ই ঝরে গিয়েছিলো এবং দেখতে তা মোটা লোমের মতো ছিলো। খাট পাখায় ছিলো বাঁকা কয়েকটি কুইল বা পালক দণ্ড। এগুলো সেলাইয়ের সুইয়ের মতো পুরু ছিলো। মাথার উপরে ছিলো হাড়ের শিরস্ত্রাণ। ওদের বাসস্থান নিউজিল্যান্ডের ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে চলায় এই শিরস্ত্রাণ সহায়ক ছিলো। ওদের মাথা ও গলার অনাবৃত ত্বকের রঙ কালচে নীল-বেগুনি, নীল বা হলুদ। গলায় ঝুলে থাকে গাঢ় রক্তবর্ণের গলকম্বল। এরা ফল খায় তবে সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী বা পাখির ছানাও এদের খাদ্য। দ্বীপে বিষধর সাপ ছাড়া এরাই ভয়ংকরতম প্রাণী। যখন কোণঠাসা হয় তখন প্রচণ্ড লাথি হাঁকে। লাথির চোটে মানুষের পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। এরা অনেক মানুষকে হত্যা করেছে।

ক্যাসোয়ারি পাখিরা একা থাকে। বনের মধ্যে দিয়ে শিকার সন্ধানে ছোটার সময় এরা কখনো কখনো ভীতি প্রদর্শন করে। গুড়গুড় করে গম্ভীর গর্জন করে। বেশ দূর থেকে গর্জন শোনা যায়। এটি কালেভদ্রে পাখির মতো শব্দ করে। কাছে গিয়ে গুল্মের ভিতর দিয়ে গমনরত ক্যাসোয়ারিকে দেখলে একে মানুষের উচ্চতাবিশিষ্ট প্রাণী বলে মনে হবে। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাবে চকচকে চোখ। হঠাৎ বিশাল প্রাণীটি আতঙ্কিত প্রাণীর মতো চারদিকে লণ্ডভণ্ড করে আসুরিক শক্তিতে ঝোপঝাড় চারাগাছ ভেঙে ছুটতে থাকবে। কারো মনে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যদি বিশাল মাংসাশী পাখি বড়ো বড়ো শিকারের স্বাদ পায় তাহলে সে ভয়ানক বিপজ্জনক প্রাণীতে পরিণত হয়।

পরিশেষে বলতেই হয়, Diatryma চতুর শিকারী ছিলো না। এক গ্রুপের প্রাণীরা ওদের এড়িয়ে যেতে পারতো। ওরা সে সময়ের অনুল্লেখযোগ্য প্রাণী। তবে এরা খুব কর্মতৎপর ছিলো। পাখির মতো ওরাও উষ্ণশোণিত প্রাণী। তবে ওরা দেহকে তাপ অপরিবাহী করেছিলো পালক দিয়ে নয়, লোম দিয়ে। ওরাই ছিলো প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী। স্তন্যপায়ীরা পাখির উত্তরসূরি। শেষে স্তন্যপায়ীরাই উত্তরাধিকারী হিসেবে পৃথিবীকে অধিগ্রহণ করে এবং অধিকাংশ পাখিকে খেচর জীবনে নির্বাসন দেয়।

নবম পরিচ্ছেদ

ডিম, শাবক থলে ও ফুলকা

আঠারো শতকের শেষে ইংলন্ডে বিস্ময়কর এক প্রাণীর চামড়া দেখা গেলো। অস্ট্রেলিয়ায় নূতন প্রতিষ্ঠিত কলোনি থেকে এটি আনা হয়েছিলো। প্রাণীটি আকারে শশকের মতো। ওটারের দেহের ঘন লোমের মতো এর দেহেও লোম ছিলো। উপাঙ্গগুলো লিপ্তপাদ ও নখরযুক্ত। এর পায়ুছিদ্র একটা। এই ছিদ্র দিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করা ও প্রজনন সম্পন্ন হতো। পায়ুছিদ্র সরীসৃপের অবসারণীর মতো। সবচেয়ে অদ্ভুদ ব্যাপার হলো এর ছিলো বড় চ্যাপ্টা হাঁসের মতো চঞ্চু। এটি এতোই উদ্ভট ব্যাপার ছিলো যে বেশ কিছু মানুষ একে সত্যিকারের প্রাণী নয় বলে ফতোয়া দিয়ে একে ভুয়া দানো বলে ঘোষণা করে। এ সময় দূর প্রাচ্যে মৎস্যকুমারী, সমুদ্র-ড্রাগন ও অন্যান্য বিস্ময়কর জীবের পরিচয় দিয়ে পর্যটকদের কাছে সে সবের খণ্ডাংশ বিক্রির মাধ্যমে পর্যটকদের প্রতারণা করা হতো। কিন্তু চামড়াটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করা হলে দেখা গেলো যে এটি ভুয়া নয়। লোমশ মাথায় অদ্ভুদ চঞ্চুটি বেমানানভাবে লাগানো ছিলো। চঞ্চু ও মাথার সন্ধিস্থলে জামার আস্তিনের মতো ঝুলন্ত মাংসখণ্ড ছিলো। একে সত্যিকারের প্রাণী বলে প্রমাণ করা অসম্ভব মনে হলেও, আসলে এটি সত্যিকারের প্রাণী ছিলো।

একমাত্র প্রমাণ হিসেবে যখন শুষ্ক চামড়া উপস্থাপন করা হয়েছিলো তখনো চঞ্চুটিকে পাখির চঞ্চুর মতো মনে হয়েছিলো। কিন্তু প্রাণীটির পুরো দেহ সংগ্রহ করা সম্ভব হলে দেখা গেলো চঞ্চুটি পাখির চঞ্চুর মতো শক্ত নয়। জীবিত প্রাণীর চঞ্চু নমনীয় ও চর্মবৎ। কাজেই এর সাথে পাখির চঞ্চুর সাদৃশ্যকে গণ্য না করলেও চলে। চুল বা লোম স্তন্যপায়ী প্রাণীর নিদর্শন। এটি অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ। যেমন পাখির জন্য পালকই গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কাজেই এটি স্পষ্ট যে, রহস্যপূর্ণ এই প্রাণী অবশ্যই সেই বড়ো দলের সদস্য যে দলে বিবিধ রকমের প্রাণী যথা শৃ, সিংহ, হাতি ও মানুষ অন্তর্ভুক্ত। স্তন্যপায়ীর লোমশ আরবণ প্রাণীর দেহকে তাপ অপরিবাহী করে দেহে উচ্চ তাপমাত্রা বজায় রাখে। কাজেই, নূতন লভ্য প্রাণীটি উষ্ণ শোণিত প্রাণী ছিলো বোঝা যায়। অনুমান করা যায় যে বৈশিষ্ট্যের কারণে এই দলটির নাম স্তন্যপায়ী, স্তন্যপায়ীদের সেই তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটিও এদের ছিলো। অর্থাৎ এদের দেহে স্তন ছিলো। স্তন্যপায়ীর শিশুরা স্তন চুষে দুধ পান করে।

অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশিকরা এই প্রাণীটিকে ওয়াটার-মোল বা জল-ছুঁছো নাম দিয়েছিলো কিন্তু বিজ্ঞান প্রদত্ত নামটি আরো মেধাজ্ঞাপক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদের আরো অনেক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ভাবী নাম নির্বাচনে উৎসাহিত করতে পারতো কিন্তু যে নামটি উদ্ভাবিত হলো তা বরং নিরস মনে হয়। উদ্ভাবিত নামটি হলো প্ল্যাটিপাস। অর্থ চ্যাপ্টা-পাবিশিষ্ট প্রাণী। এর পরপরই, যেহেতু এই নামটি আগে চ্যাপ্টা পা বিটল বা গুবরে পোকার ক্ষেত্রে ব্যবহার

করা হয়েছিলো, সেহেতু এই নামটি এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। কাজেই, দ্বিতীয় একটি নাম বের করতে হবে। দ্বিতীয় নাম রাখা হলো ওরনিথোরিন্কাস বা বার্ড-বিল। বাংলায় পক্ষী-চঞ্চু। এই বৈজ্ঞানিক নামটি এখনো বহাল আছে। অবশ্য, অধিকাংশ মানুষের কাছে এটি প্ল্যাটিপাস নামেই পরিচিত। পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার নদীসমূহে বিল বার্ডরা দারুন সাঁতার কাটে এবং ভেসে থাকে। কখনো কখনো জলপৃষ্ঠে ঘুরে বেড়ায়। সাঁতার কাটে লিপ্ত পুরোপদের সাহায্যে। এটিকে ওরা দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে হাতের সাহায্যে। ডুব সাঁতারের সময় এরা ছোট পেশল মাংস খণ্ড দিয়ে কান ও ছোট চোখ ঢেকে রাখে। নদীর তলায় চারদিকে খনন করার সময় এরা দেখতে পায় না। তবে মিঠাপানির চিংড়ি, কৃমি ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণীকে চঞ্চুর সাহায্যে অনুভব করতে পারে। চঞ্চু স্নায়ুপ্রান্ত দ্বারা সমৃদ্ধ এবং খুবই স্পর্শকাতর। এটি দক্ষ সাঁতারু এবং সে সঙ্গে শক্তিমান ও পরিশ্রমী খনকও বটে। নদী তটে ওরা ১৮ মিটার লম্বা সুড়ঙ্গ খনন করতে পারে। এরা উল্টোভাবে লিপ্তপদ দিয়ে দাঁড় টানে এবং হাতের নখর দিয়ে খনন করে। সুড়ঙ্গে স্ত্রী বার্ড বিল ঘাস, খাগড়া, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে বাসা বানায়। এই বাসাগুলোর একটি থেকে এই প্রাণী বিষয়ে সাড়া জাগানো খবরটি পাওয়া গিয়েছিলো। দাবি করা হয়েছিলো যে এরা ডিম পাড়ে।

ইউরোপের অনেক প্রাণিবিজ্ঞানী এটি অসম্ভব বলে জানিয়েছিলেন। তাঁদের মতে কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী ডিম পাড়ে না। যদি প্ল্যাটিপাসের বাসায় কোনো ডিম পাওয়া যায়, তাহলে তা অবশ্যই অন্য কোনো প্রাণী কর্তৃক সেখানে পেড়ে যাওয়া ডিম। ডিমগুলোর বর্ণনা এরকম : এগুলো মার্বেল আকারের ও গোলাকৃতির। ডিমের খোলক নরোম। ডিমের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় সম্ভবত এগুলো সরীসৃপের ডিম। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ জোর দিয়ে বলেন এগুলো প্ল্যাটিপাসের ডিম। প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে শত বর্ষ ধরে তপ্ত তর্কবিতর্ক চলেছে। ১৮৮৪ সালে একটি স্ত্রী প্ল্যাটিপাসকে একটি ডিম পাড়ার ঠিক পরেই গুলি করা হয়। এর দেহের মধ্যে আরো একটি ডিম পাওয়া যায়। এ ডিমটিও বেরোনর পথেই ছিলো। এখন আর সংশয়ের অবকাশ রইলো না। বার্ড বিলই ডিমপাড়া একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। দশ দিন পর ডিম দুটো ফুটো যখন বাচ্চা বের হলো সে বাচ্চা খাবারের সন্ধানে গেলো না। যেমনটি সরীসৃপের বাচ্চারা যায়। স্ত্রীর উদরদেশ থেকে কতিপয় বিশেষ গ্রন্থি বিকশিত হলো। এগুলোর সাথে প্ল্যাটিপাসের ঘর্মগ্রন্থির গঠনগত সাদৃশ্য রয়েছে। অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর দেহের চামড়ার মতো এর চামড়াও অতি উষ্ণ দেহকে শীতল রাখে। তবে এই বিশেষ ঘর্মগ্রন্থি থেকে যে নিঃসরণ বের হয় তা ঘন ও চর্বিসমৃদ্ধ। এটি দুধ। দুধ গড়িয়ে যায় লোমে। শিশুরা লোমগুচ্ছ চুষে চুষে এই দুধ পান করে। ওদের স্তনে বোঁটা নেই। কাজেই প্ল্যাটিপাসে খাঁটি স্তন আছে বলা যাবে না। তবে স্তনের সূচনা বলা যাবে।

স্তন্যপায়ীদের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো দেহে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হওয়া। এটি প্ল্যাটিপাসে সম্পূর্ণ বিকশিত হয়েছিলো বলে মনে হয় না। প্রায় সকল স্তন্যপায়ীর দেহে তাপমাত্রা ৩৬° থেকে ৩৯° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। প্ল্যাটিপাসের দেহের তাপমাত্রা ৩০° সে.। এই তাপমাত্রা বেশ ওঠা-নামা করে।

আদি স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপের দেহে মিশ্রিত রক্ত প্রবাহের সাথে পৃথিবীর অন্য একটি প্রাণীর দেহের মিশ্রিত রক্ত প্রবাহের হুবহু মিল দেখা যায়। এই প্রাণীটিও অস্ট্রেলিয়ার। নাম

স্পাইনী এন্ট ইটার বা কন্টকীপিপঁড়াভুক। এর নামকরণের ইতিহাসও প্ল্যাটিপাসের মতো। বিজ্ঞান প্রথমে একে শনাক্ত করে একিডনা রূপে। অর্থাৎ কন্টকী প্রাণী এই নামটি একটি মাছের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছিলো। কাজেই এর নাম রাখা হয় টেচিগ্লসাস। অর্থাৎ দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালনক্ষম প্রাণী। কিন্তু প্রথম নামটিই বহাল থাকে। এটিকে সজারুর মতো দেখায়। এর পিঠে গেঁথে রয়েছে কাঁটা। শক্ত লোমের আবরণ থেকে কাঁটা বেরিয়ে থাকে। চার পায়ে সাতাঁর কাটার ভঙ্গিতে এরা মাটি খুঁড়ে। এতো দক্ষতার সাথে মাটি সরায় যে, শক্ত মাটি সরাতে ওদের বেগ পেতে হয় না। এরা সোজা বা খাঁড়াভাবে মাটিতে ঢুকে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা যাবে মাটির নিচে যেনো একটি গম্বুজ যার থেকে অতি তীক্ষ্ণ কাঁটা উঁচিয়ে রয়েছে। মুখ্যত এরা খনক প্রাণী নয়। আত্মরক্ষার জন্যই ওরা মূলত মাটির নিচে যায়। বেশিরভাগ সময় নিরাপদ জায়গায় পড়ে পড়ে ঘুমায় নয়তো ঝোপঝাড়ে হংসগতিতে হেলে দুলে চলে পিপঁড়া ও উইয়ের সন্ধানে। পিপঁড়া বা উইয়ের বাসা মিললে সামনের পায়ের নখর দিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলে। এরপর টিউয়ের মতো তুন্ড থেকে দীর্ঘ জিহ্বা বের করে পিপঁড়া বা উই লেহন করে। জিহ্বা ভেতর-বার করে খুব দ্রুত গতিতে।

প্ল্যাটিপাসের চঞ্চুর মতো এই তুণ্ড ও কাঁটা এদের বিশেষ জীবননির্বাহ প্রণালির সঙ্গে খাপ খায়। এগুলো বিশেষত্বমণ্ডিত বৈশিষ্ট্য। বিবর্তনের দৃষ্টিতে এই বৈশিষ্ট্যদ্বয় সম্প্রতি অর্জিত। মৌলিকভাবে একিডনা ও প্ল্যাটিপাস পরস্পর খুব কাছাকাছি। এর দেহে লোম আছে। এর দেহের তাপমাত্রা খুব কম, এর একটিই পায়ুপথ বা অবসারণী রয়েছে এবং এটি ডিম পাড়ে।

প্রজননের একটি ব্যাপারে প্ল্যাটিপাসের সাথে এদের পার্থক্য রয়েছে। স্ত্রী একিডনা বাসায় ডিম পাড়ার বদলে এদের দেহের নিচ থেকে সৃষ্ট সাময়িক থলেতে ডিম রাখে। বলা হয় যে, ডিম পাড়ার মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে এরা শরীরকে গোল করে বাঁকিয়ে উদর থলেতে ডিম পাড়ার ব্যবস্থা করে। গোলগাল সরল দেহবিশিষ্ট এই প্রাণী ব্যায়ামবিদের মতো এরকম শারীরিক কসরত যে দেখাতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন। ডিমের খোলক ভিজা এবং তা লোমে আটকে থাকে। সাত থেকে দশ দিন পর ডিম ফুটে। মায়ের উদর থেকে হলুদাভ ঘন দুধ বের হয়। বাচ্চা দুধ লেহন করে। উদর থলেতে বাচ্চারা প্রায় সাত সপ্তাহ থেকে। ইতোমধ্যে বাচ্চা দৈর্ঘ্যে ১০ সেন্টিমিটারের মতো লম্বা হয় এবং দেহে কাঁটা গজাতে থাকে। অনুমান করা হয় যে, থলেয় থাকা বাচ্চারা মায়ের অস্বস্তির কারণ হয়। মা এদের আঁচড়িয়ে থলে থেকে বের করে গর্তে জমা করে। মা আরো কয়েক সপ্তাহ ওদের খাবার যোগায় এবং তুণ্ড দিয়ে গুঁতিয়ে ওদেরকে দুধ পানে উৎসাহিত করে। বাচ্চাদের পিঠের কাঁটা মায়ের উদরের মাটি পরিষ্করণে সাহায্য করে। এ সময় পিট বাঁকা করে উদরদেশ স্ফীত করে। পরে বাচ্চারা মাথা তোলে এবং ওদের ছোট চোয়াল দিয়ে মায়ের লোম আঁকড়ে ধরে।

সরীসৃপ মাতা তার সন্তানের জন্য যে খাদ্যের ব্যবস্থা রাখে তা হলো ডিমের কুসুম। ছোট হলুদ বলের মতো কুসুম খেয়ে শাবককে এমন শরীর গড়ে তুলতে হয় যা পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী এবং খোলক থেকে বেরোনর পরপরই যাতে ওরা পরিপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাপনে সক্ষম হয়। একে তখন অবশ্যই বেরোতে হবে এবং খাবার সন্ধান করতে হবে। বাকী জীবনের সবটুকু অংশেও এদেরকে নিজের খাদ্য যোগাড় করতে হয়। প্ল্যাটিপাস অনুসৃত পদ্ধতি অধিকতরো কার্যকর। এদের ডিমে কুসুম থাকে কম। কিন্তু বাচ্চা বেরোনোর পরপরই

ওদের কাছে সহজপাচ্য দুধকে বিশেষ খাদ্যরূপে অবিরাম সরবরাহ করা হয়। ফলে এই দুধ বাচ্চার শারীরকে দীর্ঘদিন ধরে বিকাশে সাহায্য করে। মাতৃ যত্নের এই কৌশল একটি বড় ধরনের পরিবর্তন। এটি স্তন্যপায়ীর জীবনে এক ক্রান্তিকাল। আরো মার্জিত ভাষায় বললে, এটির উপরই পুরো স্তন্যপায়ী প্রাণীদলের সাফল্য নির্ভর করেছে।

একিডনা ও প্ল্যাটিপাসের দেহের নকশা নিঃসন্দেহে খুব প্রাচীন ধাঁচের। কিন্তু কোন্ অশ্মীভূত সরীসৃপ ওদের পূর্বপুরুষ সে বিষয়ে দৃঢ় কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। এ ধরনের বহু প্রাণী সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানের সাধারণ ভিত্তি হলো দাঁতসমষ্টি। যে কোনো প্রাণিদেহের সবচেয়ে টেকসই অংশ হলো দাঁত। কাজেই প্রায়শ দাঁতের জীবাশ্ম পাওয়া সহজ। প্রাণীর খাদ্য ও অভ্যাস বিষয়ে দাঁত অনেক তথ্য হাজির করে। এগুলো প্রজাতিসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটে। বংশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে দুই বংশের দাঁতের মিল প্রবল প্রমাণ হিসাবে কাজ করে। অসুবিধে হলো, প্ল্যাটিপাস ও একিডনা যখন যথাক্রমে জলতলে আহার গ্রহণ ও পিঁপড়া খাওয়া রপ্ত করে তখনই দাঁত হারায়। নিশ্চিত বলা যায় ওদের পূর্বপুরুষদের দাঁত ছিলো। কারণ প্ল্যাটিপাস শাবকে জন্মের পর এখনো তিনটি ক্ষুদ্র দাঁত গজায়। তবে অল্প সময় পরে এই দাঁতের পরিবর্তে শক্ত প্লেট সৃষ্টি হয়। এদের পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি কোনো। কাজেই, প্রকৃতপক্ষে যে কোনো সরীসৃপ দলের জীবাশ্মের সঙ্গে এদের যুক্ত করার ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এটি একটি যুক্তিসিদ্ধ অনুমান হতে পারে যে, প্ল্যাটিপাস ও একাইডনা যে ধরনের প্রজনন কৌশল বর্তমানে গ্রহণ করেছে, সে ধরনের প্রজনন পদ্ধতি সরীসৃপের কোনো কোনো দল স্তন্যপায়ী প্রাণীতে রূপান্তরের সময় গ্রহণ করেছিলো।

কিন্তু ওরা কোন ধরণের সরীসৃপ ছিলো? আজকের স্তন্যপায়ীর নিদর্শন হলো চুল উষ্ণশোণিত প্রবাহ ও স্তন বা দুধ উৎপাদক গ্রন্থি। এর কোনোটিই অশ্মীভূত হয় না। আমরা এসব ছিলো ধরে নিতে পারি শুধু। যেমন আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি কতিপয় ডাইনোসর যেমন স্টেগোসর নিঃসন্দেহে সূর্য থেকে দ্রুত তাপ শোষণের খুব কার্যকর পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছিলো। এরকমটি ঘটানোর ক্ষেত্রে কিন্তু, এরাই প্রথম সরীসৃপ নয়। এর আগের গ্রুপের পেলিকোসরও এই ব্যবস্থা নিতে পারতো। এদের একটির নাম ডাইমেট্রোডন। এর মেরুদণ্ড থেকে দীর্ঘ কাঁটা গজাতো। কাঁটাগুলো পরস্পর চামড়া দ্বারা যুক্ত ছিলো। স্টেগোসর-এর প্লেট যে কাজটি করতো ডাইমেট্রোডনের চামড়ার পাশও একই রকম সৌর প্যানেলের কাজ করতো। পেলিকোসর সম্পর্কে মজার ঘটনা হলো, যখন ওদের আধিপত্য প্রবল হয়ে উঠে তখনই ওদের পালের মতো ঝুঁটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। যদিও আবহাওয়ায় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটছিলো তবু এটি খুবই বিসদৃশ মনে হয় যে, বিবর্তনের ধারায় তাপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির এমনি একটি মূল্যবান কৌশল, বিকল্প অন্য কোনো অধিক কার্যকর ব্যবস্থা সৃষ্টির আগেই, বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই; অনুমান করা হয় যে পেলিকোসর এবং ওদের উত্তরসূরি থেরাপসিডরা কিছুটা উষ্ণশোণিত প্রাণী ছিলো। থেরাপসিডরা দৈর্ঘ্যে ১ মিটার বা এর কিছু বেশি লম্বা ছিলো। বিশেষ করে এ ধরনের ছোট প্রাণীর পক্ষে উষ্ণশোণিতবিশিষ্ট হতে হলে কোনো ধরনের কার্যকর তাপ অপরিবাহী বস্তুর অবশ্যই প্রয়োজন দেখা দেবে। এ থেকে ধারণা হয় এই প্রাণীদের কারো কারো শরীরে লোম ছিলো।

অন্যান্য সূত্রে জানা যায় কতিপয় থেরাপসিড স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পরিণত হবার পথে ছিলো। যথার্থ উপায়ে অর্ন্ততাপ সঞ্চারণ পদ্ধতিতে দেহে তাপ সৃষ্টির জন্য প্রচুর শক্তির দরকার হয়। শক্তির জন্য দরকার দৈনিক অধিক খাদ্য এবং দ্রুত খাদ্য পাচন পদ্ধতি। এটি অর্জন করার জন্যে সরীসৃপ মার্কা দাঁত বর্জন জরুরি। সরীসৃপের দাঁত সরল, পেরেকের মতো। এগুলো দিয়ে খাবার ধরে রাখা যায়। খাদ্যকে কেটে টুকরো করা, চূর্ণ করা ও পেষা ইত্যাদি করার জন্য বিশেষ ধরনের দাঁতের প্রয়োজন। ঠিক এ ধরনেরই পরিবর্তন থেরাপসিডের দাঁতে লক্ষ করা যায়।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে এরা উষ্ণশোণিত ও লোমশ প্রাণী, তবু কি ওদের স্তন্যপায়ী বলা যাবে? এই প্রশ্ন অবশ্য কিছুটা কৃত্রিম মনে হবে। এ সকল শর্ত তো মানুষের উদ্ভাবন, প্রকৃতির নয়। আসলে প্রাচীন ধারাসমূহ একটার মধ্যে অপরটা কিভাবে মিশে যায় তা বর্ণনা করা যায় না। দলবদ্ধ শারীরবিদ্যাগত বৈশিষ্ট্যসমূহকে মানুষ লক্ষণ হিসেবে বেছে নিতে পারে। কিন্তু গ্রুপের কোনো স্বতন্ত্র সদস্য বিভিন্ন গতিতেও পরিবর্তিত হতে পারে, যার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়ে অন্যগুলো তুলনামূলকভাবে অপরিবর্তিত থেকে যেতে পারে। তদুপরি এ ধরনের পরিবর্তন–উদ্দীপক পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ বহু বংশব্যাপী একই ধরনের উদ্দীপনা সঞ্চার করে। প্রকৃতপক্ষে, সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, কতিপয় একেবারে স্বতন্ত্র সরীসৃপ গ্রুপে বিভিন্ন সময়ে উষ্ণশোণিত প্রবাহ অর্জিত হয়েছিলো। এটি এমনো হতে পারে, সরীসৃপের যে ধারা থেকে প্ল্যাটিপাস ও একিডনার বিকাশ ঘটেছিলো সেই উৎস থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেনি।

বংশ–বৃক্ষের আকৃতি যাই হোক না কেনো কমপক্ষে একটি দলের সরীসৃপেরা ২০ কোটি বছর আগে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে বিবর্তনের ধারার সূচনা করেছিলো। আফ্রিকার দক্ষিণাংশে একটি প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছিলো ১৯৬৬ সালে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত স্তন্যপায়ীদের জীবাশ্মের মধ্যে এটিই আদিতম ও প্রায় পূর্ণাঙ্গ। এটি লম্বায় মাত্র ১০ সেন্টিমিটার। দেখতে শ্রু–এর মতো। এর চোয়াল ও করোটির খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য বিচার করলে খাঁটি স্তন্যপায়ীর সাথে এর যোগসূত্র দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। এর দাঁতগুলো পোকা খাওয়ার জন্য বিশেষভাবে গঠিত হয়েছিলো। যে সব বিজ্ঞানী একে পরীক্ষা করেছিলেন তাঁদের মনে এটি যে অবশ্যই উষ্ণশোণিত ও লোমশ প্রাণী ছিলো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না। এ মুহূর্তে আমরা বলতে পারছি না যে, এরা প্ল্যাটিপাসের মতো ডিম পাড়তো কি না বা জীবন্ত শাবক প্রসব করতো কি না এবং শাবক স্তন চুষে দুধ পান করতো কি না। যাহোক, সে সময় স্তন্যপায়ী প্রাণী নিশ্চিতভাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও এদের মধ্যে থেকে স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে পরবর্তীকালে বড় ধরনের বিকাশ সাধিত হয়নি। বরং ডায়নোসরদের নাটকীয়ভাবে বিস্তৃতি ঘটেছিলো। সংখ্যায় ও আকারে ছোট স্তন্যপায়ীরা যদিও নগণ্য ছিলো, তবু ওরা টিকেছিলো। ওদের রক্ষা করেছে উষ্ণশোণিত। গরম রক্তের বদৌলতে ওরা রাতে সক্রিয় হতে পারতো যখন বড় সরীসৃপেরা ঠান্ডায় অবশ হয়ে পড়ে থাকতো। স্তন্যপায়ীরা নিশ্চিতভাবে গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পতঙ্গ ও অন্যান্য ছোট প্রাণীর সন্ধান করতো। এ অবস্থা বিরাজ করে বিরাট সময় জুড়ে। প্রায় ১৩.৫ কোটি বছর। শেষ পর্যন্ত, ডায়নোসরদের ভাগ্য বিপর্যয় হলো এবং এদের চূড়ান্ত বিলুপ্তির পর ৬.৫ কোটি বছর আগে ছোট স্তন্যপায়ীরা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় এগিয়ে এলো।

ছোট স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আজকের ওপোসামের মতো প্রাণী ছিলো। ওপোসাম আমেরিকার বাসিন্দা। ভার্জিনিয়া ওপোসাম আকারে ও আকৃতিতে বড় ইঁদুরের মতো। এদের গোঁফের মতো লোম আছে। দেহ অপরিষ্কার, লম্বা, কুঞ্চিত ও বাঁকা লোমে আবৃত। চোখগুলো দেখতে বোতামের মতো। লেজ লোমহীন ও খুব লম্বা। লেজ দিয়ে খুব শক্তভাবে গাছের ডাল আকঁড়ে ধরে অন্তত কিছুক্ষণ ঝুলে থাকতে পারে। এর মুখের হাঁ বিশাল। মুখে রয়েছে ছোট ছোট ধারালো দাঁত। হাঁ করলে ভীতিজনক দেখায়। আমেরিকার দক্ষিণে আর্জেন্টিনা থেকে উত্তরে কানাডা পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। এদের অভিযোজন ক্ষমতা অসাধারণ। এরা অতি ঠাণ্ডা তাপমাত্রা সহ্য করে। সময় সময় ওদের অনাবৃত কান তুষার প্রদাহে আক্রান্ত হয়। এরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে দস্যুর মতো লুঠ করে বেড়ায়। এরা খাদ্যোপযোগী সব কিছু যথা ফল, পোকা-মাকড়, কৃমি, ব্যাঙ, টিকটিকি, পাখির ছানা ইত্যাদি খায়।

এদের সবচেয়ে অসাধারণ ব্যাপার হলো প্রজনন পদ্ধতি। স্ত্রী-প্রাণীর উদরের নিচে একটি বড়ো শাবক থলে রয়েছে। যলের মধ্যে ওরা বাচ্চা পুষে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলম্বাসের অধীনে কর্মরত অভিযাত্রী পিনযোন যখন ব্রাজিল থেকে প্রথম ওপোসামটি ইউরোপে আনেন তখন ওখানকার কেউ এ ধরনের প্রাণী দেখেন নি। স্পেনের রাজা ও রাণী থলের ভিতরে হাত ঢুকাতে প্রলুব্ধ হন এবং বিস্ময়বোধ করেন। বিশেষজ্ঞরা থলের নাম রাখেন মারসুপিয়াম বা ছোট ব্যাগ। কাজেই ইউরোপ প্রথমবারের মতো এ ধরনের প্রাণীর সাথে পরিচিত হয়।

সন্দেহ নেই যে শাবকরা থলেতে পোষিত হয়। কারণ এদেরকে থলের মধ্যে দেখা যায়। ক্ষুদ্র বেগুনি-লাল রঙের শাবকগুলো মুখ দিয়ে স্তনের বোঁটা কামড়ে ঝুলতে থাকে। কিন্তু শাবকগুলো থলেতে ঢুকলো কি করে? সে সময় কেউ কেউ বলতো এবং আমেরিকার লোককাহিনীতে এখনো প্রচলিত যে, এদেরকে ফুঁ দিয়ে থলেতে ঢুকানো হয়। কাহিনী অনুযায়ী ওপোসোমরা নাকে ঘষাঘষি করে সঙ্গম কাজ চালায়। গর্ভধারণ হয় নাকের ছিদ্রে। সময়মতো স্ত্রী ওপোসাম থলেতে নাক ঢুকিয়ে ভোঁস ভোঁস শব্দ করে ও নাক ঝেড়ে বাচ্চাকে থলেতে ঢুকায়। গল্পের অবতারণা হয়েছে এ কারণে যে, থলেতে বাচ্চা আসার ঠিক আগে সে থলেতে নাক ঢুকায় এবং সযত্নে চেটে চেটে থলে পরিষ্কার করে। আসলে এটি থলে বাচ্চা রাখার পূর্ব প্রস্তুতি।

কল্পকাহিনীর চেয়ে সত্য কদাচিৎ কম চমৎকার মনে হয়। একিডনা ও প্ল্যাটিপাসের মতো ওপোসামে একটি মাত্র অবসারণী থাকে। রন্ধ্রনিয়ন্ত্রক পেশি দ্বারা অবসারণী বন্ধ থাকে। অবসারণীর মধ্যে পায়ু ও মূত্র-জনন ছিদ্র মুক্ত হয়। এরা সঙ্গম করে এবং পুরুষ ওপোসাম স্ত্রী ওপোসামের ডিম নিষেক করে দেহের অভ্যন্তরে। ভ্রূণের জন্য স্বল্প পরিমার্ণ কুসুমের সাশ্রয় থাকে। বার দিন আঠার ঘন্টা পর ভ্রূণ দেহের বাইরে বহিষ্কৃত হয়। জানা মতে স্তন্যপায়ী জগতে এটিই সর্বনিম্ন গর্ভধারণকাল। বেগুনি-লাল অন্ধ ক্ষুদ্র শিশুগুলো আকারে মৌমাছির চেয়ে বড়ো নয়। তখনো এদের দেহ এতো অপূর্ণগঠিত যে, এদেরকে শিশু বলা সঙ্গত নয়, কাজেই এদের বিশেষ নাম দেয়া হয়েছে নিওনেট। স্ত্রী ওপোসাম একবারে দুই ডজন নিওনেট প্রসব করতে পারে। মায়ের অবসারণী দিয়ে বেরিয়ে এসে নিওনেটরা হেঁচড়ে মায়ের উদরের লোমের ভিতর দিয়ে শাবক থলের দরোজায় পৌছে। ওদের ভ্রমণ পথ আট সেন্টিমিটার। এটি তাদের জীবনকালের প্রথম এবং অতি কষ্টসাধ্য ভ্রমণ। এই পথ অতিক্রমণে প্রায় অর্ধেকের

মৃত্যু ঘটে। একবার শাবক থলের উষ্ণতার সান্নিধ্যে ও নিরাপত্তার গণ্ডীতে পৌছাঁলে প্রত্যেকে তেরটি স্তনের বোঁটার যে কোনো একটাকে কামড়ে ধরে এবং দুধ পানে লেগে যায়। যদি তেরটিরও অধিক নিওনেট ভ্রমণ সম্পন্ন করে থলেতে পৌছাঁয় তাহলে বিলম্বে আসা নিওনেট কোনো খালি বোঁটা না পেয়ে উপোস দিতে বাধ্য হয় এবং মারা পড়ে।

নয় বা দশ সপ্তাহ পর শিশু ওপোসাম থলের বাইরে আসে। এখন ওরা পূর্ণগঠিত। শিশুরা খুবই হাস্যকর উপায়ে মায়ের লোম আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিককার একটি বিখ্যাত চিত্রে একটি ওপোসামকে দেখানো হয়েছিলো। চিত্রে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র শিশু ওপোসামরা ওদের ছোট লেজ দিয়ে তাঁদের মায়ের লেজ জড়িয়ে আছে। ওপাসামের লেজে চেপে শিশুরা চলেছে। একজনের পর আরেকজন চিত্রকর এমনভাবে অনেক চিত্রকর ঐ চিত্রের কপি করেন। সর্বশেষ চিত্রকরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে ওপোসাম মাতা লেজকে উল্টিয়ে পিঠে লাগিয়ে রেখেছে। শিশুরা সারিবদ্ধভাবে লেজে ঝুলে আছে। জাদুঘর ওপোসামের চামড়া দেওয়ালে ফ্রেমে বন্দী করার সময়, বই পড়ে সর্বশেষ চিত্রানুযায়ী চামড়া ফ্রেমবদ্ধ করার ব্যবস্থা নেয়। তাতে এই চিত্রানুগ গল্প আরো প্রতিষ্ঠা পায়। এটি অবশ্য অন্য একটি কল্পকাহিনী যার সাথে এই অদ্ভুত জীবটি জড়িয়ে আছে। শিশু ওপোসামরা ওরকম শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে সারিতে থাকে না। এরা মায়ের সারা দেহে জড়িয়ে থাকে। মামের লম্বা লোক আকঁড়ে ঝুলে। কোনোটি উদরে কোনোটি পিঠে, যেমনটি মানবশিশু বাতিল ও পরিত্যক্ত জায়গায় খেলার মাঠ গড়ে নিয়ে তিড়িং বিড়িং লাফাতে থাকে এরাও মায়ের দেহকে তেমনিভাবে ব্যবহার করে। এটি করে মাকে পরিত্যাগের তিন মাস আগে। তিন মাস পর ওরা স্বাধীন জীবনযাপন করে।

আমেরিকায় ষাটটি প্রজাতির ওপোসাম আছে। ক্ষুদ্রতম ওপোসাম আকারে ইদুঁরের মতো এবং শাবক থলেহীন। এর শিশু আকারে চালের দানার চেয়ে বড়ো নয়। এরা মায়ের পেছনের পায়ের মধ্যে থাকা স্তনের বোঁটায় ঝুলে থাকে। মনে হয় খাট আঙুর শাখায় এক গুচ্ছ আঙুর ঝুলছে। অন্যদিকে জলের ওপোসাম আকারে ছোট ভোঁদরের মতো। এর লিপ্তপদ থাকে এবং অধিকাংশ সময় সাঁতার কাটে। থলের শিশুরা এক উপায়ে জলে ডুবে-মরা থেকে বাঁচে। রন্ধ্রপেশি থলের মুখ বন্ধ রাখে যেমন জিপার বা চেইন দিয়ে ব্যাগ বন্ধ থাকে। শিশুরা কয়েক মিনিট পর্যন্ত জলে নিমগ্ন অবস্থা সহ্য করতে পারে এবং থলের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। কিন্তু বন্ধ থলেতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে এবং শাবকদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়তে হয়।

আদি স্তন্যপায়ীর জীবাশ্ম অবশ্যই মারসুপিয়ালদেরই ছিলো যা দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া গিয়েছিলো। হতে পারে এই দলের উৎসও সেখানে। কিন্তু জীবন্ত মারসুপিয়ালদের বড় অংশই আমেরিকায় নয় অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। এরা কিভাবে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে পাড়ি জমিয়েছিলো?

প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে সেই যুগে ফিরতে হবে যখন পৃথিবীতে ডায়নোসরের আধিপত্য তখনো বহালতবিয়তে। এই সময় পৃথিবীর মহাদেশসমূহ পরস্পর যুক্ত ছিলো। সবগুলো মহাদেশ মিলে এক প্রকাণ্ড ভূখণ্ড ছিলো। কাজেই জীবাশ্মগুলো সেসব নিকট সম্পর্কিত ডায়নোসরদের যাদের জীবাশ্মসমূহ বর্তমানে সকল মহাদেশে পাওয়া যাচ্ছে।

উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকায় ডায়নোসরের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। আদি স্তন্যপায়ীর মতো সরীসৃপদেরও একইভাবে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। কিন্তু ডায়নোসরের রাজত্বের শেষে, এই প্রকাণ্ড ভূমি দু'ভাগে বিভক্ত হয়—একটি উত্তরাংশীয় অধিমহাদেশ যার অধীন বর্তমান ইউরোপ, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অপরটি দক্ষিণাংশীয় অধিমহাদেশ, যাতে অন্তর্ভুক্ত আজকের দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, কুমেরু ও অস্ট্রেলিয়া।

এই দলভুক্তি ও পরবর্তী ভাঙন এবং ভাঙনের প্রাথমিক প্রমাণ ভূতত্ত্ব থেকে জানা গেছে। বর্তমানের মহাদেশগুলো কিভাবে একে অপরের সঙ্গে খাপ খাইয়েছে, ওদের বিপরীত প্রান্তের শিশগুলো পরস্পরের মধ্যে কিভাবে বিস্তৃত আছে, চৌম্বকীয় কেলাসের পূর্বমুখী অবস্থান, মহাসাগরের মধ্যভাগের শৈলশিরা ও দ্বীপসমূহের সৃষ্টিকাল সমুদ্রতল খনন ও অন্যান্য উৎস ইত্যাদি গবেষণা থেকে মহাদেশগুলোর অবস্থা জানা গেছে। চৌম্বকীয় কেলাসের পূর্বমুখী অবস্থান থেকে এগুলো প্রথম গঠিত হবার অবস্থা জানা যায়।

বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের বিতরণ বিবেচনা করলে আরো জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশাল উড্ডয়ন ক্ষমতাহীন পাখি বিশেষ স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। আমরা জেনেছি, পাখির আদি ইতিহাসে এদের উদ্ভব। একটি দলে নিষ্ঠুর ডায়াট্রিমা পাখি অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এর উদ্ভব উত্তরাংশীয় অধিমহাদেশে। এসব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দক্ষিণাংশীয় অধিমহাদেশে অন্য স্বতন্ত্র একটি পরিবারের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিলো যারা অনুকূল অবস্থায় ছিলো। এরা হলো র‍্যাটাইট দক্ষিণ আমেরিকার রিয়া, আফ্রিকার উটপাখি, অস্ট্রেলিয়ার এমু ও ক্যাসোয়ারি ও নিউজিল্যান্ডের কিউই। এদের বিতরণ ব্যবস্থা অবশ্য বিভ্রান্তি উদ্রেককর। এরা পরস্পর এতোই সদৃশ যে, মনে হয় সম্ভবত এদের সবার উৎস হলো একটি উড্ডয়ন ক্ষমতারহিত পূর্বপুরুষ। কিন্তু উড্ডয়ন ক্ষমতাহীন পাখিরা বিভিন্ন মহদেশে গেলো কি করে? পূর্বেস্থিত দক্ষিণাংশীয় অধিমহাদেশ এই সমস্যার সমাধান দিতে পারে। পাখিরা হেঁটে অধিমহাদেশের বিভিন্ন অংশে গিয়েছিলো এবং সেখানেই থেকে গেছে। সেখানে এদের বিভিন্ন গঠনে বিবর্তন ঘটেছে। বিবর্তিত সে সব পাখি আজ আমরা দেখতে পাই। ইতোমধ্যে অধিমহাদেশ নানা অংশে বিভক্ত হয়ে আলাদা হয়ে গেছে।

মাছিরা এই বক্তব্যের পক্ষে সমর্থন যোগায়। পরজীবী পতঙ্গরা পোষক প্রাণীর সাথে নানা অঞ্চলে ভ্রমণ করেছে এবং দ্রুত নূতন প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়ে নূতন পোষকে আশ্রয় নিয়েছে। অতি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরিবারের মাছিদের কেবল অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। এটা বোধগম্য নয় যে, ওদের পোষকরা যদি ওদেরকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে দিয়ে বয়ে নিয়ে যায় সেখানে ওদের পাওয়া না যাওয়ার কারণ কি? এমনও হতে পারে তাদের নিকট আত্মীয়দের অন্যান্য লোমশ প্রাণীদের মধ্যে ওরা যাবার সময় ফেলে যায় নি।

উদ্ভিদ থেকে এ বিষয়ে প্রমাণ মিলে। দক্ষিণাংশীয় বিচ বৃক্ষ ও ইউরোপীয় বিচ বৃক্ষের বেশ পার্থক্য রয়েছে তবে এরা পরস্পর সম্পর্কিত। বিচ অরণ্য নির্মাণকারী বৃক্ষ। দক্ষিণাংশীয় বিচ বৃক্ষ কেবল দক্ষিণ গোলার্ধেই বিস্তৃতি লাভ করে। এই বিতরণের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা সহজ। দক্ষিণাংশীয় বড় ভূখণ্ড শেষ পর্যন্ত ভেঙে যেতে শুরু করে। আফ্রিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরে সরে যায়। অস্ট্রেলিয়া ও কুমেরু পরস্পর সংলগ্ন থাকে এবং স্থলসেতু বা দ্বীপপুঞ্জের

মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকার শীর্ষের সাথে যুক্ত থাকে। এ সময় মনে হয়, আদি স্তন্যপায়ী উৎস থেকে মারসুপিয়ালদের উদ্ভব ঘটছিলো। যদি এটি দক্ষিণ আমেরিকায় ঘটে থাকে, কয়েকটি প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, অস্ট্রেলিয়া–কুমেরু ব্লক ছাড়িয়েও এদের বিস্তৃতি ঘটে।

ইতোমধ্যে, আদি স্তন্যপায়ীদেরও উদ্ভব ঘটছিলো উত্তরাংশীয় অধিমহাদেশে এরা ভিন্ন উপায়ে বাচ্চা ভরণপোষণের ব্যবস্থা বিকাশ ঘটিয়েছে। শাবক থলেতে একবারে প্রাথমিক পর্যায়ের শাবক না রেখে ওরা শাবককে দেহের অভ্যন্তরে ফুলকায় রেখে বড়ো করে। ফুলকায় শাবক ধারণ একটি নূতন কৌশল। এ বিষয়ে আমরা পরে জানতে পারবো। এই মুহূর্তে এটি জানাই যথেষ্ট যে এই ভিন্ন শাখার স্তন্যপায়ীদের অস্তিত্ব আজো আছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় মারসুপিয়ালদের প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে ততোদিন পর্যন্ত যতোদিন মহাদেশটি এককভাবে ওদেরই বিচরণক্ষেত্র ছিলো। এ সময় নেকড়ে ও সিংহের মতো মাংসাশী প্রাণীর মতো প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। ওদের খড়্গ বা তলোয়ারের মতো দাঁত ছিলো। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলীয় অধিমহাদেশের খণ্ডাংশগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে চলেছিলো এবং দক্ষিণ আমেরিকা ধীরে উত্তরমুখী সরে যাচ্ছিলো। ক্রমে এটি পানামার পার্শ্ববর্তী স্থলসেতুর মাধ্যমে উত্তর আমেরিকার সাথে যুক্ত হয়। এই স্থলভাগ দিয়ে ফুলকাধারী স্তন্যপায়ীরা দক্ষিণ আমেরিকায় আসে এবং এখানকার আদি বাসিন্দা মারসুপিয়ালদের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলার পর্যায়ে মারসুপিয়ালদের বহু প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেবল সুবিধাবাদী ও সহনশীল ওপোসামরা টিকে যায়। এদের কেউ কেউ আক্রমণকারীর রাজত্বেও হানা দেয় এবং সেখানে কলোনি স্থাপন করে। উত্তর আমেরিকার ভার্জিনিয়া ওপোসাম আজো সেখানে বহাল তবিয়তে রয়েছে।

অধিমহাদেশের দাক্ষিণাংশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যে সকল মারসুপিয়াল ছিলো তারা কেউ বেঁচে থাকতে পারেনি। অধিমহাদেশের বিশাল অংশ কুমেরুতে পরিণত হয়। এটি দক্ষিণ মেরুতে ভেসে যায়। এখানে এ সময় ভীষণ ঠাণ্ডা ছিলো। এতো ঠাণ্ডা যে বিশাল বিশাল বরফের চাঁই গঠিত হয় এবং জীবনধারণের পরিবেশ বিনষ্ট হয়। অধিমহাদেশের তৃতীয় অংশের প্রাণীরা ছিলো অধিক ভাগ্যবান। এই অংশটি হলো অস্ট্রেলিয়া। এটি উত্তরে ও পূর্বে ভেসে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের অববাহিকায় আসে এবং অন্য মহাদেশ থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন থাকে। কাজেই এখানকার মারসুপিয়ালরা বিগত ৫ কোটি বছর ধরে বিচ্ছিন্ন থেকে বিবর্তিত হয়েছে।

এই বিশাল সময়ে এদের মধ্যে বিভিন্ন টাইপের বহু ধরনের মারসুপিয়ালের সৃষ্টি হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপক পরিবেশের সুযোগ ভোগ করতে গিয়ে ওদের মধ্যে এরকম ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। আপনি অ্যাডেল্যাডের ২৫০ কিলোমিটার দূরে ন্যার‍্যাকূর্টে গুহার চুনাপাথরে এক সময়ের দর্শনীয় প্রজাতির প্রাণীর দেহাবশেষ দেখতে পাবেন। এই গুহাগুলো চুনদণ্ডের সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। গুহার ছাদ থেকে বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে পড়ন্ত চুন এই দণ্ড সৃষ্টি করে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে প্রধান গুহার একেবারে শেষ প্রান্তে উপলখণ্ডের ফাঁক দিয়ে আসা একটু মৃদুগন্ধবাহী বাতাস অনুভব করা গেলো। এতে ইঙ্গিত পাওয়া গেলো যে এর পেছনেও কোনো অজানা গুহা থাকা সম্ভব। খনন করে একটা সরুপথ পাওয়া যায়। পথ অনুসরণ করে মারসুপিয়াল জীবাশ্মের সবচেয়ে বড় সংগ্রহের সমাবেশ আবিষ্কৃত হলো।

এক ঘন্টা হামাগুঁড়ি দেওয়ার পর কঠিন শিলার মধ্যে দিয়ে কৃমির মতো পেঁচিয়ে মুচড়ে আপনি আরো সরু ঘুরপথে এসে দুটো নিচু গ্যালারি দেখতে পাবেন। এরপরও পেটে ভর রেখে ইঞ্চি-ইঞ্চি এগিয়ে সরু সুড়ঙ্গপথ হয়ে ওখানে পৌছাবেন। গ্যালারি এক মিটার উচুঁ এবং এর ছাদ ঝুলে আছে চুনদণ্ডে ভর করে। বাতাসে আর্দ্রতা খুব বেশি। আপনার নিঃশ্বাস কুয়াশায় পরিণত হবার উপক্রম হবে। ৫/৬ জন একত্রে নিঃশ্বাস ছাড়লে পুরো গ্যালারি ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে। গুহার মেঝে লাল নরম তলানিতে ঢাকা। বহু পূর্বে বিলুপ্ত অন্তঃসলিলা নদীর বন্যায় এই তলানি পড়েছিলো। কাদার সাথে এসেছিলো মারসুপিয়ালের হাড়। এদের কতকগুলো উপরের গুহার বাসিন্দা ছিলো। অন্যগুলো চারপাশের অরণ্য থেকে হঠাৎ কোনো কারণে গুহাদ্বারের পাশে অগভীর গর্তে পড়ে গিয়েছিলো মনে হয়। কাদার মধ্যে অনেক হাড় জড়ো হয়ে আছে। হাড়ের মধ্যে রয়েছে পা, স্কন্ধদেশের অংসফলক, দাঁত ও করোটি ইত্যাদির হাড়। সবচেয়ে বিস্ময়কর করোটির হাড় পাওয়া। শারীরবিদের ল্যাবরেটরি থেকে পরিষ্কার করে সদ্য আনা হাড়ের মতোই এগুলোর রঙ ফ্যাকাশে ক্রিম বা ফ্যাকাশে সাদা। এগুলো এতো ভঙ্গুর যে সামান্য স্পর্শে ভেঙে যায়। ফোম ও প্লাস্টারের আবরণে যদি তোলা যায় তাহলেই অক্ষত হাড় পাওয়া সম্ভব।

এমন মারসুপিয়ালের দেহাবশেষ এখানে রয়েছে যেটি আকার ও আকৃতিতে গণ্ডারের সমতুল্য। বিশাল ক্যাঙ্গারুর দেহাবশেষ পাওয়া গেছে যার গলা ছোট জিরাফের গলার মতো লম্বা। এই গলার সাহায্যে ওরা গাছের পাতা ছিঁড়ে খেতো। একটা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে। পূর্বে ভাবা হয়েছিলো যে এটি মাংসাশী প্রাণী। কারণ এর চোয়ালের পেছনের দাঁতগুলো লম্বা কাঠির মতো। সম্ভবত এই দাঁত দিয়ে শিকারের দেহ টুকরো টুকরো করে খণ্ড করতো। এর আকারের জন্য নাম দেওয়া হয়েছিলো মারসুপিয়াল সিংহ। এটির সামনের পা জোড়া গবেষণা করে সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, এই পা গাছে ঝুলে থাকার উপযোগী ছিলো। কাজেই এটি বৃক্ষ আরোহী ছিলো এবং এর ভয় উদ্রেককর দাঁত দিয়ে কেবল শক্ত ফল কাটা হতো।

এই প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছিলো ৪০,০০০ বছর আগে। এরা শেষ পর্যন্ত কি কারণে বিলুপ্ত হলো তা আজো জানা যায় নি। হতে পারে যে পরিবর্তিত আবহাওয়ার দরুণ এরা টিকে থাকতে পারেনি। কুমেরু থেকে অস্ট্রেলিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরমুখী ভাসতে থাকে। আসলে এখনো অস্ট্রেলিয়া ভেসে চলেছে এবং সরার গতি বর্তমানে বেশি। বছরে প্রায় ৫ সেন্টিমিটার সরে আসাতে ক্রমে আবহাওয়ায় উষ্ণতা ও শুষ্কতা বাড়ছে।

অবশ্য এখনো অনেক মারসুপিয়াল টিকে আছে। এখনো প্রায় প্রধান বার পরিবারে দুইশত প্রজাতির মারসুপিয়াল আছে। দক্ষিণ গোলার্ধের ফুলকাধারী প্রাণীদের সাথে অনেক মারসুপিয়ালের হুবহু মিল আছে। ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীরা অস্ট্রেলিয়াতে উপনিবেশ স্থাপনে এসে ইউরোপীয় প্রাণীদের সাথে যাদের মিল আছে তাদেরকে ইউরোপীয় প্রাণীর নামেই নামাকরণ করে। দক্ষিণের উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যের একটি প্রাণীর নামাকরণের উদাহরণ এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কালোনি স্থাপনকারীরা ছোট লোমশ, সুচালো দীর্ঘ নাসা প্রাণী দেখে নাম দিলো মারসুপিয়াল ইঁদুর। নামটি যথাযথ হলো না কারণ এটি ইঁদুর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী নয়। এরা শস্যদানা কুড়িয়ে খায় না। বরং এ প্রাণীটি বর্বর শিকারী। এদের দেহের আকারের সমান পোকামাকড়ের উপর বসে এদেরকে চিবিয়ে গুড়ো করে ফেলে।

অস্ট্রেলিয়ায় মাংসাশী মারসুপিয়াল আছে যারা সরীসৃপের ও পাখির ছানার সাথে টেক্কা দেয় এবং ধরে খায়। এদের নাম মারসুপিয়াল বিড়াল। কিছুদিন আগেও মারসুপিয়াল নেকড়ে ছিলো। নাম থাইল্যাসিন। এটি খুব দক্ষ শিকারী ছিলো। অস্ট্রেলিয়ায় নূতন পোষা ভেড়া শিকার করতো ওরা, ফলে চাষাদের হাতে ওরা মারা পড়তো। শেষ পর্যন্ত এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সর্বশেষ জীবিত প্রাণীটি ১৯৩৩ সালে লন্ডন চিড়িয়াখানায় মারা যায়। কিন্তু এখনো তাসমেনিয়ার সুদূরবর্তী অঞ্চলে কয়েকটার বেচেঁ থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দুটো ক্ষেত্রে ফুলকাধারী ও মারসুপিয়াল বা শাবক থলেধারী প্রাণীদের মিল এতোই কাছাকাছি যে, চিড়িয়াখানায় আপনি যদি ওদেরকে পাশাপাশি দেখতে পান, তাহলে আপনি হাতে ধরে ভালো করে না দেখা পর্যন্ত আপনার পক্ষে ওদের শনাক্ত করা অসম্ভব হবে। সুপার গ্লাইডার নামক মারসুপিয়াল ইউক্যালিপটাস গাছে বাস করে। এরা পাতা ও ফুল খায়। এদের সামনের ও পেছনের পায়ের আঙ্গুলে দেহের বর্ধিত চামড়া প্যারাসুটের মতো ওদেরকে শাখা থেকে শাখায় গড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। অনেকটা দক্ষিণ আমেরিকার উড়ন্ত কাঠবিড়ালীর মতো ; খননকারী প্রাণীদের দেহের গঠনে বিশেষত্ব থাকে। মারসুপিয়াল ও ফুলকাধারী প্রাণীদের মধ্যে সেরকম বিশেষ অঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। ফুলকা ও শাবকথলেধারী ছুঁচোদের দেহে খাট রেশমি লোম, প্রায় বিলুপ্ত চোখ, খুব ছোট লেজ ও শক্তিশালী খনক পুরোপদ রয়েছে। স্ত্রী শাবকথলেধারী ছুঁচোর অবশ্য শাবকথলে থাকে। ওদের শাবকদের ভাগ্য ভালো। কারণ থলের মুখ পেছন দিকে খোলা। নয়তো সুড়ঙ্গ খননের সময় থলে মাটিতে ভরে যেতো।

সকল শাবকথলেধারী বা মারসুপিয়াল ফুলকাধারীদের সমতুল্য নয়। কোয়ালা মাঝারি আকারের প্রাণী। এরা গাছে বাস করে ও গাছের পাতা খায়। বানরের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। কিন্তু কোয়ালা দেখতে বানরের মতো নয়, এরা ধীরগতিসম্পন্ন ও কষ্ট করে থপ থপ করে চলে। এদের সাথে বানরের তুলনা চলে না। বানর বুদ্ধিমান ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। নামব্যাট পিপঁড়াভুক প্রাণী। সকল পিপঁড়াভুক প্রাণীর মতো নামব্যাটের জিহ্বা আঠালো ও লম্বা। তবে অন্যগুলোর মতো এর জিহ্বায় চরম অভিযোজন সম্পন্ন হয়নি। যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল পিপঁড়াভুকের তুণ্ডে দীর্ঘ বাঁকা নলের সৃষ্টি হয়েছে এবং এর সকল দাঁত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নামব্যাটের চোয়াল এতো দীর্ঘ হয়নি এবং এতে এখনো দাঁত রয়েছে। হানি ওপোসাম নামের মারসুপিয়ালের সাথে কোনো ফুলকাধারী প্রাণীর একেবারেই মিল নেই। এটি আকারে ইদুঁরের মতো। চোয়াল সুচালো। এর জিহ্বার আগা বুরুশের মতো। এরকম জিহ্বা দেখা যায় প্যার‍্যাকিট-এ। এই জিহ্বা দিয়ে ওরা ফুল থেকে মধু ও রেণু লেহন করে।

বুডি নামের প্রাণী তাসমেনিয়ার উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যে বাস করে। প্রাণীটি অসাধারণ এবং যে কোনো অর্থে অস্ট্রেলীয়। এটি র‍্যাট-ক্যাঙ্গারু বা ইদুঁর ক্যাঙ্গারু দলের সদস্য। মারসুপিয়ালদের এই দলটি ছোট। এরা খুব লাজুক। একেবারেই নিশাচর। মাংসসহ সব ধরনের খাবার যায়। এক জোড়া সুচালো ছোট দাঁত খাওয়ায় সাহায্য করে। মুখ দিয়ে এরা কিছু খড় টোকায় ও মাটির উপর জড়ো করে। পরে এসবকে পেছনের পা দিয়ে ঠেলে লেজের উপর তুলে লেজ বাঁকিয়ে খড়গুলোকে শক্ত করে ধরে যাতে বস্তাবন্দী থাকে ও না পড়ে। এরপর বুডি সরে যায়। এ জন্যে একে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হয়। বুডি সম্পূর্ণ পেছনের পায়ে ভর কর চলে। পেছনের পা খুব লম্বা। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত প্রাণী ক্যাঙ্গারুর মতো

কোনো প্রাণীকে যদি ক্যাঙ্গারুর পূর্ব-পুরুষ হিসাবে দাঁড় করাতে হয় তাহলে লাজুক, অরণ্যচারী, সর্বভুক, লাফ দিয়ে চলা বুড়িকে কল্পনা করা যেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের ক্রমাগত উত্তরে ভেসে চলা এবং এর ফলে এখানে শুষ্কতা ও উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে ক্যাঙ্গারুর ত্বরিৎ বিকাশ সম্ভব হয়েছে। একই কারণে অস্ট্রেলিয়া বিস্তীর্ণ, ঘন শ্যামলী নিসর্গ হারিয়ে পাতলা অরণ্যে পর্যবসিত হয়েছে এবং এর স্থলে বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তর ও তৃণভূমি সৃষ্টি হয়েছে। ঘাস খাদ্য হিসাবে উত্তম। কিন্তু অরণ্যের বাইরে গিয়ে মুক্ত প্রান্তরে বিচরণ বিপজ্জনক। এসময় এরা শিকারী প্রাণীর গ্রাস হতে পারে। কাজেই তৃণভুক যে সকল প্রাণী তৃণভূমিতে বসতিস্থাপন করেছে তাদেরকে অবশ্যই দ্রুত দৌড়ানোয় সক্ষম হওয়া চাই। ক্যাঙ্গারু ছোটায় দ্রুতি অর্জন করেছে।। বলা যায় দৌড়ানোর এই পদ্ধতি বুড়ির পদ্ধতির সমৃদ্ধ সংস্করণ। এর অবিশ্বাস্যভাবে লাফিয়ে চলতে পারে।

ক্যাঙ্গারু পৃথিবীর সমভূমিতে বিচরণকারী অন্যান্য নিরামিষাশী প্রাণীর মতো চারপায়ে না দৌড়িয়ে কোনো যে লাফিয়ে চলে তা কেউ জানে না। বুড়ির মতো এর পূর্বপুরুষদের খাঁড়া হয়ে চলার প্রবণতা একে হয়তো প্রভাবিত করেছে। তবে এই উত্তর যথার্থ নয় এবং সেসঙ্গে অন্য প্রশ্নের জন্ম দেয়। শাবকথলেতে বড়ো আকারের শাবক নিয়ে চলার সমস্যা থেকে লাফানো হয়তো অনেক আরামদায়ক মনে হয়েছে। বিশেষ করে যখন অমসৃণ, শিলাময় ভূমিতে দ্রুত দৌড়ানোর সময় খাড়া থেকে লাফিয়ে চলাই বেশি সুবিধের। কারণ যাই হোক, লাফিয়ে চলার ক্ষেত্রে ক্যাঙ্গারু চূড়ান্ত উৎকর্ষ অর্জন করেছে। এদের পেছনের পা ভয়ানক শক্তিশালী। দীর্ঘ পেশল লেজ পেছনে শক্ত হয়ে থেকে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। এরা ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার যেতে পারে এবং তিন মিটার উচুঁ বেড়া ডিঙাতে পারে।

তৃণভোজীদের দ্বিতীয় সমস্যা ছিলো দাঁত ক্ষয়। ঘাস শক্ত। বিশেষ করে বর্তমানে মধ্য অস্ট্রেলিয়ার গরম ও শুষ্ক মাটিতে যে ঘাস জন্মায় তা বেশ শক্ত। মুখে ঘাস ছিঁড়ে চিবিয়ে মণ্ড করা হজমের জন্য খুবই দরকারী। কিন্তু এটি দাঁতের জন্য খুব ক্ষতিকর। অন্যান্য অঞ্চলের তৃণভোজীদের পেষণদন্ত রয়েছে যার গোড়া থাকে উন্মুক্ত। সারাজীবন পেষণদন্ত বৃদ্ধির মাধ্যমে দাঁতের ক্ষয়পূরণ হয়। ক্যাঙ্গারুর দাঁতের এই ক্ষমতা নেই। এদের দাঁতের গোড়া উন্মুক্ত নয়। কাজেই ওরা দাঁত পুনঃস্থাপনের মতো অন্য ধরনের ব্যবস্থা নেয়। চোয়ালের দুই পাশে চার জোড়া গণ্ডাস্থি থাকে। কেবল সামনের জোড়া সক্রিয় থাকে। যখন এটির গোড়া পর্যন্ত ক্ষয়ে যায়, দাঁত জোড়া পড়ে যায়। এর ঠিক পেছনের জোড়া সরে এসে তখন এই খালিস্থান পূর্ণ করে। ইত্যবসরে প্রাণীটির পরমায়ু হয় পনের বা বিশ। তখন এর শেষ পেষণদন্ত সক্রিয় থাকে। শেষ পর্যন্ত, শেষ জোড়াও ক্ষয়ে পড়ে যায়। অন্য কোনো কারণে ক্যাঙ্গারুর মৃত্যু না ঘটলেও, উপোস থেকে অর্থাৎ খাদ্য খেতে না পেরে ওদের মৃত্যু ঘটে।

ক্যাঙ্গারু পরিবারে ৪০টি প্রজাতি রয়েছে। ক্ষুদ্রতমটির নাম ওয়ালাবি। সবচেয়ে বড়টি রেড বা লাল ক্যাঙ্গারু। এটি দাঁড়ালে মানুষের চেয়ে উচুঁ দেখায় এবং সকল মারসুপিয়ালের চেয়ে এটি বড়।

ক্যাঙ্গারু ওপোসামের মতো প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে। ডিম খোলকের অবশেষের মধ্যে থাকে। খোলক কয়েক মাইক্রন পুরু এবং তাতে অল্প পরিমাণ কুসুম থাকে। ডিম্বাশয় থেকে ডিম জরায়ুতে নেমে আসে। জরায়ুতে ডিম মুক্তভাবে থাকে। নিষিক্ত হয় এবং বিকাশ ঘটে। স্ত্রী ক্যাঙ্গারু যদি প্রথমবারের মতো সঙ্গমে রত হয় তাহলে ডিম জরায়ুতে বেশিক্ষণ থাকে

না। লাল ক্যাঙ্গারুতে মাত্র ৩৩দিন পর নিওনেট বেরিয়ে আসে। সাধারণত একবারে একটি নিওনেট জন্ম নেয়। এটি অন্ধ, লোমহীন। দেখতে কীটের মতো। মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার দীর্ঘ। এর পেছনের পা দেখতে ফুলের কুঁড়ির মতো। সামনের পা জোড়া তুলনামূলভাবে বেশ বিকশিত। সামনের পা দিয়ে মায়ের উদরের লোমে এঁকেবেঁকে চলে। একসময় ভাবা হতো যে, মা লোম লেহন করে সন্তানের গমন পথ করে দেয়, কিন্তু এখন জানা গেছে যে, যখন সে তার উদর চাটে তখন সে নিজেকে পরিষ্কার করে। বিশেষ করে ডিমের পর্দা ছিড়ে যেসব তরল পদার্থ অবসারণী হয়ে গায়ে লাগে তা পরিষ্কার করে।

নিওনেট তিন মিনিটের মধ্যে শাবকথলেতে গমন করে। সেখানে যাওয়া মাত্র চারটি স্তনের বোঁটার যে কোনোটি মুখে নিয়ে চুষতে শুরু করে দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মায়ের যৌনচক্র পুনরায় শুরু হয়। আরেকটি ডিম জরায়ুতে নেমে আসে এবং ডিম নিষেকের জন্য প্রস্তুতি নেয়। সে সঙ্গমে মিলিত হয় এবং ডিমের নিষেক সম্পন্ন হয়। তখন একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটে। নিষিক্ত ডিমের বিকাশ বন্ধ থাকে।

ইতোমধ্যে থলের মধ্যে নিওনেটের বৃদ্ধি ঘটে অস্বাভাবিকভাবে। স্তনের বোঁটা দীর্ঘ এবং এর শেষপ্রান্ত একটু স্ফীত। যদি স্তনের বোঁটায় অসতর্কভাবে টান পড়ে নিওনেটের মুখ ছিড়ে গিয়ে একটু রক্তপাত হতে পারে। মা ও শিশু গায়ে গায়ে লেগে যায় বা চাপের ফলে মায়ের স্তন থেকে শাবকের মুখে দুধের প্রবাহ হয় বলে যে গল্প আছে তার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই।

১৯০ দিন পর শাবক যথেষ্ট বড় হয় এবং স্বাধীনভাবে বাইরে চলার উপযুক্ত হয়। এরপর থেকে ক্রমে থলের বাইরে থাকার সময় বাড়ে। ২৩৫ দিন পর শেষবারের মতো থলে পরিত্যাগ করে।

এ সময়ে যদি খরা নামে জরায়ুর নিষিক্ত ডিম তখনো সুপ্তাবস্থায় থাকে। মধ্য অস্ট্রেলিয়ায় প্রায়ই খরা হয়। যদি বৃষ্টি হয় ও চারণভূমি লতাগুল্মে ভরে উঠে, ডিমের বিকাশ পুনরায় শুরু হয়। ৩৩ দিন পর আরেকটি সীমের দানার মতো নিওনেট মায়ের অবসারণী দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে আসে এবং অনেক কষ্টে ও ঝুঁকি নিয়ে থলেতে পৌঁছায়। স্ত্রী আবার সঙ্গমে রত হয়। কিন্তু প্রথম সন্তান সহজে স্তনদুগ্ধ পানের অধিকার ছাড়ে না। সে নিয়মিত ফিরে এসে তার পূর্বে চোষা বোঁটা থেকে দুধ পান করে। আরো কথা আছে। এখন যে দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে এর সাথে প্রথম সরবরাহ করা দুধে পার্থক্য রয়েছে। শেষেরটির মিশ্রণ ভিন্ন। কাজেই মায়ের উপর তিন পর্যায়ের শিশু নির্ভরশীল। একটি কর্মঠ শিশু। সে পায়ে ভর করে চলে এবং মাঠে বিচরণ করে ও ঘাস খায়। কিন্তু ফিরে এসে মায়ের স্তন চুষে। দ্বিতীয়টি ছোট নিওনেট। থলেতে দুধ চুষে এবং তৃতীয়, নিষিক্ত তবে বিকাশমান ডিম যা জরায়ুতে প্রসবের অপেক্ষায় দিন গুজরান করে।

সাধারণের ধারণা মারসুপিয়ালরা সেকেলে প্রাণী। সবেমাত্র আদি ডিমপাড়া একিডনা ও প্ল্যাটিপাস থেকে একটু উন্নত হয়েছে। এটি সত্যের অপলাপ মাত্র। মারসুপিয়ালের প্রজনন পদ্ধতি স্তন্যপায়ীর ইতিহাসে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে খুব গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিলো। কিন্তু ক্যাঙ্গারু একে চমৎকারভাবে পরিমার্জিত করেছে। স্ত্রী ক্যাঙ্গারুর সাথে পৃথিবীর কোনো প্রাণীর তুলনা করা যায় না। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ক্যাঙ্গারু বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের তিনটি শাবককে একসাথে ধারণ করে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ জটিল যন্ত্রবিশেষ। এর বিকাশে সময় লাগে বেশি। ভ্রূণ অবস্থায়ও এটি উষ্ণশোণিত প্রাণী এবং দ্রুত খাবার পুড়িয়েই শক্তি নিঃশেষ করে। দুটো বৈশিষ্ট্যেরই দাবী

হলো বিকাশমান শাবকের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা। সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী ডিমের খোলকের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত থাকে ভ্রূণের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি খাদ্যের ব্যবস্থা করার উপায় বের করেছে। উত্তরাংশীয় অধিমহাদেশের আদি স্তন্যপায়ী প্রাণীরা মারসুপিয়াল স্তরের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হতো কিনা তা আমাদের জানা নেই। এরা স্তন্যপায়ীসদৃশ সরীসৃপ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এই সরীসৃপদের কখনো শাবকথলে ছিলো না। নিশ্চিতভাবে এদের পূর্বপুরুষরা আজকের অস্ট্রেলীয় মারসুপিয়ালের মতো এমন উৎকর্ষমণ্ডিত ফলপ্রসূ পদ্ধতি উদ্ভাবিত করেছিলো বলে অনুমান করা অসঙ্গত। কিন্তু উত্তরাংশীয় ফুলকাধারীরা তাদের স্বীয় সুবিধার জন্য ফুলকা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

ফুলকা ভ্রূণকে দীর্ঘ সময় ধরে জরায়ুর মধ্যে রাখে। এটি চ্যাপ্টা থালার মতো এবং জরায়ু প্রাচীর সংলগ্ন। ফুলকা নাভিরজ্জুর দ্বারা ভ্রূণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। জরায়ু প্রাচীরের সঙ্গে মিলনস্থলটি ভাঁজযুক্ত। কাজেই ফুলকা ও মাতৃকলার মধ্যে জায়গা অনেক বড়ো হয়। এই জায়গা দিয়েই মা ও ভ্রূণের মধ্যে আদান-প্রদান হয়। মায়ের দেহ থেকে রক্ত সরাসরি ভ্রূণে প্রবেশ করে না। কিন্তু মায়ের রক্তে তার ফুসফুস থেকে গৃহীত অক্সিজেন ও খাদ্য থেকে আহরিত পুষ্টিবিশিষ্ট হয় এবং তা ফুলকা ও মাতৃকলার মিলনস্থল দিয়ে ব্যাপিত হয়ে ভ্রূণের রক্তে প্রবিষ্ট হয়। এর উল্টোটাও হয়। ভ্রূণ উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থ ভ্রূণ থেকে মায়ের রক্তে ব্যাপিত হয়। মা তার বৃক্কের মাধমে ভ্রূণের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে।

এগুলো বড়ো ধরনের জৈব-রাসায়নিক জটিল কর্মকাণ্ড। এ ছাড়া আরো ব্যাপার আছে। স্তন্যপায়ীর যৌনচক্র নিয়মিত নূতন ডিম উৎপাদন করে। এটি মারসুপিয়ালের জন্য কোনো সমস্যা নয়। কারণ প্রতিটি প্রজাতিতে পরবর্তী ডিম উৎপাদনের সময় হলে নিওনেট প্রসারিত হয়। ফুলকার ভ্রূণ অবশ্য দীর্ঘ সময় জরায়ুতে অবস্থান করে। কাজেই ফুলকা একটি হরমোন নিঃসরণ করে। এই হরমোন যতোক্ষণ ফুলকা জরায়ুতে থাকে ততক্ষণ যৌনচক্র স্থগিত করে রাখে। ফলে ভ্রূণের সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো কোনো ডিম উৎপাদিত হয় না।

এখানে অন্য একটি সমস্যা আছে। বংশগতি বিচারে মা ও ভ্রূণের কোষকলা এক নয়। কোষকলা পিতা থেকেও উপাদান পায়। যখন ভ্রূণ মায়ের দেহের সাথে যুক্ত হয়। এক দেহ থেকে অপসৃত করে অন্যদেহে সংযোজনের মতো এখনে ভ্রূণ বিমুক্তির ঝুঁকি থাকে। ফুলকা কিভাবে এরকম হওয়াকে রোধ করে তা আমাদের বিশদ জানা নেই। তবে মনে হয় অন্য হরমোন বস্তু উৎপাদনের মাধ্যমে এ সমস্যাকে সামাল দেয়।

সুতরাং এসব উপায়ের সাহায্যে ফুলকাধারী স্তন্যপায়ীর শিশুরা, প্রয়োজনে জন্মের সাথে সাথে পূর্ণোদ্যমে চলাফেরা করার জন্যে ভালোভাবে বিকশিত হওয়া পর্যন্ত জরায়ুতে থাকতে পারে। এর পরও, আরো কিছু সময় তাদেরকে দুধ সরবরাহ করা হয়, যতোক্ষণ না চারপাশ থেকে ওরা নিজেদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারে।

মারসুপিয়াল শিশুকে জীবনের একেবারে শুরুতেই যে কষ্ট পোহাতে হয়। ফুলকা-প্রজনন পদ্ধতি শিশুকে মায়ের দেহের বাইরে সেই কষ্টকর অভিযান থেকে রেহাই দিয়েছে, শুধু তাই নয়, ফুলকাধারী মা দীর্ঘদিন ধরে শিশু যতোদিন তার দেহের ভিতরে থাকে ততোদিন শিশুর সকল চাহিদা পূরণ করে। এ কারণে তিমি ও সীল জরায়ুতে বাচ্চা রেখে সাঁতার কাটতে পারে। এমনকি ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া সমুদ্রেও মাসের পর মাস সাঁতরাতে পারে। বায়ু শ্বসনকারী শিশুকে থলেতে রেখে কোনো মারসুপিয়াল মায়ের পক্ষে এরকমটি করা সম্ভব নয়। ফুলকা ধারণের এই কৌশল শেষ পর্যন্ত স্তন্যপায়ীর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। এই কৌশলই স্তন্যপায়ী প্রাণীকে সারা পৃথিবীতে বসতি স্থাপনে চূড়ান্ত সাফল্য এনে দিয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদ

অপরিবর্তিত ধারাবাহিকতা ও বিবিধায়ন

বোর্নিওর জঙ্গলে শান্ত, অনড় হয়ে বসে অপেক্ষা করুন। একটি ছোট, লোমশ, দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট প্রাণী দেখার চমৎকার সুযোগ পেতে পারেন। প্রাণীটি গাছের শাখায় বা মাটিতে চার পায়ে চলে। সুচালো নাক দিয়ে প্রতিটি জিনিসকে সে ঔৎসুক্যভরে পরীক্ষা করে। এটি দেখতে ও আচরণে মনে হবে কাঠবিড়ালী। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কোনো গোলমালে সে স্তব্ধ হয়ে বোতাম আকারের চকচকে চোখে সতর্কভাবে তাকায়। একইভাবে হঠাৎ সে নড়ে উঠে এবং পুনরায় চঞ্চল হয়। সামনে-পেছনে লেজ দুলিয়ে চলতে থাকে। যদি, কোনো খাদ্যবস্তু নজরে আসে, সম্মুখভাগের দাঁত দিয়ে সে ঠোকরিয়ে দেখার পরিবর্তে বিরাট হাঁ করে মুখে নিয়ে কচকচ করে জোরে জোরে চিবিয়ে পরমানন্দে খেতে থাকে। এ সময় আপনার মনে হবে, আপনি যা দেখছেন তা কাঠবিড়ালী ছাড়া অন্য কিছু। এই প্রাণীতে ব্যতিক্রমী আচরণ লক্ষণীয়। এই প্রাণীর অন্য গুরুত্ব রয়েছে। প্রাণীটি হলো টুপাইয়া।

সকল মানুষের মাথাব্যথার কারণ যদি কোনো জীব হয়ে থাকে, তা হলো এটি। বোর্নিওর স্থানীয় জনসাধারণ সঙ্গতকারণে, এটিকে কাঠবিড়ালী বলে জানে। তারা যে শব্দটি ব্যবহার করে তা হলো টুপাই। বিজ্ঞান এ ধরনের সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য শব্দটিকে গ্রহণ করেছে। প্রথম ইউরোপীয় বিজ্ঞানী যে নমুনাটি ধরেছিলেন বা যে প্রাণীটি সংগ্রহ করেছিলেন তার মুখে ইঁদুরের মতো চর্বণ দন্ত নেই এবং মুখে অনেকগুলো পেরেকের মতো দাঁত দেখতে পান। তিনি এর নাম দিলেন ট্রি শ্রু বা বৃক্ষ শ্রু। কেউ কেউ প্রজনন অঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এর সাথে মারসুপিয়ালের সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করে। অর্ধশত বছর আগে, এক বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ এর করোটি নিয়ে বিশদ গবেষণা করেন। তিনি লক্ষ করেন যে, এর রয়েছে বিস্ময়কর বড়ো ম্যাজ। তিনি যুক্তিসহকারে একে বানর ও নরবানরের পূর্বপুরুষ হিসাবে গণ্য করেন এবং এদের শ্রেণিভুক্ত করেন।

বিতর্ক এখনো শেষ হয়নি। সম্প্রতি বানরের পূর্বপুরুষ বলার চেয়ে একে শ্রু-দের মধ্যে গণ্য করার পাল্লা ভারী। তবে এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটার কারণে একে সেই প্রাচীন প্রাণী হিসাবে মেনে নেওয়ার সুপারিশ করা হয় যার থেকে সকল ফুলকাধারী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে। এদের অশ্মীভূত হাড় বিবেচনা করে নিশ্চিত বলা যায় যে, ডাইনোসরের আধিপত্যে থাকা অরণ্যে প্রথম যেসব স্তন্যপায়ী প্রাণী চঞ্চল পদবিক্ষেপে ছুটাছুটি করতো তাদের দেখতে অবশ্যই টুপাইয়ার মতো ছিলো। ওরাও ছিলো আকারে ছোট, লম্বা লেজবিশিষ্ট ও সুচালো নাকধারী। অনুমিত যে, ওরা লোমশ, উষ্ণশোণিত, কর্মঠ ও পতঙ্গভুক প্রাণী ছিলো।

সরীসৃপের রাজত্বের অবসান ঘটেছে অনেক আগে। এরা রাজত্ব করতো ২৫ কোটি বছর পূর্বে। এরা জঙ্গল লণ্ডভণ্ড করেছে এবং ডোবা ও জলাভূমির শ্যামলিমা ধ্বংস করেছে। মাংসাশী সরীসৃপ উদ্ভূত হয়ে উদ্ভিদভোজীদেরকে শিকার করেছে। অন্যান্য সরীসৃপ পচাগলা শব খেয়ে জীবনধারণ করেছে। প্লেসিওসর ও ইকথাইওসর মাছের সন্ধানে সমুদ্রে তোলপাড় তুলেছে এবং টেরোসর গড়িয়ে চলেছে বায়ুমণ্ডলে। পরে, ৬.৫ কোটি বছর আগে, এ ধরনের সকল প্রাণীর ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। এরা বিলুপ্তির গহব্বরে বিলীন হয়ে গেছে।

পৃথিবীর অরণ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হলো। কোনো বড়ো পশু নিসর্গ মাড়িয়ে গেলো না। ডাইনোসরদের প্রথম আবির্ভাবকালে, ঝোপঝাড়ে টুপাইয়ার মতো স্তন্যপায়ীরা তখনো পোকামাকড় শিকার করছিলো। শত হাজার বছরেও এ দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে কদাচিৎ। মানুষের সময় গোনার মাপে এ সময়কে অনন্ত মনে হতে পারে। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে এটি একটি ছোট মুহূর্ত মাত্র। বিবর্তনের ইতিহাসে এই মুহূর্তটি দ্রুত ও চোখ ধাঁধানো উদ্ভাবনে সমৃদ্ধ। কারণ এ সময় ছোট পিঁপড়াভক প্রাণীরা রাজত্বকারী সরীসৃপের বিলুপ্তিতে সৃষ্ট সকল শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে নূতন প্রজন্ম ও উত্তরসূরি সৃষ্টি করছিলো এবং বড়ো সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করছিলো।

আদি পতঙ্গভুক স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আজতক টুপাইয়াই টিকে আছে। অন্যান্যরা থাকলেও পৃথিবীর নানান অগম্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনেকেরই বিভ্রান্তিকর নামাকরণ হয়েছে। এতে বোঝা যায় এদের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ কতোটা বিভ্রান্ত। মালয়েশিয়ায় টুপাইয়ার পাশাপাশি, অমসৃণ দেহবিশিষ্ট মেজাজী প্রাণী রয়েছে যার লম্বা নাকে গোঁফের মতো কুর্চি থাকে, যার শরীর থেকে পচা রসুনের তীব্র ভোঁটকা দুর্গন্ধ বেরোয়। এটিকে কেউ তেমন একটা গণ্য করে না। এর নাম মুন র‍্যাট। আফ্রিকার সবচেয়ে বড়ো আকারের প্রাণীটির নাম এলিফ্যান্ট শ্রু বা হস্তী গন্ধমূষিক। যদিও একে ওটার শ্রু বা ভোঁদর গন্ধমূষিক বলা হয়, যেহেতু এটি সাঁতার কাটে। পুরো দলের সদস্যরা আকারে ইঁদুরের মতো। এরা লাফ দিয়ে চলে। এদের পা লম্বা এবং সহজে দোলানো যায় এমন দেহকাণ্ড। কিউবার প্রাণীটির নাম সোলেনাডন। ১৯০৯ সালের পর যদিও কেউ এদের একটিকেও দেখেনি। ওরা হয়তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্য একটি সোলেনোডন প্রজাতির বিস্তার ঘটেছে প্রতিবেশী দ্বীপ হাইতিতে। মাদাগাস্কারে একটি পুরো দল রয়েছে। এর কতকগুলোর দেহ ডোরাকাটা ও লোমশ, কতকগুলোর পিঠে রয়েছে কাঁটা। এদের নাম টেনরেকস।

সবগুলো কিন্তু বিরল নয় বা এদের বিতরণও সীমাবদ্ধ নয়। ইউরোপের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ বাসিন্দা হেজহগ বা কাঁটাচুয়াও একটি আদি পতঙ্গভুক এবং অন্যদের সঙ্গে সাদৃশ্যহীন। তবে সেক্ষেত্রে আমাদের মনের চোখ থেকে এর কাঁটার আবরণটাকে সরিয়ে দিতে হবে। এই কাঁটাগুলো রূপান্তরিত লোম বৈ অন্য কিছু নয় এবং এরা যে খাঁটি পূর্বসুরি এই বৈশিষ্ট্য তার সামান্য সংকেত মাত্র। সেখানে কাঁটাচুয়ার সঙ্গে গন্ধমূষিকও রয়েছে। পৃথিবীর বহু অংশে এরা বাস্তবিকই প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে। পত্রগুচ্ছ, ঝোপঝাড়ের সারি ও বৃক্ষ অধ্যুষিত বনানীর মধ্যে এদেরকে সমসময় উত্তেজিত অবস্থায় দেখা যায়। নাক থেকে লেজ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে আট সেন্টিমিটার হলেও এরা খুবই হিংস্র। যে কোনো ছোট প্রাণী সামনে পড়লে মোকাবেলা হবেই। দুটো মূষিক মুখোমুখি হলেও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। নিজেদের রক্ষার জন্য এদের প্রত্যহ বড়ো সংখ্যক কেঁচো ও পোকামাকড় খেতে হয়। এদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম

স্তন্যপায়ীটি হলো পিগমী শ্রু বা বামন মূষিক। এটি এতোই ক্ষুদ্র যে, এটি সুড়ঙ্গ খুঁড়লে তা পেন্সিলের বেশি কিছু ঢোকানো যাবে না। মূষিকরা তীক্ষ্ণ উচ্চগ্রামের চিঁহি চিঁহি ধ্বনির মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। এরা শব্দ-তরঙ্গে এমন গোলমাল তোলে যা মানুষের শ্রুতিসীমার বাইরে। ওদের দৃষ্টিশক্তি খুবই দুর্বল। এতে বোঝা যায়, তাদের সৃষ্ট ধ্বনি বা আল্ট্রা সাউন্ড প্রতিধ্বনিত হয়ে তাদের অবস্থানকে নির্দেশিত করে।

কতিপয় প্রজাতির মূষিক জলচর। উদ্দেশ্য, অমেরুদণ্ডী প্রাণী খেয়ে জীবনধারণ করা। ইউরোপে এদের দুটি নিকট আত্মীয় রয়েছে। একটির বাস রাশিয়ায়, অন্যটি কেবল পাইরেনীজ-এ। এর নাক দীর্ঘ ও নড়নক্ষম। সাঁতার কাঁটার সময় ও খাদ্যের সন্ধানে ব্যস্ত থাকার সময় এরা জলপৃষ্ঠের উপরে নাক উঁচিয়ে রাখে ও শ্বসন চালায়।

গন্ধমূষিক দল একটি ভিন্ন প্রাণী উৎপাদন করেছে যেটি কেবল মাটির নিচ থেকে শিকার করতে চায়। এটি হলো ছুঁচো। এদের দাঁড়ের আকৃতি পুরোপদ ও মজবুত স্কন্ধদেশ বিচার করলে, মনে হয় এদের পূর্বপুরুষরা ছিলো জলচর ছুঁচো। ছুঁচোও সুড়ঙ্গে চলাকালে সাঁতারে চলার মতো ভঙ্গি রপ্ত করেছে। ভূগর্ভে চলাচলের ক্ষেত্রে লোম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বলে ভাবা হয়, তবে অনেক ছুঁচো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বাস করে। এখানে দেহকে উষ্ণ রাখার জন্য লোমের প্রয়োজন। কাজেই লোম বেশ খাট এবং এর নির্দিষ্ট ধরন নেই। লোমকে যে কোনো দিকে ফেরানো যায়। ফলে ওরা আঁটসাঁট সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে দেহকে সামনে-পেছনে নিতে পারে। ভূগর্ভে দৃষ্টির মূল্য তুচ্ছ। যদিও কোনো আলো থাকে তা কাদায় ঢাকা পড়ে সহজে। চোখ এ কারণে আকারে বেশ খর্ব হয়ে গেছে। তবে এদের অবশ্যই শিকার খোঁজার কোনো একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাই, ট্রামগাড়িতে যেমন দুপাশে ইঞ্জিন থাকে এদেরও দেহের দুই প্রান্তে সংবেদী অঙ্গ থাকে। সম্মুখভাগে এর প্রধান সংবেদী অঙ্গ হলো নাক। নাক দিয়ে গন্ধ শোঁকে ও স্পর্শানুভব করে। নাকের উপরে বহু সংবেদী কুর্চি রয়েছে। দেহের পেছনে খাট লেজের স্মারক রয়েছে। এতেও সংবেদী কুর্চি থাকে। পেছনে কি ঘটছে তা এই কুর্চি জানিয়ে দেয়। আমেরিকার স্টার-নোসড্ মোল বা তারা-নাসা ছুঁচায় একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা আছে। তা হলো নাকের চারপাশে গোলাকৃতির মাংসল চমৎকার স্পর্শী। এই স্পর্শী সংকোচন-সম্প্রসারণে সক্ষম। এটি স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের মতো কাজ করতে পারে অথবা এটি বায়ুর রাসায়নিক পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে।

ছুঁচোর সুড়ঙ্গ কেবল গমনাগমনের পথ নয়, এটি ফাঁদও বটে। কেঁচো, গুবরে পোকা, পোকার শূককীট অজান্তে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ছুঁচোর সুড়ঙ্গের প্রাচীর ভেঙে হঠাৎ সুড়ঙ্গে পড়তে পারে। সদা চঞ্চল ছুঁচো ছুটোছুটি করে সুড়ঙ্গে। সুড়ঙ্গে যাই পড়ুক সঙ্গে সঙ্গে তা সংগ্রহে লেগে যায়। এরা সুড়ঙ্গের জাল সৃষ্টি করে এবং তিন চার ঘন্টার ব্যবধানে অন্তত একবার সুড়ঙ্গ পরিক্রম করে এবং প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ করে ও খায়। কখনো কখনো সংগ্রহের পরিমাণ এতো বেশি হয় যে, তৃপ্তি ভরে আহারের পরও উদ্বৃত্ত থাকে। উদ্বৃত্ত খাবার জড়ো করে ওরা প্রতিটি কীটে, পতঙ্গে দ্রুত একটি একটি কামড় বসিয়ে ওদেরকে অনড় করে দেয়। পরে এগুলো ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ারে জমা রাখে। অনেকগুলো ভাঁড়ার দেখা গেছে যেখানে হাজার হাজার পঙ্গু কীট রয়েছে।

মাত্র কয়েকটি পতঙ্গভুক প্রাণী প্রথমদিকে বিশেষ একটি খাদ্য গ্রহণে বিশেষত্ব অর্জন করে। খাদ্য হলো অমেরুদণ্ডী পিঁপড়া ও উই। এ কাজের জন্য বা এ ধরনের খাদ্য শিকারের জন্য যে অঙ্গটির বিশেষ ব্যবহার আবশ্যক তা হলো লম্বা, আঠালো জিহবা। পরস্পর অসম্পর্কিত অনেক প্রাণীতে বিশেষ করে যারা এই ধরনের খাবারে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যেও স্বতন্ত্রভাবে এরকম জিহ্বার বিকাশ ঘটেছে। অস্ট্রেলিয়ার পিঁপড়াভুক নামব্যাটের এ ধরনের জিহ্বা আছে। একাইডনারও রয়েছে। এমনকি পিঁপড়াভুক পাখি কাঠঠোকরা ও রিনেক পাখির জিহ্বাও লম্বা। জিহ্বা করোটির বিশেষ প্রকোষ্ঠে ঢোকানো থাকে। কোনো কোনো পাখিতে চোখের কোঠরের চারপাশেও জিহ্বাকে রাখার ব্যবস্থা থাকে। তবে আদি স্তন্যপায়ীতে জিহ্বার চূড়ান্ত বিকাশ সাধিত হয়েছে।

আফ্রিকা ও এশিয়ায় সাত প্রকারের প্যাঙ্গোলিন আছে। মাঝারি আকারের প্রাণীটি দৈর্ঘ্যে এক মিটার বা এর কিছু বেশি। খাট পা দীর্ঘ তুণ্ড। লেজ আঁকড়ে ধরায় সক্ষম। সবচেয়ে বড়ো প্যাঙ্গোলিনের জিহ্বাকে মুখের বাইরে ৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে পারে। যে খাপে জিহ্বাটিকে রাখা হয় তা বুকের কাছ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। আসলে এটি শ্রেণির সঙ্গে যুক্ত। প্যাঙ্গোলিনে দাঁত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নিচের চোয়াল হাড়ের দুটো ছিলকার মতো খাট। জিহ্বার পিচ্ছিল আঠালো পদার্থে আটকিয়ে সংগৃহীত পিঁপড়া ও উই গেলার পর তা পাকস্থলীর পেশি সঞ্চালনের দ্বারা চূর্ণীত হয়। পাকস্থলির পেশি খুব শক্ত। পাকস্থলিতে কখনো কখনো নুড়ি ঢোকানো হয়। নুড়ি চূর্ণনে সহায়ক।

শ্লথ গতির দাঁতহীন প্যাঙ্গোলিনের জন্য সুরক্ষা আবশ্যক। এদের দেহ শক্ত আঁইশে ঢাকা। এগুলোই তার শস্ত্র। ছাদে টালি বিছানোর মতো আঁইশগুলো দেহে সমন্বিত থাকে। সামান্য বিপদ দেখলেই প্যাঙ্গোলিন বুকে মুখ গুঁজে বলের আকার ধারণ করে। পেশল লেজ দিয়ে দেহের চারপাশ আঁটসাঁট ঘিরে ফেলে। আমার অভিজ্ঞতায়, প্যাঙ্গোলিন একবার গুটিয়ে গেলে, জোর করেও স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায় না। আপনি যদি এটি দেখতে কেমন চাক্ষুষ করতে চান তাহলে একে পরিত্যাগ করে সরে যান। সে সাহস সঞ্চয় করে মাথা তুলবে। তবে খুব হকচকিত ভাব থাকবে। এরপর সে গড়িয়ে চলবে।

আপনি ভাবতে পারেন যে এর জন্য সুরক্ষা দরকার। সুরক্ষা কেবল শিকারী থেকে নয়, তার খাদ্য পিঁপড়া ও উই থেকেও। এর দেহের নিচের অংশ আবরণহীন। এতে মাত্র গুটিকয় লোম থাকে। অরক্ষিত এই অংশ ওদের জন্য বিপজ্জনক। বিশেষ পেশি চোখ ও নাকের ছিদ্র বন্ধ করায় সাহায্য করে। কিন্তু অতি স্পর্শকাতর দেহের নিচের অংশে পোকামাকড়ের কামড়ের প্রতি এরা উদাসীন। বলা যায় যে, বরং পোকা-মাকড়কে ওরা স্বাগত জানায়। যেমন করে পাখি পিপঁড়াকে আক্রমণ করার জন্য আহবান করে। কারণ একই, প্যাঙ্গোলিন কখনো কখনো আঁশ তুলে পিঁপড়াকে শস্ত্রের মধ্যে চামড়ায় ঢুকতে দেয়। তবে চামড়া যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে সম্ভবত দৃষ্টি রাখে। এক মতে, এরা আঁইশ বন্ধ করে। ভিতরে পিঁপড়া থাকে। নদীতে নামে এবং সাঁতার কাটে। সাঁতার কাটার সময় পিঁপড়ারা ধুয়ে যায়। এভাবে সে দেহকে পরিষ্কার করে।

দক্ষিণ আমেরিকার নিজস্ব বিশেষ দলের পতঙ্গভুক রয়েছে। এরা প্রথমাবস্থা থেকে অন্যদের থেকে আলাদা। এদের পূর্বপুরুষ সে সব ফুলকাধারী স্তন্যপায়ীর সাথে ছিলো, তারা ৬.৩ কোটি বছর আগে, পানামা হয়ে উত্তর-আমেরিকা থেকে পরিযান করেছিলো এবং

মারসুপিয়ালদের সাথে মিশে গিয়েছিলো। অবশ্য, প্রথমদিকে উত্তর দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে এই স্থল সেতু দীর্ঘস্থায়ী ছিলো না। কয়েক কোটি বছর পর এটি জলমগ্ন হয়ে যায়। কাজেই আরেকবার মহাদেশ দুটি বিচ্ছিন্ন হয় এবং দুই মহাদেশে স্বতন্ত্রভাবে প্রাণিকুলের উদ্ভব ঘটে। শেষপর্যন্ত পুনঃসংযোগ স্থাপিত হয় এবং উত্তর থেকে দ্বিতীয়বারের মতো প্রাণীদের পরিযান ঘটে দক্ষিণে। ফলে সম্প্রতি উদ্ভূত দক্ষিণ আমেরিকার অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়।

তবে সব প্রাণী বিলুপ্ত হয়নি। টিকে থাকা প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রাণীর নাম আর্মাডিলো। প্যাঙ্গোলিনের মতো এরাও শস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত। স্পেনের ভাষায় শস্ত্রের নামেই ওদের নাম। এর স্কন্ধ ও শ্রোণির উপর দুটো বড়ো ঢাল থাকে এবং পৃষ্ঠদেশের মাঝ বরাবর অর্ধবলয় প্লেট থাকে। এগুলো ওদের দেহকে কিছুটা নমনীয় হতে সাহায্য করে।

আর্মাডিলো পোকামাকড়, অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী, শবদেহ ও যে কোনো ছোট প্রাণী খায়। ছোট প্রাণীর মধ্যে টিকটিকিও খায়। অবশ্য যদি পাকড়াও করতে পারে। এদের খাদ্য তালাশের আদর্শ পদ্ধতি হলো মাটি খনন। আর্মাডিলোর ঘ্রাণেন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ। ভূগর্ভে খাবারের গন্ধ শনাক্ত করতে পারলে এরা পাগলের মতো হঠাৎ মাটি খুঁড়তে শুরু করে। এদের পেছনে মাটির স্তূপ জমতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নাক ঢোকায়। ঘ্রাণের উৎস হারিয়ে যাবে বলে যেনো ওরা আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং যতদূর সম্ভব দ্রুত খাবার গ্রাসে পুরে। আপনি দেখে অবাক হবেন যে, ওরা কিভাবে শ্বসন চালায়। আসলে এ সময় ওরা শ্বসন বন্ধ থাকে। এরা অবিশ্বাস্যভাবে ছয় মিনিট পর্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ করে রাখতে পারে। এমন কি খননের সময়ও শ্বাসরুদ্ধ থাকে। প্যারাগুয়ের মানুষ আর্মাডিলোর বিস্ময়কর এই ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে মুখরোচক গল্প ফেঁদেছে। তার বলে যে, যখন আর্মাডিলো নদীর কাছে আসে, এরা দুলকি চালে নদী তীরে গিয়ে জলে নামে এবং অবিচলিতভাবে নদীর তলা দিয়ে হাঁটতে থাকে। শস্ত্রের ভার ওদের ডুবিয়ে থাকায় সাহায্য করে। ওরা লম্বা পা ফেলে চলে এবং একটিও ভুল পদক্ষেপ পড়ে না এবং হেঁটেই নদীর ওপারে উঠে।

বর্তমানে বিশ প্রজাতির আর্মাডিলো আছে। আরো ছিলো। এদের মধ্যে দানোর মতো এক আর্মাডিলো ছিলো যার খোলক বা বর্ম গম্বুজাকৃতির। আকারে একটি ছোট গাড়ীর মতো, এরকম আর্মাডিলোর অশ্মীভূত একটি খোলক পাওয়া গেছে। মনে হয় মানুষ এটিকে তাঁবুর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতো। এখনকার সবচেয়ে বড়ো আর্মাডিলোর নাম জায়ান্ট আর্মাডিলো বা দৈত্য-আর্মাডিলো, আকারে শূকরের অনুরূপ। ব্রাজিলের অরণ্যেই এদের বাস। সকল দলের মতো, এটি প্রধানত পতঙ্গভুক এবং বিশাল সংখ্যক পিঁপড়া খায়। প্যারাগুয়েতে ছোট তিন-ফালি-আর্মাডিলো নখরের উপর ভর করে চাবি দেওয়া পুতুলের মতো হেলে দুলে চলে। এটি নিপুণ গোলাকৃতি ধারণ করতে পারে, যার মধ্যে কোনো কিছু ঢোকানো অসম্ভব। আর্জেন্টিনার প্যাম্পাসের নিচে ছোট ছোট লোমযুক্ত, ছুঁচোর মতো আর্মাডিলো রয়েছে। এরা কদাচিৎ ভূগর্ভের বাইরে আসে। সব আর্মাডিলোর দাঁত আছে। দৈত্য আর্মাডিলোর আছে প্রায় একশতের কাছাকাছি দাঁত। কোনো স্তন্যপায়ীতে এতো সংখ্যক দাঁত নেই। তবে দাঁতসমূহ সরল, ছোট ও পেরেকের মতো।

দক্ষিণ আমেরিকার বিশেষ দলের পতঙ্গভুকসমূহ, অবশ্য, আফ্রিকার প্যাঙ্গোলিনের মতো সব দাঁত হারিয়েছে। সেখানে তিন আকারের পতঙ্গভুক আছে। ক্ষুদ্রতম হলো পিগমী বা বামন পতঙ্গভুক। এরা গাছেই জীবন কাটায় এবং উই এদের একমাত্র আহার। এটি আকারে

কাঠবিড়ালীর মতো। নরোম সোনালি লোমে ঢাকা দেহ। চোয়াল বাকা। বাকা চোয়াল এক।৮ খাটো নল গঠন করে, এর চেয়ে বড়োটি বিড়াল আকারের। নাম তামান্ডুয়া। গ্রাহী লেজবিশিষ্ট এবং খাট মোটা লোম দ্বারা দেহ আবৃত। এটিও বৃক্ষচারী, তবে কখনো কখনো মাটিতে নামে। মুক্ত সমভূমিতে যেখানে কবরের স্মৃতিস্তম্ভের আকারে বিশাল উইয়ের ঢিবি থাকে সেখানে সবচেয়ে বড়ো দৈত্য পিঁপড়াভুকের বাস। এটি দুই মিটার বা এর চেয়েও বেশি লম্বা। এর লেজ খুব বড়ো। লেজের লোম অমসৃণ ও কুঞ্চিত এবং পতাকার মতো। যখন এরা নিষ্পাপ প্রান্তর দিয়ে এলোমেলো পদবিক্ষেপে টলমলে করে চলে তখন লেজ পতাকার মতো বাতাসে দুলে। সামনের পা দুটো ধনুকের মতো বাঁকা। নখর এতো লম্বা যে ভিতর দিকে গুটিয়ে রাখতে হয় এবং এরা পায়ের কিনারার উপর ভর দিয়ে হাঁটে। উইয়ের ঢিবিকে ওরা এই নখর দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে, অনেকটা কাগজ ছেঁড়ার মতো। এর দাঁতহীন চোয়াল নল গঠন করে যা পুরোপদ থেকেও লম্বা। আহারকালে ক্ষুদ্র মুখ থেকে জিহ্বার বিরাট মাংসের ফালি ভীষণ দ্রুত গতিতে ভেতর-বার যাওয়া আসা করে এবং উইয়ের ঢিবির গ্যালারীর ভিতর পর্যন্ত চালিয়ে দেয়।

সকল পতঙ্গভুক বেশ ধীরগতিসম্পন্ন। দৈত্য-পতঙ্গভুককেও মানুষ দৌড়ে হারাতে পারে। যেহেতু এদের দাঁত নেই সেহেতু মনে হতে পারে যে এদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। এটি বিস্ময়কর ঠেকে যদি পতঙ্গভুক ও আর্মাডিলোর দেহে শস্ত্র না থাকতো তাহলে কি হতো। কিন্তু বামন পতঙ্গভুক ও তামান্ডুয়া। বৃক্ষবাসী উইও পিঁপড়া পছন্দ করে এবং বৃক্ষেই বেশিরভাগ সময় কাটায়। ফলে এরা বেশিরভাগ শিকারী প্রাণীর নাগালের বাইরে থাকে। দৈত্য-পিঁপড়াভুককে প্রথম দর্শনে ভয়ংকর মনে হলেও এরা ক্ষতিকর নয়। যদি আপনি কোনোটাতে ফাঁস পরাতে যান এটি উল্টে পুরোপদ দিয়ে কোনোদিক না তাকিয়ে চটপট ঝাপটা মারে। যদি বড়শির মতো নখর দিয়ে ওরা একবার আপনাকে ধরতে পারে তাহলে ছোটানোর সম্ভাবনা খুব কম। গল্প আছে যে মুক্ত নিষ্পাদপ প্রান্তরে জড়াজড়ি অবস্থায় একটি জাগুয়ার ও পতঙ্গভুকের মরা দেহ পাওয়া গিয়েছিলো। জাগুয়ার দাঁত দিয়ে পতঙ্গভুকের দেহকে ভয়াবহভাবে খান্ খান্ করে ছিড়েছিলো। কিন্তু পতঙ্গভুকের নখর ঢুকে গিয়েছিলো জাগুয়ারের পিঠে। এমন কি মৃত্যুর পরও আক্রমকের গায়ে আটকে থাকা নখর শিথিল হয় নি।

পতঙ্গভুকেরা হামাগুঁড়ি দিয়ে চলা পোকা-মাকড় সংগ্রহ করে। কিন্তু পতঙ্গরাও তো উড়ে। উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যের অন্ধকার রাতে সাদা পর্দার উপর মার্কারি ভাল্বের আলো ফেলুন। এই আলো পতঙ্গকে আকর্ষণ করে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে, বহু ধরনের বিস্ময়কর পতঙ্গের ঝাঁকে স্ত্রীণ ভরে যাবে। বিশাল মথ প্রজাপতি পাখা থেকে ফেঁসো ঝরাতে থাকবে। ম্যানটিস সামনের পা জোড়াকে প্রার্থনার ভঙ্গিতে করজোড় রাখবে ভণ্ড তপস্বীর মতো। রোবটের শ্লথ গতিতে চলার মতো চলতে থাকবে বিটল বা গুবরে পোকা। লাফ দিয়ে চলবে বিশাল ক্রিকেট। এরা ঝোপের মতো শুঙ্গ-ঘষে আওয়াজ তুলবে এবং অসংখ্য মশা, ছোট মাছি ভাল্বের চারপাশে ভিড় জমাবে, এমনকি আলো বেরোনোর পথও ঢেকে ফেলবে।

ত্রিশ কোটি বছর আগে পতঙ্গরা খেচর জীবনে এসেছিলো। এর দশ কোটি বছর পর উড়ুক্কু সরীসৃপ টেরোসরদের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল তাদেরই অধিকারে ছিলো। সরীসৃপরা রাতে আকাশে ওড়তো কিনা আমাদের জানা নেই। দেহের তাপমাত্রার ভারসাম্য

বজায় রাখার সমস্যা যে সরীসৃপের ছিলো তা তো আমাদের স্মরণে আছে। পাখিরা আকাশে ওড়ায় সফল হলো। বর্তমানে নিশাচর পাখির সংখ্যা খুব কম। অতীতেও যে নিশাচর পাখি সংখ্যায় বেশি ছিলো তা মনে করার কোনো যুক্তি নেই। কাজেই যারা অন্ধকারে ওড়ার কৌশল সুষ্ঠুভাবে রপ্ত করতে পারবে তাদের জন্য পতঙ্গ ভুঁড়িভোজের সুযোগ হবে পর্যাপ্ত। কাজেই, পতঙ্গভুক প্রাণীদের মধ্যেও ভিন্নতা সৃষ্টির ব্যবস্থা প্রকৃতিতে ছিলো।

স্তন্যপায়ীরা কিভাবে খেচর জীবনে প্রবেশ করলো সে বিষয়ে আমাদের ধারণা আছে। মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনে একটা অদ্ভুত প্রাণী বাস করে। প্রাণিবিজ্ঞানীরা এর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্য একে নিয়ে একটি বর্গ তৈরি করেছেন। প্রাণীর নাম কোলুগো। এটি আকারে বড়ো শশকের মতো। কিন্তু এর পুরো দেহ, গলা থেকে লেজ পর্যন্ত নরম লোমের চামড়ার আলখিল্লায় ঢাকা। তাতে ধূসর ও ক্রিম রঙের নানান চমৎকার ফুটকি থাকে। এরা গাছের শাখায় যখন ঝুলে থাকে বা গাছের কাণ্ডের সাথে লেগে থাকে তখন খুব কাছে থেকেও একে শনাক্ত করা যায় না। যখন এরা পা প্রসারিত করে তখন আলখিল্লা দিয়ে বাতাসে গড়িয়ে যেতে পারে। আমি একসময় মালয়েশিয়ার জঙ্গলে এদের দেখার জন্য গিয়েছিলাম। স্থানীয় জনসাধারণ বলেছিলেন জঙ্গলে এই ধরনের বহু সংখ্যক বিস্ময়কর প্রাণী রয়েছে। আমি বাইনোকুলার দিয়ে গাছে গাছে চোখ বুলালাম। খুব সতর্কভাবে গাছের প্রতিটি বাকল ও শাখা দেখলাম। নিশ্চিত হলাম যে ওখানে কিছু নেই। আমি ফিরে আরেকটি গাছ পরীক্ষার সময় চোখের কোণা দিয়ে একটু করে দেখতে পাই যে আয়তাকৃতির কি যেনো একটি নীরবে গড়িয়ে চলে গেলো। আমি এটির পিছু পিছু দৌড়ালাম। কিন্তু এটি প্রায় ৯০ মিটার দূরে নিচে নেমে আরেকটি গাছের কাণ্ডে বসলো। ইত্যবসরে আমি সেখানে পৌঁছে যাই। প্রাণীটি বেশ উপরে ছিলো এবং গড়িয়ে গড়িয়ে উপরে উঠছিলো। এর পুরোপদদ্বয় একসাথে সামনের দিকে নড়ছিলো এবং পশ্চাৎপদ ও পুরোপদ পর্যায়ক্রমে ঝাপ্টাচ্ছিল। দেহের চারপাশে উড়ছিলো আলখিল্লা। আলখিল্লাকে তখন পুরনো শোবার পোশাক বলে মনে হচ্ছিলো।

কোলুগোর ওড়ার কৌশলের সাথে অন্য কতকগুলো প্রাণীর ওড়ার কৌশলের পুরো মিল আছে। মারসুপিয়াল সুপার গ্লাইডারও বাতাসে ওভাবে ওড়ে। দুই দলের বিড়ালীও ওড়ার এ ধরনের ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু কোলুগোর আলখিল্লা সবার চেয়ে বড়ো এবং দেহকে প্রায় পুরো আবৃত করে রাখে। স্তন্যপায়ীর ইতিহাসের গোড়াতেই এরা এই অভ্যাস অধিগত করে। নিশ্চিতভাবে এরা স্তন্যপায়ী দলের আদি সদস্য এবং মনে হয় এরা কোনো পতঙ্গভুক পূর্বপুরুষের সরাসরি উত্তরপুরুষ। সম্পন্ন জীবনযাপন প্রণালির সুযোগ থাকাতে এই প্রাণীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না। ফলে এদের দেহে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বাদুড়ের সাথে এর সেতুবন্ধ রচনা করা যাবে না, কারণ বাদুড়ের চেয়ে এর অভ্যন্তরীণ গঠনে অনেক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এটি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব যে, গড়িয়ে উড়ার দক্ষতা অর্জনে গোড়ার দিককার পতঙ্গভুকদের এরকম একটা পর্যায় হয়তো অতিক্রম করতে হয়েছিলো, যার থেকে ক্রমে বাদুড়ের মতো খাঁটি দক্ষ উড্ডয়নক্ষম প্রাণীর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

এই উড্ডয়ন ক্ষমতার বিকাশ ঘটে একেবারে আদিপর্বে। কারণ ৫ কোটি বছর পূর্বেকার অশ্মীভূত বাদুড় আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাদুড়ের উড়ন্ত পর্দা কব্জি থেকে প্রসারিত নয়, যেমনটি কোলুগোতে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় আঙুল থেকে তা প্রসারিত। অপর দুটি আঙুল স্ট্রাট বা চামড়ার তাঁবু গঠন করে যা দেহের

পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত থাকে। কেবল ছোট বৃদ্ধাঙুল মুক্ত থাকে। এতে নখর থাকে। মলমূত্র ত্যাগ ও গাছে আরোহণের সময় নখর ব্যবহৃত হয়। বক্ষস্থিতে তরীদল সৃষ্টি হয়েছে যাতে গড়িয়ে উড়ায় সাহায্যকারী পেশি তরীদলে যুক্ত থাকতে পারে।

পাখির দেহের মতো বাদুড়ের দেহের ওজন কমানোর জন্য দেহে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। লেজের হাড়গুলো পাতলা ও হালকা খড়ের মতো, এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উড্ডয়ন পর্দার এতে সাহায্য হয়। যদিও এদের দাঁত রয়েছে, তবে এদের মাথা খাট ও নাক ভোঁতা। ফলে সামনের দিক ভারী হয় না। এদের একটা সমস্যা আছে যা পাখিকে পোহাতে হয় না। এদের স্তন্যপায়ী পূর্বপুরুষরা দেহের অভ্যন্তরে ফুলকার শাবককে পোষণ করার সুষ্ঠু কৌশল রপ্ত করেছিলো। ফলে, বাদুড় কখনো একসঙ্গে দুটো বাচ্চা প্রসব করে না। এরা প্রতি ঋতুতে মাত্র একটা বাচ্চার জন্ম দেয়। অন্যদিকে বাদুড়ের সংখ্যা পরিমিত রাখার জন্যে, স্ত্রী বাদুড়কে অবশ্যই এই ক্ষতিপূরণ করতে হয়। অর্থাৎ এদেরকে দীর্ঘদিন সন্তান জন্ম দিয়েই যেতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই আকারের প্রাণীদের তুলনায় এরা বিস্ময়করভাবে দীর্ঘজীবী প্রাণী। কোনো কোনোটির পরমায়ু প্রায় বিশ বছর।

বর্তমানে সব বাদুড় রাতে উড়ে। সম্ভবত এরা সবসময় রাতেই উড়তো। অথচ পাখিরা বহু আগে দিনে আকাশ দখল করেছিলো। এটি করতে গিয়ে বাদুড়কে ফলপ্রসূ উড্ডয়ন রীতির বিকাশ ঘটাতে হয়েছে। এর ভিত্তি অতিনাদ সৃষ্টির উপর। যেমনটি শ্রু ও অন্যান্য বহু আদি পতঙ্গভুক প্রাণীতে নিশ্চিতভাবে এমন অতিনাদ সৃষ্টির ব্যবস্থা ছিলো। বাদুড় একে শব্দ অনুভবের কাজে ব্যবহার করে। এটি অতি উচ্চমার্গের ইকো-লোকেশন (echolocation) পদ্ধতি। অর্থাৎ বাদুড় যে শব্দ ছুঁড়ে তা কোনো বস্তুতে প্রতিরুদ্ধ হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। এই প্রতিধ্বনি অনুভব করে বাদুড় বুঝতে পারে বস্তুটি কতো দূরে বা বস্তুর প্রকৃতি কি। এই পদ্ধতি রাডারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রাডারে ব্যবহৃত হয় রেডিও-তরঙ্গ কিন্তু বাদুড়ের সোনারে শব্দধারক অঙ্কে ব্যবহার করা হয় শব্দ-তরঙ্গ। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে আমাদের তরুণ বয়সে আমরা অতি কষ্টে সেকেন্ডে ২০,০০০ শব্দ-তরঙ্গ শনাক্ত করতে পারি। বাদুড় উড়াকালে ৫০০০০ থেকে ২০০০০০ শব্দ- তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ব্যবহার করে। ক্লিক ক্লিক শব্দের মতো প্রতি সেকেণ্ডে ২০-৩০ বার খাট দৈর্ঘ্যের শব্দ সৃষ্টি করে বাদুড়। বাদুড় এতো সূক্ষ্ম শ্রবণক্ষমতা রাখে যে, প্রতিটি ক্লিকের প্রতিধ্বনি সে শুনতে পায় এবং তার চারপাশে কোথাও বাধা আছে কিনা কেবল তাই নয় দ্রুত গতিতে উড়ে চলা শিকারের অবস্থানও সে বিবেচনা করতে পারে।

অধিকাংশ বাদুড় পরবর্তী সংকেতের আগে সৃষ্ট সংকেতের প্রতিধ্বনির জন্য অপেক্ষা করে। বস্তুর যতো কাছাকাছি বাদুড় পৌছয়, ততো কম সময়ে প্রতিধ্বনি তার কাছে ফিরে আসে। শিকারের আরো কাছাকাছি এলে এরা সংকেত সংখ্যা বৃদ্ধি করে, ফলে ওরা শিকারের নিশানা নিপুণভাবে স্থির করে শিকারকে কব্জা করতে পারে।

শিকারের সাফল্য, অবশ্য, বাদুড়কে সাময়িক অন্ধত্ব দান করতে পারে, যেহেতু এ সময় তার মুখে পোকা থাকে। মুখ বন্ধ থাকায় সে স্বাভাবিক চিহি চিঁহি শব্দ প্রক্ষেপ করতে পারে না। কোনো কোনো প্রজাতির বাদুড় নাকের মাধ্যমে আওয়াজ বের করে এ সমস্যার সামাল দেয়। এদের নাকে বহু ধরনের অদ্ভুত অঙ্গের সৃষ্টি হয়। এসব অঙ্গ শব্দতরঙ্গসমূহকে সংহত

করে। এটা অনেকটা ছোট মেগাফোনের মতো কাজ করে। কান দ্বারা প্রতিধ্বনিসমূহ সংগৃহীত হয়। প্রতিধ্বনিগুলো বেশ জটিল, খুবই স্পর্শকাতর ও সক্ষম। বহুক্ষেত্রে এগুলোকে মিশিয়ে সংকেত ধরায় ব্যবহার করা হয়, কাজেই বহু বাদুড়ের মুখমণ্ডলে সোনার বা শব্দ সৃজক ও শব্দধারক অঙ্গের প্রাধান্যই বেশী যেমন বিশাল অস্বচ্ছ কান। কান তরুণাস্থগঠিত। ভিতরে টুকটুকে লাল রক্তনালি এবং নাকের উপর পাতা, কাঁটা ও মুগুরের মতো অঙ্গ যা শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্যযুগীয় পুরাণের দানোর চেয়েও এদের মুখাবয়ব অদ্ভুত। প্রতিটি প্রাণীর মুখমণ্ডলের আকৃতি ভিন্ন। কেনো? সম্ভবত, প্রত্যেকেই একটি অনন্য আওয়াজ বা শব্দ উৎপাদনে সক্ষম।

শোনার পদ্ধতিকে এভাবে ব্যাখ্যা করলে মনে হবে খুব সাদাসিধে ব্যাপার। যখন ওরা সক্রিয় থাকে তখন পদ্ধতিটাকে আরো সরল মনে হয়। বোর্নিও-এর গোমান্টন গুহায় আট প্রজাতির কয়েক কোটি বাদুড় বাস করে। এতো দীর্ঘদিন ধরে ওরা ওখানে আছে যে একটি প্রকোষ্ঠে ওদের মলমূত্র ৩০ মিটার উঁচু হয়েছে। বাদুড় দেখতে আমরা একবার অতিকষ্টে এর উপরে উঠি। দেখতে পাই পুরো উপরিভাগ জুড়ে তেলাপোকার চকচকে পুরু কার্পেট। তেলাপোকারা বাদুড়ের বিষ্টা খাচ্ছে এবং সেখানে থেকে ভারী এমোনিয়া গ্যাসের গন্ধ বের হচ্ছে। উপরে ছাদের কাছাকাছি বাদুড়েরা শিলার আড়াআড়ি সংকীর্ণ ফাঁকে ঝুলে আছে দেখতে পাই। টর্চের আলো ফেললে কয়েকটা বাদুড় শিলাচ্যুত হয়ে আমাদের মুখে পাখার বাতাস ছুঁড়ে দিয়ে উড়ে যায়। অন্যগুলো ঝুলেই থাকে। একটু হকচকিত হয়ে মাথা গুঁজে, কালো কালো চোখে তাকিয়ে ঝুলতে থাকলো। গমের ক্ষেতে শস্য দানার মতো দেখতে সবাই একই রকম। ঘন জমজমাট। হাজার হাজার বাদুড় মৃদু বাতাসে দোল খাওয়া শস্যের অনুরূপ দুলছিলো। হঠাৎ ওরা ভয়ে দৌড়াতে লাগলো। আমাদের পেছনের প্রধান প্রকোষ্ঠে আসার জন্য ও তাদের বদ্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ওরা রকেটের বেগে ছুটে আসতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে আমরা মলের পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমে আসি এবং গুহার প্রধান প্রকোষ্ঠে উড়ন্ত বাদুড়ের ঘূর্ণি প্রবাহে ভরে উঠে। বাইরে অপরিচিত দিবালোকে ভীত এবং আমাদের উপস্থিতিতে সন্ত্রস্থ বাদুড়েরা, ক্রমাগত ঘুরতে থাকে। এদের চামড়া নির্মিত পাখার আঘাতে বাতাসে ঘূর্ণি উঠে। আমরা সৌরজগৎ থেকে ভেসে আসা মর্মরধ্বনির মতো মৃদু চিঁহি চিঁহি শব্দের খানিকটা আওয়াজ যেনো শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে ওদের সৃষ্ট প্রকৃত শব্দ-তরঙ্গ আমাদের শ্রুতিতে অগম্য ছিলো। তাদের দেহ নিঃসৃত তাপ আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলছিলো এবং বায়ুহীন করে তোলাতে আমাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিলো। ওদের বর্জ্য ফোঁটা ফোঁটা মলমূত্রে আমাদের শরীর সয়লাব হয়ে উঠছিলো। সেখানে নিশ্চিতভাবে শত শত বাদুড় ভয়ে ঘুরছিলো তো ঘুরছিলোই। প্রবল বাতাস তাড়িত তুষার কণার মতো ছুটছিলো। এরকম দ্রুতগতিতে ওড়ার সময়ও তারা অবশ্যই ওদের শব্দ প্রক্ষেপণ করছিলো। এদের পরস্পর সৃষ্ট শব্দ একটি অপরটির প্রতিবন্ধক নয় কেনো? সবগুলো মিলে শব্দজটই বা সৃষ্টি হয় না কেনো? এতো দ্রুত দৌড়াদৌড়ি সত্বেও এক বাদুড়ের সাথে অন্য বাদুড়ের দৈহিক সংঘর্ষ বাঁধে না কি কারণে? এ ধরনের জায়গায়, সমস্যার পরিধি অনুমান করা দুঃসাধ্য।

গোমান্টনে সন্ধ্যা নামলে, বাদুড়েরা গুহা ছেড়ে নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ পথে শিলার মধ্যে দিয়ে উড়ে চলে। ওরা আধজনের মতো একত্রে কাছাকাছি থেকে বের হয় ঝাঁকে ঝাঁকে। মনে হয় কেঁপে কেঁপে চলা একটা বড়ো ফিতা। গুহার একটা কোণা থেকে মিনিটে হাজার হাজার

বের হয়। রাতের শিকারে অরণ্যের পথে যেনো কালো কালো দেহের প্রবাহ ছুটে চলেছে। এদের মলমূত্রের ঢিবিই ওদের সাফল্যের স্বাক্ষর। সাধারণ গাণিতিক হিসাবে দেখা যায় প্রতি রাতে এই কলোনীর বাদুড়রা কয়েক টন মশা ও ছোট পোকামাকড় সাবাড় করে।

মাত্র কয়েকটি পোকামাকড় বাদুড়ের গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে। আমেরিকার কয়েকটি মথ প্রজাপতি বাদুড় যে ধরনের শব্দ-তরঙ্গ প্রক্ষেপণ করে ঠিক সেই সংখ্যক শব্দতরঙ্গ প্রক্ষেপণে সমর্থ। যখনই বাদুড় তাদের দিকে ছুটে আসে তৎক্ষণাৎ ওরা মাটিতে নেমে আসে। অন্যান্য প্রজাপতির মথ বাদুড় আসছে টের পেলে ঘুরপথে চলে, ফলে ওদরকে অনুসরণ করা বাদুড়ের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। আবার অন্যরা সংকেত-জট সৃষ্টি করে অথবা পশ্চাৎগামী উচ্চ শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য, এরা আহারের অনুপযুক্ত বিবেচনা করে যেনো ওদের এড়িয়ে যায়।

সব বাদুড় পোকামাকড় আহার করে না। কারো কারো আবিষ্কার হলো ফুলের মধু ও পরাগ অধিক পুষ্টিকর। ওদের উড়ার দক্ষতা এতোই নিপুণ যে ওরা, হামিংবার্ডের মতো ফুলের উপর স্থির হয়ে উড়তে পারে এবং দীর্ঘ সরু জিহবা দিয়ে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারে। অধিকাংশ উদ্ভিদ পরাগায়নের জন্য পতঙ্গকে যেমন ব্যবহার করে তেমনি কয়েকটি উদ্ভিদ পরাগায়নে বাদুড়কে ব্যবহার করে থাকে। কতকগুলো ক্যাকটাস কেবল রাতে ফুল ফোটায়। ফুলগুলো আকারে বড়, শক্ত ও ফ্যাকাশে। অন্ধকারে ফুলের রঙের কোনো কদর নেই। অবশ্য ফুলের গন্ধ বেশ ভারী ও তীব্র। ফুলগুলো কাণ্ডের অনেক উপরে থাকে। ফলে বাদুড়ের পাখা কাঁটার আঘাতে জর্জরিত হয় না।

সবচেয়ে বড় বাদুড় কেবল ফল আহার করে বাঁচে। এদের নাম ফ্লাইং ফক্স বা উড়ুক্কু শেয়াল। এই নাম কেবল বড়ো আকারের জন্য নয়। এদের ডানার বিস্তার দেড় মিটার এবং গায়ের রঙ লালচে বাদামি এবং মুখ দেখতে শেয়ালের মতো। এদের চোখ আকারে বেশ বড়ো তবে কান বেশ ছোট। নাসাপত্রও নেই। ফলে এটি স্পষ্ট যে, এরা শব্দ প্রক্ষেপণকারী উড়ুক্কু প্রাণী নয়। এদের সাথে পতঙ্গভুকদের বড়ো ধরনের পার্থক্য বিচার করে আদি পতঙ্গভুকদের থেকে দুটো স্বতন্ত্র শাখায় ওদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিলো কিনা সে বিষয়ে মতৈক্যে পৌছানো যায় নি। ফল খাদক বাদুড়েরা কেবল গুহায় বাস করে না। বড় গাছের আগায় একত্রে হাজার হাজার বাদুড় শক্তভাবে ঝুলে থাকে কালো থোকা থোকা ফলের মতো। পাখা ঝাপটানো, খিচ খিচ শব্দ তোলা ইত্যাদিতে ওরা মেতে থাকে। মাঝে মাঝে ডানা মেলে জিহবা দিয়ে তা লেহন করে। উদ্দেশ্য পাখাকে উত্তমভাবে উড্ডয়নক্ষম রাখা। গরম দিনে তারা তাদের আধ-মেলা পাখা দিয়ে গায়ে বাতাস করে। তখন পুরো কলোনি চকচকে দেখায়। হঠাৎ কোনো শব্দে বা গাছে নাড়া পড়লে ওরা ক্রুদ্ধ চীৎকার তুলে এবং শত শত সংখ্যায় জোরে জোরে পাখা ঝাপটিয়ে উড়তে থাকে। আবার শীঘ্র যথাস্থানে গিয়ে বসে। সন্ধ্যায়, দলে দলে খাদ্য আহরণে বেরোয়। এদের গমনপথের কালো ছায়ারেখা পাখির গমনপথের কালো ছায়া রেখার অনুরূপ নয়। যেহেতু দেহ থেকে এদের বেরিয়ে থাকা পুচ্ছ নেই এবং পতঙ্গভোজী বাদুড়দের চেয়ে এদের উড়ার ভঙ্গিও ভিন্ন। এরা বিশাল পাখা দিয়ে সমানতালে ধীরলয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদে সান্ধ্য আকাশে উড়ে চলে। ফলের সন্ধানে ওরা ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ অতিক্রম করে।

অন্যান্য বাদুড় মাংসাশী। কেউ ঝাঁকে চলা পাখি শিকার করে, কেউ ছোট ব্যাঙ ও টিকটিকি ধরে, একটি বাদুড় অন্য বাদুড় খায় বলেও জানা গেছে। আমেরিকার এক প্রজাতির বাদুড় মাছ খায়। গোধূলিতে ওরা পুকুর, হ্রদ বা এমনকি সমুদ্রের উপরে পাখা দিয়ে জল তাড়না করে। অধিকাংশ বাদুড়ের দেহের প্রসারিত পর্দা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সম্প্রসারিত। কিন্তু মেছো বাদুড়ে এটি হাঁটুর বেশ উপরে। ফলে পা মুক্ত থাকে এবং বাদুড় পানিতে পা হেঁচড়ে নিতে পারে। এ সময় লেজ ভাঁজ করে ডানাকে জল থেকে দূরে রাখা সম্ভব হয়। এদের আঙুল আকারে বড়ো এবং এতে বড়শির মতো নখর থাকে। মাছকে আঘাত করার পর বাদুড় মাছকে জল থেকে ছেঁকে মুখে তুলে এবং জোরে দাঁত দিয়ে কামড়ে মেরে ফেলে।

রক্তচোষা বাদুড় বিশেষ ধরনের স্তন্যপায়ী। এদের মুখের সামনের দাঁতগুলো দুটো ত্রিকোণাকৃতির খুরে পরিণত হয়েছে। ঘুমন্ত স্তন্যপায়ীর উপর সে নিঃশব্দে বসে। স্তন্যপায়ীটি গরু হতে পারে, এমনকি মানুষও হতে পারে, এদের লালায় রয়েছে রক্ত জমাটরোধী পদার্থ। কাজেই যখন শিকারের দেহ কাটে তখন রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না। রক্তচোষা বাদুড় তখন শিকারের উপর উবু হয়ে বসে রক্ত লেহন করে। এরা শব্দ প্রক্ষেপণ পদ্ধতির সাহায্যে বা সোনারের সাহায্যে উড়ে। কুকুরের শ্রবণঅঙ্গও অতি-শব্দতরঙ্গ শোনায় অভ্যস্ত। ফলে ওরা বাদুড়ের আগমণ টের পায়। কুকুর বাদুড়কে আক্রমণ করে।

সর্বমোট প্রায় এক হাজার প্রজাতির বাদুড় আছে। এরা সবাই নিজেদের বাসা ও পর্যাপ্ত আহারের ব্যবস্থা করেছে। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল অঞ্চলে নয়। টুপাইয়া ধরনের স্তন্যপায়ী এবং বাদুড়ের মধ্যেকার নিকট সম্পর্কের স্বীকৃতি দেওয়া কঠিন নয়, যদি উভয়কে কাছ থেকে নিরীক্ষণ করা যায়। এরা আদি পতঙ্গভুকদের থেকে বিবিধায়নের মাধ্যমে উদ্ভূত সফল স্তন্যপায়ী প্রাণী। তিমি ও ডলফিন অবশ্যই উষ্ণশোণিত, স্তনদুগ্ধ উৎপাদনকারী স্তন্যপায়ী। এদেরও দীর্ঘ বংশপঞ্জি রয়েছে। পাঁচ কোটি বছর আগে স্তন্যপায়ীদের ব্যাপক বিস্তারের শুরুতে এদের জীবাশ্ম তৈরি হয়েছে। তবে এতো বড়ো বিশাল দেহের প্রাণী কি ক্ষুদ্র টুপাইয়ার মতো প্রাণীর উত্তরসূরি হতে পারে? এটি বিশ্বাস করা কঠিন এবং এখনো অবরোহ যুক্তি অনস্বীকারযোগ্য। এদের পূর্বপুরুষ অবশ্যই সে সময়ে সমুদ্রচারী হয়েছিলো যখন ছোট পতঙ্গভুক স্তন্যপায়ীদের কেবল অস্তিত্ব ছিলো। কিন্তু এদের অভ্যন্তরীণ শারীরিক গঠন সাঁতারের প্রয়োজনে এমন চরমভাবে অভিযোজিত হয়েছে যে, এরা কিভাবে সমুদ্রবাসী হলো সে বিষয়ে কোনো হদিস মেলে না। তিমির দুটো প্রধান দলের বংশধারা আলাদা হতে পারে। আদি মাংসাশীরা যে ভাবে উদ্ভূত হয়েছিলো একইভাবে দাঁতবিশিষ্ট তিমি উদ্ভূত হয়েছিলো পতঙ্গভুক স্তন্যপায়ী থেকে এবং বাকি বেলিন তিমিগুলো পতঙ্গভুকদের সরাসরি উত্তরসুরি।

তিমি ও আদি স্তন্যপায়ীদের মধ্যেকার বড় তফাৎগুলো জলচর জীবনযাপনের কারণেই সৃষ্ট হয়েছে। সাঁতারের সুবিধার্থে তিমির দেহে নানা বৈশিষ্ট্যের অভিযোজন ঘটেছে। পুরোপদ দাঁড়ে পরিণত হয়েছে। পশ্চাৎপদ বিলুপ্ত, যদিও সে স্থলে কয়েকটি হাড় রয়েছে দেহের গভীরে। এর থেকে প্রমাণ হয় তিমির পূর্বপুরুষে একসময় পেছনে পা ছিলো। লোম স্তন্যপায়ীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাপ-আবরক হিসাবেই এর প্রয়োজন। লোমের মধ্যে বায়ুবদ্ধ করে দেহের তাপসাম্য রক্ষা করা হয়। যে প্রাণী কখনো শুষ্ক স্থলভূমিতে আসে না তার কাছে লোমের প্রয়োজন নগণ্য। তিমিতে লোম বিলুপ্ত। অবশ্য লোমের স্মৃতিচিহ্ন তিমিতে আজো বর্তমান। ওদের তুণ্ডে রয়েছে লোমঘটিত কুর্চ। বোঝা যায় একদা এদের দেহেও লোমের

আবরণ ছিলো। তাপ-আবরকের প্রয়োজন এখনো রয়েছে। এ কারণে তিমি দেহে চর্বিস্তর সৃষ্টি হয়েছে। ত্বকের নিচে এই চর্বিস্তর দেহ থেকে তারা বের হওয়া নিবারণ করে। এমনকি শীতলতম সমুদ্রেও।

স্তন্যপায়ীরা শ্বসনের জন্য বায়ুর উপর নির্ভরশীল। জলচর স্তন্যপায়ীদের জন্য বায়ু-শ্বসন এক বড়ো বাধা। কিন্তু তিমি এ সমস্যার সুরাহা করেছে। অধিকাংশ স্থলচর প্রাণী থেকেও তিমি অনেক কার্যকরভাবে এ সমস্যার মোকাবেলা করে। স্বাভাবিক শ্বসনে মানুষ মাত্র শতকরা পনর ভাগ বায়ুকে ফুসফুস থেকে নিষ্ক্রান্ত করে। তিমি একবার প্রবল নিঃশ্বসনে শতকরা নব্বইভাগ বায়ু নিষ্ক্রান্ত করে। কাজেই একে দীর্ঘ বিরতিতে শ্বাস নিলে চলে। এরা পেশিতে বিশেষত উচ্চ ঘনমাত্রায় মাইয়োগ্লোবিন নামক পদার্থ থাকে যা অক্সিজেন জমা রাখায় সাহায্য করে। মায়োগ্লোবিনের কারণে তিমির মাংসকে কালো দেখায়। এটি এদের মাংসের বৈশিষ্ট্য। কালো-পাখনা তিমি এই কৌশলের বদৌলতে ৫০০ মিটার গভীরে ডুব দেয় এবং শ্বাস না নিয়ে ৪০ মিনিট সাঁতার কাটতে পারে।

তিমির একটি দল ক্ষুদ্র শ্রিম্পের মতো কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী ক্রিল ইত্যাদি আহারে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। আহার্য এই প্রাণীরা সমুদ্রফেনায় ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে। পিঁপড়াভুক স্তন্যপায়ীদের দাঁতের যেমন প্রয়োজন হয় না। ক্রিলজাতীয় প্রাণী আহারেও তিমির দাঁতের আবশ্যক হয় না। পরিবর্তে এদের রয়েছে বেলিন। শক্ত পাত, পাতের কিনারা পালকের মতো। পাতগুলো মজবুত, সমান্তরাল মশারির মতো মুখের তালু থেকে ঝুলে থাকে। এটি অনেকটা ছাঁকুনির মতো। তিমি বিশাল পরিমাণ জলে মুখে পুরে, জলের মধ্যে থাকে ক্রিল ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী। তিমি চোয়াল আধা বন্ধ করে এবং জল নিষ্কাশন করে। কিন্তু ক্রিল ছাঁকনিতে আটকা পড়ে। আটকা পড়া খাদ্য ওরা গিলে ফেলে। ক্রিলেরা যেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে অধিক সংখ্যায় থাকে তিমি ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ওদের সংগ্রহ করে। বিচ্ছিন্ন ক্রিলের ঝাঁকেও ওরা শিকার করে। তবে এ সময় তিমি ডুব দিয়ে ঝাঁকের নিচে গিয়ে জলের ঘূর্ণী তুলে, বুদবুদ ছুঁড়ে মুখ দিয়ে। উদ্দেশ্য ক্রিল বা অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণীকে ঘূর্ণীর কেন্দ্রে জড়ো করা। এরপর তিমি চোয়াল উর্ধ্বমুখী রেখে ঘূর্ণীর কেন্দ্রে ভেসে উঠে পুরো ঝাঁককে একবারে গ্রাস করে।

এ ধরনের খাবার খেয়ে বেলিনের দেহের বিশাল আকার হয়েছে। নীল তিমি, সবচেয়ে বড়ো। লম্বায় ৩০ মিটারের চেয়ে বেশি। বড়ো পঁচিশটি হাতির ওজনের সমান। তিমির দেহ বড়ো হওয়াতে একটি অনুকুল সুবিধা রয়েছে। বড়ো দেহের পক্ষে দেহের তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং এতে দেহের আয়তন ও পৃষ্টতলের অনুপাতও তুলনামূলক কম হয়। ওজনের বিষয়টি ডায়নোসরের জন্য ক্ষতিকর হয়েছিলো কিন্তু এদের দেহের আয়তন হাড়ের যান্ত্রিক শক্তিদ্বারা সীমিত ছিলো। নির্দিষ্ট ওজনের বেশি হলে উপাঙ্গগুলো সহজে ভেঙে যাবে। ওজন বেশি হলেও তিমিদের এতে ক্ষতি হয়নি। তিমির হাড় তিমির দেহকে মূলত অনমনীয় করে। এদের দেহের ভার রক্ষা করে জল। ক্রিলজাতীয় আহার্য প্রাণীর দিকে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বড়ো ধরনের কর্মতৎপরতার দরকার। কাজেই, বেলিন তিমি পৃথিবীতে উদ্ভূত সর্বকালের বড়ো জীবিত প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো ডায়নোসরের চারগুণ বড়ো।

দাঁতওয়ালা তিমি অন্য শিকার আহার করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো স্পার্ম তিমি স্কুইড ভোজী। এটি আকারে নীল তিমির অর্ধেক। ছোটদের মধ্যে রয়েছে ডলফিন, শুশুক ও ঘাতক তিমি। এরা মাছ ও স্কুইড শিকার করে। এরা দ্রুততম সাঁতারু। কোনোটি ঘন্টায় ৪০ কিলোমিটারও সাঁতরাতে পারে।

এতো দ্রুত গতির জন্যে সাঁতারের কলাকৌশল ও সাঁতারুর দেহগঠনশৈলী খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাছ পার্শ্বরেখা দ্বারা সাহায্য পায়। কিন্তু স্তন্যপায়ীরা বহুকাল আগে তা হারিয়েছে। দাঁতওয়ালা তিমি এর পরিবর্তে শব্দভিত্তিক একটি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে। যে পদ্ধতি শ্রু অবলম্বন করতো এবং বাদুড়ে এসে তার আরো উন্নতি ঘটেছে। ডলফিন স্বরযন্ত্রের সাহায্যে অতিশব্দ উৎপন্ন করে। এবং মাথার সম্মুখভাগে মেলন নামের অঙ্গ থাকে। এরা যে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে তার সেকেণ্ডে কম্পন সংখ্যা ২,০০,০০০। বাদুড়ের কম্পন সংখ্যার সাথে তুলনীয়। এই উপায়ে ডলফিন গমন পথের বাধা অনুভব করতে পারে। প্রতিধ্বনির গুণ বিচার করে সামনে কোন্ ধরনের বস্তু আছে তা শনাক্ত করায় সক্ষম হয়। ডলফিনসমৃদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগরে ডলফিনকে বিনাকষ্টে নির্দিষ্ট আকৃতির ভাসমান রিং বেছে নিতে পারে এবং দ্রুত জলে সাঁতার কাটতে পারে। চোখ বাঁধা অবস্থাতেই ওরা মহোল্লাসে নির্দিষ্ট আকৃতির রিং তুণ্ডে তুলে নিয়ে এসে পুরস্কৃত হয়।

আল্ট্রা সাউন্ড বা অতিনাদ ছাড়াও ওরা নানা রকমের সোরগোল তুলে যার সাথে অতিনাদের তফাৎ অনেক। অনেকের অনুমান যে এগুলো তাদের ভাষা কিনা। কতিপয় কর্মী বলেন, যদি আমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হতাম, তাহলে ওরা কি বলছে বুঝতে পারতাম, এমনটি ওদের সাথে ভাষার জটিল আদান-প্রদানও সম্ভব হতো। অদ্যাবধি ডলফিনকৃত বিশটি শব্দকে আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি। ওরা যখন দ্রুত চলে তখন যে শব্দ করে তা সবাই একজোটে থাকার জন্য। কতকগুলো শব্দ মনে হয় সাবধান করার জন্যে। দূরে থাকা অবস্থায় পরস্পরকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে কতকগুলো ডাক দেয়। তবে এ পর্যন্ত কেউ দেখাতে সমর্থ হননি যে ডলফিন এইসব শব্দ জোট করে দুই শব্দের বাক্য গঠন করেছে। এটি করা গেলে একে খাঁটি ভাষার আদিলগ্ন বলে মেনে নেওয়া যেতো। শিম্পাঞ্জি এরকম করতে পারে। আমাদের জানা মতে, ডলফিনের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

বড়ো তিমিরাও শব্দ করতে পারে। কুঁজো তিমি বেলিন তিমি দলের অন্তর্ভূক্ত। কুঁজো তিমি হাওয়াই দ্বীপে প্রতি বসন্তে সঙ্গম ও সন্তান প্রসবের জন্য সমাবিষ্ট হয়। এদের কোনো কোনোটি গায়। এরা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ, কুঁই কুঁই চিৎকার, ভালুকের মতো গর্জন, তীক্ষ্ণ ভঙ্গি চিঁহি এবং দীর্ঘ গুরু গুরু মেঘের গর্জনের মতো শব্দ করে। এরা জাঁকজমকের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা নানা প্রকারের শব্দ তখন করতেই থাকে। একঘেঁয়েভাবে এটি চলতেই থাকে যাকে বলা হয় অপরিবর্তিত ধারাবাহিকতা। শব্দে প্রতিটি বিষয় বার বার ফিরে আসে। ফিরে আসার সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। তবে যে কোনো একটি ঋতুতে গানের বিষয় ও ধারা সবসময় এক থাকে। বিশেষ করে একটি পুরো সংগীত দশ মিনিট পর্যন্ত চলে, কেউ কেউ আধ ঘন্টা ধরে সংগীত রেকর্ড করেছেন তিমিরা গাইতে পারে, গানের পুনরাবৃত্তি করে, প্রকৃতপক্ষে এমনকি ২৪ ঘন্টা গাইতে পারে। প্রতিটি তিমির গান নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তবে হাওয়াইয়ের তিমি সম্প্রদায়ের গাওয়া গানের বিষয়কে এরা ওদের গানের উপজীব্য করে।

হাওয়াইয়ের সমুদ্রে তিমিরা কয়েক মাস থাকে। এখানে ওরা গায়, সঙ্গম করে ও বাচ্চা প্রসব করে। কখনো কখনো জলপৃষ্ঠে ভেসে থাকে। এ সময় বিশাল একটা দাঁড় বা সম্ভরণ অঙ্গ জলের উপরে খাড়াভাবে থাকে। মাঝে মাঝে সম্ভরণ অঙ্গ দিয়ে জলে আঘাত করে। অকস্মাৎ ৫০ টনের দেহটাকে জলের উপরে বায়ুতে ভাসিয়ে দেয়। তখন এর আলের মতো অঙ্কভাগ দেখা যায়। পরে জলে পড়ে এবং বিকট, প্রকাণ্ড শব্দ হয় জলে, অনেকটা বাজ পড়ার মতো। বিরতি দিয়ে দিয়ে তিমি এরকম বারবার জলপৃষ্ঠের উপরে ওঠে ও নামে। তারপর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে হাওয়াইয়ের গভীর নীল উপসাগর ও প্রণালি শূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ তিমিরা বিদায় নেয়। কয়েক সপ্তাহ পর কুঁজো তিমি আলাস্কায় এসে হাজির হয়। সম্ভবত এরা হাওয়াই দ্বীপেরই কুঁজো তিমি। তবে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে আরো গবেষণা দরকার।

পরবর্তী বসন্তে তারা আবার হাওয়াইতে আসে, গান শুরু করে। রিপোর্টে দেখা যায় এবার তারা গানের নূতন বিষয় নির্বাচন করে এবং পুরনো অনেক গান বাদ দেয়। গান এতো উচ্চনাদে হয় যে জাহাজের কাঠামোতে কাঁপন ধরে। রহস্যজনক বায়বীয় গোঙানি ও কান্না যেনো কোথা থেকে ভেসে আসে মনে হয়। যদি কেউ নিরুপম নীল জলে ডুব দিয়ে সাঁতরে নিচে যায়, প্রসন্ন ভাগ্যবলে ডুবুরির নিচে গায়ককে ভাসমান দেখতে পায়। মনে হবে নীলকান্ত মণির ভিতরে যেনো রূপালি রঙের ছটা। গায়কের গানের তরঙ্গ ডুবুরির দেহকে ভেদ করবে, তার রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ডে সহানুভূতির কম্পন জাগাবে। মনে হবে গীর্জার সবচেয়ে বড়ো প্রশস্ত পাইপের ভিতরে বসে সে গান শুনছে এবং তার সমস্ত কোষকলা গানের মূর্ছনায় নিমগ্ন হবে।

আমরা এখনো জানি না তিমি কেন গান গায়। মানুষ গান শুনে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি তিমিকে–শনাক্ত করতে পারে। মানুষ যদি তা পারে তাহলে তিমিও একইভাবে তা পারবে। জলে বায়ুর চেয়ে অধিকতর ভালোভাবে শব্দতরঙ্গ সঞ্চালিত হয়। কাজেই গানের সেই অংশটাই বিশেষত সেসব নিম্ন কম্পনবিশিষ্ট শব্দ দশ, বিশ, ত্রিশ দূরে থাকা অন্য তিমি ভালোভাবে শুনতে পায়। এভাবে পুরো তিমি সম্প্রদায়ের কে কোথায় আছে কি করছে সে বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান হয়।

আদি পতঙ্গভুকদের উত্তরসূরি পিঁপড়াভুক, বাদুড়, ছুঁচা ও তিমিরা অমেরুদণ্ডী প্রাণীকে আহার্য হিসেবে সংগ্রহের জন্যে ছুটতো। তবে পুষ্টির আরো অন্যান্য উৎস সন্ধানের অপেক্ষা ছিলো। সে উৎস হলো উদ্ভিদ। কতকগুলো প্রাণীর বিকাশ ঘটলো। এরা ঘাস খেতো। এরা অরণ্যের বাইরে এসে সমতলের মুক্তাঞ্চলে বিচরণ করে ঘাস খেতো। এদের অনুসরণ করলো মাংসাশী প্রাণীরা। পাশাপাশি দুটো পরস্পর নির্ভরশীল দলের প্রাণীর উদ্ভব হলো। শিকারীরা শিকারের কৌশল উন্নত করলো। সে সঙ্গে শিকার আত্মরক্ষার কৌশল রপ্ত করলো। দ্বিতীয় একটি দল গাছের আগায় পাতার সন্ধান পেলো। প্রতি দলের অবশ্যই নিজেদের একটি অধ্যায় আছে। কারণ, প্রথমত ওরা সংখ্যায় অসংখ্য, দ্বিতীয়ত, তাদের স্বকীয় আত্মকেন্দ্রিকতা। সেসব বৃক্ষচারীরাই আমাদের পূর্বপুরুষ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শিকারী ও শিকার

পাঁচ কোটি বছর আগে সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাবের পরপরই যে ধরনের অরণ্যের বিকাশ ঘটেছিলো, আজকের অরণ্যও অনেকটা সে অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানের মতো সেসময় এশিয়ায় জঙ্গল ছিলো। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় ঘন নিবিড় উঁচু বৃক্ষের বন ছিলো। ইউরোপে ছিলো শান্ত নিসর্গমণ্ডিত অরণ্যানী। যেখানে পর্যাপ্ত আলোর সংস্থান ছিলো সেখানে মাটিতে জন্মাতো নরম কাণ্ডের গুল্ম ও ফার্ন। বৃক্ষেরা দীর্ঘ হয়ে শাখা-প্রশাখার বিশাল ছাউনি ফেলতো। সর্বত্র ঋতুর পর ঋতু গাছেরা নব পল্লবে সজ্জিত হতো। যে সকল প্রাণী এসব পাতা সংগ্রহে সক্ষম ছিলো এবং যারা তা আহার করে হজম করতে পারতো, তাদের জন্য গাছ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চিরজীবন দায়ী অফুরন্ত খাদ্য সরবরাহ করতো।

ডায়নোসররা আহারের জন্য গাছের উপর নির্ভরশীল ছিলো। এরা উত্তর আমেরিকার অরণ্যে অ্যাশ, দেবদারু ও বিচ বৃক্ষের চারা মাড়িয়ে যেতো এবং উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যের পাম ও লিয়ানা বৃক্ষ ভেঙে চুরমার করে দিতো। কিন্তু যখন অজানা কারণে ওরা অদৃশ্য হলো, পৃথিবীর অরণ্যে শান্তির বাতাবরণ প্রতিষ্ঠিত হলো। পতঙ্গকুল অপ্রতিহতভাবে তাদের দাবী অব্যাহত রাখলো, কাঠ চিবালো ও পাতা কুঁচি কুঁচি করে কাটতে থাকলো। টিকটিকিরা পাতা ছিড়লো, পাখিরা নবোদ্ভূত ফলের স্বাদ বুঝতে শিখলো এবং গাছের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে গাছের বীজ বিতরণে সাহায্য করলো। কিন্তু কোনো বড় প্রাণীর দল পাতার এই খাদ্যভাণ্ডারকে পাইকারী ও ধারাবাহিকভাবে ভোজন করেনি, ডায়নোসররা যেমনটি করেছিলো।

হাজার হাজার বছর ধরে তুলনামূলক শান্তি বিরাজ করছিলো। তবে শেষ পর্যন্ত যে সকল ছোট উষ্ণশোণিত লোমশ প্রাণী ডাইনোসরের পায়ের নিচ দিয়ে ছুটোছুটি করতো, ছোট ছোট অমেরুদণ্ডী প্রাণীকে ছোঁ মারতো, তারা নূতন খাদ্যের আস্বাদ পেতে শুরু করলো। এদের কোনো কোনোটি পোকা-মাকড় ধরায় নিমগ্ন রইলো, অন্যরা দৃষ্টি ফেরালো গাছের পাতায়।

উদ্ভিদ ভোজন সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য বিশেষ দক্ষতা আবশ্যক। যে কোনো বিশেষ খাদ্য গ্রহণে যেমন বিশেষ অঙ্গের অপরিহার্যতা দেখা দেয়। পাতার জন্যও তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার যে শাক-সবজি খুব পুষ্টিকর নয়। একটি প্রাণীকে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরি শক্তি সংগ্রহের জন্য বিশাল পরিমাণ উদ্ভিদ ভোজন করতে হয়। কতিপয় নিবেদিত উদ্ভিদভোজীকে কর্ম ঘন্টার বা দিনের তিন-চতুর্থাংশ সময় গাছের পাতা-কাণ্ড সংগ্রহ করতে হয়, চিবাতে হয়। এই প্রক্রিয়া, প্রাণীটির জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ প্রাণীকে মুক্তাঙ্গনে বিচরণ করতে হবে। বিচরণকালে সে আক্রান্ত হতে পারে। প্রাণী এই ঝুঁকি কমাতে পারে যদি সে যতো দ্রুত ও যতো বেশি সম্ভব খাদ্য কেড়ে নিয়ে দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকার দানো ইঁদুর এই কৌশলই নিয়ে থাকে। এটি খুব সতর্ক হয়ে রাতে গর্ত থেকে বেরয় এবং সে নিশ্চিত হয় সে সেখানে কোনো ভয়

নেই। নিঃসংশয় হবার অনেক পরে সে আহারযোগ্য যা পায়, পাগলের মতো তাই গণ্ডের থলেতে পুরে নেয়। সংগ্রহের মধ্যে থাকে বীজ, বাদাম, ফল, মূল, কখনো কখনো শামুক বা গুবরে পোকা ইত্যাদি। গণ্ড থলে এতো বড় যে, এর মধ্যে দুশো বা এরও বেশি গ্রাস খাদ্যের জায়গা হয়। যখন দু'পাশ ঠেসে ভরা হয়, তখন ইঁদুর কষ্টেসৃষ্টে মুখ বন্ধ করে। ইঁদুরের মুখমণ্ডল এমন ফুলে উঠে যে, মনে হয় সে মারাত্মকভাবে মামপস রোগে আক্রান্ত। খাবার নিয়ে ব্যস্তসমস্ত ইঁদুর গর্তে ঢুকে পড়ে। মাটির নিচে খাদ্যভাণ্ডারে সংগৃহীত খাদ্য জমা করে এবং খাদ্যসমূহ বাছাই করতে শুরু করে। খাদ্যোপযোগী বস্তু চিবিয়ে দেখে এবং কাঠের ছোট টুকরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুড়ি ইত্যাদিকে ভবিষ্যতে কাজে আসবে মনে করে এক পাশে সরিয়ে রাখে। তবে এ সকল বস্তু কখনো কাজে আসে না, বরং তাদেশ হতাশ করে।

উদ্ভিদভোজীদের বিশেষ ভালো দাঁত থাকতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে কেবল যে এর ব্যবহার চলে তা নয়। একে যে সকল বস্তুর মোকাবেলা করতে হয় তাও খুব শক্ত। কাঠবিড়ালী, নেংটি ইঁদুর, বিভার, সজারুর মতো ইঁদুরেরা সামনের চিবানোর দাঁতের ও কর্তন দাঁতের গোড়া উন্মুক্ত রেখে এই সমস্যার মোকাবেলা করেছে। এসব দাঁত ক্ষয়ে গেলে আবার গজায়। এই কাণ্ড সারাজীবন ধরে চলতে থাকে। খুব সহজ অথচ ফলপ্রসূ আত্ম-শান দেওয়ার প্রক্রিয়ার দ্বারা ওরা দাঁতের ধার বজায় রাখে। কর্তন দণ্ডের মূল কাঠামো ডেন্টাইন (dentine) নির্মিত, কিন্তু এর সম্মুখভাগ পুরু ও প্রায়ই উজ্জ্বল বর্ণের এনামেল (enamel) দ্বারা আবৃত। এনামেল, ডেন্টাইন থেকে শক্ত। ফলে দাঁতের কর্তন-ধার বা দাঁতের কিনারা বাটালির আকৃতি পায়। কর্তন দাঁতের শীর্ষদেশ যখন চূর্ণ করে, নিচের ডেন্টাইন অংশ দ্রুত ক্ষয়ে যায়, ফলে এনামেলের ধার অবমুক্ত হয়। এতে দাঁত বাটালির আকৃতি নেয়।

চর্বিত, চূর্ণীত ও মণ্ডকৃত খাদ্যকে হজম করতে হবে। এতেও বড় ধরনের সমস্যা আছে। উদ্ভিদকোষ যে সেলুলোজ দ্বারা গঠিত হয়, তা জৈবপদার্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্থায়ী। কোনো স্তন্যপায়ী সৃষ্ট পাচক রস এর উপর কার্যকর নয়। কিন্তু কোষমধ্যস্থ পুষ্টিকর বস্তু সকলকে মুক্ত করা গেলে সেগুলো কোনোভাবে ভাঙা যেতে পারে। ওসব যদি খুব পুরু না হয়, তাহলে যান্ত্রিকভাবে চিবিয়ে একে ভাঙা যায়। অবশ্য কতকগুলো ব্যাকটেরিয়ার বিরল গুণ আছে। এই গুণের সাহায্যে ওরা একটা গাঁজন উৎপাদন করে যা সেলুলোজকে দ্রবীভূত করে। উদ্ভিদভোজীদের পাকস্থলিতে এই ব্যাকটেরিয়া উৎপাদিত হয়। ব্যাকটেরিয়ার আহার্য হলো সেলুলোজ। পাকস্থলি কোষের অন্যান্য উপাদান শোষণ করে। পুরোপুরি উদ্ভিদভোজীদের ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত খাদ্য হজম হতে সময় লাগে অনেক বেশি।

শশক সোজাসুজি হজমের কাজটি অন্য উপায়ে সম্পন্ন করে। এই উপায় সচরাচর অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। পাতা আহারের পর, কর্তন দাঁত পাতা খণ্ড খণ্ড করে ও পেষণ দাঁত তা চূর্ণ করে ও পরে তা গেলা হয়। পাকস্থলিতে খাদ্য আসার পর তা অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পাকস্থলি নিঃসৃত পাচকরসের সাথে মিশ্রিত হয়। শেষপর্যন্ত খাদ্যবস্তু অন্ত্রে নেমে আসে এবং নরম বড়িতে পরিণত হয়ে পরিত্যক্ত হয়। সাধারণত শশক গর্তে বিশ্রাম নেবার সময় এরকম ঘটে। যখনই মলদ্বার দিয়ে বড়িগুলো বেরিয়ে আসে তখনই সে ফিরে আবার ওগুলো গিলে ফেলে। সেগুলো পাকস্থলিতে যায় এবং বড়ির অবশিষ্ট পুষ্টি পাকস্থলি

বের করে নেয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া শেষে বড়িগুলোকে গর্তের বাইরে এসে ত্যাগ করা হয়। শশকের গর্তের বাইরে প্রায়ই এসব বাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা যায়।

হাতির বিশেষ ভারী সমস্যা রয়েছে। কারণ এরা শুধু পাতা খায় না, এরা প্রচুর পরিমাণ আঁশযুক্ত ডালপালা ও কাষ্ঠল বস্তুসমূহ ভক্ষণ করে। গজদন্ত ছাড়া, এদের একমাত্র দাঁত হলো চর্বন দাঁত। মুখের পেছনভাগে চর্বন দাঁত থাকে। এরা প্রচণ্ডভাবে খাদ্যবস্তুকে চূর্ণ করে। চর্বণ দাঁত ক্ষয়ে গেলে কয়েক বছর পর পর নূতন চর্বন দাঁত গজায় পেছনের দিকে। পরে এই দাঁত স্থানান্তরিত হয়ে সামনে চলে আসে। চর্বন দাঁত সাঙ্ঘাতিক চাপ দিয়ে খাদ্যবস্তুকে পেষণ করে এবং মণ্ডে পরিণত করে। তবু, হাতির খাদ্য এতো কাষ্ঠল যে একে হজম করে এর থেকে সারবস্তু বের করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। হাতির পাকস্থলি অবশ্য বেশ বড়। কাজেই এতে হজমের কাজের জন্য খাদ্য বেশি সময় ধরে রাখার মতো সংস্থান থাকে। মানুষ আহার করার পর সাধারণত হজম প্রক্রিয়া শেষ হতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। সেক্ষেত্রে হাতির লাগে আড়াই দিন। কারণ, বেশিরভাগ সময় খাদ্য পাকস্থলির পাচক রস ও ব্যাকটেরিয়ার নির্যাসের মধ্যে হজম হতে থাকে। ইতিহাসের বেশ আদিকালে ফার্ন ও সাইক্যাড আহারকারী কিছু ডায়নোসরকে একই ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় এবং একইভাবে সমাধান করতে হয়, এবং এটি সম্ভব হয়েছিলো বিশাল বপু সৃষ্টির মাধ্যমে।

হাতির মলে, এতো দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পরও, প্রচুর ডালপালা, আঁশ, বীজ আস্ত থেকে যায়। হাজার হাজার বছর ধরে হাতি কতকগুলো গাছ খেতে অভ্যস্থ। এসব গাছ বংশরক্ষার্থে বীজে এমন কঠিন আবরণের সৃষ্টি করেছে যাতে হাতির পাকস্থলির পাচকরসে তা দীর্ঘদিন থেকে ভিজলেও যেন পচে না যায়। কিন্তু বর্তমানে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ঘটনা যে, হাতির পাচক রসে বর্তমানে বীজাবরণ নরম না হলে আদৌ বীজে অঙ্কুর গজায় না।

এন্টেলোপ, হরিণ, মোষ ও গৃহপালিত ভেড়া ও গরু সেলুলোজ হজম করার জন্য অতি পরিচিত দীর্ঘ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়। ওরা নিচের পার্টির কর্তন দাঁতের সাহায্যে মাঠ থেকে ঘাস কাটে এবং ঘাসকে জিহবা বা উপরের চোয়ালের মাড়ি দিয়ে চাপ দেয়। উপরের চোয়ালে সামনের অংশে দাঁত থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে ঘাস গিলে ফেলে এবং তা রোমন্থন থলেতে পৌঁছায়। রোমন্থন থলে পাকস্থলিরই একটি অংশ। এখানে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। ব্যাকটেরিয়া জারক রস নিঃসরণ করে। এখানে খাদ্যকে পেশিযুক্ত থলেতে নিংড়ানো হয় এবং খাদ্যকে সামনে পেছনে নাড়িয়ে মন্থন করা হয়। এ সময় ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজের উপর ক্রিয়া করে। তালগোল পাকানো খাদ্যকে আবার গলায় তুলে আনা হয়, একসাথে মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে পেষণ দণ্ডের সাহায্যে চিবানো হয়। রোমন্থক এই প্রাণীদের চোয়াল কেবল উপর নিচ করতে পারে না, সামনে-পেছনেও যেতে পারে। রোমন্থনের কাজটি করে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে, অবসরে। যখন প্রাণী মুক্ত বিচরণ প্রান্তর ছেড়ে, দিনের গরমের সময় গাছের ছায়ায় বসে আরাম করে তখনও রোমন্থন চলে। শেষ পর্যন্ত মুখ ভর্তি চিবানো খাবার দ্বিতীয় বারের মতো গেলা হয়। খাদ্য রোমন্থন থলে হয়ে মূল পাকস্থলিতে যায়। পাকস্থলিতে শোষণ প্রাচীর থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রাণী এই পর্যায়ে তার সকল শ্রমের কিছুটা ফায়দা উঠাতে পারে।

খাদ্য হিসেবে পাতার আরো একটি দুর্বল দিক আছে। পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের অঞ্চলসমূহে অধিকাংশ গাছে একসাথে কয়েক মাস পাতা থাকে না। যে সব প্রাণী পাতা-নির্ভর, শীত আসার আগে তাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। এশীয় ভেড়া

খাদ্যকে চর্বিতে পরিণত করিয়ে লেজের চারপাশে গদীর আকৃতিতে জমা করে। অন্যান্য প্রাণী যতদূর সম্ভব দেহে চর্বি জমা করে এবং কয়েক মাস শীত নিদ্রায় কাটায়। ফলে খাদ্যের চাহিদা কমে যায়।

শীতনিদ্রার কারণ অবশ্য সঠিক শনাক্ত করা যায়নি। কেউ যদি মনে করেন যে কেবল তাপমাত্রা নেমে যাওয়াই এর নিশ্চিত কারণ, তাহলে একটি প্রাণীকে অবিরাম গরম রাখা ঘরে রাখা সত্ত্বেও সে শীতনিদ্রা যায়, যেমনটি তার সহযাত্রীরা শীতকালের ঠাণ্ডায় বাইরে শীতনিদ্রায় কাটায়। আসলে ওদের দেহের জমা চর্বিই ওদের শরীরে উত্তেজনা জাগায়। যে পরিমাণ চর্বি ধারণ সম্ভব, সে পরিমাণ চর্বি প্রাণিদেহে জমা হলে, প্রাণী তখন নিদ্রায় গিয়ে ঐ খাবার স্বতঃস্ফূর্তভাব আত্মীকৃত হতে থাকে।

ডরমাউসকে (Dormouse) শীতকালে একটা প্রায় গোলাকৃতির বস্তুর মতো দেখায়। এটি গর্ত খুঁজে নেয়। মাথা পেটে গুঁজে, চোখের দৃষ্টি উপরের দিকে রেখে, নরম লোমশ লেজ দেহের চারপাশে জড়িয়ে এরা ধীরে ধীরে দেহের তাপ সরে যেতে দেয়। ক্রমে ওদের হৃৎস্পন্দনের হার কমে আসে। এর শ্বাস-প্রশ্বাস এতো অগভীর এবং এতো দীর্ঘ বিরতিতে হয় যে, তা বোঝা খুব মুশকিল। পেশিগুলো শক্ত হয় এবং পুরো শরীর পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জৈবনিক ক্রিয়াকাণ্ড স্থগিত থাকার ফলে দেহের জ্বালানি ব্যয় খুব কম হয়। কাজেই যে পরিমাণ জমা চর্বি থাকে তা দিয়ে দেহের সকল অপরিহার্য কাজ কয়েক মাস ধরে চলতে পারে। অতি ঠাণ্ডায় প্রাণী জেগে যায়। যদি ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাবার বিপদ দেখা দেয়। তখন এরা নড়ে উঠে এবং ভয়ানক কাঁপতে শুরু করে। কেঁপে কেঁপে পেশিতে জ্বালানি পুড়িয়ে দেহকে উষ্ণ করে। এমনকি জরুরি প্রয়োজনে ওরা দেহের অবশিষ্ট জমা চর্বি দ্রুত দৌড়াদৌড়ি করে ঠাণ্ডার দুর্দান্ত প্রকোপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পোড়াতে থাকে। তারপর আবার ঘুমোতে যায়। সাধারণত বসন্তের গরম আবহাওয়ায় ডরমাউস ও অন্যান্য শীতনিদ্রাভোগী প্রাণীরা গর্তের বাইরে আসে। এদের তখন প্রচণ্ড ক্ষিদে। জরুরি খাদ্য সংগ্রহ করা চাই। কারণ শীতে ওদের দেহের ওজন প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু এখন আর উপোস দিতে হবে না। গাছে গাছে পাতারা আবার উঁকি দেয়।

এ ধরনের পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে বিশাল সংখ্যক নানা ধরনের প্রাণী শাক-সবজি খেয়ে দেহের পুষ্টির প্রয়োজন মেটায়। পৃথিবীর অরণ্যসমূহ শাক-সবজি সরবরাহ করে। গাছের আগায় ডালপালার মধ্যে কাঠবিড়ালী দাপাদাপি করে বেড়ায়। গাছের বাকল, কাণ্ড, ফল ফুল সংগ্রহ করে। কতিপয় প্রজাতিতে সামনের ও পেছনের পায়ের মধ্যে লোমশ পর্দা থাকে। পর্দার সাহায্যে ওরা শাখা থেকে শাখায় গড়িয়ে যায়।

গাছের উপরে বানরেরও আবাস। বানরের বহু প্রজাতি বহু ধরনের খাদ্য যেমন পতঙ্গ, ডিম, পাখির ছানা, ফল খায়। কিন্তু অন্যরা কেবল নির্দিষ্ট গাছের পাতা খায় এবং এগুলো হজমের জন্য জটিল ধরনের পাকস্থলি গড়ে ওঠে। মাটির উপরের নিরাপত্তাহীন জগতে জীবন যাত্রা নির্বাহে ওদেরকে চমৎকার কর্মতৎপর হতে হয়, মুষ্টিবদ্ধ করা যায় এমন ধরনের হাত থাকতে হয় এবং ত্বরিৎ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়। তাদের মধ্যে এসকল গুণের সমন্বয়ের ফলে শেষ পর্যন্ত ওদের আরো বিকাশ ঘটেছে। এ কারণে ওদের নিয়ে স্বতন্ত্র একটা অধ্যায়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হবে। মাটির উপরে পত্রাহারী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ওদের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য নয়। প্রথম একটি প্রাণী বৃক্ষশাখায় জীবনযাপনে গিয়েছিলো। প্রাণীটি

BANSDOC Library Dhaka

দক্ষিণ আমেরিকার শ্লথ। শ্লথ বৃক্ষাচারী হওয়ার সমস্যাকে সমাধান করেছে ঠিক বানর যেভাবে করেছে তার বিপরীত উপায়ে।

শ্লথ দুইপ্রকার। দুই আঙুল ও তিন আঙুলধারী শ্লথ। এদের মধ্যে তিন আঙুলধারী শ্লথই বেশি কুঁড়ে। দীর্ঘ হাড়বিশিষ্ট হাতের শেষ প্রান্তে থাকা বড়শির মতো নখর দিয়ে ওরা শাখা আঁকড়ে ঝুলে থাকে। এরা কেবল সেক্রোপিয়া গাছের পাতা খায়। এ গাছ শ্লথের জন্য সহজলভ্য। এগুলো সংখ্যায় জমায়ও বেশি। কোনো শিকারী প্রাণী শ্লথকে আক্রমণ করে না। সেক্রোপিয়া গাছে, তাদের কাছে, প্রকৃতপক্ষে, কেউ এমনকি পৌছাতেও পারে না। এই গাছের পাতা আহারে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। এ রকম নিরাপত্তায় প্রলুব্ধ হয়ে এরা এমনই এক অস্তিত্বে নিমগ্ন হয় যে, বলা যায় অনেকটা অবশের মতো পড়ে থাকে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৮ ঘন্টাই ঘুমিয়ে কাটায়। সে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে উদাসীন। এর মোটা লোমের মধ্যে সবুজ শেওলা জন্মায়। লোমের গভীরে চামড়ার উপর পরজীবী মথ সম্প্রদায় বাস করে এবং ওর মধ্যে শূককীট উৎপাদন করে। ছাতাপড়া লোমের মধ্যে শূককীট ঘুরে বেড়ায়। এর পেশিগুলো এরকম যে, এগুলো, এমনকি স্বল্পতম দূরত্বেও ঘণ্টায় এক কিলোমিটার বেগে প্রাণীকে চালানোয় সক্ষম হয় না। নখরযুক্ত হাতই কেবল দ্রুত নাড়াতে পারে। এরা মূলত বোবা। শ্রবণশক্তিও এতো কম যে এক সেন্টিমিটার পাশ থেকে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় না। এরা ধীরে পাশ ফিরে ও চোখ পিটপিট করে। এটুকু মাত্র ওরা সাড়া দেয়। অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর তুলনায় ওদের ঘ্রাণশক্তি কম তীক্ষ্ম, যদিও ঘ্রাণশক্তি আমাদের চেয়ে বেশি। এরা একা একা খায় ও ঘুমায়।

কিন্তু এদেরও কোনো না কোনো ধরনের সামাজিক জীবন নির্বাহ করতে হয়। এরকম অল্প ও ভোঁতা ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রজননের জন্য একটি শ্লথ অন্য একটি শ্লথকে খুঁজে পায় কিভাবে? একটি মাত্র পথ আছে। দেহের অন্যান্য প্রক্রিয়ার মতো শ্লথের হজমক্রিয়াও ধীরে চলে। এটি সপ্তাহে একবার মলমূত্র ত্যাগ করে। কিন্তু অতি বিস্ময়ের কথা মলমূত্র ত্যাগের জন্য ওরা মাটিতে নামে এবং অভ্যাসগতভাবে একই জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে। এটি তার জীবনের একমাত্র মুহূর্ত যখন সে সত্যিকারের বিপদে পড়তে পারে। এ সময় জাগুয়ার একে সহজে ধরতে পারে। আপাতত অপ্রয়োজনীয় এই ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিশ্চয়ই আছে। এর মল ও মূত্রে চরম ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ থাকে। শ্লথের ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই কেবল একটু বেশি সক্রিয়। কাজেই শ্লথের জমানো আবর্জনাই অরণ্যে একটি স্থান যা অন্য শ্লথের পক্ষে সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এবং এই জায়গাতেই সপ্তাহে একবার বা একাধিকবার দুটি শ্লথের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়াও সম্ভব। এটিই হতে পারে ওদের মিলনক্ষেত্র। মাটির উপরে এভাবে মিলিত হওয়া ছাড়া আর কোনো সহজ পথ নেই। আমরা এ ব্যাপারে অবশ্য নিশ্চিত হতে পারি না। কারণ প্রাণীর আচরণ নিয়ে গবেষণারত কোনো ছাত্র এখন পর্যন্ত এমন কোনো সাহসের, তিতিক্ষার ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন চুপচাপ বসে থেকে শ্লথের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনযাপন বিষয়ে এর বেশি তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি।

অরণ্যের মাটির কাছাকাছি শাক-সবজি জন্মে কম। কতক অঞ্চল এমনই ঘন ছায়াবৃত যে সেখানে পচা পাতার পুরু স্তর এবং পাতা ভেদ করে উঠা কিছু ছত্রাক ছাড়া আর কিছুই থাকে না। অন্যত্র যদি ডাল-পাতার চাঁদোয়া কম পুরু থাকে, তাহলে মাটিতে কিছু গুল্ম ঝোপঝাড়, কিছু গাছের চারা গজায়। আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছোট এন্টেলোপ, মাউসডিয়ার ও

ডুইকার (Duiker) এ ধরনের উদ্ভিদ আহার করে। এদের আকার কুকুরের আকারের অনুরূপ। এরা খুব লাজুক। এদের দেখার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। ওরা ধীর পায়ে নিঃশব্দে চিত্রবিচিত্র ছায়ার মধ্যে দিয়ে এসে খুঁতখুঁতে মনোভাব প্রদর্শন করতে সতর্কভাবে খুঁটে খুঁটে পাতা বাছাই করে। অরণ্য জীবনের এই রহস্য কখনো ভুলবার নয়। মাংসাশী ও নিরামিষাশী প্রাণীর অতি প্রাচীন ইতিহাস আছে। পাঁচ কোটি বছর আগে আদি পত্রাহারী বিশেষজ্ঞ প্রাণীদের মধ্যে আজকের রোমন্থন স্তন্যপায়ীর মতো প্রাণী ছিলো।

দক্ষিণ আমেরিকায়, রোমন্থকদের ভূমিকা শিংযুক্ত প্রাণীরা পালন করেনি। রোডেন্ট বা ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, পাকা (Paca) অ্যাগোটি প্রভৃতি দলের প্রাণী এই ভূমিকা পালন করেছে। এরা আকারে ও আকৃতিতে পরস্পর সদৃশ্য, এরা একক জীবন নির্বাহ পছন্দ করে। ওদের সবার মেজাজ মর্জিও প্রায় একই রকম। কোন কিছু ঘটলে ওরা স্নায়ুর চাপে ভুগে। ওরা লাজুক। বিপদের সামান্য সন্দেহ জাগলে বা অপরিচিত গন্ধ পেলে এরা গুটিয়ে যায়, ভয়ার্ত বিশাল গোল চোখে তাকায়। ডালপালার নড়ে উঠার শব্দে ওরা মাথা উঁচিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে দিগ্বিদিক ছুটে।

উঁচু গাছপালা ও চারা গাছের ডালপালা ছিঁড়ে খেতে হলে প্রাণিদেহ বড় হওয়া চাই। প্রতিটি অরণ্যে টাট্টু ঘোড়া থেকে ঘোড়ার আকারের অল্পবিস্তর প্রাণী থাকে। এরা এতো গোপনে, নিঃশব্দে চলে যে এবং সংখ্যায় এতো কম যে, ওদের চোখে পড়ে কালে-ভদ্রে। মালয় ও দক্ষিণ আমেরিকার নিশাচর টাপির, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অঞ্চলসমূহে সামান্য লোমযুক্ত এ ধরনের প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণী হলো সুমাত্রার রাইনোসেরোস বা গণ্ডার। এরা দুঃখজনকভাবে বিলুপ্ত প্রায়। জিরাফের নিকট্যাত্মীয় খাট স্কন্ধের ওকাপি ছিলো কঙ্গোতে। বিজ্ঞান সর্বশেষ সবচেয়ে বড় যে প্রাণীটিকে আবিষ্কার করেছে তা হলো ওকাপি (Okapi)। এরা লাজুক প্রকৃতির প্রাণী। এই শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপীয়রা এই প্রাণীটিকে আর দেখতে পায়নি।

অরণ্যের মাটিতে বিচরণকারী বড় ছোট এই সকল প্রাণী একক জীবন নির্বাহে অভ্যস্ত। এর কারণ খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য নয়। একটি অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে বড় দলের প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার মতো ডাল-পাতার সরবরাহ ছায়াঘন অরণ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। যেভাবে হোক, যদি কতিপয় প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, তাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা আবশ্যক। বনের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা সম্ভব নয় এবং শব্দ-সংকেত ব্যবহার করলে শিকারী প্রাণী আকর্ষিত হতে পারে। কাজেই মাউসডিয়ার, অ্যাগোটি (Agouti) ও তাপির জোড়ায় জোড়ায় চলে। তারা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করে। অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করে মলমূত্র বা চোখের কাছে অবস্থিত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের সাহায্যে। আত্মগোপনই ওদের আত্মরক্ষার কৌশল। বিপদ টের পেলে তাদের পরিচিত গুল্ম ঝোপ-ঝাড়ের গোপন আশ্রয়ে ওরা যেন হাওয়া হয়ে যায়। অর্থাৎ পলকে ওরা গোপন স্থানে সরে পড়ে।

শিকারের সন্ধানী শিকারীরাও একক জীবন নির্বাহ করে। জাগুয়ার কব্জা করে তাপিরকে, চিতা বাঘ থাবা বসায় ডুইকারের ঘাড়ে। ভ্রমণরত ভালুক অধিকাংশ জিনিস খায় এবং সুযোগ পেলে মাউসডিয়ারকেও মোকাবেলা করে। শিকারীদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট জেনেট (Genets) জংলী বিড়াল, গন্ধগোকুল (Civets)ও বেজী (Weasels) ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর ছাড়াও পাখি ও সরীসৃপ খায়।

সকল শিকারী প্রাণীর মধ্যে বিড়ালই মাংস খাওয়ায় বিশেষত্ব অর্জন করেছে। এরা নখরকে খাপে গুটিয়ে রাখার মাধ্যমে তীক্ষ্ম রাখে। আক্রমণকালে বিড়াল শিকারের গায়ে বড়শির মতো বাঁকা নখর ঢুকিয়ে দেয় এবং ঘাড়ে তীব্র কামড় বসায়। ফলে স্নায়ু রজ্জু ছিঁড়ে গিয়ে শিকারের দ্রুত মৃত্যু ঘটে।

মাংসাশীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সামনের দাঁতের ঠিক পেছনে, মুখের দু'পাশে, লম্বা ছুরির মতো দাঁত। এই দাঁত দিয়ে ওরা শিকারের চামড়া ছিলে নেয়। আরো পেছনে খাঁজ কাটা দাঁত রয়েছে চোয়ালে। এই দাঁত মাংস কাটার জন্যে। সব দাঁত জবাইয়ের কাজ সম্পন্ন করার যন্ত্রবিশেষ। কুকুর ও বিড়ালদের কেউ আসলে চিবোতে পারে না। এরা খাদ্যকে দলা করে দ্রুত গলায় ঠেলে দেয়। লতা-পাতা থেকে মাংস হজম করা তুলনামূলকভাবে সহজ। হজমের কাজে শিকারীর পাকস্থলির সাহায্য লাগে কম।

আদি অরণ্যে শিকারী প্রাণীরা ওৎ পেতে, শনাক্তকরণের মাধ্যমে উড়ে গিয়ে ও থাবা মেরে একা একা রাতের অন্ধকারে যে কৌশলে উদ্ভিদভোজী প্রাণীদেরকে শিকার করতো, আজো তাই করে। তবে ২.৫ কোটি বছর আগে নূতন ও একেবারে ভিন্ন কিছু কৌশলের বিকাশ ঘটেছিলো। পৃথিবীর আবহাওয়া ও নিসর্গে পরিবর্তন আসায় শিকারীদেরকেও ছায়ার বাইরে অর্থাৎ মুক্তাঙ্গনে বেরিয়ে আসতে হয়। তখন তৃণভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

ঘাস সরল ও আদি উদ্ভিদ মনে হয়। আকারে ছোট। এর পাতা ও মূল থাকে। আসলে এরা বেশ উন্নত উদ্ভিদ। এদের ছোট, অস্পষ্ট ফুল থাকে। পরাগায়নে এরা পতঙ্গের উপর নির্ভরশীল নয়। মুক্তাঙ্গনে বাতাস এদের পরাগ বয়ে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তরে। এদের কাণ্ড মাটির একটু উপরে বা মাটির একটু নিচ দিয়ে আড়াআড়িভাবে প্রলম্বিত থাকে। যখন মুক্তাঙ্গনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, পুরনো শুষ্ক পাতা পুড়ে পুড়ে আগুন বিস্তৃত হয়। কিন্তু কাণ্ড ও মূল অক্ষত থাকে। এই কাণ্ড ও মূল থেকে আবার পাতা গজায় সঙ্গে সঙ্গেই। এটি সম্ভব একারণে যে ঘাসের পাতা কাণ্ডের শীর্ষদেশ থেকে গজায় না, যেমনটি গজায় গুল্ম ও বৃক্ষে। এদের পাতা গজায় কাণ্ডের গোড়া থেকে। ঘাসভোজী প্রাণীদের জন্যও তা খুবই উপকারে আসে। উপর থেকে ঘাসের পাতা ছিঁড়ে বা কেটে নেয়ার পরপরই পাতা আবার বাড়তে থাকে। বাড়ন্ত পাতা ওদের খাদ্য যোগায়।

গরু-বাছুরের পালও ঘাসের উপকার করে। ওরা গুল্ম, ঝোপঝাড় ও গাছের চারা মাড়িয়ে নষ্ট করে ও আহার করে। নইলে ওরা বড় হয়ে ঘাসকে আলো থেকে বঞ্চিত করতো এবং ঘাসকে স্থানচ্যুত করতো। কাজেই, দেখা যাচ্ছে তৃণভূমির বিস্তার ও তৃণভোজী প্রাণীর বিকাশ যুগপৎ সম্পন্ন হয়েছে ক্রমে ক্রমে।

মুক্তাঙ্গন কেবল তৃণভোজীদেরকে আকর্ষণ করেনি। এখানে লুকানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। খাদ্যের অন্বেষণে শিকারী প্রাণীরাও এই মুক্তাঙ্গনে আসতে প্রলুব্ধ হয়। সবচেয়ে বড় আমিষাশী প্রাণী হাতি ও গণ্ডারের এতে ভয় নেই। এদের জন্য বৃক্ষের ভিতর দিয়ে সহজে ও নিঃশব্দে গমনে সক্ষমতা অর্জন আবশ্যক হয়ে উঠেছিলো এবং ফলে তাদের একটি নির্দিষ্ট আকারও সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু সেখানে তাদের কোনো সীমাবদ্ধতা ছিলো না। ফলে ওরা আকারে এখনো বড় হচ্ছেই। এদের বিশাল বপু এবং বপুতে মজবুত চামড়া। কোনো মাংসাশীর পক্ষে এদেরকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়। কিন্তু খাদ্যসম্ভার সমৃদ্ধ মুক্তাঙ্গন ছোট প্রাণীদের জন্য আকর্ষণীয় হলেও বিপজ্জনকও বটে।

কেউ কেউ মাটির গর্তে নিরাপদ আশ্রয় করে নিয়েছে। সুড়ঙ্গ খননের জন্য তৃণভূমি চমৎকার জায়গা। তৃণভূমির ভূগর্ভে গাছের মূল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করার সুযোগ পায় না। কাজই, বিনা বাধায় ওরা বিস্তর সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে এবং বহু প্রজাতির প্রাণী অভূতপূর্ব এই সুযোগ গ্রহণ করেছে।

খুবই নিবেদিত ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের খনক হলো অদ্ভুত ইঁদুর গোষ্ঠি বা রোডেন্ট। পূর্ব আফ্রিকার আবরণহীন ছুঁচো এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ছুঁচো কেবল ঘাসের পাতা খায় না, ঘাসের মূল কন্দ ইত্যাদিও খায়। এরা সপরিবারে বাস করে। ভূগর্ভের নিচে ব্যাপক সুড়ঙ্গ খুঁড়ে। সুড়ঙ্গ বিশেষ বাসগৃহ, সেবাসদন, গুদাম ঘর ও পায়খানা ঘর ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। গরমকালের পুরোটাই ওরা ভূগর্ভে কাটায়। আফ্রিকার সমভূমির শুষ্ক মাটি ওদের মধ্যে নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে। এরা দৃষ্টিশক্তিকে ব্যবহার করে না, গায়ে লোমও নেই। অন্ধ, অনাবৃত, নলাকৃতির দেহবিশিষ্ট ছুঁচোর দেহে থাকে কুঁচকানো ধূসর বর্ণের ত্বক। এদের অদ্ভুত-দর্শন কর্তন দাঁতও এদের অবয়বে কোনো উন্নতি ঘটাতে পারেনি। মুখের সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে দাঁতগুলো মাথা থেকে বেরিয়ে থাকে। এগুলোকে আহারের কাজে নয় শুধু গর্ত খোঁড়ার কাজেও ব্যবহার করা হয়। মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ বানানোর কাজ অরুচিকর, কিন্তু ছুঁচো অন্যান্য খনকদের মতো মুখভর্তি মাটি নেওয়া থেকে বিরত থাকার কৌশল অবলম্বন করে। এরা বেরিয়ে থাকা দাঁতের উপরে ঠোঁট ভাঁজ করে রাখে এবং মুখ জোর করে এঁটে খননের কাজ চালিয়ে যায়।

খোঁড়ার সময় ওরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে। সামনের খননকারী ব্যস্তসমস্ত হয়ে মাটি খুঁড়ে এর পেছনের ছুঁচোর মুখে ছুঁড়ে। যেহেতু এরা অন্ধ, চোখেমুখে মাটি পড়ায় উদ্বেগবোধ করে না। সেও পায়ের মধ্যে দিয়ে মাটি সারির তৃতীয় ছুঁচোর মুখে ছুড়ে দেয়। এভাবে একের পর এক মাটি পেছনে ঠেলতে ঠেলতে মাটি সুড়ঙ্গের উপরে চলে আসে। সুড়ঙ্গের মুখে শাঙ্কবাকৃতির ছোটখাট অগ্ন্যুৎপাত সৃষ্ট স্তূপের মতো মাটি জমে যায়।

হাতে গোনা শত্রুই কেবল ছুঁচোকে আহারে পরিণত করতে পারে। ছুঁচো যে কোনো বিড়াল বা কুকুরের চেয়ে দ্রুত খনন করতে পারে এবং এদেরকে মাটির উপরে আসারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে সকল খনক ঘাসের মূল খায় না এবং ঘাস খায় তাদেকে আহারের জন্য গর্তের বাইরে যে কোন একটা সময়ে আসতেই হয়, তখন এদের বিপদে পড়ার বেশ সম্ভাবনা থাকে। উত্তর আমেরিকার সমতলভূমিতে ছোট শশকের আকারবিশিষ্ট ইঁদুরগোষ্ঠী কলোনি স্থাপন করে, এদের একটি সদস্যের নাম প্রেইরি ডগ (Prairie dog) বা পরী কুকুর। এরা মাটির উপরে কেবল বিচরণই করে না, এরা দিনের বেলায় সে সময়েই বিচরণ করে যখন ছোট নেকড়ে, বনবিড়াল, বেজী ও বাজ পাখি জাতীয় প্রাণীরা উপস্থিত থাকে। সুযোগ পেলেই ওরা পরী কুকুড়ের ঘাড় মটকায়। পরী কুকুররা এ কারণে আত্মরক্ষার উপায় বের করেছে যা উন্নতভাবে সংঘটিত সামাজিক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

এদের ঘন বসতি। বসতিকে শহর বলা হয়। এক শহরে হাজার হাজার পরী কুকুরের বাস। প্রতিটি শহর কতকগুলো কমিউনিটিতে বিভক্ত। কমিউনিটি বা এলাকাগুলোর নাম কুঠুরী বা প্রকোষ্ঠ। প্রতি কুঠুরীতে ৩০টি প্রাণী থাকে। এরা পরস্পরকে ভালোভাবে জানে। এদের অনেকের আন্তঃসংযোগের সুড়ঙ্গ থাকে। কুঠুরীর কয়েকটি সদস্য পাহারার দায়িত্বে থাকে। এরা গর্তের উপরে ঢিবির ঠিক নিচে অর্থাৎ সুড়ঙ্গের মুখের নিচে খাড়া হয়ে এমনভাবে

বসে যাতে বাইরে কি ঘটছে তা ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে। কেউ শত্রু চিহ্নিত করতে পারলে সে পর পর লুইসেলের আওয়াজের মতো শব্দ ছুঁড়ে। বিভিন্ন শিকারী বিভিন্ন ধরনের ডাক দেয়। কাজেই সবাই বিপদ সম্পর্কে শুধু জানতো পারে নই বিপদটা কি তাও বুঝতে পারে। সুড়ঙ্গ-প্রহরীর ডাক শুনে নিকটে যারা থাকে তারাও চীৎকার শুরু করে। এভাবে শব্দ সারা শহরে ছড়িয়ে যায়। তখন সবাই সতর্ক প্রহরায় থাকে। বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায় না, বরং গর্তের কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শত্রুর মোকাবেলায় অপেক্ষমান থাকে। সেই অবস্থান থেকে, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অনুপ্রবেশকারীর দিকে তাকায় এবং তার গতিবিধি লক্ষ্য করে। যখন নেকড়ে শহরের দিকে আসে, কুঠুরী থেকে বা প্রকোষ্ঠ থেকে প্রকোষ্ঠে সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। শহরের নাগরিকবৃন্দ একজোটে একদৃষ্টিতে অনুপ্রবেশকারী নেকড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তাকে কাছে আসতে প্রলুব্ধ করে। কাছে আসা মাত্র ওরা সুড়ুৎ করে সুড়ঙ্গে সরে পড়ে।

পরী কুকুড়ের সামাজিক জীবন আত্মরক্ষার কাজে সীমাবদ্ধ নয়। প্রাপ্তবয়স্করা তাদের গর্তের বাইরে বসে, অন্য ধরনের শব্দের মাধ্যমে তাদের মালিকানা ঘোষণা করে, সঙ্গে সঙ্গে ওরা বাতাসে একটা ছোট লাফও দেয়। প্রজনন ঋতুতে কুঠুরী বা প্রকোষ্ঠের সদস্যরা এক জোটে থেকে তাদের চৌহদ্দিকে অনুপ্রবেশকারীদের থেকে রক্ষার জন্য পাহারা দেয়। যখন উত্তেজনার বা ভয়ের মুহূর্ত কেটে যায়, তখন ওরা হাত-পা ঝেড়ে আরাম করে। নগরবাসীবা শহরে ঘুরে বেড়ায় এবং একে অন্যের চৌহদ্দি ঘুরে দেখে। যদি কোনো আগন্তুক কোনো নাগরিককে আমন্ত্রণ জানায়, সে সতর্কভাবে আগন্তুককে আলতোভাবে দায়সারা চুমু দেয় এবং পরস্পরের পায়ুগ্রন্থি শুঁকে। ওরা পরস্পরের সাথে সত্যিকারভাবে পরিচিত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াই এর উদ্দেশ্য। যদি তা নয় বুঝতে পারে, তাহলে ওরা আলাদা হয়ে যায়। আগন্তুক শেষাবধি বিদায় নেয়। তবে ওরা যদি আবিষ্কার করতে পারে যে ওরা একই কুঠুরীর সদস্য তখন ওরা মুখ ব্যাদান করে গভীর চুমু খায়, একে অন্যকে খিদমত করে এবং কখনো-কখনো পাশাপাশি থেকে বিচরণে বেরোয়।

শহর এলাকার ভিতরে পরী কুকুর লতাপাতার খুব যত্ন নেয়। ওরা যে সব উদ্ভিদ পছন্দ করে সেগুলোকে এতো বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে যে সেগুলোর পুরোটাই প্রায় খাওয়া হয়ে যায়। তখন ওরা তাদের রাজত্বের অন্য অংশে চলে যায় এবং পুরনো চারণভূমি কিছুদিন অনাবাদী থাকে যাতে গাছগুলো আবার গজাতে পারে। এরা নির্ধারিত চাষও করে। এরা সেজ (সুগন্ধী সবুজ পাতাযুক্ত উদ্ভিদ) গাছ পছন্দ করে না। এটা সমতল ভূমির সাধারণ উদ্ভিদ। উদ্ভিদ আকারেরও বেশ বড় হয়। যদি এর চারা গজায় এবং ওদের নূতন স্থাপিত কলোনি অঞ্চলে যদি এই উদ্ভিদ বড় হয়ে যায় তাহলে একে কেবল ওরা এড়িয়ে যায় না। একে কেটে ফেলে এবং ওদের পছন্দসই উদ্ভিদের জন্য জায়গা অবারিত করে।

আরো দক্ষিণে, আর্জেন্টিনার পম্পাসের উপর পরী কুকুরের ভূমিকায় অভিনয় করে একটি গিনিপিগ। আকারে স্পেনিয়াল কুকুরের মতো। এর নাম ভিসকাচা (Viscacha)। এটিও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাস করে। কিন্তু এটি গোধূলি ও প্রত্যুষে বিচরণ করে। অনেক অন্য প্রাণীর মতো এরা মৃদু আলোকে সক্রিয় হয়। এদের প্রকট শনাক্তকারী চিহ্ন থাকে। তা হলো মুখে আড়াআড়ি আঁকা প্রশস্ত সাদা-কালো ডোরা। এরা গর্তের উপর শিলাস্তূপ সজ্জিত করে। গর্ত খননের সময় বেশ ভারী কোনো পাথর পোল তারা কষ্টে সৃষ্টে এটিকে টেনে উপরে

তুলে স্তূপাকারে জমায়। এ ছাড়াও, উত্তম চাষার মতো, এরা চারণভূমিতে বড় যে কোনো বস্তু দেখলেও তা মহা উৎসাহে টেনে এনে জমা করে। কাজেই, কেউ যদি ডিসকাচা কলোনির কাছাকাছি পম্পাসের উপরে কোনো কিছু ফেলে, তাহলে সেটিকে আর অকুস্থলে পাওয়া যাবে না। পেতে হলে যেতে হবে ডিসকাচার শিলাস্তূপে।

ডিসকাচা ফুলকাধারী এক বিশাল স্তন্যপায়ী দলের উত্তরসূরি। পানামা স্থলসেতু গঠনের সময় এই স্তন্যপায়ীরা উত্তর আমেরিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় পরিযায়ী হয়েছিলো। এই স্থলসেতু যখন ভেঙে যায় তখন ওরা দক্ষিণ আমেরিকাতেই পরিত্যক্ত হয়। পিঁপড়াভুক, আর্মাডিলো (Armadillo)ও অন্যান্য ধরনের বানর যেমন অরণ্যে কলোনি স্থাপন করেছিলো, তেমনি ফুলকাধারীরাও তৃণভূমি জয় করেছিলো। এদের মধ্যে কোনো কোনোটি অদ্ভুত প্রাণীতে পরিণত হয়। দুটোর কথা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। সে দুটো হলো জায়েন্ট অ্যান্টইটার বা দানো পিঁপড়াভুক এবং খোলকবিশিষ্ট দুই মিটার উঁচু বিলুপ্ত আর্মাডিলো। সেখানে অনেক ঘাস এবং পাতাভোজী প্রাণী ছিলো। এই দলের জীবিত প্রাণীর মধ্যে ভিসকাচাই একমাত্র নয়, ছোট শশকবর্ণের গিনিপিগও আছে। কিন্তু একদিন সেখানে বিশাল আকারের উদ্ভিদভোজীও ছিলো। একটাকে দেখতে উটের মতো। লম্বায় হাতির মতো। অন্যটি শ্লথের আত্মীয়, আরো বড়, উচ্চতায় সাত মিটার। ক্লান্ত পদবিক্ষেপে ঝোপঝাড় বৃক্ষ খেয়ে চলতো।

পানামা স্থলসেতু পুনঃস্থাপিত হলে উত্তর থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রাণীরা আবার ছড়িয়ে পড়ে। এসবের মধ্যে অনেক অদ্ভুত গঠনের প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়। দানো উট ও শ্লথ মরে যায়। একসময় সাড়া জেগেছিলো, যখন গত শতকের শেষ প্রান্তে, মহাদেশের সুদূরে শীর্ষদেশে (উত্তর আমেরিকার উত্তরের শেষ প্রান্তে) প্যাটাগোনিয়ায় এক জার্মান বসতি স্থাপনকারী ভূগর্ভে বাসকারী স্লথের সদ্য চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন। তিনি একটি গুহায় অভিযান চালানোর সময় গুহার পেছনে এ চিহ্নগুলো দেখতে পান। বড় বড় পাথরের সারির পেছনেই ওগুলো ছিলো। মনে হয় পাথরের সারি গুহাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। চিহ্নের মধ্যে ছিলো এক স্তূপ বড় বড় হাড়, চামড়ার টুকরো। চামড়ায় ছিলো লম্বা, কুঞ্চিত, অমসৃণ বাদামী লোম এবং এতে কৌতূহল উদ্দীপক হাড়ের অর্বুদ ছিলো প্রোথিত। এবং আরো ছিলো গোবর। তা দেখতে সদ্য ও তাজা। জার্মান ভদ্রলোক সীমানা নির্দেশ করার জন্য একটি পোস্টে চামড়া আটকে রেখেছিলেন। সেখানে কয়েক বছর পর সুইডেনের এক পর্যটক তা দেখতে পান। শেষ পর্যন্ত নমুনাটি পৌঁছে লন্ডনের ন্যাচারাল মিউজিয়ামে। এটিকে গ্রাউন্ড শ্লথ বা ভূগর্ভে বাসকারী স্লথের অবশেষ বলে লন্ডনে ঘোষণা দেওয়া হয়। এই নমুনা এতোই তাজা যে, মনে হয় এই প্রাণী এখনো বেঁচে আছে। নুড়ি পাথরের খণ্ডগুলো দেখে মনে হয় মানুষের তৈরি দেয়ালের ভিতের মতো। গোবরে ঘাসের কাণ্ডগুলোতে স্বচ্ছ ধার দেখা যাচ্ছিলো যদিও এগুলো শিকড়সহ তোলার বদলে কেটে নেওয়া হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেন, সম্ভবত ভারতীয়রা এই দানোদের তাড়িয়ে গুহায় ঢুকিয়েছিলো এবং সেখানে দেয়ালের পেছনে আবদ্ধ করে রেখে আধ-পোষা প্রাণীদের মতো এদেরকে ঘাস সরবরাহ করেছিলো।

রোমাঞ্চকর এসব জল্পনা কল্পনার সমর্থন বা খারিজ করার বিষয়টি ঝুলছিলো বহুদিন ধরে। দুঃখের সাথে বলতে হয়, বিষয়টি বর্তমানে দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেউ গুহায় গেলে আবিষ্কার করবে যে গুহাটি ছিলো বিশাল। পেছনে নুড়িপাথরের সারি। একে

একটি দেয়ালের ভিত বলে মনে হবে। এগুলো ছাদের ধ্বসে পড়া অংশ ছাড়া নিশ্চিতভাবে অন্য কিছু নয়। গুহার আবহাওয়া খুব শুষ্ক ও তীব্র শীতল। গোবর এতো তাজা দেখানোর কারণ এগুলো বরফে জমাট বেঁধে গিয়েছিলো। ঠাণ্ডা দেশটিতে চারদিকে ভালো করে পরিভ্রমণ করলে গরুর দ্বিগুণ বড় আকারের কোনো প্রাণী নিশ্চয়ই কারো নজর এড়াবে না। যদিও এটি নজরে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তৎসত্বেও, আমরা জানি যে, দক্ষিণ আমেরিকার এই অংশে ভারতীয়রা আট থেকে দশ হাজার বছর আগে এসে পৌঁছেছিলো। ভূতাত্ত্বিক সময় গণনায় দেখা যায় গ্রাউন্ড শ্লথ পাঁচ হাজার বছর আগে জীবিত ছিলো। কাজেই অন্তত কিছু মানুষ দুলকি চালে চলা চমৎকার এই প্রাণীটিকে চাক্ষুষ করেছিলো।

দক্ষিণে শ্লথদের উদ্ভবের সময়কালে উত্তর আমেরিকার পানামা প্রণালীর অন্যপাশে, অপর ভিন্ন দলের তৃণভুক প্রাণীর বিকাশ ঘটছিলো প্রেইরিতে। এদের পূর্বপুরুষরা ছিলো অরণ্যচারী প্রাণী। দেখতে তাপির মতোই তবে আকারে মাউসডিয়ারের অনুরূপ। এদের পেষণ দণ্ড ছিলো গোলাকৃতির এবং তা অরণ্যের ডাল-পালা ছিঁড়ে খাবার উপযোগী। সমভূমিতে এই প্রাণীরা শত্রু থেকে পালানোর জন্য দ্রুত, আরো দ্রুত দৌড়াতে শুরু করে। প্রথম দিকে ওদের পুরোপদে ও পশ্চাৎপদে যথাক্রমে চারটি ও তিনটি আঙুল ছিলো। লম্বা পা, যন্ত্রের হাতলের মতো অধিক সুবিধা দান করে। এতে যথার্থভাবে পেশিযুক্ত হতে পারে এবং লম্বা পা দেহকে দ্রুত চালাতে পারে। কালে কালে তৃণভোজীদের পা লম্বা হয়। ওদের দেহ মাটি থেকে উঁচুতে উঠে। আঙুল দেহের ভার সামলায়। শেষ পর্যন্ত পাশের আঙুলগুলো ক্ষয়ে যেতে থাকে। আদি ঘোড়া আকারে ছিলো কুকুরের মতো। সে প্রসারিত মধ্যম আঙুলে ভর করেই দৌড়াতো। গোড়ালির হাড়গুলো পায়ের অর্ধেকের উপরে চলে আসে, পার্শ্ব আঙুলসমূহ খাট হয়ে যায়। এগুলোর নাম স্প্লিন্ট বোন (Splint bone)। নখ পুরু হয়ে আঘাত শোষণকারী সুরক্ষামূলক খুরে পরিণত হয়।

পায়ের পরিবর্তনের সাথে দেহের অন্যত্রও পরিবর্তন সাধিত হয়। তৃণভূমিতে ঘাস তুলনামূলকভাবে অধিক শক্ত হয়ে উঠেছিলো। ফলে চিবানোয় অসুবিধে দেখা দেয়। ঘাসের পাতায় ক্ষুদ্র ধারালো বালিকণা উৎপাদিত হয় যা দাঁতকে মারাত্মকভাবে ক্ষয় করে। কাজেই প্রাক-ঘোড়ায় গোলাকৃতির পেষণ দন্ত বড় চূর্ণন দণ্ডে পরিণত হয়। দাঁতের কিনারা ডেন্টিন নির্মিত ও শক্ত। তৃণভোজী প্রাণীদের একটি সমস্যা হলো এদেরকে দীর্ঘক্ষণ ধরে মাথাকে মাটির কাছে রাখতে হয়, ফলে এরা শিকারীর দিকে ভালো নজর দিতে পারে না। পেষণ দণ্ড আকারে বড় হওয়া এবং মাথা নিচু করে খাদ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজনে করোটির আকৃতি দাঁড়িয়েছে লম্বাটে। কাজেই এভাবে সেকালে আজকের মতো আকৃতির ঘোড়ার উদ্ভব ঘটেছিলো। এদের বিস্তৃতি ঘটেছিলো আমেরিকার সমভূমিতে। শেষে যখন বেরিং প্রণালি শুষ্ক ছিলো তখন ওরা ইউরোপে পরিযায়ী হয়। এরপর ওদের বিস্তৃতি ঘটে দক্ষিণে এবং আফ্রিকায় বসতি গড়ে। পরে ঘোড়ার আদি বাসভূমি আমেরিকায় ওদের বিলুপ্তি ঘটে। এর তিনশ বছর পর স্পেনীয় বিজয়ীরা জাহাজে করে আমেরিকায় ঘোড়া নিয়ে আসে। কিন্তু ইউরোপ ও আফ্রিকায় ঘোড়া, গাধা ও জেব্রারূপে এদের সমৃদ্ধি ঘটে।

জেব্রা আফ্রিকার সমতল ভূমিতে অন্যান্য দ্রুতগামী বিচরণকারীদের সাথে ভাগ বসায়। এসময় এদেরও নিজস্ব পথে বিকাশ ঘটতে থাকে। এরা অরণ্যচারী এন্টেলোপদের উত্তরসূরি ও এদের ক্ষুদ্র সংস্করণ। দেখতে মাউস ডিয়ার ও ডুইকারের মতো। ইতোমধ্যেই এদের

অরণ্যে দৌড়ানোর মতো পায়ের সৃষ্টি হয়েছে তবে ঘোড়ার সাথে ওদের সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, ঘোড়াকে একটা আঙুলের বা খুড়ের উপর ভর করে চলতে হয়। কিন্তু এদের রয়েছে দুটো আঙুল বা দুটি খুর। এখন অরণ্য ছেড়ে সমতলে আসার পর, এদের পা আরো দীর্ঘ হয়েছে এবং দ্বিখণ্ডিত খুরবিশিষ্ট প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এ প্রাণীরা হলো এন্টলোপ (Antelope), গেজেলা (Gazella) হরিণ ইত্যাদি। বর্তমানে এদের এতো সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে যে, পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে এসকল বন্যজন্তুর দর্শনীয় সমাবেশ পর্যবেক্ষণ করা যায়।

সমভূমির কিনারে মুক্ত ঝোপ-ঝাড়ে যেখানে এখনো আত্মগোপনের সামান্য সুযোগ রয়েছে সেখানে অন্যান্য অরণ্যচারী স্বজনদের মতো এন্টেলোপ, ডিক ডিক ও ডুইকারেরা বাস করে। ছোট ছোট লতা গুল্ম ছিঁড়ে খায়। একা বা জোড়ায় জোড়ায় তাদের চিহ্নিত এলাকায় বিচরণ করে এবং এলাকা পাহারা দেয়। অধিকতর মুক্তাঞ্চলে, যেখানে আত্মগোপন সম্ভব নয়, সেখানে এন্টেলোপ বিশাল পাল গড়ে বিচরণের মাধ্যমে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে। নিয়মিতভাবে ওরা মাথা উঁচিয়ে চারদিকে দৃষ্টি চালায়। প্রখর দৃষ্টি ও তীব্র ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে ওরা সতর্ক থাকে। ফলে শিকারী আকস্মিক পালে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পায় না। যদি শেষাবধি আক্রান্ত হয় ধাবমান পাল শিকারীকে হতবুদ্ধিকর অবস্থায় ফেলে। এরা এতো এলেমেলোভাবে বিভিন্ন দিকে ছোটে যে, আক্রমণকারী কোনটাকে টার্গেট করবে ঠিক করতে পারে না। একপাল ইম্পালা (Impala) শত শত স্বতন্ত্র ইম্পালায় যেন বিস্ফোরিত হয়ে বিভিন্ন দিকে দৌড়াতে থাকে এবং তিন মিটার উঁচুতে লাফিয়ে উঠে। বিশাল সংখ্যক প্রাণী এক সাথে চড়ার জন্য বড় চারণভূমির প্রয়োজন পড়ে। কাজেই পশুর পালকে নিয়মিত বড় বড় এলাকায় সফর করতে হয়। বন্যপশু ৫০ কিলোমিটার দূরে বৃষ্টিপাত হলে তা শনাক্ত করতে পারে এবং সেখানে নূতন অংকুরিত ঘাস খেতে ওরা চলে যায়। কিন্তু এই যাযাবর স্বভাব তাদের সামাজিক বিন্যাসে জটিলতার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে প্রজননের ক্ষেত্রে। অরণ্যে প্রজনন নির্ভর করতো এক জোড়া পশুর উপর। এটি খুব সহজে সম্পন্ন হতো। কোনো কোনোটি যেমন ইম্পালা, স্প্রিংবক ও গেজালার ক্ষেত্রে এতদসত্বেও সামাজিক বিন্যাসে অঞ্চলই ভূমিকা পালন করে। স্ত্রী ও পুরুষ আলাদা পাল গড়ে। গুটিকয় কর্তা গোছের পুরুষ দলত্যাগী হয়ে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেকে নিজেদের সীমানা চিহ্নিত করে, সীমানার ভেতর অনুপ্রবেশকারী পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে এবং স্ত্রী পশুকে আকর্ষণের চেষ্টা করে। স্ত্রী এলাকায় এলে সঙ্গম সম্পন্ন হয়। তবে এর জন্য তাদেরকে বড় মূল্য দিতে হয়। অধিকাংশ মোড়ল পশু তিন মাস বা এর কাছাকাছি সময়ের পর শান্ত হয়ে পড়ে। ওরা বিপর্যস্থ হয়। শেষপর্যন্ত শক্তিশালী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ওদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠে। তখন ওরা আবার পুরুষের পালে ফিরে আসে।

এলান্ড এন্টেলোপদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এলাণ্ড ও জেব্রা শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিকতার গণ্ডি ভাঙাহাতে গোনা পশুদলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এরা স্ত্রী ও পুরুষ মিলে পাল গড়ে। স্ত্রীর অধিকার নিয়ে পুরুষদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ সমাধান আনে। এই যুদ্ধ যেখানে সেখানে সংঘটিত হতে পারে।

তৃণভোজী শিকারের জন্য শিকারীদেরকে সমভূমিতে তাদের দৌড়ানোর কৌশলে প্রভূত উন্নতি সাধন করতে হয়েছে। এরা কম সংখ্যক আঙুল-শীর্ষের উপর দেহের ভর রেখে

দৌড়ায় না, কারণ, ওদের আঙুলের প্রয়োজন আছে। আঙুলের নখরই ওদের আক্রমণের হাতিয়ার। ওরা অন্যভাবে এই সমস্যার সমাধান করে। এদের পা কার্যকরভাবে দীর্ঘ এবং এর হাড়গুলো খুবই নমনীয়। শরীর পুরো মেলে ধরে দ্রুত দৌড়ানোকালে, বাতাসে চার পা একত্রে তুলে এন্টেলোপ যেমনভাবে ছুটে, ওদের পাও দেহের নিচে ওভাবে চলতে থাকে। চিতার দেহ সরু ও লম্বা। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী পশু হলো চিতা। চূড়ান্ত মুহূর্তে দৌড়ার গতি ঘন্টায় ১১০ কিলোমিটার হতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতি খুবই শক্তি ব্যয়সাপেক্ষ। পাকে সামনে-পেছনে স্প্রিংয়ের মতো দ্রুত আনা-নেওয়াতে পেশির উপর ভয়ানক চাপ পড়ে। চিতা একারণে এর দ্রুতিকে এক মিনিটের বেশি স্থায়ী রাখতে পারে না। কয়েক শত গজের মধ্যে শিকার কাবু করতে না পারলে, চিতা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। এ সময় এন্টেলোপ মজবুত কোমর ও পা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সমতলের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়।

বর্তমানে সিংহের দৌড়ার গতি প্রায় চিতার মতো। এক ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৮০ কিমি যেতে পারে। অন্য বন্য পশুও দীর্ঘক্ষণ ধরে এই গতিতে দৌড়ানোয় সক্ষম। কাজেই সিংহকে আরো জটিল কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়েছে। কখনো কখনো ওরা চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নেয়। হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে শিকারের কাছে যায়। দেহ মাটির কাছে থাকে এবং যতদূর সময় দেহকে আড়ালে আবডালে রাখে। কখনো কখনো একা একা শিকার করে। কখনো বিড়ালের মতো দলে মিলে শিকার করে। এরা সারিবদ্ধ হয়ে চলে। এন্টেলোপ, জেব্রা বা অন্য বন্যপশুর কাছাকাছি এলে লাইনের শেষে থাকা সিংহেরা তুলনামূলক দ্রুত দৌড়ে শিকারের পালকে ঘিরে ফেলে। শেষে, ওরা পালের কাছে দৃশ্য হয়ে পালকে সারির কেন্দ্রে থাকা সিংহের দিকে তাড়না করে। এই কৌশলে ওরা পাল থেকে কয়েকটি শিকারকে হত্যা করতে পারে। দেখা গেছে এরকম শিকারে ওরা একবারে সাতটি পশুকে হত্যা করেছে।

হায়েনা সিংহ থেকে শ্লথ গতির। এরা ঘন্টায় ৬৫ কিমি পর্যন্ত দৌড়ায়। ফলে ওদের শিকার পদ্ধতি আরো সূক্ষ্ম ও দলনির্ভর। স্ত্রীদের আলাদা বাসস্থান। এখানে থেকে ওরা গর্ভের সন্তান বড় করে। তবে সবাই মিলে কাজ করে এবং রাজত্বের সীমানা ধরে রাখে ও রক্ষা করে। এদের ভাষা ও ভঙ্গি আছে। এগুলোর সাহায্যে ওরা পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। এরা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ, ঘড় ঘড়, শূয়োরের মতো ঘোঁত ঘোঁত, বাচ্চা কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ বা তীক্ষ্ম চীৎকার করে। মাঝে মাঝে সমস্বরে ভয়ংকর উন্মত্ত আওয়াজ তুলে যা দূর থেকে অট্টহাসির মতো মনে হয়। ওদের লেজ মনোরম ভঙ্গি প্রদর্শন করে। সাধারণত লেজের আগা অবনত থাকে। লেজ খাড়া হলে বুঝতে হবে সে আক্রমণোদ্যত, লেজ পিঠের উপর উঠালে সে মিলনের জন্য উত্তেজিত বুঝতে হবে, পেটের নিচে দুই পায়ের নিচ দিয়ে লেজ গুটিলে বুঝে নিতে হবে ওরা ভয়ার্ত। এরা নিজেদের মধ্যে উত্তম সমঝোতার মাধ্যমে শিকার করে। এরা শিকারে এতো সফল যে আফ্রিকার সমভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ প্রাণী হত্যা এদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। সিংহ বড় বপুর জোরে ওদের শিকারে ভাগ বসায়। জনসাধারণের মধ্যে মুখরোচক গল্প প্রচলিত যে হায়েনা ও সিংহ এক জোটে শিকার করে। তা আদৌ সত্যি নয়।

হায়েনা সাধারণত রাতে শিকার করে। কখনো ওরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বন্য শিকারের খোঁজে বের হয়। দলের সংখ্যা দুই বা তিন। পালে চড়াও হয়ে ওরা পরীক্ষা করে। পরে নিজেরা ধীরে ধীরে দৌড়ানো ধাবমান পশুদের কাছে থেকে দেখে। আসলে ধাবমান

প্রাণীদের মধ্যে কোনো ধরনের দুর্বলতা আছে কিনা তা শনাক্ত করাই ওদের মূল উদ্দেশ্য। সবশেষে, ওরা একটি প্রাণীকে নির্বাচন করে এবং তার উপর মারাত্মকভাবে চড়াও হয়। শিকারের দিকে ছুটে গিয়ে গোড়ালিতে ছোঁ মারে। এভাবে করতে করতে পশু তাড়িত হয়ে দিগ্বিদিক ভুলে হত্যাকারীর সামনে এসে পড়ে। এরকম অবস্থায় পড়লে তার নিশ্চিত মরণ, যখন সামনের হায়েনার সাথে সে লড়াইরত থাকে তখন আরেকটি হায়েনা তার পেটে কামড় বসিয়ে ঝুলে থাকে। বন্যপশুটি তখন খোঁড়াতে থাকে। শীঘ্রই এর পেট ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে এবং সে মরে যায়।

জেব্রা শিকার সহজসাধ্য নয়। জেব্রা শিকারে হায়েনারা বড় দল গড়ে। এরা শিকারে যাত্রার আগেই যেন ঠিক করে নেয় যে ওরা আজ জেব্রা শিকার করবে। তারা নিয়মিত যেখানে মিলিত হয় সেখানেই সন্ধ্যায় সবাই হাজির হয়। ওরা পরস্পরকে জড়াজড়ি করে সম্ভাষণ জানায়। পরস্পর মুখ, গলা ও মাথায় স্পর্শ করে। একটার পেছনে আরেকটা লাইন করে দাঁড়ায় এবং জননাঙ্গ শুঁকে ও চাটে। সারিবদ্ধ হয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তারা তাদের রাজত্বের সীমানায় কখনো দাঁড়ায় এবং নূতন করে প্রস্রাব দিয়ে সীমানা চিহ্ন আরোপ করে। আবার কখনো তারা কোনো অঞ্চলে গিয়ে জড়ো হয়ে দাঁড়ায় এবং উত্তেজিত হয়ে পরস্পরকে শোঁকে। যতদূর বোঝা যায়, এরা যে জায়গায় দাঁড়ালো এরকম অন্য জায়গাতেও দাঁড়াতে পারতো। এরকম করার গুরুত্ব এখানে যে, ওরা আসলে সবার মধ্যেকার সমঝোতা অটুট আছে কিনা পরখ করে নেয়। যখন তারা এরকম দলবদ্ধ থাকে, তখন পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বন্যপশুকে দেখে সোজা দুলকি চালে চলে। তাদের প্রতি কোনো মনোযোগ প্রদর্শন করে না। শেষ পর্যন্ত তারা জেব্রা দেখতে পেলেই শিকার শুরু করে।

জেব্রারা পাঁচ ছয় বা তারও বেশি এক দলে চলে। দলের প্রজননক্ষম পুরুষ নেতা দলের নেতৃত্ব থাকে। বিপদের সময় সে ঘোড়ার মতো হ্রেষা শব্দে বিপদের ঘোষণা দেয়। যখন পালের অন্যরা দৌড়ে পালায় তখন নেতা পেছনে থাকে। সে মাদী ও বাচ্চা এবং শিকারী হায়েনাদের মাঝখানে অবস্থান নেয়। হায়েনারা অর্ধচন্দ্র সারিতে চলতে থাকে। নেতা ঘুরে গিয়ে হায়েনার দলকে আক্রমণ করে, জোরে লাথি মারে ও কামড়ায়, এমনকি হায়েনা দলের নেতাকে তাড়া করে। সে বাধ্য হয়ে পিছিয়ে পড়ে এবং অন্যদের পালানোর সুযোগ দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি হায়েনা জেব্রা নেতাকে ছাড়িয়ে মাদী ও শিশু জেব্রাকে ছোঁ মারতে শুরু করে। অবিরাম আক্রমণ চলতে থাকে। এসময় কোনোটির পায়ে, পেটে বা জননাঙ্গে দাঁত বসিয়ে কামড়ে ধরে এবং প্রাণীটিকে টেনে ফেলে দেয়। পালের অন্য জেব্রারা ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালায়। হায়েনারা পড়ে যাওয়া জেব্রার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং চিৎকার, তর্জন গর্জন করতে করতে শিকারকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলে। পনের মিনিটের মধ্যে পুরো শবদেহের চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি হাড়, লোপাট হয়ে যায়। কেবল মাথার খুলি পড়ে থাকে।

কাজেই, এন্টেলোপের দ্রুতগতি শিকারীদেরকে দলবদ্ধ ও ছলাকলাপূর্ণ শিকার-কৌশল রপ্ত করতে বাধ্য করেছে। বিড়াল ও কুকুর পরিবারেই কেবল এসবের বিকাশ ঘটেনি, অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কারণ তৃণভূমিতে শিকারের জন্য অন্যান্য জন্তুরাও বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে এদের একটি দল খুব ধীরগতিসম্পন্ন ছিলো। এদের আত্মরক্ষার হাতিয়ারও ছিলো নগণ্য। কাজেই এদের জন্য দলবদ্ধ হয়ে শিকার করা এবং পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। শেষাবধি এরাই সমভূমির সবচেয়ে প্রতারক, দক্ষ ও সংযোগ রক্ষাকারী শিকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। এদের ইতিহাস অন্বেষায় আমাদেরকে আবার অরণ্যে চোখ ফেরাতে হবে। কারণ সেটাই তাদের আদি উৎস। সেখানে বৃক্ষশীর্ষে ওরা কোমল পাতা ও ফলের খোঁজে ঘোরাফেরা করতো।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৃক্ষচারী জীবন

হাত-পায়ের সাহায্যে আপনি যদি গাছে আরোহণ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে দুটো ক্ষমতা অত্যন্ত কার্যকর: একটি, দূরত্ব বিচার করার ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়টি শাখা আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা। প্রথম ক্ষমতা অর্জনের জন্য মুখমণ্ডলের সামনে দিকে দুটো চোখের অবস্থান চাই যাতে একই বস্তুতে দুটো চোখের দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট হতে পারে এবং দ্বিতীয় ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন আঁকড়ে ধরার মতো হাতের আঙুল। বর্তমানে জীবিত প্রায় দুই শত প্রজাতির প্রাণী এই দুটি ক্ষমতা অর্জন করেছে। এদের মধ্যে বানর, নরবানর ও মানুষ অন্তর্ভুক্ত। বরং আত্মপ্রশংসার মতো শোনালেও এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বর্গভুক্ত প্রাণী। এই বর্গের নাম প্রাইমেট (Primate)।

সংশয়ের অবকাশ নেই যে, আদি পতঙ্গভুক শ্রুসদৃশ স্তন্যপায়ীরা বিভিন্ন প্রাণী যথা বাদুর, তিমি ও পিঁপড়াভুক ইত্যাদির যেমন পূর্বপুরুষ ছিলো, তেমনি প্রাইমেটরাও উদ্ভূত হয়েছিলো সেসব আদি পতঙ্গভুক শ্রুসদৃশ প্রাণী থেকে। প্রকৃতপক্ষে টুপাইয়াই সে সকল প্রাণীদের জন্য ছিলো আদর্শ মডেল এবং এরা প্রাইমেটদেরও খুব কাছাকাছি গোছের প্রাণী ছিলো। এদেরকে একই শ্রেণিভুক্ত প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই প্রশ্ন সমাধানে তুলনামূলক শারীরবিদ্যাবিশারদরা দুটো বৈশিষ্ট্যকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বৈশিষ্ট্যদ্বয় হলো চক্ষুকোটর পুরোপুরি হাড় দ্বারা এবং জিহ্বার অধঃজিহ্বা তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত হওয়া। এসকল বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য কতিপয় টুকিটাকি প্রযুক্তিক বৈশিষ্ট্যের বৈগুণ্য টুপাইয়া যে খাঁটি প্রাইমেট তা প্রমাণ করায় বিশেষজ্ঞদের সাহায্য করেছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী একমত যে, প্রাইমেটদের আদি পূর্বপুরুষকে অবশ্যই টুপাইয়ার মতো দেখাতো। কিন্তু তবু প্রাইমেটদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ টুপাইয়াতে লক্ষণীয় নয়। এর হাতে আলাদা আলাদা আঙুল রয়েছে, কিন্তু বৃদ্ধাঙুল অন্য চার আঙ্গুলের বিপরীতমুখী না হওয়াতে হাত দিয়ে এরা সত্যিকার অর্থে ধরতে পারে না। এছাড়া প্রতি আঙ্গুলের মাথায় চ্যাপ্টা নখের পরিবর্তে তীক্ষ্ম নখর রয়েছে। এর চোখ বড়ো ও উজ্জ্বল। তবে দুটো চোখ তুণ্ডের দু পাশে অবস্থিত, ফলে ওদের দুই চোখের দৃষ্টি অংশত আবৃত হয়। এরা এখনো বৃক্ষারোহণে অভ্যস্ত নয়। একটা বা দুটো প্রজাতির টুপাইয়া কাঠবিড়ালীর মতো শাখায় চলাচল করে বটে, এদের অধিকাংশই ওদের বাসভূমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অরণ্যের ঝোপঝাড় বা মাটিতে দিনের বেশিরভাগ সময় বিচরণ করে। একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এরা দিনের বেলায় সক্রিয় থাকে এবং যখন আপনি ওদের ঝোপ-ঝাড়ে ছুটতে দেখবেন তখন লক্ষ্য করবেন যে ওরা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণেই চলাফেরা করছে। এরা লম্বা নাক দিয়ে পত্রগুচ্ছে, বাকলের নিচে ঘ্রাণ নেয় এবং নুড়ি-পাথর ও শিলার ফাঁক শুঁকে দেখে।

ঘ্রাণই ওদের সামাজিক জীবনের ভিত্তি। এরা রাজত্বের সীমানা নির্ধারণ করে অল্প কয়েক ফোঁটা মূত্র এবং কুঁচকি ও ঘাড়ের গ্রন্থি নিঃসৃত গন্ধের সাহায্যে। এদের নাক এদেরকে উত্তম সেবা প্রদান করে। নাক খুব লম্বা ও সুবিকশিত। নাসারন্ধ্র বিস্তৃত এবং এতে রয়েছে ঘ্রাণগ্রাহী কোষসমূহ। নাসারন্ধ্র দুটো নাসাছিদ্র দ্বারা উন্মুক্ত হয়। নাসাছিদ্রের আকৃতি উল্টানো যতিচিহ্নের মতো এবং কুকুরের জালি নাসাছিদ্রের অনুরূপ লোমহীন ভেজা চামড়া দ্বারা পরিবৃত। মোটকথা স্বীকার করতে হয় যে, প্রথম দর্শনে টুপাইয়াকে বানরের সাথে মিলিয়ে দেখলে অসদৃশই মনে হবে। কিন্তু প্রাইমেটদের একটি পুরো দল এদের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বহন করে যা অন্য দিক বিচারে নির্ভুলভাবে বানরের বৈশিষ্ট্যসদৃশ এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলোই এদের রূপান্তরের কারণ তুলে ধরে। এই দলটির নাম প্রোসিমিয়ান (Prosomiam) বা প্রাকবানর।

এদের মধ্যে আদর্শ প্রাকবানর হলো মাদাগাস্কারের বলয়পুচ্ছ লেমুর (Ringtailed Lemur)। বিড়ালের আকারবিশিষ্ট বলেই একে বিড়াল লেমুরও বলা হয়। এদের গায়ে সাদা-ধূসর নরম লোম, মুখের অগ্রে থাকা সবুজ-হলদে চোখ ও একটি লম্বা লোমশ লেজ রয়েছে। লেজ চমৎকার কালো-সাদা বলয়যুক্ত। এরা সাধারণত যেভাবে ডাকে তা অনেকটা বিড়ালের মিউ মিউ আওয়াজের মতো। বিড়ালের সাথে মিল কেবল এটুকুতেই। এরা শিকারী নয় এবং বেশিরভাগ প্রোসিমিয়ানের মতো উদ্ভিদভোজী।

এই লেমুরেরা দলে দলে মাটির উপর দীর্ঘসময় কাটায়। তাদের জীবনযাত্রায় গন্ধ একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে। টুপাইয়ার নাকের কাছাকাছি নাকের আকৃতি, যদিও তা এখনো শেয়ালের নাকের মতোই লম্বা এবং এখনো তাতে ভেজা জালি ও নাসাছিদ্রের চারপাশে লোমহীন ত্বক রয়েছে। এদের তিন প্রকারের গন্ধগ্রন্থি আছে। এক জোড়া মণিবন্ধের ভিতরের দিকে। এই গ্রন্থি শক্ত কাঁটার মাধ্যমে বিমুক্ত হয়। অন্যটি বগলের কাছে বুকে ও তৃতীয়টি জননাঙ্গের চারপাশে। এগুলোর সাহায্যে পুরুষ লেমুর আত্মরক্ষার সংকেত প্রদান করে। মেয়ে লেমুরও কিছু কিছু একাজ করে। লেমুরের দল জঙ্গলের মধ্যে যখন আস্ফালন করতে করতে চলে তখন একটি লেমুর একটি নির্দিষ্ট গাছের চারার কাছে আসে এবং সতর্কভাবে ঘ্রাণ নেয়। সে গাছ শুঁকে নিশ্চিন্ত হয় যে সেই গাছের উপরে অন্য কারো হাত পড়েনি। নিঃসন্দেহ হবার পর সে মাটিতে হাত রাখে এবং যতদূর সম্ভব উঁচুতে পশ্চাৎদেশ উঠিয়ে গাছের বাকলে জননাঙ্গ কয়েকবার ঘষে। কখনো এক মিনিট বা এর একটু বেশি পরে অন্য একটি লেমুর এসেও একই কাণ্ড করে। পুরুষ লেমুররাও একটি চারাগাছ দু'হাতে ধরে দোল খায়। ওদের কব্জির কাঁটা বাকলে বিঁধে এবং সেখানে গ্রন্থি নিঃসৃত গন্ধ জমা পড়ে।

পুরুষ লেমুর সংকেত দেবার জন্যই কেবল গন্ধ ব্যবহার করে না, আত্মরক্ষার জন্যও তা ব্যবহার করে। যখন সে প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নেয়, তখন সে মহাজোরে কয়েকবার দুই হাতের তালু ঘষে এবং কব্জি দিয়ে বগলের গ্রন্থি ঘষে। এরপর সে লেজকে পেছনের পা জোড়ার ভিতর দিয়ে বুকের কাছে নিয়ে আসে এবং কব্জির উপরের কাঁটায় লাগায় যাতে লেজ গন্ধে ভরপুর হয়। এভাবে শস্ত্রমণ্ডিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় সম্মুখ যুদ্ধে চারপায়ে দাঁড়িয়ে পৃষ্ঠদেশ উঁচু করে এবং চমৎকার লেজটিকে দিয়ে নিজের পিঠে আঘাত করে। লেজের লোমগুলো তখন খাড়া হয়ে যায়। এরকমটি করার উদ্দেশ্য যাতে লেজের

ঝাপটায় গন্ধ সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরস্পরের সীমানায় লেমুরের দলের সাক্ষাৎ ঘটলে এই লড়াই চলে ঘন্টা ধরে। এ সময় ওরা লাফ-ঝাঁপ দেয়, উচ্চস্বরে চিৎকার করে, জৃম্ভণ বা মুখব্যাদান করে এবং কব্জির কাঁটা দিয়ে উত্তেজিতভাবে চারা গাছের বাকল ক্ষতবিক্ষত করে।

লেমুর বেশ কিছু সময় গাছেও কাটায়। এরা এখানে বানরসদৃশ আচরণ করে। এসময় এরা প্রাইমেট বৈশিষ্ট্যের কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। মাথায় সামনের চক্ষুজোড়া বাইনোকুলারের মতো দৃষ্টিদান করে। নড়নক্ষম হাতের চার আঙুল ও বিপরীতমুখী বৃদ্ধাঙুল দিয়ে গাছের শাখা আঁকড়ে ধরে। আঙ্গুলের আগায় নখরের বদলে থাকে খাট নখ। মুঠি করলে নখের আঘাত লাগে না এবং এই হাত দিয়ে দক্ষতার সাথে শাখাশীর্ষ থেকে ফল ও পাতা তুলে আনতে পারে।

মুঠি করে ধরতে পারা শিশু লেমুরের জন্য খুব দরকারি। টুপাইয়া শিশুদের মাটির উপরে থাকা বাসায় রাখা হয়। মা প্রতি দুইদিনে একবার মাত্র ওদের দেখতে আসে। সম্ভবত অসহায় শিশুদের প্রতি শিকারীর দৃষ্টি পড়ার ভয়ে ওরা ঘন ঘন আসে না। শিশু লেমুর মায়ের লোম আঁকড়ে ধরতে সক্ষম। জন্মের সাথে সাথেই ওরা মায়ের লোম আঁকড়ে ধরে। মা যেখানে যায় শিশুও সেখানে যায়। এভাবে শিশু ২৪ ঘন্টা পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণে থাকে। লেমুর একবারে একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। কখনো দুটি বাচ্চার জন্ম হয়। মা দলের সাথে জঙ্গলের মেঝেতে বসে পিঠে বাচ্চা নিয়ে বিশ্রাম নেয়। শিশুরা আনন্দে হামাগুড়ি দিয়ে এক স্ত্রী প্রাণী থেকে অন্য স্ত্রী প্রাণীর পিঠে চড়ে। কখনো কোনো শান্ত স্ত্রী লেমুরের দেহে ৩/৪টা বাচ্চা ঝুলে থাকে। এসময় অন্য স্ত্রী লেমুর ঝুঁকে পড়ে স্নেহভরে বাচ্চার শরীর চেটে দেয়।

লেমুরের পায়ে আঁকড়ে ধরার সব আঙুল রয়েছে। আঙুলগুলো আকারে সমান। কাজেই যখন ওরা মাটি বা শাখায় দৌড়ায় তখন চার পায়ের উপর ভর করেই দৌড়ায়। মাদাগাস্কারে বিশটিরও বেশি ধরনের লেমুর আছে। অধিকাংশ লেমুর বেশির ভাগ সময় গাছেই কাটায়। লেমুর থেকে একটু বড়ো, সফেদ সাদা লোমের সুন্দর প্রাণী সিফাকা লাফে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। এর পা হাত থেকে বেশ লম্বা। এরা এক গাছ থেকে অন্য গাছে চার-পাঁচ মিটার দূরত্ব লাফ দিয়ে পার হতে পারে। এই বিশেষত্ব অর্জনের জন্যে একে মূল্য দিতে হয়েছে। এরা চার পায়ে দৌড়াতে পারে না। কখনো কখনো এরা মাটিতে নামে। হাত খাটো হওয়ার দরুন, খাড়া হয়ে দাঁড়ানো ছাড়া বিকল্প থাকে না। এরা দুই পা জোড় করে লাফ দেয়। গাছ থেকে গাছে লাফ দেবার সময়ও ওরা জোড় পায়ে লাফ দেয়।

সিফাকার চিবুকের নিচে গন্ধগ্রন্থি থাকে। এরা খাড়া ডালে চিবুক ঘষে গ্রন্থিরস লাগিয়ে সীমানা চিহ্নিত করে এবং বাকলের উপর ফোঁটা ফোঁটা মূত্র ছিটিয়ে গন্ধকে আরো জোরালো করে। এরপর নিতম্বের পার্শ্বদেশকে সর্পিল গতিতে গাছের ডালে ঘষতে থাকে। পরে ধীরে ধীরে ডালের উপরে উঠে।

লেমুরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃক্ষচারী হলো ইন্দ্রি লেমুর। এরা সিফাকার নিকটাত্মীয়। এরা কদাচিৎ মাটিতে নামে। জীবিত লেমুরের মধ্যে এরা আকারে সবার চেয়ে বড়ো। প্রায় এক মিটার লম্বা। এর দেহে মোটা কালো-সাদা ডোরা থাকে এবং লেজ খাট হয়ে ছোট স্যারকে পরিণত হয়। লেজ লোমে ঢাকা পড়ে। সিফাকার পায়ের চেয়ে এদের পা লম্বা। বুড়ো

আঙুল থেকে অন্য সব আঙুলের ফাঁক অনেক বড়ো। বুড়ো আঙুল বেশ বড়ো ও অন্য আঙুলের দ্বিগুণ। পা দেখতে মনে হয় যেনো ক্যালিপার (ব্যাস মাপার যন্ত্র)। এটি দিয়ে ইন্দ্রি গাছের মোটা গুঁড়ি আঁকড়ে ধরতে পারে। সব লেমুর থেকে ইন্দ্রি চৌকষ লাফ দিতে পারে। পেছনের পা টান টান রেখে প্রচণ্ড লাফ দিয়ে, বাতাসে ভেসে ওরা উপরের শাখায় চড়তে পারে। এসময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মাথা খাড়া থাকে এরা একটার পর একটা লাফ দিতেই থাকে এবং অরণ্যে গাছের পর গাছ অতিক্রম করে।

গাছ শনাক্ত করার জন্য ইন্দ্রিও গন্ধ ব্যবহার করে। যদিও বলয়লেজী লেমুরের চেয়ে ইন্দ্রি গন্ধ ব্যবহার করে অনেক কম। এদের জীবনে গন্ধ খুব একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে না। এর পরিবর্তে ওরা অন্যভাবে নিজেদের রাজ্যের সীমানা ঘোষণা করে। ইন্দ্রি গায়। প্রতি সন্ধ্যা-সকালে ইন্দ্রি পরিবার জঙ্গলের একটি অংশে বিলাপের সুরমূর্ছনা ছড়ায়। প্রতিটি সদস্য এই সুরব্যঞ্জনায় অংশী হয় এবং একটার পর একটা সুর ধরে। ফলে কয়েক মিনিট ধরে এই সুরলহরী অনাহতভাবে চলতে থাকে। বিপদ এলে ওরা মাথা তুলে এবং ধিক্কার সূচক ধ্বনি তুলে যা অরণ্যের বহুদূর পৌঁছে যায়।

বৃক্ষচারী জীবনে সীমানার দাবিতে ইন্দ্রির ধ্বনি ব্যবহার যথার্থ তবে অসুবিধেও আছে। এটি মারাত্মক অবিবেচনাসুলভ কাজও বটে। এতে তাদের উপস্থিতি ও অবস্থানস্থল শত্রুর জানা হয়ে যায়। শাখা শীর্ষে থাকলে ইন্দ্রির কোনো বিপদ হয় না। কোনো প্রাকৃতিক শত্রুর পক্ষে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কাজেই, ওরা বিনষ্টির আশংকা থেকে মুক্ত থেকে গেয়ে যেতে পারে।

যদিও বলয়লেজী লেমুর, সিফাকা (Sifaka), ইন্দ্রি (Indri) ও অন্যান্য কতিপয় মাদাগাস্কার লেমুর দিনে সক্রিয় থাকে কিন্তু এরা স্বল্প আলোয় দেখতে পায়, কারণ এদের অক্ষিপটলের পেছনে একটি প্রতিফলক স্তর থাকে। নিশাচরদের এই বৈশিষ্ট্য থাকে এবং নিশ্চিত প্রমাণ আছে যে কিছুকাল আগেও লেমুররা নিশাচর ছিলো। মাদাগাস্কারে ওদের অনেক আত্মীয় এখনো নিশাচর। শান্ত লেমুর গাছের কোটরে বাস করে। এরা আকারে প্রায় শশকের আকারের অনুরূপ। দিনে কোটর-দ্বারে ওরা বসে থাকে। ক্ষীণদৃষ্টি দিয়ে উঁকি দেয়। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে একটু সতেজ হয়ে উঠে। কৌতুককর ভঙ্গিতে ওরা ধীরে গাছে আরোহণ করে। মনে হয় জরুরি প্রয়োজনেও ওরা এর চেয়ে দ্রুত আরোহণে সক্ষম হবে না। দলের সবচেয়ে ছোট আকারের প্রাণীটি হলো মাউস লেমুর (Mouse Lemur)। এদের নাক চেপ্টা, মোটা ও ওল্টানো এবং চোখ বড়ো আকারের ও আকর্ষণীয়। পাতলা জঙ্গলে ওরা ছুটাছুটি করে। ইন্দ্রির নিকট সম্পর্কের সমরূপ নিশাচর অপর লেমুরের নাম আবহি। দেখতে ইন্দ্রির মতোই। তবে পার্থক্য যা, তা লোমের ক্ষেত্রে। কালো-সাদা ডোরার পরিবর্তে এদের লোম ধূসর বর্ণের। লোমের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্যও বেশি। সবচেয়ে প্রাচীন ও অতি বিশেষজ্ঞ লেমুর হলো আই আই (Aye aye)। আকারে ওটেরর আকারের মতো। কালো লম্বা ও মোটা লোম, ঝোপের মতো লেজ ও বিশাল পর্দাবিশিষ্ট কান। প্রতি হাতে একটি আঙুল বেশ লম্বা। দেখতে মনে হয় শুকিয়ে গেছে। অনেকটা হাড় গঠিত ইলেক্ট্রিক প্রোব-এর মতো। এই আঙুল দিয়ে পচা কাঠ থেকে আই আই তাদের প্রধান খাদ্য গুবরে পোকার শূককীট টেনে বের করে খায়।

পাঁচ কোটি বছর আগে শুধু মাদাগাস্কারে নয়, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় লেমুর ও অন্য প্রোসিমিয়ানরা ছিলো। তিন কোটি বছরের কাছাকাছি সময়ে মোজাম্বিক চ্যানেলের বিকাশ ঘটে এবং আফ্রিকা মহাদেশ থেকে মাদাগাস্কার বিচ্ছিন্ন হয়। এ সময় অধিক বিকশিত প্রাইমেটদের উদ্ভব ঘটে। এরাও গাছে বাস করতো এবং ফল ও পাতা খেতো। এরা লেমুরের সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতো। অবশ্য প্রাইমেটরা কখনো মাদাগাস্কারে পৌছাতে পারেনি। মাদাগাস্কার চারপাশে ভারত মহাসাগর দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকায় লেমুরদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না। সম্প্রতি বিলুপ্ত ও জীবাশ্ম সূত্রে প্রাপ্ত শিম্পাঞ্জী আকৃতির লেমুরের দেহাবশেষসহ বর্তমানের নানা ধরনের বিকাশ ঘটেছিলো অপ্রতিহতভাবে। অন্যত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওরা বানরের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরেছিলো। তবে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়নি। যেহেতু একক ব্যতিক্রম দক্ষিণ আমেরিকার ডউরাফউলি ছাড়া অন্য বানরেরা কেবল দিনের বেলাতেই সক্রিয় ছিলো, সেসব প্রোসিমিয়ানদের কোনো কোনোটি এখনো টিকে আছে, যেহেতু নিশাচর এই প্রাণীদেরকে দিনে সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবেলা করতে হয়নি।

আফ্রিকায় বেশ কয় ধরনের বুশ বেবি (Bush baby) রয়েছে যাদের মাউস লেমুরের সাথে নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। বুশ বেবির সাঙ্গে পোটো? এবং আরো বেশি কোমল এংগওয়ান্টাবো? লেমুরের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই দুটোকে শান্ত লেমুরের সমকক্ষ বিবেচনা করা যায়। শান্ত লেমুরের মতো এরা ধীর প্রকৃতির। এশিয়ায় দুটো মাঝারি আকারের নিশাচর প্রোসিমিয়ান দেখা যায়। একটি শ্রীলংকার সরু ও লম্বা লোরিস (Loris) এবং অন্যটি লোরিস থেকে একটু বড়ো মোটা গোলগাল শ্লো লোরিস (Slow Loris) । এই প্রাণীদের চোখ যদিও বেশ বড়ো আকারের তবু এরা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবার লক্ষ্যে গাছে গন্ধ লাগিয়ে রাখে। গন্ধ চিহ্ন দেয় মূত্রের সাহায্যে। তবে যেহেতু এই প্রাণীরা আপেক্ষিকভাবে আকারে ক্ষুদ্র এবং গাছের গুঁড়িতে বাস না করে শাখা-পল্লবে বাস করে তাতে গন্ধচিহ্ন স্থাপনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রবল মূত্রপ্রবাহ লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। প্রার্থিত শাখায় না লেগে তা অন্য শাখায় বা মাটিতে পড়ে গিয়ে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে। কাজেই ওরা হাত ও পায়ের উপর প্রস্রাব করে এবং হাত-পা ঘষে পুরো রাজ্য জুড়ে হাত লাগিয়ে লাগিয়ে সংকেত রাখে।

টারসিয়ার (Tarsier) নামের আরো একটি প্রোসিমিয়ান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জঙ্গলে বাস করে। আকারে ও আকৃতিতে ছোট বুশ বেবির মতো। তবে মুখমণ্ডলের দিকে এক পলক তাকালেই বুশ বেবির সাথে এদের পার্থক্য ধরা পড়ে। এদের বিশাল জ্বলজ্বলে চোখ রয়েছে। দেহের অনুপাতে এই চোখ আকারে ১৫০ গুণ বড়ো। আমাদের হিসেবেও তাই। আসলে এই বিচারে, পৃথিবীর যে কোনো জায়গার প্রাণী থেকে এদের চোখ আকারে সবার চেয়ে বড়ো। চোখের কোঠর থেকে চোখ বেরিয়ে স্থির হয়ে থাকে ফলে ওরা পাশে দেখতে পায় না যেটা আমরা পারি। আমরা চোখের কোণা দিয়েও দেখি। পরিবর্তে ওদেরকে পাশে কিছু দেখতে হলে, পুরো মাথা ঘোরাতে হয়। পেঁচা যেভাবে সহজে মাথাকে ঘুরিয়ে থাকে, এরাও ১৮০° কোণে মাথাকে ঘুরিয়ে ঘাড়ের পেছনে কোনো বস্তুকে দেখে থাকে। বোর্নিওর সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে যে এরা মাথা ঘোরাতে পারে। আরো বিস্ময়ের হলো, মাথাকে পুরো বৃত্ত জুড়েই ঘোরায়। ফলে মানুষের ধারণা দেহের সাথে মাথা যেভাবে যুক্ত আছে তাতে অন্যান্য প্রাণী থেকে এদের মাথার নিরাপত্তা কম। একসময় উৎসাহী মাথা শিকারীরা ভাবতো যে জঙ্গলে টারসিয়ারের দৃষ্টি এই সংকেত ঘোষণা করতো যে শীঘ্রই একটি মাথার পতন ঘটবে। এটি

শুভ সংকেত যদি আপনি মাথা শিকারের অভিযানে বের হন কিন্তু আর যদি আপনি ঘরে শান্তভাবে বসে থাকার পরিকল্পনা করেন তাহলে তা খুব শুভ হবে না।

চোখ যেমন দর্শনীয়, টারসিয়ারের কানও কাগজের মতো পাতলা। অনেকটা বাদুড়ের কানের অনুরূপ। নির্দিষ্ট শব্দের দিকে একে ঘোরানো ও আকুঞ্চিত করা সম্ভব হয়। চোখ ও কানের মতো দুটো অতি বিকশিত সংবেদী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এরা পোকা-মাকড়, ছোট সরীসৃপ এমনকি সদ্য পালক গজানো পাখিও শিকার করে। লম্বভাবে থাকা শাখায় ঝুলে থেকে ওরা শরীরটাকে খাড়া অবস্থায় রাখে। গুবরে পোকা জঙ্গলের মাটিতে পাতার মধ্যে দিয়ে হেলে-দুলে চলাকালে টারসিয়ারের মনোযোগ দ্রুত আকর্ষিত হয়। হঠাৎ সে মাথা ঘুরিয়ে নিচে কান খাড়া করে শুনে। নড়নক্ষম কানকে সামনে এগিয়ে দেয়। গুবরে পোকা বোকামি করে শব্দ করে চলতেই থাকে। তখন টারসিয়ার খুব দ্রুত এক লাফে তিড়িং করে নিচে নামে এবং দুই হাতে পোকা ধরে দাঁত বসিয়ে দেয়। চোখ বন্ধ করে নিষ্ঠুর ভঙ্গি করে আয়েশের সাথে চোয়াল দিয়ে খচ খচ করে পোকা চিবিয়ে খায়।

টারসিয়ার মূত্রের সাহায্যে রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত করে। কিন্তু এর শিকার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করলে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মতো এদের দর্শনেন্দ্রিয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। নাকের দিকে দৃষ্টি দিলে এ বিশ্বাস কেবল দৃঢ়ই হয় না, বরং বোঝা যায় এরা অন্যান্য প্রোসিমিয়ানদের থেকে স্পষ্ট আলাদা। চোখ এতো বড়ো যে করোটির সম্মুখভাবে নাকের জন্য স্থান খুবই সংকীর্ণ এবং অভ্যন্তরীণ নাসারন্ধ্র বুশ বেবির নাসারন্ধ্রের তুলনায় অনেক কম পরিসরবিশিষ্ট। নাসারন্ধ্র কমা আকৃতিরও নয় বা এতে লেমুর ও অন্যান্য প্রোসিমিয়ানদের মতো লোমহীন ভেজা ত্বকও নেই। এ ক্ষেত্রে টারসিয়ারের সাথে বানর ও নরবানরের সাদৃশ্য আছে। ফলে বিশ্বাস করার কারণ ঘটে যে এই আদি প্রাণিকুল থেকে সকল উন্নত ধরনের প্রাইমেট উদ্ভূত হয়ে থাকবে। আসলে, একসময় এ তত্ত্বকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়েছিলো। বর্তমানে এ ব্যাপারে বিতর্ক আছে। এই ছোট প্রাণী লাফ দেওয়ায় বিশেষ পারদর্শী। তা ছাড়া এরা নিশাচর। লাফ বিশেষজ্ঞ ও নিশাচর এই প্রাণীর সরাসরি বানরে উত্তরণ সম্ভব নয়। তবে এদেরকে প্রথম দিককার প্রাইমেটদের নিকট আত্মীয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। পাঁচ কোটি বছর আগে সারা পৃথিবীতে আদি প্রাইমেটরা প্রোসিমিয়ানদেরকে স্থানচ্যুত করেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত পুরানো ও নূতন পৃথিবীতে বানর গোষ্ঠীর পত্তন করেছিলো।

বানরেরা সকল প্রোসিমিয়ানদের থেকে গুরুত্বপূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। ব্যতিক্রম কেবল টারসিয়ারের ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে বানরের প্রাধিকার হলো দৃষ্টিশক্তির, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নয়। যে কোনো আকারের গাছে বাস করা প্রাণীদের জন্য এটি অতি প্রয়োজনীয়। কারণে গাছ থেকে গাছে লাফ দেয়ার সময় কোথায় পড়ছে তা দেখতে পাওয়া জরুরি। কাজেই অন্ধকারের চেয়ে দিনের আলো এ কাজের জন্য বেশি উপযুক্ত। ডউর‍্যাফউলি ছাড়া সব বানর দিনেই সক্রিয়। প্রোসিমিয়ান থেকে বানরের দৃষ্টিশক্তি অধিকতর ভালো। এরা কেবল বস্তুর গভীরেই দেখতে পায় না, এরা বর্ণও শনাক্ত করতে পারে। নিপুণ দৃষ্টির বদৌলতে ওরা দূরের পাকা ফল ও সজীব পাতা চিনতে পারে। এক রঙবিশিষ্ট বনানীতে অন্যান্য প্রাণীদের যেখানে দেখতে না পাওয়ার কথা, সেখানে ওরা গাছে গাছে অন্য প্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ করতে পারে। ওরা

পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রঙ ব্যবহার করে। বানরের রঙ বিষয়ে ধারণা এতো ভালো হবার দরুন, সকল স্তন্যপয়ীর মধ্যে এরাই সর্বাধিক উজ্জ্বল বর্ণের।

আফ্রিকায় বাস করে ডি ব্রাজা'স গুয়েনন (Guenon)। এর দাড়ি সাদা, চোখের কোটর নীল, কপাল হলুদ, মাথায় টুপির মতো কালো চুল। ম্যান্ড্রিলের (Mandril) রক্তজবা লাল ও নীল মুখমণ্ডল। ভার্বেট (Verbet) পুরুষ বানরের চমকানো নীল জননাঙ্গ। চীনের স্নো মাঙ্কি (Snow monkey) বা তুষার বানরের ধাতব সোনালি বর্ণের লোম এবং উজ্জ্বল বিশুদ্ধ নীল রঙের মুখমণ্ডল। আমাজানের অরণ্যের উকারি (Okari) বানরের মুখমণ্ডল রক্তলাল ও লোমহীন। সবচেয়ে চমকপ্রদ বর্ণের বানরের কথা বলা হলো বটে। তবে আরো অনেক প্রজাতির বানর রয়েছে যাদের রঙিন লোম ও চামড়া থাকে। এই সাজসজ্জা আত্মপ্রচার ও ভয়ভীতি প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়। এসব দেখে প্রজাতি শনাক্ত করা যায় এবং লিঙ্গ নির্বাচন করাও সম্ভব হয়।

এরা গাছের উঁচুতে বসে উচ্ছৃঙ্খলভাবে চেঁচামেচি করে, ডালপালার মধ্যে দিয়ে। উল্টে-পাল্টে দৌড়-ঝাঁপ দেয়। ঈগল পাখি ছাড়া কোনো শিকারী ওদের নাগাল পায় না। তবে এদের উপস্থিতির বিষয়ে এরা সরব ঘোষণা দিয়েই থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার হাওলার বানর (Howler monkey) সকাল-সন্ধ্যা বসে সমস্বরে শব্দ তুলে। এদের স্বরযন্ত্র অসাধারণ বড়ো এবং এদের গলা বেলুনের মতো ফুলে যায়। এদের সমবেত ধ্বনি কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যায়। যে কোনো প্রাণীসৃষ্ট ধ্বনির চেয়ে এদের ধ্বনি সর্বাপেক্ষা উঁচু। তবে সব বানরের বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি সৃজনের ব্যাপারে রিপোর্ট আছে। কোনো বানর বোবা এমনটি জানা যায়নি।

দক্ষিণ আমেরিকায় যেসব বানর পৌঁছেছিলো তারা পানামা যোজক সমুদ্রে তলিয়ে যাবার দরুণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ওদের স্বতন্ত্র ধারাতেই বিকশিত হতে থাকে। অভ্যন্তরীণ দেহগঠন বৈশিষ্ট্যের নিরিখে ওরা যে একটি সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছিলো তা বোঝা যায়। দেহগঠন সবার ক্ষেত্রে প্রায় একইরকম। নাকের বৈশিষ্ট্যের কথাই ধরা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার বানরের নাক চেপ্টা, নাসারন্ধ্র প্রশস্ত কিন্তু পৃথিবীর বাদবাকি সব বানরের নাক সরু, অগ্রমুখী বা নিম্নমুখী।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি দলের বানর এখনো যোগাযোগের ক্ষেত্রে গন্ধ ব্যবহার করে, যদিও এরা দিনে সক্রিয় থাকে। দলের বানরদের নাম মারমোসেট (Mermoset) ও ট্যাম্যারিন (Tamerin)। পুরুষ বানর গাছের বাকল চিবিয়ে নেয় এবং বাকল মূত্র দিয়ে ভেজায়। তবে এদের দেহে বিস্তর সাজসজ্জারও আয়োজন আছে। গোঁফ, কর্ণলোম ও মাথায় মুকুটের মতো চুলের শোভা রয়েছে। সামাজিক পরিবেশে ওরা এগুলোকে সগর্বে প্রদর্শন করে এবং পরস্পরকে উচ্চ শব্দে তিরস্কারের ভঙ্গিতে হুমকি দেয়। গন্ধ-সংকেতের মতো এদের সন্তান পালন পদ্ধতিও প্রাচীন। এ পদ্ধতি লেমুরের সন্তান যত্ন নেওয়ার পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বয়স্ক বানররা পরস্পরের মধ্যে শিশুদের হাত-বদল করে কখনো বিশেষ কোনো ধৈর্যশীল পিতার দেহে সব শিশু একত্রে ভর করে এবং পিতাকে দীর্ঘ কষ্ট সইতে হয়।

খাঁটি বানরকুলে মারমোসেট ক্ষুদ্রতম বানর। মনে হয় বানরের মৌলিক জীবনাচরণ পদ্ধতি থেকে ওরা সরে গিয়ে কাঠবিড়ালীর জীবনযাপন পদ্ধতি রপ্ত করেছে। এরা বাদাম খায়,

পোকা ধরে, বিশেষ অগ্রমুখী কর্তন দন্তের সাহায্যে বাকল চিবিয়ে রস লেহন করে। পিগমী বা বামন–মারমোসেট লম্বায় মাত্র ১০ সেন্টিমিটার। যেহেতু এরা বহরে ছোট সেহেতু ওরা শাখায় আরোহণের পরিবর্তে শাখা বেয়ে ছুটোছুটি করে এবং শাখায় ওদের নখরের দাগ পড়ে। এতে বোঝা যায় এরা সরাসরি পতঙ্গভুক প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তবে সম্প্রতি এক ভাষ্যে জানা গেছে, মারমোসেটের ভ্রূণের আঙুলে বানরের আঙুলের মতো নখের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে নখ ঝরে গিয়ে নখর জন্মায়।

মারমোসেটরা অবশ্য ব্যতিক্রম। অধিকাংশ বানর আকারে এদের চেয়ে বড়ো। আসলে, বিবর্তনের পুরো ইতিহাস জুড়ে প্রাইমেটদের মধ্যে আকার–বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বোঝা সহজসাধ্য নয় যে, কেনো এরকমটি হবে। হতে পারে তা প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ প্রাণীদের কারণে। কেবল বড়ো আকার পেশি ও দ্রুত গতির বদৌলতে ওরা জয়ী হতে পেরেছে। ফলে পরবর্তীকালের প্রজন্মের মধ্যে বড়ো হবার প্রবণতা সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু ওজনে বেশি হওয়াতে হাতের উপর চাপ পড়ে অধিক। দক্ষিণ আমেরিকার বানর এই সমস্যাকে অনন্য উপায়ে মেটানোর ব্যবস্থা করেছে। এরা তাদের লেজকে দড়ির মতো বাঁকানো পারে। লেজের আগায় লোম থাকে না এবং আঙুলের আকারে লেজে আল–তোলা চামড়া থাকে। লেজ এতো শক্তিশালী যে, একটি স্পাইডার মাঙ্কি (Spider monkey) লেজের সাহায্যে ঝুলে থেকে দু'হাতে ফল আহরণ করতে পারে।

আফ্রিকার বানরে, কতিপয় কারণে, এরকম লেজের বিকাশ ঘটেনি। এরা লেজকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। শাখায় চলাচলের সময় ওরা লেজকে লম্বভাবে রাখে যাতে দেহের ভারসাম্য রক্ষা হয়। লাফ দেওয়ার সময় লেজ ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে। এটি এমনভাবে সাহায্য করে যাতে প্রাণীটি নির্দিষ্ট স্থানে নামার সময় দেহকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। এতদসত্ত্বেও বিশ্বাস করা কঠিন যে দক্ষিণ আমেরিকার গ্রাহী লেজের মতো আফ্রিকার বানরের লেজ অধিক ব্যবহার উপযোগী। আফ্রিকার বানরদের লেজ আরোহণে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবার কারণে এবং আকারে বড়ো হবার দরুন, এরা হয়তো বৃক্ষবাসকে ক্রমেই অসুবিধাজনক ও নিরাপত্তাহীন মনে করতে থাকে। ফলে ওরা বেশিরভাগ সময় মাটিতেই কাটাতে থাকে। নিশ্চিতভাবে এটি সত্যি যে নূতন পৃথিবীতে স্থলচারী কোনো বানর নেই। অথচ পুরনো পৃথিবীর বহু বানর স্থলচর।

মাটিতে বানরের লেজের গুরুত্ব নেই বললেও চলে। বেবুনের লেজের অর্ধেক অবসন্নের মতো মাটিতে গড়াতে থাকে। দেখতে মনে হয় লেজ ভেঙে গেছে। এদের নিকট আত্মীয় ড্রিল (Drill) ও ম্যান্ড্রিল (Mandrill)–এর লেজ একেবারে খাট। একই অবস্থা দেখা যায় ম্যাকাক (Macaque) পরিবারে।

সব প্রাইমেটদের মধ্যে ম্যাকাক বানরই সবচেয়ে সফল ও বহুমুখী ক্ষমতাসম্পন্ন। যদি আপনি একটি উজ্জ্বল বর্ণের, অভিযোজনক্ষম, বহুমুখী ক্ষমতাসম্পন্ন, সুস্থগতির, তৎপর, শক্তসমর্থ ও চরম আবহাওয়ায় টিকে থাকায় সক্ষম সকল আগন্তুক বানর থেকে একটি বানর পছন্দ করতে চান তাহলে উত্তরাধিকারীসহ সবার চেয়ে ম্যাকাকই জয়ী হবে। এদের ষাটটি প্রজাতি ও উপপ্রজাতি রয়েছে। অর্ধপৃথিবী জুড়ে এরা ছড়িয়ে আছে। তাদের বিস্তৃতি রোধ করেছে এক প্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগর এবং অন্য প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগর। এদের একটি

দল জিব্রালটারে রয়েছে। ইউরোপের অরণ্যে এটিই একমাত্র বানর যা মানুষের সংস্পর্শের বাইরে রয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারেও প্রশ্ন আছে। বিগত দু'শ বছরে সেখানে ব্রিটিশ সৈন্যরা বানরের সংখ্যা কমতে থাকায় নিয়মিত উত্তর আফ্রিকা থেকে বানর আমদানি করতো। ব্রিটিশদের পদার্পণের আগে সুদূর রোমান আমল থেকে ওরা সেখানে ছিলো। মনে হয় এতদসত্বেও মানুষ পোষার জন্য এদেরকে প্রণালি পার করে নিয়ে আসতো। তবু ম্যাকাকদের বাহাদুরি এখানে যে, যে কোনোভাবে, দীর্ঘকাল ধরে ওরা শিলায় টিকে থাকতে পেরেছিলো। ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র যে বানরটিকে দেখা যায়, সেটি হলো রেসাস বানর (Rhesus monkey)। এটি ম্যাকাক দলের একটি প্রজাতি, এরা মন্দিরের আশেপাশে বাস করে এবং এদেরকে পবিত্র মনে করা হয়। আরো পুর্বে, একটি প্রজাতির বানর দক্ষ সাঁতারু। জলাভূমিতে ওরা কাঁকড়া ও অন্যান্য কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী খুঁজে বেড়ায়। এরা হাত ও পাক দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে এবং ডুব দেয়। মালয়েশিয়ার শূকরলেজী ম্যাকাককে (Pigtailed macaque) নারকেল গাছে চড়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রভুর জন্য নারকেল পেড়ে দেয়। সবচেয়ে উত্তরে যে সব ম্যাকাক রয়েছে তারা জাপানের বাসিন্দা। এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। শীতের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষার জন্য ওদের দীর্ঘ, কুঁচকানো লোম থাকে।

প্রায় সকল ম্যাকাক বেশিরভাগ সময় মাটিতেই কাটায়। এদের হাত ও চোখ বৃক্ষচারী জীবনের জন্য উপযুক্ত, তবে স্থলচর হবার জন্যও ওদের দেহে সকল প্রাক-অভিযোজন ঘটেছে। এদের তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্যের সুযোগ রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যে বিষয়টি এখনো অনুল্লেখিত। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এদের বড়ো ও অধিক জটিল মগজ।

অপর দুটি বিকশিত বৈশিষ্ট্যের সাথে এর সম্পর্ক অপরিহার্য। আঙুলগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করতে হলে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা চাই। দুটো চোখে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব একটি ছবিতে পর্যবসিত হতে হলে অখণ্ড বৃত্তের আবশ্যক। বানরকে আঁকড়ে ধরা ও ক্ষুদ্র বস্তু খোঁজার জন্য যদি আঙুল ব্যবহার করতে হয়, তাহলে হাত ও চোখের মধ্যে নিপুণ সমন্বয় ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ কারণে মগজে দুটো প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কেবল একটি বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার কম। তা হলো ঘ্রাণেন্দ্রিয়। লেমুরের সাথে বানরের মগজের তুলনা করলে, দেখা যায় যে, বানরের মগজে ঘ্রাণ-ভাল্ব খাট হয়ে গেছে এবং তা ঢেকে ফেলেছে বহুল সম্প্রসারিত করোটির বহিঃস্তর। মগজের এই অংশ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শেখার ক্ষমতা প্রদানে সহায়ক।

বানর কিভাবে প্রশিক্ষিত হবার ক্ষমতা রাখে তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত হলো জাপানী ম্যাকাক বানর। জাপানী বিজ্ঞানীরা এদের অনেক দল নিয়ে গবেষণা করেছেন। জাপানের দক্ষিণাংশে উচু পর্বতে শীতে ভারী বরফ পড়ে। সেখানে এক প্রজাতির বানর বাস করে। পর্যবেক্ষকরা এই বানরগুলোর দিকে নজর রাখেন। এরা অরণ্যের একটি নির্দিষ্ট অংশে বিস্তৃত রয়েছে। এদের বিষয়ে আগে কেউ জানতো না। এখানে কিছু উষ্ণ আগ্নেয় প্রস্রবণ আছে। পর্যবেক্ষণে জানা গেলো যে বানরেরা আয়েশের সাথে উষ্ণ জলে স্নান করে। প্রথমে মাত্র গুটিকয় স্নানের প্রয়াস চালায়। পরে এই অভ্যাস সবার মধ্যে রপ্ত হয়। বর্তমানে শীতকালে সব বানর উষ্ণজলে স্নান করে। এই দৃশ্য দেখার কৌতূহল থেকেই বিজ্ঞানীরা এটি

আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো । যে অভিযোজন ক্ষমতা বানরদের নূতন প্রয়াসকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করেছিলো তা ম্যাকক বানরদের তৎপরতার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

অন্য একটি দল এমনকি আরো নাটকীয় কলাকৌশল প্রদর্শন করে। এরা ছোট দ্বীপ কোশিমার বাসিন্দা। কোশিমা দক্ষিণ হনসুর একটি দ্বীপ। জাপানের মূল ভূখণ্ড থেকে সংকীর্ণ প্রবল বেগবতী স্রোতস্বিনী দ্বারা এই দ্বীপ বিচ্ছিন্ন। কাজেই এই দলের সব বানরই খুব কাছাকাছি বাস করে। ১৯৫২ সালে একদল বিজ্ঞানী এদের নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। বানরেরা প্রথমে বন্য ও লাজুক ছিলো। কাজেই বিজ্ঞানীরা এদেরকে বাইরে বের করে আনার জন্য মিষ্টি আলু খাওয়াতে থাকেন। ১৯৫৩ সালে সাড়ে তিন বছর বয়সী স্ত্রী বানর একটি মিষ্টি আলু তুলে নেয়। এই বানরকে বিজ্ঞানীরা ভালোভাবে জানতেন এবং এর নাম দিয়েছিলেন ইমো। ইমো শত শত বার মিষ্টি আলু এভাবে আগেও তুলে নিয়ে খেয়েছিলো। বরাবরের মতো আলুতে মাটি ও বালি লেগেছিলো। কিন্তু ইমু কতিপয় কারণে আলু নিয়ে জলাশয়ে নামে এবং আলুটিকে জলে ডোবায় ও হাত দিয়ে ঘষে ময়লা পরিষ্কার করে। এটা কি পরিমাণ যুক্তিসিদ্ধ চিন্তার পরিণতি তা বলা অসম্ভব, তবে, ঘটনা হলো, এরকম একবার করার পর, তা অভ্যাসে পর্যবসিত হয়।

এক মাস পর ইমোর এক সঙ্গী এভাবে আলুতে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে। চার মাস পর ইমোর মা-ও তাই করে। দলের সবার মধ্যে এই অভ্যাস ছড়িয়ে যায়। কেউ কেউ কেবল স্বাদুজলে নয়, সাগরের লোনাজলেও আলু ধুয়ে নিতে থাকে। সম্ভবত ওরা লোনাজলের স্বাদ অধিক সুস্বাদু মনে করেছিলো। বর্তমানে সাগরের জলে মিষ্টি আলু ধুয়ে নেওয়া সর্বজনীন অভ্যাসের অন্তর্গত হয়ে গেছে। ইমু যখন প্রথম পরীক্ষা করেছিলো সে সময়ে যারা বয়োবৃদ্ধ ছিলো কেবল তাদের মধ্যেই এই অভ্যাস গড়ে উঠেনি। বৃদ্ধেরা মজ্জাগত অভ্যাসের বাইরে গিয়ে নূতন পরিবর্তনকে রপ্ত করতে পারেনি।

ইমো কেবল এই উদ্ভাবন করে ক্ষান্ত হয়নি। বিজ্ঞানীরা নিয়মিতভাবে সাগরের বালুকাবেলায় মুঠো মুঠো আস্ত ধান ছিটে পা দিয়ে মাড়িয়ে বালিতে মিশিয়ে দিতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, বানররা দীর্ঘ সময় করে ধান খুঁটে নিতে থাকবে। এই ফাঁকে ওদের নিয়ে গবেষণা করার পর্যাপ্ত সুযোগ মিলবে। তাঁরা ইমোর উপর নির্ভর করেননি। ইমো দু'হাতে বালি মেশানো ধান তুলে নিয়ে হেলে-দুলে শিলার জলাশয়ে নেমে ফেলে দেয়। বালি জলে ডুবে যায় কিন্তু ধান ভেসে থাকে। বানর দানাগুলো তুলে নেয়। আবার এই অভ্যাস ছড়িয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই সবাই এরকম করতে থাকে।

সঙ্গী-সাথী থেকে শেখার এই সক্ষমতা ও তৎপরতা একটি কমিউনিটিতে দক্ষতা ও জ্ঞানের অংশী হবার প্রেরণা সঞ্চার করে। কমিউনিটিতে সবাই ভাগ করে কর্ম-সম্পাদন করে। অর্থাৎ সংক্ষেপে একটা কালচার বা সংস্কৃতির জন্ম হয়। কালচার শব্দটি যদিও সাধারণত মানবসমাজের জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু এখানে কোশিমার ম্যাকাকদের মধ্যে এ দৃশ্যটি সরলভাবে সংঘটিত হওয়া শুরু করেছে।

কোসিমা ম্যাকাকদের খাওয়ানোর পর্বটি অন্য একটি বিষয়ে অগ্রগতি সাধন করেছে। এই ছোট প্রাণীরা বেশ কঠোর আক্রমণকারী। এদের শক্তিশালী দাঁত দিয়ে ওরা পরস্পরকে আঘাত করতে ওরা দ্বিধা করে না। বর্তমানে ওরা মানুষের এতো পরিচিত যে ওরা আর

মানুষকে ভয় পায় না। মানুষ যখন মিষ্টি আলুর থলে নিয়ে আসে তখন এরা কেড়ে নেবার চেষ্টায়ও পিছপা হয় না। একটা আলুর বেশি একবারে থলে থেকে বের করা কষ্টকর। গবেষকরা বেলাভূমিতে ওগুলো ছিটিয়ে দিয়ে সরে পড়েন। ম্যাকাকরা আলুর স্তূপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং একটা আলু মুখে, একটা হাতে নিয়ে তিন পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকে। গুটিকয়, অবশ্য আরো উত্তম কাজ করে। এরা কয়েকটি আলু নিয়ে দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে, পেছনের পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে, দৌড়ে শিলায় সুরক্ষিত স্থানে কেটে পরে। বহু প্রজন্ম ধরে যদি নিয়মিতভাবে ও স্থায়ীভাবে দৈনিক আলুর যোগান দেওয়া হয়, তাহলে সহজেই দেখা যাবে যে, যাদের দেহে আবশ্যকীয় ভারসাম্য ও পায়ের অনুপাত যথার্থ তারা উপরিলিখিত কৌশল অনায়াসে অবলম্বনের মাধ্যমে বেশিরভাগ খাদ্য সাবাড় করবে। এরাই বেশি খাদ্য পাবে এবং এরাই দলের নেতৃত্ব দেবে। এরা অধিক সফলতার সাথে প্রজনন সম্পন্ন করবে এবং দলের মধ্যে ওদের জিন বা বংশগতি বৈশিষ্ট্য ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই, কয়েক হাজার বছরের মধ্যে ম্যাককরা দ্বিপদী জন্তুতে পরিণত হবে। সত্যিকারভাবে, আফ্রিকাতে এই পরিবর্তনই ঘটেছে। এর উৎস অন্বেষণের জন্য আমাদেরকে ৩ কোটি বছর পিছিয়ে যেতে হবে।

সে সময়ে নিচু শ্রেণির একটি প্রাইমেট দল আকারে বড়ো হচ্ছিলো। গাছের মধ্যে দিয়ে ওরা যেভাবে চলাচল করছিলো, আকার পরিবর্তনের কারণে তাদের চলায়ও পরিবর্তন এসেছিলো। শাখায় দেহের ভারসাম্য রক্ষার এবং শাখার উপর দিয়ে ছোটার পরিবর্তে ওরা ডালে ঝুলতে শুরু করলো। ঝুলে থাকায় সফল হলে ওদের দেহের গঠনেও পরিবর্তন আসে। হাত লম্বা হলো। দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে হাতের দৈর্ঘ্য বেশি। ফলে অনেক দূরে সে হাত বাড়িয়ে পৌছাতে পারে। লেজের কোনো ভূমিকা রইলো না। কাজেই লেজের বিলুপ্তি ঘটলো। দেহের পেশি ও হাড়ে পরিবর্তন এলো যাতে উদর সুরক্ষিত থাকে। মেরুদণ্ডের সমান্তরালে উপর আর ঝুলে থাকলো না। খাড়া মেরুদণ্ডে উদর যেনো ফিতার বন্ধনে বাঁধা পড়লো। এ সকল পরিবর্তনই প্রথম নরবানরের উদ্ভব ঘটালো।

বর্তমানে প্রধান চার ধরনের নরবানর আছে : এশিয়ার ওরাংওটাং (Orangutan) ও গিবন (Gibbon) এবং আফ্রিকার গরিলা (Gorilla) ও শিম্পাঞ্জী (Chimpanzee)।

বোর্নিও সুমাত্রার বিখ্যাত লাল চুলো ওরাংওটাংরাই ভারী বপুর বৃক্ষচারী নরবানর। পুরুষ ওরাং দাঁড়ালে লম্বায় দেড় মিটার, হাত দৈর্ঘ্যে আড়াই মিটার এবং বিশাল ওজন অর্থাৎ ২০০ পাউন্ড। চারটি উপাঙ্গের আঙুলের মুঠো করার ক্ষমতা আছে। এদেরকে চার হাতি হিসেবে বর্ণনা করা ভালো। উরুসন্ধির বন্ধনী এতো লম্বা ও শিথিল যে, বিশেষ করে তরুণ বয়সের প্রাণীরা পা-কে এমন কোণে রাখে যা দেখলে ওরা কষ্ট পাচ্ছে বলে আমাদের কাছে মনে হবে এবং এটি আমাদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বিবেচিত হবে। সোজা কথায়, বৃক্ষচারী জীবনের উপযুক্ত হবার লক্ষ্যেই ওদের দেহের অভিযোজন ঘটেছে।

সে সঙ্গে দেহের আকার ওদের জন্য বোঝা মনে হয়। ভারে ডাল ভেঙে পড়ে। কখনো ওদের পছন্দের ফল পেরে খেতে পারে না, কারণ তা তাদের নাগালের বাইরে থাকে। শাখায় ঝুলেও ফল সংগ্রহের উপায় থাকে না। শাখা ভেঙে যাবার আশংকা থাকে। গাছ থেকে গাছে বিচরণও সমস্যা দেখা দেয়। এক গাছের শাখা অন্য গাছের মধ্যে ঢুকে গেলে অবশ্য বিশেষ

অসুবিধে হয় না। তবে সবসময় এরকমটি তো হয় না। ওরাং ওটাং এই সমস্যার সমাধান করে অন্যভাবে। সে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে কোনোক্রমে একটি মজবুত শাখা জড়িয়ে ধরে অথবা যে শাখায় বসে সেটিকে ক্রমে ঝুলিয়ে অন্য শাখার কাছাকাছি এলে হামাগুড়ি দিয়ে সেই শাখায় আশ্রয় নেয়।

উপরিখিত কৌশলগুলো যদিও এদের দক্ষ উদ্ভাবনী, তবে এগুলো সহজসিদ্ধ নয় এবং এরা দ্বারা দ্রুত চলাও সম্ভব হয় না। বৃদ্ধ পুরুষ ওরাংওটাং আকারে এতো বড়ো হয় যে, এর কাজে এই প্রক্রিয়া খুবই শ্রমসাধ্য। কোনো দূরত্ব অতিক্রমণে ইচ্ছুক হলে তাকে গাছ থেকে নেমে আসতে হয়। তারপর সে শম্বুকগতিতে অরণ্যভূমিতে হেঁটে ইপ্সিত স্থানে পৌছায়। প্রমাণ রয়েছে যে, বৃক্ষচারী জীবনও ওদের জন্য বিপজ্জনক। বয়স্ক ওরাংওটাং এর হাড় গবেষণায় দেখা যায়, ওদের শতকরা ৩৪ ভাগ হাড় ভেঙ্গে যায়।

পুরুষ ওরাং ওটাং এর বয়স বাড়তে থাকলে বিশাল গলকম্বলের মতো গল-থলে সৃষ্টি হয় এবং তা গলা থেকে ঝুলতে থাকে। এগুলো চর্বিপূর্ণ নয়, বেশ ফাঁপা এবং এগুলোকে বাতাস দিয়ে ফোলানো যায়। থলেগুলো এতো লম্বা যে তা বুক পেরিয়ে বগল এবং অংসফলক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হাওলার বানরের মতো, এদের পূর্বপুরুষরা এই থলের সাহায্য শব্দ বড়ো করতো কিন্তু বর্তমানের ওরাংওটাংরা গান করে না। এরা বিশেষত্বমণ্ডিত দীর্ঘস্বর তুলে দীর্ঘশ্বাস বা আর্তনাদের শব্দের মতো তুলে যা দুই তিন মিনিট স্থায়ী হয়। এই স্বর উৎপাদনে সে গল-থলেকে আংশিক স্ফীত করে। থলে কোঁচকানোর সময় ভাঙা ভাঙা বিরতি দিয়ে কয়টি শব্দ বের হয়। ওরা শব্দ করে মাঝে মাঝে। অধিকাংশ সময় ওরা ওষ্ঠের সরু ফাঁক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ, চিৎকার, চিঁহি চিঁহি, দীর্ঘশ্বাস ও চোষার মতো শব্দ তোলে। বহু বিচিত্র শব্দ করলেও তা বেশ নীচু। খুব কাছে থাকলে তা শোনা যায়। এরা খুব ঘন ঘন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা সে বিড় বিড় করে অস্পষ্ট শব্দে অন্যমনস্কভঙ্গিতে জানিয়ে দেয়। পুরুষরা মাকে পরিত্যাগ করার পরপরই নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেয়। একা একা ঘুরে ও খায়। কেবল স্ত্রী প্রাণীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ওরা স্বল্পসময়ের জন্য সাথীর সন্ধান করে।

স্ত্রী ওরাংওটাং আকারে পুরুষ ওরাং-এর প্রায় অর্ধেক। এরাও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। বাচ্চাদের নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। দেহের আকারের কারণের হয়তো এদেরেও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়। এরা ফলাহারী, বড়ো বপুর জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ দরকার। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনই এই পরিমাণ খাদ্য যোগাড় করতে হয়। ফলবান বৃক্ষ যত্রতত্র থাকে না। এরা জঙ্গলের এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকে, অনেক ফাঁকে ফাঁকে বিরাজ করে। কোনো কোনো গাছ ২৫ বছরে একবার ফল দেয়, অন্যরা শত বছর ধরে অবিরাম ফল দেয় বটে তবে একেকবার মাত্র এক একটি শাখায়। অপরাপর বৃক্ষদের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আবহাওয়ার পরিবর্তনহেতু নিয়মিত ফলদানের নির্দিষ্ট সময় ঠিক থাকে না। হঠাৎ তাপমাত্রা কমে যেতে পারে এবং সেই সাথে ভারী ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত হতে পারে। এমনকি যখন বৃক্ষ ফল উৎপাদন করে, ফল গাছে কেবল ঝুলে থাকতে পারে এবং মাত্র এক সপ্তাহ আগে বেশি পাকার আগে খাওয়ার উপযোগী অবস্থায় থাকতে পারে। এর মধ্যে অন্যেরা ফল চুরি করতে পারে বা ফল মাটিতে পড়ে যেতে পারে। ফলে ওরাং ওটাংকে অবিরাম ফলের খোঁজে দীর্ঘ অভিযানে বেরোতে হয়। ওরা নিজেরা যা আবিষ্কার করে তার নিজের জন্য তা লাভজনক।

গিবনরাও ফলাহারী। গিবন প্রধান দু'ভাগে বিভক্ত। এদের প্রজাতির সংখ্যাও বহু। স্বতন্ত্র পথে ওদের বিকাশ ঘটেছে। দেহ আকারে বৃদ্ধি পাওয়ায় নরবানরা গাছের শাখায় ঝুলতে উদ্দীপনা পেয়েছিলো কিন্তু প্রাচীনকালের গিবনরা পুনরায় আকারে খাট হয়ে নূতন ধরনের চলাফেরা রপ্ত করেছিলো। উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যে বৃক্ষ শাখায় গিবনের পদচারণা এক অপূর্ব দৃশ্য। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় তা অবলোকন করতে হয়। এরা শরীরটাকে বাঁকিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করে এবং শূন্যে নয় থেকে দশ মিটার পার হয়ে বিচ্ছিন্ন একটা ডাল ধরে এবং ডালে ঝুলে আবার চোখ ধাঁধিয়ে আবার লাফ দিয়ে অন্য ডালে চলে যায়। যে হাতের সাহায্যে গিবন এমন লাফ দিতে পারে তা দৈর্ঘ্যে পায়ের সমান। এরা কদাচিৎ মাটিতে নামে। এরা কখনো হাতে ভর দিয়ে চলে না। হাত মাথার উপরেই থাকে। নিপুণ ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জনের কারণে ওদের হাতের থাবা বিশেষত্বমণ্ডিত হয়েছে। শাখায় ঝুলে দ্রুত চলার জন্য হাতকে বড়শির মতো ব্যবহার করতে হয়। ডালকে যেমন হুড়কা বা ছিটকিনির মতো হাতে আটকাতে হয় আবার তৎক্ষণাৎ হাতকে মুক্ত করারও আবশ্যক হয়। এ কারণে বুড়ো আঙুল হাতের কব্জির কাছে নেমে এসেছে এবং তা আকারে খাট হয়ে গেছে। কাজেই, গিবন বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে মাটি থেকে ছোট জিনিস তুলতে পারে না। হাতকে কাপের মতো করে এক পাশ দিয়ে ছোঁ মেরে জিনিস তুলতে হয়।

যেহেতু এরা আকারে ছোট, গাছে ফলও পর্যাপ্ত সেহেতু এই ফল দিয়ে অনেকেরই উদরপূর্তি সম্ভব। কাজেই, দলবদ্ধ হয়ে ঘোরাফেরা করাই এদের জন্য বাস্তবসম্মত। এরা মিলে মিশে নিরেট পরিবারবদ্ধ হয়ে বাস করে। গিবন দম্পতির সাঙ্গে বিভিন্ন বয়সের চারটি বাচ্চা থাকে। প্রতি সকালে পরিবারের সবাই সমবেত স্বরে গান করে। পুরুষ একটা দুটো বিচ্ছিন্ন পরীক্ষামূলক ধ্বনি তারস্বরে তুলতে থাকলে অন্যরাও তাতে যোগ দেয়। দলের সবাই আনন্দগীত করতে করতে একসঙ্গে ভোজন করে। সবশেষে স্ত্রী গিবন এতো উচ্চনাদে দ্রুত থেকে দ্রুত সুর তুলে এমন তীব্র মূর্ছণা ছড়ায় যা কোনো বড় ওস্তাদ গাইয়ের পক্ষেও সম্ভব নয়। এর সমকক্ষ সুর সৃষ্টি করতে পারে মাদাগাস্কারের ইন্দ্রি। তাদের উভয়ের পূর্বপুরুষ যেহেতু ভিন্ন সেহেতু এদের একটি অর্থাৎ গিবন চলাফেরায় ব্যবহার করে সামনের দুটো উপাঙ্গ এবং ইন্দ্রি করে পেছনের দুই উপাঙ্গ। অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্য লক্ষণীয়ভাবে গায়ক, নিরামিষাশী ও দৈহিক কসরৎ প্রদর্শনে পটু একই ধরনের পরিবারভুক্ত নরবানর সৃষ্টি করেছে।

আফ্রিকার দুটি নরবানরের সাথে তাদেরই নিকটাত্মীয় এশীয় নরবানদের বড়ো ধরনের পার্থক্য রয়েছে একটি ক্ষেত্রে। আফ্রিকার নরবানরদ্বয় অধিকাংশ সময় স্থলচর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। গরিলারা মধ্য আফ্রিকার অধিবাসী। এদের একরকম গঠনের প্রাণীরা থাকে কঙ্গো অববাহিকায় এবং আকারে একটু বড়ো ধরনের গরিলারা থাকে রোয়ান্ডা ও জায়ারে সীমান্তের আগ্নেয় অঞ্চলের ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে অরণ্যে। তরুণ গরিলা কখনো সখনো গাছে আরোহণ করে। কিন্তু আরোহণ করে নিঃশব্দে। সর্বজনীন সন্ধিপদী ওরাংওটাংদের মতো আত্মবিশ্বাস নিয়ে আরোহণে ওরা পারঙ্গম নয়, ওরাংওটাং-এর পা যেভাবে গাছ আঁকড়ে ধরতে পারে, গরিলা পা সেভাবে গাছ আটকে ধরতে পারে না। দেহটাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যায় প্রধানত হাতই। গরিলা যখন নিচে নামে তখন প্রথমে পায়ে ভর রাখে, পরে হাত দিয়ে ধরে দেহকে

টেনে নেয়। কখনো গড়িয়ে নামে। এসময় পায়ের চেপ্টা পাতা দিয়ে গাছের গুড়ি, ছোট গুল্ম, লতা, বাকল যা পায় তাতে ঠেকনা দেয়।

প্রাপ্তবয়স্ক বড়ো পুরুষ গরিলা আকারে বিশাল খুব মজবুত গাছ ওদের ভার বহন করতে পারে। এরা গাছে আরোহণ করে কদাচিৎ। আরোহণের কোনো কারণও নেই। এদের দাঁতের আকৃতি ও পরিপাক যন্ত্রের প্রকৃতি ওরাংওটাং–এর মতো, অর্থাৎ এরাও মুখ্যত ফলাহারী ছিলো। এখনো এরা প্রধানত শাক–সবজির উপর নির্ভরশীল। গাছে না চড়ে হাতের নাগালে পাওয়া লতা, গুল্ম, শাক ইত্যাদিই আহরণ করে। সাধারণত ওরা মাটিতেই ঘুমায়। শাক–সবজি, লতা–গুল্মের উপর বিছানা পাতে।

এরা পরিবারবদ্ধ হয়ে বাস করে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা এক ডজন বা তারও বেশি। বড়ো আকারের রুপালি পিঠ গরিলা পরিবারের অধিপতি হয়। অধিপতি দল পরিচালনা করে। অধিপতির সাথে কয়েকটি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে গরিলা থাকে। তারা শান্তভাবে বসে ধীরে ধীরে মাটি থেকে বিশাল থাবা দিয়ে বিরামহীনভাবে পর্যাপ্ত শাক–সবজি তুলে, বনবাদাড়ের মধ্যে দিয়ে লাটিমের মতো ঘুরে গাছপালা গায়ে জড়ায়। এরা কখনো কখনো পরস্পরের পরিচর্যা করে। বেশিরভাগ সময় ওরা নীরবে বসে থাকে। মাঝে মাঝে শান্তভাবে ঘোঁত ঘোঁত বা গলগল শব্দ করে। দলের কেউ যদি মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও যায় তাহলে কিছুক্ষণ পর পর ঢেকুর তোলার মতো মৃদু শব্দ তোলে। উদ্দেশ্য অন্যদেরকে তার অবস্থান জানিয়ে দেওয়া।

বয়স্ক গরিলা ঝিমানোর সময় তরুণরা খেলে, মল্লযুদ্ধ করে। কখনো পেছনের পা তুলে বুকে ঢাক বাজানোর মতো দ্রুত শব্দ তোলার মহড়া দেয় যেমনটি বড়োরা করে।

রূপালি পিঠ গরিলা দলকে নেতৃত্ব দেয় ও রক্ষা করে। যদি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী দ্বারা ভীত বা ক্রোধান্বিত হয় তাহলে সে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করে। গর্জাতে থাকে এবং এমনকি আক্রমণও করে। ওর হাতের একটা ঘুষিতে মানুষের হাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। তুলনামূলকভাবে ওর চেয়ে কমবয়স্ক গরিলা তার দলের মেয়ে গরিলাকে ভেগে যাবার প্রলোভন দিলে এবং ক্রমাগত জ্বালাতন করলে সে যুদ্ধ নামে। কিন্তু তারা দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে নীরবে ও শান্তিতে।

বহু বছর ধরে গরিলাদের কতিপয় দলকে গবেষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে গরিলাদের সাথে একটা বোঝাপড়া সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তবে মানুষকে তাদের কাছে বন্ধুর মনোভাব নিয়ে যেতে হবে এবং যথাযথ ভদ্র আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। গরিলা পরিবারের মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের মধ্যে বসার অনুমতি লাভ করা একটি মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা। এরা বহুভাবে আমাদেরই মতো। এদের দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় আমাদের দর্শণ, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের একেবারে কাছাকাছি। কাজেই আমরা যেভাবে এই পৃথিবীকে অনুভব করি ওরাও সেভাবে করে। আমাদের মতো ওরাও বড়ো পরিবারবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে বাস করে। ওদের পরমায়ু মানুষের পরমায়ুর অনুরূপ। ওরাও আমাদের ন্যায় একই বয়সে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক থেকে বৃদ্ধ হয়। এমনকি আমরা যেমন সংকেতময় ভাষা ব্যবহার করি, ওদের মধ্যে বসলে, ওদেরকেও তেমন সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতে দেখি। ওদের চাহনি রূঢ়। নরবানরের দৃষ্টিতে বললে এ চাহনি ভীতি–উৎপাদক একটি

চ্যালেঞ্জ যা প্রতিহিংসাকে আমন্ত্রণ জানায়। মাথা নিচু করে চোখ বুঁজে ওরা আত্মসমর্পণের ভঙ্গি প্রদর্শন করে, সেসঙ্গে বন্ধুত্বও ঘোষণা করে।

গরিলার মেজাজের সাথে খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত এবং এই খাদ্য পেতে হলে এদেরকে কি করতে হয়? এরা পুরোপুরি শাক-সবজি, লতা-পাতার উপর নির্ভরশীল এবং হাতের কাছে এ সবের অফুরন্ত সম্ভার রয়েছে। এরা আকারে এতো বড়ো ও এতো শক্তিশালী যে, এদের প্রকৃত কোনো শত্রু নেই। কাজেই এদেরকে দেহ ও মনে খুব বেশি তৎপর হবার আবশ্যক হয় না।

আফ্রিকার অপর নরবানরটি হলো শিম্পাঞ্জী। এদের খাদ্যভ্যাস ভিন্ন, মেজাজও ভিন্ন। গরিলা দুই ডজন নানা ধরনের ফল ও পাতা আহার করতে পারে। কিন্তু শিম্পাঞ্জী দুই শত নানা ধরনের ফল ও পাতা আহার করে। এছাড়া উই, পিঁপড়া, মধু, পাখির ছানা, পাখি ও এমনকি বানরের মতো ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীও ভক্ষণ করে। এ কারণে এরা কৌতূহলী ও খুব কর্মতৎপর।

জাপানের একটি বিজ্ঞানী দল টাঙ্গানিকা হ্রদের পূর্ব তীরবর্তী অরণ্যে কতকগুলো শিম্পাঞ্জী দলের উপর গবেষণা করেছেন। বর্তমানে এরা মানুষের উপস্থিতির সাথে পরিচিত। ফলে এদের সাথে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়।

এদের দলে সদস্য সংখ্যা বেশি কম হতে পারে। তবে গরিলার দলের সদস্য থেকে এদের দলে সদস্যসংখ্যা অনেক বেশি। একটি দলে পঞ্চাশটি পর্যন্ত শিম্পাঞ্জী থাকতে পারে।

শিম্পাঞ্জী বৃক্ষ আরোহণে পটু। এরা গাছে খায় ও ঘুমায়। তবে এরা অভ্যাসগতভাবে মাটিতে ঘোরাফেরা করে ও বিশ্রাম নেয়। এমনকি ঘন অরণ্যেও। মাটিতে ওরা চারপায়ে চলে। হাত আঙুলের গাঁটের উপর ভর রাখে। দীর্ঘ অনমনীয় হাত ঘাড়কে উঁচুতে রাখে। যখন দলের সবাই এক জায়গায় বসতি গড়ে মাটিতে আরাম করে তখনও ওরা অবিরাম কাজ করতে থাকে। কেউ বিছানা তৈরি প্র্যাকটিস করে, গাছের আগায় শাখায় ঝুঁকে প্ল্যাটফর্ম বানায় কেউ। তবে কাজ শেষ হবার আগেই হয়তো ওরা ক্লান্ত হয় এবং গাছ থেকে নেমে এসে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়।

ওদের পরস্পরের মধ্যে যৌনবন্ধন নানাবিধ। কতকগুলো স্ত্রী ও পুরুষ একগামী। অন্যান্য পুরুষ শিম্পাঞ্জী বহুগামী, অনেক স্ত্রী শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে সঙ্গম করে। স্ত্রী শিম্পাঞ্জীরা পশ্চাৎদেশের এক চতুর্থাংশ, ফ্যাকাশে লাল মাংসল কুশানের মতো ফুলে উঠলে, ওরা যৌন উত্তেজনা বোধ করে এবং কখনো কখনো বহু পরুষ শিম্পাঞ্জীর সাথে প্রণয় ও রমণে প্রবৃত্ত হয়। মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধন বেশ গভীর। প্রসবের পরপরই শিশু ছোট হাত দিয়ে মায়ের লোম আঁকড়ে ধরে। তবে প্রথমদিকে হাত এতো সবল থাকে না, যাতে দীর্ঘক্ষণ ঝুলে থাকতে পারে। মা তাকে ঝুলে থাকায় সাহায্য করে। পাঁচ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত, দলে বিচরণের সময় শিশু মার পিঠে বসে থাকে ঘোড়ার সহিসের মতো। শিশুর আঁকড়ে ধরার মতো হাত হলে তা মাকে জড়িয়ে ধরায় সাহায্য করে। এতে মা ও শিশুর মধ্যে দৃঢ় নির্ভরশীলতা সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে শিম্পাঞ্জী সমাজে। এতে করে শিশু মায়ের কাছ থেকে বহু কিছু শিখতে পারে। মাও শিশু বড়ো হবার সময় কাছে থেকে নজর রাখতে পারে, কি করছে তদারক করতে পারে। বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে এবং মায়ের আচার-আচরণের দৃষ্টান্ত শিশুকে দেখাতে পারে।

বিশ্রামরত দলের প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অবিরাম আন্তঃক্রীড়া চলে। নবাগত, পরস্পরাকে সম্ভাষণ জানায়। একটি সম্প্রসারিত হাতের পেছনের অংশ পেতে দেয়। অন্যটি তা শুঁকে ও নখ দিয়ে স্পর্শ করে। ধূসর বর্ণের টাকমাথা বয়স্ক পুরুষ শিম্পাঞ্জীর চোখ দুটো উজ্জ্বল এবং মুখের ত্বক কুঁচকানো। এরা প্রায়ই প্রধান কর্মস্থলের অদূরে বসে থাকে। তখন এদের বয়স ৪০ হতে পারে এবং এরা খিটখিটে মেজাজের হয়। এদের প্রতি বেশ সম্মান দেখানো হয়। স্ত্রীরা দৌড়ে গিয়ে বুড়োর ওষ্ঠে চুম্বন করে এবং আবেগের সাথে শব্দ করে। দলের তরুণ, বয়স্ক সবাই মিলে ঘন্টার পর ঘন্টা পরস্পরের পরিচর্যা করে, কালো চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালায়, চামড়ায় নখের আঁচড় দিয়ে আঁশ বা পরজীবী উপড়ায়। একাজ করায় ওরা খুব ব্যগ্র হয়, পরস্পরকে পরিচর্যা করায় ওরা আনন্দ পায়। ৫/৬টি শিম্পাঞ্জী শৃঙ্খলের মতো পরপর বসে পরিচর্যায় মগ্ন থাকে। এটি খাঁটি সামাজিক কাজে পরিণত হয়েছে এবং এটি বন্ধুত্বের সংকেত ও বটে।

একভাবে না হলে অন্যভাবে, দলটি চারপাশের সবকিছুকে অনুসন্ধান করে। একটি গাছের গুঁড়ি থেকে বেরোনো বাজে গন্ধ ওরা শুঁকে দেখে সতর্কভাবে এবং আঙুল ঢুকিয়ে পরখ করে। একটি পাতা ছেঁড়া হলো। এটিকে খুব যত্নের সাথে পর্যবেক্ষণ করে নিচের ঠোঁট দিয়ে চেখে দেখা হয় এবং গাম্ভীর্যের সাথে আবার পরীক্ষার জন্য অন্য শিম্পাঞ্জীকে দেওয়া হয়, পরে তা ছুঁড়ে ফেলা হয়। দল উইয়ের ঢিবি পরিদর্শনে যেতে পারে। যাবার পথে কেউ একটি ডাল ভেঙে নিয়ে এটিকে ছেঁটে নির্দিষ্ট আকারে পরিণত করে এবং পাতাগুলো ছিড়ে ফেলে। উইয়ের ঢিবিতে এসে কোনো একটি গর্ত দিয়ে কাঠিটি ঢুকায়। কাঠি তুললে দেখা যায় এতে অনেক সৈনিক উই চোয়াল দিয়ে কামড়ে ধরে আছে। বহিরাগতদের বিরুদ্ধে সৈনিক উই বাঁসা রক্ষার জন্য এরকম আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। শিম্পাঞ্জী কাঠিকে ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে টেনে নেয়। ফলে উই মুখের ভিতরে চলে আসে। পরে আরাম করে উই চিবিয়ে খায়। শিম্পাঞ্জী কেবল অস্ত্র বানায় না, অস্ত্র ব্যবহারও করে।

মূলত স্থলচর, গন্ধপ্রভাবিত ও কদাচিৎ নিশাচর জীবনযাপনে সিদ্ধ আদি প্রাইমেটরা বৃক্ষচারী হবার পথে এগিয়েছিলো। ফলে ওদের মধ্যে আঁকড়ে ধরার মতো হাত, লম্বা হাত, ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন রঙ নির্ণয়ে সক্ষম চোখ ও সমৃদ্ধ মগজের বিকাশ সাধিত হচ্ছিলো। এই সকল গুণাবলির পরিপ্রেক্ষিতে বানর ও নরবানর বৃক্ষচারী জীবনে বড়ো সাফল্য পেয়েছিলো। কিন্তু এদের মধ্যে যারা দেহের আকারবৃদ্ধির বা অন্য কারণে স্থলচর জীবনযাপনে ফিরে আসে তাদের ক্ষেত্রে এই সকল গুণাবলি নূতন পরিবেশে টিকে থাকায় সাহায্য করে এবং এসবের আরো পরিবর্তন সাধিত হয়। সমৃদ্ধ মগজ শেখা ও দল-সংস্কৃতির পত্তনে সহায়ক হয়। নিপুণ হাত সমন্বিত দৃষ্টিশক্তি অস্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহারে সমর্থন জোগায়। যে সকল প্রাইমেট অধুনা এ সকল দক্ষতা ব্যবহার করে, ২ কোটি বছর আগে, আফ্রিকায় প্রথম উদ্ভূত প্রাচীন নরবানরদের একটি শাখার প্রাণীরাও এই কৌশল ব্যবহার করতো। এখন এগুলোরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। সেই শাখাটিই শেষাবধি খাড়া হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের মেধার বিকাশ এমন পর্যায়ে ঘটায় যে এরা পৃথিবীকে পুরো কব্জা করে ও পৃথিবীতে এমন কর্তৃত্ব কায়েম করে যা অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যোগাযোগ উদ্ভাবনে পারদর্শী

সমস্ত বড়ো প্রাণীদের মধ্যে *Homo sapiens* বা মানুষেরা হঠাৎ সংখ্যায় বেড়ে গেলো। দশ হাজার বছর আগে এরা সংখ্যায় ছিলো এক কোটি। এরা উদ্ভাবনে দক্ষ, যোগাযোগ রক্ষায় সফল ও উপায় উদ্ভাবনে সম্ভাবনাময়। কিন্তু প্রজাতি বিবেচনায়, মনে হয়, অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা যে সকল বিধি ও সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এদের সংখ্যাও সে সকল বিধি ও সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরে, প্রায় চার হাজর বছর আগে, এদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। দুই হাজার বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিলো তিন কোটি। এক হাজার বছর আগে এরা পৃথিবী ছেয়ে ফেলতে শুরু করে। আজ পৃথিবীর জনসংখ্যা পাঁচশ কোটিরও বেশি। জনসংখ্যাবৃদ্ধির বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে এই শতকের শেষে তা ছয়শ কোটির উপরে যেতে পারে। এই অসাধারণ প্রাণীরা অভূতপূর্বভাবে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। এরা মেরুপ্রদেশের তুষার এবং বিষুব রেখার উষ্ণমণ্ডলীয় জঙ্গলে বাস করে। মানুষ উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছে যেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ উত্তরোত্তর হালকা পরিমাণে থাকে। এরা বিশেষ পোশাক পরে ওরা সমুদ্রের তলদেশে হেঁটে বেড়ায়। কেউ কেউ এই গ্রহ ছেড়ে চাঁদেও পাড়ি জমিয়েছে।

এসব ঘটলো কিভাবে? হঠাৎ করে মানুষ এমন কোনো শক্তি অর্জন করলো যার পরিপ্রেক্ষিতে সকল প্রজাতির প্রাণীর চেয়ে সফলকাম হতে পারলো? আফ্রিকার সমতলভূমিতে ৫০ লক্ষ বছর আগে এ গল্পের শুরু। সেই সমতল ভূমি আজকের মতো ঘাস ও গুল্মে আবৃত ছিলো। ঘাস ও গুল্মের আবরণ ছিলো আরো ঘন। বর্তমানের প্রজাতিগুলো সে সময় আকারে ছিলো বিশাল। শূকরের আকার ছিলো বর্তমানের গরুর আকারের অনুরূপ। ওদের দাঁত ছিলো এক মিটার লম্বা। মোষ আকারে ছিলো বিরাট। বর্তমানে হাতির যা উচ্চতা সেকালের হাতির উচ্চতা ছিলো এর তিন গুণ। অবশ্য জেব্রা, গণ্ডার জিরাফের আকার ছিলো আজকের জেব্রা, গণ্ডার ও জিরাফের সমতুল্য। সেখানে শিম্পাঞ্জী আকারের নরবানরও ছিলো। এরা ছিলো অরণ্যচারী নরবানরদের উত্তরসূরি। এরা ১ কোটি বছর আগে কেবল আফ্রিকায় নয়, ইউরোপ ও এশিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম স্থলচর নরবানরের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। এদের নাম রাখা হয় অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus)। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় কয়েক ধরনের নরবানরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের কুলুজী বিষয়ক জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। যখনই এক টুকরো নূতন জীবাশ্ম মাটির তলা থেকে আবিস্কৃত হচ্ছে, তখনই নূতন বেগে বিতর্কের অবতারণা হচ্ছে। কারণ সকল গবেষক এই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে এই প্রাণীদের মধ্যেই রয়েছে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষেরা। দল হিসাবে এদেরকে স্বচ্ছন্দে নর-বানরসদৃশ মানুষ বলা যায়।

এরা সংখ্যায় প্রচুর নয়। এদের অশ্মীভূত হাড়ও কালেভদ্রে মেলে। তবে এরা জীবিত অবস্থায় দেখতে কিরকম ছিলো সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির জন্য প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলো পর্যাপ্ত। এদের হাত ও পা বৃক্ষ–আরোহী পূর্বপুরুষদের হাত ও পাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ওদের আঙুলে নখর নয়, নখ ছিলো। এরা আঙুলে দিয়ে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে পারতো। উপাঙ্গগুলো বা হাত–পা দৌড়ানোর উপযুক্ত ছিলো না। এন্টেলোপ বা মাংসাশীরা যে উদ্দেশ্যে উপাঙ্গকে ব্যবহার করতো, এরা নিশ্চিতভাবে উপাঙ্গকে সেরূপ উদ্দেশ্যসাধনে কার্যকর করতে পারতো না। ওদের করোটিতেও অতীতের অরণ্যচারী জীবনযাপনের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। চোখের কোঠর দেখে বোঝা যায়, চোখ উত্তম বিকশিত ছিলো। সকল বানরগোষ্ঠী ও নরবানরগোষ্ঠীর জন্য যেমন স্বচ্ছ দৃষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তেমনটি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো এদের ক্ষেত্রেও। তুলনামূলকভাবে এদের ঘ্রাণশক্তি দুর্বল। কারণ করোটিতে নাসা–ফাটল খর্বকায় লক্ষ করা যায়। দাঁতগুলো ছোট ও গোলাকৃতির। এগুলো ঘাস চিবানো বা আঁশবিশিষ্ট ডাল–পালা গুঁড়ো করার মতো উপযুক্ত নয়। মাংসাশীদের দাঁতের মতো কাটা–ছাঁটার উপযোগী দাঁত নয়। সমতলে ওরা তাহলে কি আহার করতো? সম্ভবত এরা গাছের মূল উপড়াতো। ফল আহরণ করতো। কিন্তু এরা শিকারী প্রাণীতেও পরিণত হয়েছিলো, যদিও ওদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগঠন এ কাজে সমর্থন যোগানোয় প্রায় অক্ষম ছিলো।

এদের শ্রেণিফলক প্রমাণ করে যে, সমতলে কলোনি স্থাপনের শুরুতেই এরা খাড়া হয়ে দাঁড়াতো। বৃক্ষচারী প্রাইমেট গাছ থেকে হাত দিয়ে ফল ও পাতা আহরণ করতো। তখন থেকেই এদের মধ্যে খাড়াভাবে দাঁড়ানোর প্রবণতা তৈরি হতে থাকে। গাছ থেকে মাটিতে নামার পর এদের অনেকেই স্বল্পক্ষণের জন্য পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারতো। অবশ্য সমতলে জীবনযাপনের জন্যে স্থায়ীভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো খুবই অপরিহার্য ছিলো। নরবানরসদৃশ মানুষেরা সমভূমির শিকারী প্রাণীদের তুলনায় দৈর্ঘ্যে খাট, ধীরগতিসম্পন্ন ও অস্ত্রহীন ছিলো। কাজেই শত্রুর আগমনের আগে সতর্কবার্তা লাভ ওদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিলো। ওদের খাড়া হয়ে দাঁড়ানোয় সক্ষমতা অর্জন এবং চারদিকে নজর রাখতে পারা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছিলো। এই ক্ষমতা শিকারের জন্যও খুব মূল্যবান ছিলো। সমতলের সিংহ, শিকারী কুকুর, হায়েনা ইত্যাদি যাবতীয় শিকারজীবী পশু ঘ্রাণের সাহায্যে বহু তথ্য সংগ্রহ করে। এরা নাককে মাটির কাছাকাছি রাখে। কিন্তু নরবানরসদৃশ মানুষের দৃষ্টিশক্তিই ছিলো তথ্য আহরণের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষচারীদেরও এই বৈশিষ্ট্য ছিলো। মাথা উঁচুতে রেখে বেশ দূরে চারদিকে নজর চালাতে পারা ধূলিসিক্ত ঘাসে গন্ধ শোঁকার চেয়ে অনেক লাভজনক ছিলো। মুক্ত তৃণভূমিতে বেশিরভাগ সময়যাপনকারী পটাস বানর এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করতো। বিপদের সম্ভাবনা দেখলে ওরা পেছনের পায়ে ভর রেখে দাঁড়াতো।

খাড়া হয়ে দাঁড়ানো নিশ্চিতভাবে দেহের গতিবৃদ্ধির উপায় নয়। বরং নরবানরসদৃশ মানুষের এতে গতি হ্রাস পেয়েছে। প্রাইমেটদের মধ্যে দু'পায়ে দৌড়ানো প্রাণীর মধ্যে সম্ভবত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দৌড়বিদই অন্যতম। দৌড়বিদ যে কোনো দূরত্ব অতিক্রম করে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৫ কিলোমিটার দৌড়ের মাধ্যমে। অথচ চারপায়ে লাফিয়ে চলা বানর এক ঘণ্টায় এর দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করে। তবে দ্বিপদীত্ব অন্য একটি সুবিধার সৃষ্টি করেছে। নরবানরসদৃশ মানুষেরা নিপুণ হাত জোরে মুঠি করতে পারতো। ওদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বৃক্ষচারী

জীবনযাপনের আবশ্যকতায় এই ধরনের হাতের বিকাশ ঘটেছিলো। যখন ওরা খাড়া হয়ে দাঁড়াতো, এই হাতদুটো সবসময় দাঁত ও নখরের বিকল্পরূপে তৈরি থাকতো। শত্রু হুমকি দিলে হাত দিয়ে পাথর ছুঁড়ে, লাঠি ঘুরিয়ে আত্মরক্ষা করতো। সামনে শবদেহ পড়লে, সিংহের মতো দাঁত দিয়ে শবের চামড়া ছিলতে না পারলেও হাত দিয়ে ধারালো পাথরের সাহায্যে চামড়া কেটে ফেলতো। এরা এমন কি একটা পাথর নিয়ে অন্য পাথরে আঘাত করে করে একটা নির্দিষ্ট আকৃতি দিতে পারতো। এরা স্বেচ্ছায় যে সব আকৃতির পাথর বানাতো সেগুলোর সাথে স্রোতে গড়ানো বা তুষার দ্বারা ভাঙা পাথরের স্পষ্ট পার্থক্য ছিলো। নরবানরসদৃশ মানুষের হাড়ের সাথে এ সকল পাথর পাওয়া গেছে বহুল পরিমাণে এবং এগুলোকে শনাক্তও করা হয়েছে। এই মানুষেরা যন্ত্রপাতি নির্মাতায় পরিণত হয়। কাজেই নরবানরসদৃশ মানুষেরা সমতলের প্রাণী সমাজে একটি স্থায়ী আসন দাবী করতে পেরেছিলো।

এই অবস্থা দীর্ঘদিন বজায় থেকেছিলো। সম্ভবত ৩০ লক্ষ বছর ধরে। ধীরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নরবানরসদৃশ মানুষের দেহ স্থলচর জীবনে অভিযোজিত হতে থাকে। পা দৌড়ানোর উপযুক্ত হয় এবং আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা হারায়। পা অনেকটা খিলানের ভূমিকা পালন করে। বস্তি প্রদেশে পরিবর্তন আসে। শ্রোণিচক্রের কেন্দ্রে সন্ধি স্থানান্তরিত হয়। ফলে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। শ্রোণি গামলার আকৃতি ধারণ করে এবং প্রশস্ত হয়। এতে শ্রোণি ও পাঁজরের মধ্যে পেশির মজবুত বাঁধন গড়ে উঠে। ফলে খাড়া দেহে উদরকে সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। পাঁজর খানিকটা বাঁকা হয়। যাতে দেহের উর্ধ্বাংশের ওজন দেহের কেন্দ্রানুগ হয়। অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো করোটির পরিবর্তন। চোয়াল খাটো হয়ে যায় এবং কপাল গম্বুজাকৃতি পায়। প্রথম নরবানরসদৃশ মানুষের মগজ আকারে গরিলার মগজের আকারের সমরূপ ছিলো। প্রায় ৫০০ ঘন সেন্টিমিটার। বর্তমানে মানুষের মগজ আকারে এর দ্বিগুণ। মানুষ উচ্চতায় দেড় মিটারের উপরে। বিজ্ঞান এই শেষোক্ত প্রাণীদের দেহের বৈশিষ্ট্য ও উচ্চতা বিবেচনা করে নাম রেখেছে *Home erectus* বা খাড়া মানব।

Homo erectus পূর্বপুরুষদের চেয়ে দক্ষ কারিগর। এরা কয়েকটি পাথরকে সযত্নে ঘষে এক প্রান্তকে এমন সুঁচালো করে, যার দু'পাশই ধারালো এবং পাথরের আকার এমন ছোট করা হয় যাতে স্বচ্ছন্দে হাতে ধরা যায়। কেনিয়ার দক্ষিণপূর্বস্থিত ওলোরগেসেইলি নামক স্থানের মাটির নিচে এদের সফল শিকারের প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। ছোট একটি জায়গায় বর্তমানে বিলুপ্ত দানো বেবুনের ভাঙাচোরা হাড় পাওয়া গেছে। এখানে কমপক্ষে ৫০টি প্রাপ্তবয়স্ক ও এক ডজন অল্পবয়স্ক জন্তুকে জবাই করা হয়েছিলো বলে ধারণা করা হয়। অন্যান্য অবশেষের মধ্যে রয়েছে শত শত ঘষামাজা পাথর ও কয়েক হাজার অমসৃণ খোয়া। সবগুলো শিলাগঠিত। এই অঞ্চলের ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে এ ধরনের প্রাকৃতিক শিলার কোনো অস্তিত্ব নেই। এ থেকে অনেক কিছু ধারণা করা সম্ভব। পাথরগুলোকে যেভাবে ঘষামাজা করে আকৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে বোঝা যায় এই শিকারীরা ছিলো খাড়া মানব। এই পাথরগুলোকে দূর থেকে বহন করে আনা হয়েছিলো। এর অর্থ শিকার কর্মটি ছিলো পূর্বপরিকল্পিত এবং শিকারীরা শিকার লাভের পূর্বেই অস্ত্র সজ্জিত ছিলো। বেবুনদের এমন কি বর্তমানে জীবিত ছোট প্রজাতির সদস্যরাও শক্তিশালী চোয়ালের অধিকারী ও স্বভাবে দুর্দান্ত। আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া দু'একজন হয়তো ওদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। ওলোরগেসেইলিতে যে সংখ্যক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিলো তা থেকে বোঝা যায় যে, দলবদ্ধ হয়ে

নিয়মিত এই শিকার ও জন্তু নিধন চালাতো। বর্তমানে এই খাড়া মানুষেরা স্পষ্টত খুবই দুর্দান্ত শিকারীতে পরিণত হয়েছে।

আমরা যেটিকে ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করি, তারা শিকার পরিকল্পনা ও শিকার আক্রমণের সময় কি সে ধরনের ভাষা ব্যবহার করতো? ওদের করোটি ও কণ্ঠাস্থি এবং গলার নরম কলা গবেষণা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। আধুনিক নর-বানররা যে ধরনের ঘোঁৎ ঘোঁৎ ও চিঁহি চিঁহি আওয়াজ করে, এই প্রাণীরা আরো জটিল ধরনের আওয়াজ করতে বলে সম্প্রতি ধারণা করা হচ্ছে। আমরা বলতে পারি, ওদের ভাষা সম্ভবত ছিলো নিম্নস্বরের ও অস্পষ্ট।

অবশ্য ওরা অন্য একটি মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতো। সে মাধ্যমটি হলো অঙ্গ-ভঙ্গি। এ থেকে আমরা স্থির অনুমান করতে পারি যে এরা কেমনটি ছিলো এবং ওরা কি বোঝাতে চাইতো। অন্য সব প্রাণীর চেয়ে মানুষের মুখমণ্ডলে স্বতন্ত্র আরো অনেক পেশি রয়েছে। ফলে ওষ্ঠ, চিবুক, ইত্যাদিকে নানাভাবে নাড়ানো সম্ভব হয়েছে, যা অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই খাড়া মানুষের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারটি মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবার ব্যাপারে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই।

মানুষের শনাক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো। আমরা নিশ্চিত ধরে নিতে পারি যে, আমাদের মুখমণ্ডলের আকৃতি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। এটি প্রাণিকুলের মধ্যে একটি অসাধারণ ঘটনা। সংঘবদ্ধ দলে কোনো কাজে স্বতন্ত্র প্রাণীকে সহযোগিতা করতে হলে তাকে নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসময় তাৎক্ষণিকভাবে একে অপরকে চিনে নেওয়া বেশ সঙ্কটজনক। অনেক সমাজবদ্ধ প্রাণী যেমন হায়েনা ও নেকড়ে গন্ধ শুঁকে পরস্পরকে শনাক্ত করে। মানুষের দৃষ্টিশক্তি ঘ্রাণশক্তির চেয়ে প্রখর। কাজেই গ্রন্থি নিঃসৃত সুগন্ধী রসের সাহায্যে শনাক্ত করার পরিবর্তে ওরা মুখমণ্ডলের আকৃতি দিয়েই পরস্পরকে শনাক্ত করে।

যেহেতু মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যসমূহ খুবই পরিবর্তনশীল, এগুলো মানুষের মতিগতি পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ তথ্য হাজির করতে পারে। আমরা স্বল্প কষ্টে মানুষের উৎসাহ, উল্লাস, বিরক্তি, রাগ ও বিনোদনের অভিব্যক্তি বুঝতে পারি। এ ধরনের আবেগ প্রকাশ ছাড়াও আমরা মুখমণ্ডলের সাহায্যে সম্মতি-অসম্মতি, আহ্বান, আদেশ ইত্যাদি সংক্ষেপে জানাতে পারি। আমরা পিতা-মাতা থেকে যে সকল অঙ্গভঙ্গি রপ্ত করেছি তা সমাজের অবশিষ্ট মানুষের সাথে ভাগ করে নেই। আমাদের সকলের সামাজিক পটভূমি এক বলেই আমাদের ব্যবহৃত অঙ্গভঙ্গি স্বেচ্ছাপ্রসূত? নাকি এটি আমাদের মর্মমূলে প্রোথিত এবং তা প্রাগৈতিহাস কাল থেকে বংশগতিসূত্রে অর্জিত? কতিপয় অঙ্গভঙ্গি যেমন গণনা পদ্ধতি বা অপমান করার রকমসকম সমাজ থেকে সমাজে ভিন্ন রকম হয় এবং এগুলো স্পষ্টত শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অন্যগুলো মনে হয় বিশ্বজনীন এবং এগুলোর মূল অনেক গভীরে। উদাহরণস্বরূপ খাড়া মানুষ আমাদের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি বা অসম্মতি জানাতে পারতো কি? এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমাদের সাথে সংযোগ ছিলো না এমন অন্য সমাজের মানুষ দ্বারা ব্যবহৃত অঙ্গভঙ্গি সূত্রে পাওয়া যেতে পারতো।

পৃথিবীতে নিউগিনি হলো সর্বশেষ অঞ্চল যেখানে উপরিলিখিত ধরনের মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। এমন কি সেখানেও, পাশ্চাত্যের ইউরোপীয় জনসাধারণের প্রভাব থেকে

মুক্ত থাকতে পেরেছে মাত্র গুটি কয় মানুষ। কারণ এই দ্বীপের প্রায় সর্বত্র অভিযান পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু দশ বছর আগে সেপিক নদীর উৎসমুখে অরণ্যঘেরা পর্বতের ছোট একটি জায়গা আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে বহিরাগতদের পদক্ষেপ পড়েনি। এই অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় বিমানের নাবিক এই অঞ্চলে স্পষ্টভাবে কতকগুলো কুঁড়ে ঘর লক্ষ করেন। প্রত্যেকের ধারণা, যে এই অঞ্চলটি জনবসতিশূন্য সে সময় এই অঞ্চলটি অস্ট্রেলিয়ার শাসনাধীন ছিলো। দ্বীপের নিয়ন্ত্রণকারী অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাত এই জনগোষ্ঠী আবিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন। জেলা কমিশনারের নেতৃত্বে অনুসন্ধানী দল গঠিত হয়। আমি এই দলে যোগ দেবার সুযোগ পাই। নদীতীরের গ্রাম থেকে মাল ও তাঁবু বহনের জন্য একশ লোক নিয়োগ করা হয়। নদীর একটি শাখার তীরে অবস্থিত জানামতে সর্বশেষ গ্রামটির জনসাধারণ বলেছিলো যে, সামনের পাহাড়ে মানুষের বসতি আছে বলে তারা জানতো, তবে কেউ কখনো তাদের সাক্ষাৎ পায়নি। এরা কোনো ভাষায় কথা বলে তা তারা জানে না এবং এদেরকে কোন গোষ্ঠীর মানুষ বলা যাবে তাও তারা জানে না। অবশ্য এদের গ্রামেও সভ্য মানুষের আনাগোনাও হয়েছে কালে-ভদ্রে। এই গ্রামের মানুষের অজানা ঐ মানুষদের বিয়ামী বলে অভিহিত করে।

আমরা দুই সপ্তাহ ধরে পরিভ্রমণের পর পদচিহ্ন আবিষ্কার করি। প্রতিদিনই আমরা বৃষ্টির তোড়ে জবুথবু হয়েছি এবং আহারের জন্য সঙ্গে নেওয়া খাদ্যের উপর পুরো নির্ভর করেছি। সাথীদের মধ্যে দুজন আমাদের আগে আগে দ্রুত চলছিলেন। আমরা তাঁদের অনুসরণ করছিলাম। সকালে ক্যাম্প গোটানোর সময় অদূরের জঙ্গলে ওদের পদচিহ্ন দেখতে পাই। বুঝতে পারলাম ওরা আগের দিন সন্ধ্যা থেকে আমাদের দিকে নজর রাখছিলো। সে রাতে জঙ্গলে কিছু উপহার সামগ্রী রাখা হলো। কিন্তু ওরা তা স্পর্শ করলো না। নদী তীরের মানুষদের ভাষায় আমরা সম্ভাষণ জানালাম। বিয়ামীরা সেই ভাষা বুঝতে পারলো কিনা আমরা জানতে পারিনি। যাহোক, প্রত্যুত্তরও মেলেনি। এভাবে রাতের পর রাত কেটে গেলো। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের গমনাগমন পথের চিহ্ন হারিয়ে ফেলি। তিন সপ্তাহ পর, ওদের সাথে সাক্ষাতের আশা পরিত্যাগ করা হলো। এরপর এক ভোরে জেগে উঠে তাঁবুর কয়েক মিটার দূরে জঙ্গলে সাত জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ওরা আকারে খাট ও ন্যাংটা। তবে কোমরে জড়িয়ে রাখা বেতে সামনে পেছনে ছোট ছোট পল্লব গোঁজা রয়েছে দেখা গেলো। কয়েকজনের গলায় ও কানে জন্তুর হাড় দিয়ে গড়া নেকলেস ও কানের দুল ছিলো। এক জনের কাঁধে ছিলো সেলাই করা ব্যাগ। ব্যাগে ছিলো ফল ও মূল।

আমরা তাবু থেকে ঠেলাঠেলি করে যখন বেরিয়ে আসি তখনো ওরা দাঁড়িয়েছিলো। এরা আমাদের উপর বড়ো ধরনের আস্থা রেখেছিলো। আমরাও দ্রুত যতদূর সম্ভব দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদী অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আমাদের বন্ধুত্বের নমুনা প্রদর্শন করি। নদীতীরের মানুষ তাদের সাথে কথা বলে। কিন্তু বিয়ামী মানুষ তা বুঝতে পারেনি। আমাদের জানা সাধারণ অঙ্গভঙ্গির উপরই আমরা পুরোপুরি নির্ভর করলাম। এগুলো সমর্থন পেলো, যেহেতু এগুলোর বেশ কিছু ওদেরও জানা।

আমরা হাসলাম। বিয়ামী মানুষ হাসি বিনিময় করলো। এই ভঙ্গিটি অদ্ভুত মনে হয়। এটি বন্ধুত্বের সংকেত। এতে ওদের দাঁতের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। দাঁতই

মানুষের একমাত্র প্রাকৃতিক অস্ত্র। কিন্তু হাসির অপরিহার্য উপাদান দাঁত নয়, ওষ্ঠের নড়াচড়া। অন্যান্য প্রাইমেটে এটি প্রশমনের অঙ্গভঙ্গি। তরুণ শিম্পাঞ্জীর জন্য এটি সংকেত। যেমন তরুণটি কর্তৃত্বকারী জ্যেষ্ঠ শিম্পাঞ্জীকে এই সংকেত দিয়ে জানায় যে সে তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে। মানুষের এই অঙ্গভঙ্গিতে সামান্য সংশোধন এসেছে। মুখের প্রান্তদ্বয় টান টান হয়ে উপরে উঠে এবং এই ভঙ্গি স্বাগত সম্ভাষণের ও আনন্দের অভিব্যক্তি। আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, এই অভিব্যক্তি আমরা সম্পূর্ণত মা-বাবা থেকে শিখিনি এবং এটি আমাদের অঙ্গভঙ্গির সংগ্রহশালার অভিন্ন অঙ্গ। জন্মগতভাবে বোবা-কালা শিশুকে খাওয়ানোর জন্য তুললে সে বোবা কালা হওয়া সত্ত্বেও হাসি দেয়।

আমরা বিয়ামীদের সাথে সম্পর্ক পাতার জন্য ব্যগ্র ছিলাম। ওদের দেবার জন্য বিচি, লবণ, ছুরি, কাপড় ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। এসব উপহার তাদের মনকে প্রসন্ন ও উৎসাহী করে তুলেছিলো বলে মনে হচ্ছিলো। আমরা তাদের বোনা থলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভ্রূ তুলেছিলাম প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝতে পারে এবং থলে থেকে ট্যারো গাছের মূল ও কাঁচা কলা বের করে। আমরা আমরা পরস্পর জিনিস লেন-দেন শুরু করি। কোনো একটি জিনিসের দিকে তাক করে আঙুলে আঙুল স্পর্শ করে সংখ্যা গুণতে থাকি এবং মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে থাকি। এ সকল অঙ্গভঙ্গি ওদেরও অপরিচিত নয়। এ কাজে আমরা ভ্রূকেই বেশিরভাগ ব্যবহার করেছি। মুখমণ্ডলে ভ্রূ-কেই বেশি নাড়ানো সম্ভব। সম্ভবত ভ্রূর কাজ হলো চোখে ঘাম গড়িয়ে পড়া রোধ করা। কিন্তু এ কারণে ভ্রূ'র নড়াচড়ার যথার্থতা ব্যাখ্যা করা যাবে না। ভ্রূ'র প্রধান কাজ নিশ্চিতভাবে সংকেত দেওয়া। বিয়ামীরা অসম্মতি জানায় ভ্রূদ্বয়কে কুঁচকে। ভ্রূ কুঁচকে মাথা ঝাঁকি দিয়ে এরা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট জানিয়ে দিলো যে, আমাদের প্রদত্ত-উপহার সামগ্রী তাদের প্রার্থিত নয়। ভ্রূ তুলে আমাদের দেওয়া ছুরি হাতে নিয়ে ওরা বিস্ময় প্রকাশ করে। বিয়ামী দলের পাশে দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়ানো একজনের চোখে চোখ রেখে মুহূর্তের মধ্যে ভ্রূ তুললে এবং সে সঙ্গে মাথাটাকে সামান্য পেছনে ঝুঁকালে, সেই বিয়ামী মানুষও তাই করে। এই ভঙ্গিটি পরস্পরকে মেনে নেওয়া এবং পরস্পরের উপস্থিতিকে স্বাগত জানানোই বোঝানো হয় সম্ভবত।

সারা পৃথিবীতে ভ্রূ নিক্ষেপের ব্যবহার প্রচলিত। ফিজির বাজারে, জাপানী স্টোরে, ব্রাজিলের জঙ্গলে ভারতীয়দের মধ্যে ও ইংল্যান্ডের পাবলিক হাউসে অর্থাৎ সর্বত্র এই ভ্রূ'র ব্যবহার রয়েছে। স্থানভেদে এর সংক্ষিপ্ত অর্থ ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু ভ্রূ সংকেতের ব্যবহার ব্যাপক এবং এটিকে অসংখ্য অসদৃশ গ্রুপের মানুষ ব্যবহার করে। তাতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস হয় যে মানব সম্প্রদায় এই বৈশিষ্ট্যকে বংশগতিসূত্রে সাধারণভাবে অর্জন করেছে। খাড়া মানুষ শিকার পরিকল্পনায় বন্ধুকে সমর্থনায়, সম্মিলিত শিকার ও শব টেনে এনে সাথী ও সন্তানদের আনন্দ দেওয়ায় উত্তমরূপে ভ্রূকে ব্যবহার করেছে।

এর সাহায্যে ওরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। খাড়া মানব উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করেছে। এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে এবং এরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকা থেকে নীলনদের অববাহিকা এবং উত্তর ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি ঘটে। এদের দেহাবশেষ আরো পূর্বে জাভা ও চীনেও পাওয়া গেছে। এরা আফ্রিকা থেকে এশিয়াতে পরিযায়ী হয়েছিলো

নাকি এরা এশিয়ার নরবানরসদৃশ মানুষের উত্তরসূরি এ নিয়ে প্রশ্ন উঠে এখনো। জোরের সাথে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আফ্রিকার কতিপয় দলের মানুষ ইউরোপে পৌঁছেছিলো। গুটিকয় টিউনিসিয়া, সিসিলি ও ইটালির মধ্যকার স্থলসেতু পেরিয়ে গিয়েছিলো। অন্যরা ভূমধ্যসাগর ঘিরে পূর্ব দিকে এবং বলকানের ভিতর দিয়ে দিয়ে উত্তরমুখী পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলো।

দশ লক্ষ বছর আগে ইউরোপে কিছু সংখ্যক খাড়া মানব ছিলো। কিন্তু ৬ লক্ষ বছর আগে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। পরিবর্তনটা হয়েছিলো ক্রমে ক্রমে তবে তা কোনোভাবে স্থায়ী ও অবিরাম ছিলো না। দীর্ঘকাল ধরে আবহাওয়া সুস্থতার দিকে যাচ্ছিলো। উত্তরদিক থেকে বরফ খণ্ডগুলোর অগ্রগমন স্থগিত হয় এবং সাময়িকভাবে পিছুতেও থাকে। তবে সার্বিক প্রবণতা ছিলো শীতলীকরণের দিকে। জল বরফে বন্দী হয়ে পড়ার দরুণ সমুদ্রে জলের স্তর নিচে নেমে যায় এবং অনেক স্থলসেতু বেরিয়ে পড়ে। ফলে শেষতক মানুষ বেরিং প্রণালি পেরিয়ে আমেরিকায় এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপমালা সহ নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়া ছড়িয়ে পড়েছিলো।

ইউরোপে খাড়া মানুষ উত্তরোত্তর শীতল আবহাওয়ার মোকাবেলা করেছিলো। আফ্রিকার সমতলভূমিতে ওরা উদ্ভূত হয়েছিলো। আফ্রিকার আবহাওয়া ছিলো উষ্ণ। দীর্ঘদিন ঠাণ্ডা অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী প্রাণীদের মতো ওদের দেহে ঘন লোম ছিলো না। নিঃসন্দেহে, এমতাবস্থায় বহুপ্রাণী পুনরায় উষ্ণ অঞ্চলে ফিরে গিয়েছিলো, নতুবা মৃত্যুবরণ করেছিলো। দক্ষ, নিপুণ হাত ও উদ্ভাবনী মেধার অধিকারী মানুষকে এর কোনোটি করতে হয় নি। তারা লোমশ প্রাণী শিকার করে শবদেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে গায়ে ব্যবহার করেছিলো এবং আশ্রয় নিয়েছিলো গুহায়।

ফ্রান্সের দক্ষিণে ও স্পেনে এদের অনেক বাসভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের বিশাল চুনাপাথর ঘটিত অববাহিকায়, যেমন ডরডগ্নি এবং পাইরেনিজ পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত পাহাড়সমূহে বড় বড় ফুটোর মতো অসংখ্য গুহা রয়েছে। এ সকল গুহার প্রায় প্রতিটিতে মনুষ্য বসতির চিহ্ন রয়েছে। গুহায় প্রাপ্ত বস্তুসমূহ পরীক্ষা করে আমরা তাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। ওরা হাড়ের সুচ দিয়ে চামড়ার বস্ত্র সেলাই করতে জানতো। তারা সযত্নে বাঁকানো বহু কাঁটাযুক্ত হাড়ের হার্পুন দিয়ে মাছ শিকার করতো এবং জঙ্গলে বর্শা দিয়ে পশুপাখি শিকার করতো। বর্শার মাথায় থাকতো পাথরের ব্লেড। পোড়া কালো পাথর প্রমাণ করে যে ওরা আগুনকে আয়ত্তে এনেছিলো। আগুন ছিলো তাদের জন্য অমূল্য সম্পদ। কারণ শীতে ভীষণভাবে কাঙ্খিত উষ্ণতা পেতো আগুন থেকে। এ ছাড়া আগুনে মাংস ঝলসে নিতো। নইলে তাদের ছোট দাঁত দিয়ে মাংস চিবিয়ে খাওয়া সম্ভব ছিলো না।

পূর্বপুরুষদের দাঁতের চেয়ে ওদের দাঁত আরো ছোট হয়ে যায়। তবে করোটি আকারে বৃদ্ধি পায়। আমাদের করোটির মতো বড়ো। করোটির অভ্যন্তর থেকে ছাপ নিয়ে দেখা যায় মগজের কথা নিয়ন্ত্রণকারী অংশ পূর্ণ বিকশিত ছিলো। কাজেই অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে, এই মানুষেরা একটা ভাষায় কথা বলতো। কথা বলতো জটিল ভাষায় গড় গড় করে। সংক্ষেপে, কেবল কংকালের কথা বিবেচনা করলে, ৩৫,০০০ বছর আগে ফ্রান্সের গুহায়

বসবাসরত মানুষদের সাথে আজকের মানুষের মধ্যে লক্ষণীয় কোনো পার্থক্য নেই। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা আধুনিক সকল মানুষ *Homo sapiens* নামেই ওদের নাম রেখেছিলেন অনেকটা শোভনরীতি পরিহার করে। *Homo sapiens* মানে 'জ্ঞানী মানুষ'।

চামড়ার পোশাক পড়ে, কাঁধে বর্শা ফেলে, ম্যামথ শিকারে যে মানুষটি গুহা থেকে বেরিয়ে আসে তার সাথে নিউইয়র্কের, টোকিওর বা লন্ডনের রাস্তায় মোটরে বসা ফিটফাট, কম্পিউটার প্রিন্টিং নিয়ে আলোচনারত কর্তা ব্যক্তিটির তফাৎ দেহ বা মগজের দীর্ঘকালের বাড়তি বিকাশের ফল নয়। এটি ঘটেছে সম্পূর্ণ নূতন বিবর্তন সূত্রের কারণে।

মানুষ কতকগুলো মেধার বৈগুণ্যে নিজেদেরকে অন্যান্য সকল প্রাণী থেকে বিশিষ্ট করে চিহ্নিত করেছে। আমরা এক সময় মনে করতাম যে আমরাই কেবল যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ব্যবহার করতে পারি। বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি যে তা সত্য নয়। শিম্পাঞ্জী তা পারে। গ্যালপ্যাগোজ–এর ফিঞ্চ পাখিও লম্বা কাঁটা কেটে–ছেঁটে গাছের কোটর থেকে গুবরে পোকার শূককীট বের করার ক্ষেত্রে কাঁটাকে পিনের মতো ব্যবহার করে। শিম্পাঞ্জী ও ডলফিনের যোগাযোগের ভাষা বিষয়ে আরো অধিক তথ্য জানার পর আমাদের ব্যবহৃত জটিল ভাষাকে গৌণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তবে আমরাই একমাত্র প্রাণী যারা প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র আঁকতে পারি। এই মেধার বদৌলতে আমাদের এমন বিকাশ ঘটেছে যা শেষাবধি মানবজীবনে নূতন মাত্রা যোগ করেছে।

ইউরোপের প্রাচীন গুহাগুলোতে চিত্রের প্রথম নকশাগুলো দেখা গিয়েছিলো। গুহায় বসবাসকারী মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবজন্তুর চর্বিপূর্ণ পাথরের আলোকদানীর মৃদু আলোয় পথ দেখে অন্ধকার গর্তে বহু দূর পর্যন্ত গিয়েছিলো সেখানে খাদের অনেক গভীরে, গমনপথে বা প্রকোষ্ঠের দেয়ালে তারা নানান নকশা এঁকেছিলো। সে সব অঞ্চলে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছাতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগে। রঙের জন্য ওরা লাল, বাদামি ও হলুদ গিরিমাটি ব্যবহার হতো। কাঠির আগা ছেঁচে ওরা বুরুশ বানাতো, অথবা আঙুলকে বুরুশের বিকল্প হিসাবে কাজে লাগাতো। কখনো কখনো পাথরে রঙ ছিটিয়ে দিতো। সম্ভবত রঙ ছিটাতো মুখ দিয়ে। কখনো শক্ত পাথর নির্মিত যন্ত্র দিয়ে প্রাচীর খোদাই করতো। কিছু কিছু ভাস্কর্য ও মাটির মডেলও সেখানে পাওয়া গেছে। তাদের চিত্রের প্রায় সকল বিষয় হলো শিকার সম্পর্কিত। যেমন ম্যামথ, হরিণ, ঘোড়া, বন্য গরু–ষাঁড়–ছাগল, বাইসন ও গণ্ডার ইত্যাদি। কোনো কোনো চিত্রে একটার উপর আরেকটা চিত্র আঁকা হতো। নিসর্গের কোনো চিত্র ছিলো না। কদাচিৎ মানুষের চিত্র দেখা যেতো। একটি বা দুটি গুহায় মানুষেরা তাদের বসবাসের বিশেষ স্মৃতি জাগরূক সংকেত রেখে গেছে। হাতের উপর রঙ ছড়িয়ে দিয়ে হাতের ছাপ রেখেছে শিলায়। মনে হয় হাতের বহিঃরেখা স্টেনসিল দিয়ে এঁকে রেখেছে। জীবজন্তুর চিত্রের ভিতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আঁকা হয়েছে সমান্তরাল রেখা, বর্গক্ষেত্র, ঝাঁঝরা এবং বিন্দুর সারি, বক্ররেখা, যেগুলো স্ত্রী জননাঙ্গের প্রতীক মনে করা হয় এবং বরগা–যেগুলোকে তীরের প্রতীক বলা যায়। এগুলো সর্বাপেক্ষা কম দর্শনীয় নকশা হলেও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

এরা কেনো আঁকতো অদ্যাবধি আমরা জানতে পারিনি। হতে পারে নকশাগুলো ওদের ধর্মীয় আচরণের অংশ। বড় ষাঁড়ের চারপাশে আঁকা বরগাকে যদি তীর মনে করা হয়, তাহলে এগুলো শিকার সফল হবার জন্য আঁকা হয়েছিলো। যদি গরু–মোষের ফোলানো পেট আঁকা

হয়েছিলো একে গর্ভবতী বোঝানোর জন্যে, তাহলে ধর্মীয় আচরণ বৃদ্ধিকালে পালে পালে শিকার লাভ নিশ্চিত করার জন্যও এ ধরনের চিত্র আঁকা হয়ে থাকবে। হতে পারে যে ওদের অনুষ্ঠান কম জটিল ছিলো এবং জনগণ আনন্দ পেতো বলেই কেবল আঁকতো। শিল্পের জন্যই শিল্পকর্ম করে পুলকিত বোধ করতো। এ ব্যাপারে সম্ভবত বিশ্বজনীন একক ভাষ্য কল্পনা করা ভুল হবে। অতি প্রাচীন চিত্রের বয়স প্রায় ৩০,০০০ বছর। সাম্প্রতিককালের চিত্রের বয়সও ১০,০০০ বছর হতে পারে। এই দুটো সময়ের মধ্যে পুরো পাশ্চাত্য সভ্যতার বয়স প্রায় ছয় গুণ। কাজেই অনুমান করার কারণ নেই যে সকল চিত্রের পেছনে একই উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিলো। যেমন আধুনিক রেস্তোরার প্রেক্ষাপটে বাজানো সংগীতের সাথে গ্রেগরের কালের সংগীতের একই উদ্দেশ্য বলা সঙ্গত হবে না। সেগুলো ঈশ্বরকে নিবেদিত হয়েছিলো বা তরুণদেরকে উজ্জীবিত করেছিলো অথবা সম্প্রদায়ের লোকদেরকে প্রেরণা জুগিয়েছিলো। তবে সব কিছুর পেছনে নিশ্চিতভাবে যোগাযোগ রক্ষার গরজটিই ছিলো মুখ্য। আজো এ সবের যোগাযোগ রক্ষার ক্ষমতা লক্ষণীয়। এগুলোর সার অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হলেও আমরা এগুলোর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও নান্দনিক সংবেদনশীলতার প্রতি সাড়া না দিয়ে পারি না। এই সংবেদনশীলতার সাহায্যে শিল্পীরা ম্যামথের দেহের বহিরাকৃতি, পালের এন্টলার হরিণের শাঙ্কবাকৃতির মাথা অথবা অস্পষ্ট বাইসনের চিত্র এঁকেছিলো।

পৃথিবীর অন্যত্র গুহায় শিকারী মানুষের শিলাচিত্র আবিষ্কার হওয়া সম্ভব। উদ্দেশ্যও বের করা যাবে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এখনো শিলায় নকশা আঁকে। নকশাগুলো নানা দিক দিয়ে ইউরোপে অঙ্কিত প্রাগৈতিহাসিক নকশারই মতো। এগুলো আঁকা হয় পাথর ও শিলার আশ্রয়স্থলে। এখনো এমন জায়গায় আঁকা থাকে যেখানে পৌঁছানো খুবই কষ্টসাধ্য। আঁকা হয় আকরিক মাটি দিয়ে। একটা চিত্রের উপরে আরেকটি চিত্রও আঁকা হয়। চিত্রের মধ্যে রয়েছে বিমূর্ত গাণিতিক নকশা, হাতের ছাপ, প্রায়শ যে সকল খাদ্যের উপর ওদের জীবন নির্ভরশীল সেসবের চিত্র। যেমন ব্যারামুন্ডি মাছ, কচ্ছপ, টিকটিকিজাতীয় সরীসৃপ ও ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি।

এ সকল নকশা বার বার আঁকা হয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে জীবজন্তুর চিত্র যদি সজীব থাকে তাহলে চারপাশের জঙ্গলে ওদের বংশবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। অন্যত্র ছবি আঁকাকে পূজা হিসেবে মনে করা হয়। কেন্দ্রীয় মরুভূমির ওয়ালবিরি সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশাল আত্মাবিশিষ্ট সাপ দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস করে। রঙধনু হলো সরীসৃপ। ঝড়ের পর এর রঙবর্ণে রঞ্জিত লেজ আকাশে আবির্ভূত হয়। বৃদ্ধেরা বলে, দীর্ঘ বালিপাথরের পাহাড়ের গোড়ার গর্তে এটি বাস করে। পাহাড়টি রয়েছে উপজাতিদের রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে। কেউ সাপটিকে চাক্ষুষ করেনি কখনো, যদিও বালিতে এর চলাচলের চিহ্ন থাকে। বহু প্রজন্ম আগে মানুষ শিলায় সাপ-ঈশ্বরের মূর্তি এঁকেছিলো। মূর্তিটি হলো বিশাল ঢেউ খেলানো বক্ররেখা। সাদা গিরিমাটি দিয়ে আঁকা। বক্ররেখার কিনারায় দেওয়া হয়েছিলো লাল রঙ। এর পাশে ছিলো অশ্বখুরাকৃতির চিত্র। প্রাগৈতিহাসিক কালের জ্যামিতিক নকশার সাথে এসবের মিল রয়েছে। অশ্বখুরাকৃতি চিত্র সাপের উত্তরসূরি মানুষের প্রতীক। এসব ছাড়াও পাহাড়ে অন্যান্য সংকেত, সমান্তরাল রেখা, কেন্দ্রানুগ বৃত্তরাজি, বিন্দু ও বরগা রয়েছে যেগুলো প্রাচীন প্রাণীর পদচিহ্ন, সাপ ও বর্শার প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রজন্মের পর প্রজন্মের মানুষ এ সকল নকশা বার বার এঁকেছে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওরা পূজা করেছে এবং সৃষ্টিকর্তা সাপ-ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করেছে। বৃদ্ধ ওয়ালবিরি

মানুষেরা সেখানে নিয়মিত গিয়ে প্রাচীন গাঁথাগুলো উচ্চারণ করতো এবং এগুলো স্মরণ করে ধ্যান করতো। সাপের স্মৃতিচিহ্ন, গোল পাথরে খোদাইকৃত বিমূর্ত প্রতীকগুলোকে শিলার ফাটলে রেখে দেওয়া হতো। বৃদ্ধেরা শ্রদ্ধাভরে তা তুলে নিয়ে লাল গিরিমাটি ও ক্যাঙ্গারুর চর্বি দিয়ে লেপন করতো। তারপর বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতো। তরুণদেরকে সাপের মূর্তির নিচে নিয়ে যাওয়া হতো তাদের মনে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য, প্রতীকসমূহের অর্থ বোঝানোর জন্য এবং মূকাভিনয় ও গান বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য।

এটা অনুমান করার কোনো কারণ নেই যে ফ্রান্সের প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীদের সাথে আমাদের সম্পর্কের চেয়ে আদিবাসীদের সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্টতর ছিলো। আদিবাসীদের জীবনযাপন প্রণালি এখনো পাথর যুগের মানুষের জীবনযাপন প্রণালির খুব কাছাকাছি। *Homo sapiens*-রাও পৃথিবীর সর্বত্র বহু বছর ধরে এরকম জীবনযাপন করতো। জীবজন্তু শিকার করতো, ফল, বীজ ও মূল সংগ্রহ করতো। এ ধরনের জীবন বিপর্যয়কর ও কর্কশ। পুরুষ, মহিলা ও শিশু নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশের নিষ্করুণ বাছাইয়ের সম্মুখীন হতো। অসতর্ক ও ধীরগতির মানুষ শিকারী প্রাণীর আহারে পরিণত হতো। দুর্বলেরা উপোসে মারা পড়তো এবং বৃদ্ধেরা খরার কোপানলে পড়ে জীবনধারণে ব্যর্থ হতো। বংশগতি বৈশিষ্ট্যের বিবিধায়নের কারণে কেউ কেউ প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচার সুযোগ পেয়েছিলো। এরা টিকে থাকে। প্রজনন ঘটায় এবং পরবর্তী প্রজন্মে এই অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সঞ্চালিত করে।

যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করতো সে পৃথিবীর প্রভাব পড়েছিলো তাদের দেহে এবং তাদের জিনের মধ্যে দেহে একেবারে সম্প্রতি পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিলো। উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী অস্ট্রেলীয় আদিবাসী ও আফ্রিকার মানুষের চামড়া কালো। ত্বক রঞ্জনের কাণ্ডটি কয়েকবার অর্জিত হয়েছিলো এবং তা ঘটেছিলো স্বতন্ত্রভাবে। কাজেই এক কালো চামড়ার মানুষের সাথে অন্য কালো চামড়ার মানুষের নিকট সম্পর্কের ধারণাটি অবান্তর। অতিরিক্ত সূর্যালোক খুব ক্ষতিকর হতে পারে। সাদা চামড়ার উপর অত্যধিক সূর্যরশ্মি পড়লে তা ক্যানসার উৎপাদন করতে পারে। কালো রঙ এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বর্ম হিসেবে কাজ করে। আফ্রিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বহু মানুষ এ ধরনের পরিবেশে বাস করেও অন্য একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সেটি হলো পাতলা কৃশ তনু। চারপাশের উষ্ণ পরিবেশের দরুণ এমন দেহগঠন অর্জিত হয়েছে। দেহের ওজনের তুলনায় চামড়ার আয়তন বেশি থাকে। বিস্তৃত ত্বকে বাতাস ও বাষ্পীভূত ঘর্ম দেহকে ঠাণ্ডা রাখে।

শীতল অঞ্চলে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। অল্পস্বল্প যে সূর্যালোক পড়ে তা স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সূর্যালোক ছাড়া দেহ ভিটামিন ডি তৈরি করতে পারে না। কাজেই উত্তর গোলার্ধে, যেখানে সূর্য প্রায় ঢাকা পড়ে থাকে, সেখানে যেমন স্ক্যান্ডিন্যাভিয়ার মানুষদের গায়ের রঙ ফর্সা। সুমেরু বৃত্তের অধিবাসী এস্কিমোদেরও ফ্যাকাশে সাদা রঙের ত্বক। এছাড়া এদের দেহগঠন মরুবাসীদের দেহগঠনের বিপরীত। এরা খাটো ও বামনাকৃতির। দেহের আয়তন ওজনের অনুপাতে কম বিধায় দেহ তাপ সংরক্ষণে সক্ষম হয়। ওদের মুখমণ্ডল লোমহীন। এটি সম্ভবত ঠাণ্ডায় অভিযোজন করার কারণেই ঘটে থাকবে। তুষার অঞ্চলে গোঁফ দাঁড়ি তাদের জন্য বিড়ম্বনার কারণ হতে পারতো।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা এ ধরনের বৈশিষ্ট্য যেহেতু জিনের মধ্যে বা বংশগতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তারা যেখানেই বাস করুক না কোন, প্রজন্মের পর প্রজন্মে বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হবে। অবশ্য ততোদিনই পরিলক্ষিত হবে যতোদিন যে প্রক্রিয়ায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো অস্তিত্ব পেয়েছে সেগুলো হাজার বছর ধরে যদি অপরিবর্তিত থেকে যায়।

একজোটে চলা শিকারজীবী গোষ্ঠীর মানুষের অস্তিত্ব আজো বর্তমান। অস্ট্রেলীয় আদিবাসী ও আফ্রিকার বুশম্যানরা মরুভূমিতে বাস করে। অন্য দলগুলো মধ্য আফ্রিকা ও মালয়েশিয়ার বহুল বৃষ্টি ঝরা অরণ্যে তাদের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসে খুঁজে নেয়। তাদের চারপাশের প্রাকৃতিক জগতে তারা শান্তিতে বাস করে। এর কোনো ব্যত্যয় হয় না। যখন যা প্রয়োজন তার তাৎক্ষণিক যোগান আসে। কোথাও এদের অতিরিক্ত সংখ্যাধিক্য নেই। তাদের পরমায়ু সংক্ষিপ্ত। খাদ্যাভাব ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় এদের জন্মহার কমায় ও শিশু মৃত্যুর কারণ হয়। মানুষের অস্তিত্বের পর থেকেই মানুষকে এ অবস্থায় কাটাতে হয়। প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে খাড়া মানবকে এমন অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়। এর প্রায় নয়শত নব্বই বছর পরেও তারা এবং তাদের উত্তরসূরি *Homo Sapiens* এই রকম জীবন যাপন করতে হয়। সে সময়ের পুরোটা জুড়ে আমাদের বিবেচনা মতে, মানুষের সংখ্যা প্রতি একশ বছরে শতকরা এক ভাগের এক দশমাংশ বেড়েছিলো।

পরে নাটকীয় দ্রুতির সাথে, প্রায় আট হাজার বছর আগে, অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। অরণ্য ও মরুভূমির বাইরে স্থলভাগে মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এদের লক্ষ্য ছিলো বন্য ঘাস, যা আজকের মতো তখনা গজাতো। বালুগঠিত পাহাড় ও মধ্যপ্রাচ্যের উর্বর বদ্বীপসমূহ। এখানে অফুরন্ত বীজের সমাবেশ ঘটে এবং তা পূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করে। ফল সহজে আহরণ করা যায় এবং বাতাসের সাহায্যে খোল থেকে বীজ আলাদা করা সহজ হয়। নিঃসন্দেহে, মানুষ মুক্তাঞ্চলে শিকারে যাবার সময় যেখানে বীজ দেখেছিলো সেখানে তা সংগ্রহ করেছিলো এবং খেয়েছিলো। কিন্তু তার ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটলো তখনই যখন সে বুঝতে পারলো যে বন্য গাছ কখন পাওয়া যাবে তার ভরসায় অপেক্ষা করা অনুচিত হবে। তার সংগৃহীত সকল বীজ আহার না করে কিছু বীজ যদি সুবিধামতো জায়গায় রোপণ করে তাহলে তাকে পরবর্তীকালের গ্রীষ্মে এই গাছের খোঁজে আর বেরোতে হবে না। সে তার বীজক্ষেতের পাশে স্থায়ী নিবাস গড়তে পারে এবং শস্য জন্মানোর অপেক্ষায় থাকতে পারে। সে বীজ সংগ্রাহক না হয়ে চাষায় পরিণত হতে পারে। সে স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি বানিয়ে গ্রামে বসবাস করতে পারে। একইভাবে তারা প্রথমদিকে শহরের পত্তন ঘটায়।

সিরিয়ার উরুক গড়ে উঠেছিলো ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর নলখাগড়া আচ্ছাদিত জলাভূমিবিশিষ্ট বদ্বীপে। বর্তমানে এটি একটি মরুভূমি। শহরটি জটিল প্রকৃতির ছিলো। এর চারপাশ ঘিরে ছিলো শস্যভূমি। মানুষ ছাগল ও ভেড়ার পাল পুষতো। এরা পোড়া মাটির পাত্র বানাতো। এখনো সেখানে ওসবের ভগ্নাংশ দেখা যায়। শহরের কেন্দ্রে একটি কৃত্রিম পাহাড় নির্মাণ করা হয়েছিলো। পোড়া মাটির ইট এতে ব্যবহার করা হয়েছিলো। ইটগুলো নলখাগড়ার বিনুনী দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। উরুকের নাগরিকদের স্থায়ী জীবনযাপনের ফলে যোগাযোগের কৌশল উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছিলো। অবিরাম ভ্রমণে যেসব লোক দিন কাটাতো, তাদের কাছে অল্পস্বল্প ব্যবহারের জিনিসপাতি থাকতো। যারা ঘরে বাস

করতো তাদের কাছে সব জিনিসই থাকতো। উরুকের একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছোট একটি কাদা মাটির তৈরি টেবলেট পাওয়া গিয়েছিলো। এটি খোদাই করা ছিলো। এটিই আদিতম লিপিখণ্ড। আজো কেউ জানে না সত্যিই আসলে এর অর্থ কি। মনে হয় সেটি খাদ্য বরাদ্দের হিসাব। আকৃতি দেখে মনে হয় তারা যে সকল বস্তু ব্যবহার করতো তারই প্রতিকৃতি। তবে এরা প্রকৃতিকে হুবহু অনুকরণ করেনি। চিহ্নগুলো সাধারণ নকশার মতো। যাদের জন্য লেখা হয়েছিলো তারা অবশ্যই তা বুঝতে পারতো।

টেবলেট পোড়ানো হলে, মানুষ বিবর্তন তরঙ্গকে নূতন খাতে প্রবাহিত করে তা ধরা পড়ে। বর্তমানে স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তি অন্যদের কাছে তথ্য পৌছাতে পারে নিজস্ব উপায়ে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির উপস্থিতি বা তার অবিরাম অস্তিত্ব বজায় রাখা অপরিহার্য নয়। অন্যত্র থাকা মানুষ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষরা তার সাফল্য ও ব্যর্থতার, তার অন্তর্দৃষ্টি ও তার মেধার বিষয় জানতে পারে। তারা যদি ইচ্ছে করে, ঘটনাবলি বাছাই করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সার সংক্ষেপ পেতে পারে, যা তাদেরকে বিজ্ঞ করে তুলবে।

নীল নদীর অববাহিকা, মধ্য আমেরিকার জঙ্গল ও চীনের সমতল ভূমির অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষও একই ধরনের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। বিষয়কে নকশার মাধ্যমে উপস্থাপনের বিষয়টি আরো সহজ হয়েছে এবং এর নূতন অর্থ দাঁড়িয়েছে। এগুলোকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি উৎপাদন করা যায়। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশের প্রান্তদেশে, জনসাধারণ একটা ব্যাপক পদ্ধতিতে এগুলোর বিকাশ সাধন করেছে। তারা কথা বলার সময় ব্যবহৃত প্রতিটি ধ্বনিকে পাথর কেটে, কাদা মাটিতে খাঁজ কেটে বা কাগজে এঁকে আকৃতি দিয়েছে।

অভিজ্ঞতার বিনিময় ও জ্ঞানের বিস্তারের ফলে বিপ্লব সাধিত হয়। এক হাজার বছর আগে চীনারা কারিগরি উপায় উদ্ভাবন করে এ ধরনের চিহ্নগুলোর বহুল উৎপাদনে জোর দিয়েছিলো। ইউরোপে যদিও আরো অনেক পারে, গুটেনবার্গ স্বতন্ত্রভাবে চলনশীল টাইপের মাধ্যমে ছাপার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছিলেন। কাদার টেবলেটের উত্তরসুরি আজকের গ্রন্থাগারগুলোকে গোষ্ঠীসমূহের মগজের সমাবেশ বলা যেতে পারে। যা একাধিক মানুষের মগজের স্মরণে ধরে রাখা অসম্ভব। এ ছাড়াও এগুলোকে অতি দৈহিক ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লেইক এসিড বা ডিএনএ হিসেবে দেখা যেতে পারে যা আমাদের বংশগতিসূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীর অনুসঙ্গ। এসব আমাদের আচরণ নিরূপণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী, যেমনটি আমাদের কোষকলার ক্রোমোজোম আমাদের দেহের ভৌতিক কাঠামো নিরূপণ করে। এটি ছিলো আমাদের পুঞ্জীভূত জ্ঞান, যা শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে প্রকৃতির শাসন থেকে রেহাই পাবার পথ বাতলে দিয়েছিলো। কৃষি প্রযুক্তি, কারিগরি কৌশল, চিকিৎসা, প্রকৌশল, গণিতশাস্ত্র ও মহাকাশ ভ্রমণ বিষয়ক আমাদের জ্ঞান সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলে এবং গ্রন্থাগারকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন সব বিষয়কে মরুদ্বীপে যদি পরিত্যাগ করা হয় তাহলে যে কেউ দ্রুত শিকারীও সংগ্রাহকের জীবনযাপনে ফিরে যাবে।

পাখনার বদৌলতে মাছ ও পালকের বদৌলতে পাখি যথাক্রমে জলে ও বায়ুতে বসবাসে সফল হয়েছিলো। সংযোগ রক্ষা ও সংযোগ বার্তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মানুষের আগ্রহ তার সাফল্যের চাবিকাঠি। আমাদের পরিচিতিকে আমরা সীমাবদ্ধ করি না বা তা কেবল আমাদের

প্রজন্মের আওতাতেই রাখি না। পুরাতত্ত্ববিদেরা উরুক ও অন্যান্য প্রাচীন নগরী থেকে অতি কষ্টে সযত্নে উদ্ধার করা কাদা-লিপির মর্মোদ্ধার করতে চান এই আশায় যে, কোনো দাম্ভিক নগরপ্রধানের কুলপঞ্জির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো বাণী বহু আগে কতিপয় নাগরিক রেখে গেছে কিনা তা আবিষ্কার করা। আমাদের নগরসমূহের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আণবিক বিস্ফোরণেও টিকে থাকার মতো মজবুত স্টিলের স্তম্ভে বাণী খোদাই করে রাখছেন। বিজ্ঞানীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, গণিতশাস্ত্রের ভাষাই হলো সমস্ত ভাষার পরিশীলিত রূপ। বিজ্ঞানীরা একটি বিশ্বজনীন সত্যকে নির্বাচন করেন। তাঁদের বিশ্বাস অনন্তকাল ধরে এই সত্যকে চিহ্নিত করা হবে। বিশ্বজনীন সত্য যেমন আলোক-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য একটি ফর্মূলা বা সূত্র। ছায়াপথের অন্য নক্ষত্রপুঞ্জে এই সূত্রানুযায়ী রশ্মিকে ছুঁড়ে দিয়ে দাবী করুক যে, তিনশ কোটি বছরের বিবর্তনের পর এই পৃথিবীতে একটি প্রাণী উদ্ভূত হয়েছে। যে প্রাণী প্রথমবারের মতো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও হস্তান্তরের উপায় উদ্ভাবন করেছে।

বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদ কেবল একটি প্রজাতির জন্য নিবেদিত। সে প্রজাতি আমরা বা মানুষ। এতে এই ধারণা হতে পারে যে, মানুষই বিবর্তনের চূড়ান্ত বিজয়। কোটি কোটি বছর ধরে সে সব বিকাশ সাধিত হয়েছে, সে সবের লক্ষ্য মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধারণার সপক্ষে সমর্থন যোগানোর মতো কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই এবং অনুমান করারও যুক্তি নেই যে, ডাইনোসরের চেয়ে আমাদের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর হবে। উদ্ভিদ ও পাখি, পোকামাকড় ও স্তন্যপায়ীতে এখনো বিবর্তন প্রক্রিয়া চলছে। কাজেই এটি ঘটা সঙ্গত যে, যে কোনো কারণে যদি মানুষকে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে হয়, তাহলে অন্য যে কোনোখানে নম্র, অপ্রতিরোধী প্রাণী নূতন আকারে বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের জায়গা দখল করবে।

কিন্তু যদিও প্রাকৃতিক জগতে আমাদের বিশেষ অবস্থান আছে বলে আমরা অস্বীকার করি, তা অনন্তের দৃষ্টিতে নমনীয় ও শোভন বলে প্রতিভাত হলেও, এটি আমাদের পক্ষে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার অযুহাত হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। সত্যিকারের ঘটনা হলো, আমরা বর্তমানে যেভাবে পৃথিবীর সব কিছুকে পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছি, অতীতে জীবিত বা মৃত কোনো প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। আমরা পছন্দ করি বা না করি, পৃথিবীর ভয়ংকর দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। আমাদের হাতে কেবল আমাদেরই ভবিষ্যৎ নয়; এই পৃথিবীর অংশী অন্যান্য জীবিত প্রাণীর দায়িত্বও আমাদেরকে বহন করতে হবে।

BANSDOC Library
Accession No. 18785

BANSDOC Library
Dhaka